নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী

পঞ্চম খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, ১৩৬২
মুদ্রণ সংখ্যা ২২০০

সম্পাদনা
আশা দেবী
অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট
অংকন : গৌতম রায়
মুদ্রণ : চয়নিকা প্রেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও বাণী মুদ্রণ ১২ নরেন সেন স্কোয়ার কলকাতা ৯ হইতে বংশীধর সিংহ কর্তৃক মুদ্রিত।

॥ সূচীপত্র ॥

পদসঞ্চার

কল্যাণীয়া পাখীকে

কথামুখ

"Quim te trouxe aqua ?"

তেরোজন সহচর সেনাপতি একসঙ্গে মাথা নিচু করে দাঁড়ালো। তারপর চোখ তুলে তাকাতেই সকলের দৃষ্টি অন্ধ হয়ে এল কয়েক মুহূর্তের জন্যে।

দরবার নয়—ইন্দ্রপুরী। প্রশস্ত—বিশাল। বহুমূল্য পাথরে দেওয়ালগুলি অলংকৃত ; নানা রঙের রেশম কিংখাবের ছড়াছড়ি। এই একটি ঘরেই যে পরিমাণ মণি-মাণিক্য সঞ্চিত, রাজা মানোএলের গোটা লিসবোয়া শহরেও তা আছে কিনা সন্দেহ। সেই মণি-মাণিক্যের দীপ্তি পড়ে ধাঁধা লেগে গেল বিদেশীদের বিহ্বল চোখে।

কিন্তু এদের দেখেও রাজ-দরবারেও চাঞ্চল্যের সাড়া পড়েছে একটা। মস্তকাবরণে আচ্ছাদিত, দীর্ঘশ্মশ্রু এবং দীর্ঘকায় আরব বণিকেরা ভ্রূকুটি করল একসঙ্গে, কানাকানি করল পরস্পর, জরির খাপের মধ্যে বাঁকা মরক্কো ছোরার বাঁটেও স্ফীত আঙুল এসে পড়ল কারো কারো। সভাপণ্ডিতেরা কাব্যগ্রন্থ থেকে মুখ তুলে তাকালেন জিজ্ঞাসু নেত্রে। যে তাম্বুলিক জামোরিণের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে তাম্বুল সরবরাহ করছিল, হঠাৎ তার হাত কেঁপে উঠল, একটা খিলি খসে পড়ল মাটিতে। আর বিশালকায় মাংসাশী নায়ারদের কটিবন্ধে অনেকগুলি বক্রাগ্র তলোয়ার ঝলমলিয়ে উঠল—সাড়া দিলে অশুভ ঐকতানের মতো।

কালিকটের জামোরিণ—অর্থাৎ রাজা—দৈনিক দরবারে বসেছেন। চৌদ্দজন বিদেশীর দিকে তিনি একবার আড়চোখে তাকালেন মাত্র। তারপর সামনের দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন, সুলেমান, তোমার কি আর্জি ?

উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করলেন মোপ্‌লা বণিক সুলেমান। বললেন, বন্দরের অল্প দূরেই একদল লোক আবার আমার জাহাজ আক্রমণ করেছিল। বহুমূল্য মুক্তা আর মশলা লুঠ করেছে তারা। আমি প্রায় সর্বস্বান্ত। জামোরিণ প্রতিকার করুন।

তৎক্ষণাৎ কোনো উত্তর দিলেন না জামোরিণ। মণি-বলয়িত দক্ষিণ হাতখানি ঈষৎ মেলে দিলেন তিনি, তাম্বুলিক সসম্ভ্রমে সে হাতে পানের একটি খিলি রক্ষা করল। পানটি মুখে দিলেন রাজা, মাত্র কয়েক মুহূর্ত চিবিয়েই নিক্ষেপ করলেন পিকদানিতে। তাঁর কৃষ্ণ ললাটে চিন্তার রেখা বিকীর্ণ।

মোপ্‌লা বণিক আবার করুণ স্বরে বললেন, জামোরিণ বিচার করুন।

জামোরিণ ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন একবার। চূড়াকার কেশশীর্ষে গুচ্ছবদ্ধ পদ্মরাগ আর নীলকান্ত মণি ঝকমকিয়ে উঠল।

প্রশান্ত গম্ভীর গলায় বললেন, আচ্ছা, শীগগিরই এর ব্যবস্থা হবে।

আরব বণিকদের ভ্রূকুটি-ভয়াল দৃষ্টির সামনে তেমনি নীরবে দাঁড়িয়েছিল চৌদ্দজন। দেশীয় ভাষার এই সমস্ত কথাবার্তা বিন্দুমাত্র বুঝতে পারছিল না তারা। শুধু নির্বোধ ভঙ্গিতে লক্ষ্য করছিল বাণিজ্যলক্ষ্মীর বরপুত্র জামোরিণকে।

এলাচলতা আর দারুচিনি-বীথিকার গন্ধমর্মরে ভরা এক বিচিত্র তটভূমি। পর্তুগালের মৃত্তিকার সঙ্গে কী আকাশ-পাতালের ব্যবধান। নীল-শ্যামলের এক অপরূপ দিগন্ত, তার কোলে হিন্দু ভাস্কর্যের এক অপূর্ব নগরী। সে নগরীর রাজা যেন কোন্ দূর স্বপ্নলোকের অধিবাসী। তাঁর মাথার ওপর রত্নছত্র, পরিধানে আশ্চর্য এক সূক্ষ্ম বস্ত্র—মসলিন; তার প্রতিটি প্রান্ত পর্যন্ত রত্নে খচিত। জামোরিণের কথা দূরে থাক, তাঁর বীজনকারী ভৃত্যের অঙ্গেও যে অলঙ্কারসজ্জা তা দেখেই রাজা মানোএলের ঈর্ষায় জর্জরিত হওয়া উচিত।

বিদেশীদের সেনাপতি একবার মুখ ফেরালো পাশের সৈন্যটির দিকে। অস্ফুট স্বরে জানতে চাইল ঃ তোমার কী মনে হয় পাউলো ?

পাউলো বুকের ওপর প্রলম্বিত ক্রুশটি স্পর্শ করল একবার। কোমরের তলোয়ারে হাত পড়ল কি নিতান্তই একটা যোগাযোগেই ? চাপ-দাড়ির আড়ালে ধারালো দাঁতের ঝিলিক জেগে উঠল পাউলোর—হয়তো হাসল সে।

—রত্নখনির সন্ধান মিলল মনে হচ্ছে। এবার আমাদের পথ করে নিতে হবে।

—রাজা মানোএলের জয় হোক—স্বগতোক্তি করলে সেনাপতি। কালো চামড়ার টুপি আঁটা কপালে রেণু রেণু ঘাম জমে উঠেছে। তলোয়ার-ধরা কঠোর হাতে কপালটা মুছে ফেলল। আরব বণিকেরা কেমন ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতেই যে তাকিয়ে আছে! ক্ষুধিত নেকড়ে যেন একপাল!

—ক্রীশ্চান ?—জামোরিণ ডাকলেন।

শরীরের পেশীগুলো সজীব হয়ে উঠল সেনাপতির—সামনে ঝুঁকে পড়ে জানালো সসম্মান অভিবাদন। আর মণিবলয়িত বাহু তুলে তাকে কাছে আসবার জন্যে সংকেত জানালেন জামোরিণ। অনামিকার বিশাল হীরকখণ্ড থেকে একটা তীব্র আলো এসে আঘাত করল সেনাপতির চোখে—এগিয়ে গেল মন্ত্রমুগ্ধের মতো।

জামোরিণ বললেন, কী চাও তোমরা ?

আরব বণিকদের দৃষ্টিতে শান পড়ছে। খাপ থেকে বেরিয়ে আসা মরক্কো ছোরার চাইতেও যেন তা নগ্ন। অস্বস্তি বোধ করল সেনাপতি। তারপর সতর্ক হয়ে বললে, আমাদের মহামান্য দিগ্বিজয়ী পর্তুগালের রাজার কাছ থেকে কিছু সংবাদ এনেছি। নিভৃতেই নিবেদন করতে চাই।

—বেশ। দরবার শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো তা হলে। তোমাদের বক্তব্য শোনা যাবে তারপর।

সেনাপতি আবার সসম্ভ্রমে অভিবাদন করলেন। বললেন, দীর্ঘ সমুদ্র-

যাত্রায় আমরা ক্লান্ত, সম্প্রতি ক্ষুধার্তও বটে। কাজ শেষ হয়ে গেলে জাহাজে ফিরে আমরা বিশ্রাম করতে পারতাম।

জামোরিণ অল্প একটু হাসলেন।

—ক্রীশ্চান, তোমরা ব্রাহ্মণ রাজার আতিথ্য গ্রহণ করছো, অতিথির প্রতি কর্তব্য আমাদের জানা আছে। কোনো চিন্তা নেই, তোমরা অপেক্ষা করো।

কিন্তু সেনাপতি স্বস্থানে ফিরে আসতে না আসতেই কাণ্ড হল একটা। আরব বণিকদের পক্ষ থেকে একজন বর্ষীয়ান প্রতিনিধি উঠে দাঁড়ালেন। মেহেদিরঙা দাড়িতে আঙুল বুলোতে বুলোতে তিনি বললেন, আমারও একটি বক্তব্য আছে।

জামোরিণ চোখ তুললেন।

বণিক বললেন, এই বিদেশী ক্রীশ্চানদের এখনো চেনা যায়নি ভালো করে। কী এদের মতলব তাও বোঝবার উপায় নেই। এ ক্ষেত্রে জামোরিণ নিভৃতে এদের সঙ্গে দেখা করেন, সভাস্থ ব্যক্তিরা তা চান না।

উৎকর্ণতায় দরবার থমথম করছিল, হিল্লোলিত হয়ে উঠল এইবার। আহত মধুচক্রের মতো একটা অনুচ্চ গুঞ্জন পরিক্রমা করে ফিরতে লাগল চারদিক। বিশালকায় নায়ারদের কটি-বিলম্বিত তলোয়ারগুলি ঝনঝনিয়ে উঠল একসঙ্গে। সেনাপতি উঠে দাঁড়াতে গেল তীরবেগে, পাশ থেকে হাত চেপে ধরল পাউলো।

মণিবলয়িত বাহু স্বস্তিকের ভঙ্গিতে প্রসারিত করলেন জামোরিণ।

—রাজভক্ত বণিককে ধন্যবাদ; কিন্তু তাঁকে জানাচ্ছি যে তাঁদের উৎকণ্ঠা অহেতুক। দু-একজন বিদেশী শত্রুর চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষার শক্তি কালিকটের রাজার আছে। তাছাড়া ক্রীশ্চানদের যখন একবার আমি কথা দিয়েছি, তখন কিছুতে তার আর অন্যথা হতে পারে না।

—জামোরিণের যা অভিপ্রায়!

রক্তমুখে বসে রইলেন আরব আর মোপ্‌লা বণিকেরা। তাঁদের নেতার চোখ পড়ল ক্রীশ্চান সেনাপতির তলোয়ারের দিকে। কী অস্বাভাবিক দীর্ঘ! ওই তলোয়ার ধরে হাতখানা বাড়িয়ে দিলে ওর অগ্রভাগ তাঁর বুকখানাকে স্পর্শ করতে পারে। অভিজ্ঞ বহুদর্শী বণিক অকারণেই শিউরে উঠলেন একবার।

এর মধ্যেই কখন পরিচারকেরা ফল আর স্বাদু পানীয় এনে উপস্থিত করেছে বিদেশী অতিথিদের জন্যে। সুমিষ্ট তরমুজ আর এলাচি এবং মশলার গন্ধভরা সরবৎ আস্বাদন করতে করতে একসঙ্গে একই কথা ভাবতে লাগল চৌদ্দজন বিদেশী। কবে তাদের তলোয়ারের মুখে তরমুজের মতো টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এই দেশ—রাজা মানোএল সম্রাট মানোএল হয়ে মুখে তুলে ধরবেন প্রতাপের পানপাত্র?

শুধু আরব বণিকদের দিকে ভুলেও তারা চেয়ে দেখল না একবার।

নীল সমুদ্রের কোলে প্রাচ্যের সেরা বন্দর কালিকট।

ঘাটে সারি সারি বিদেশী জাহাজ। নানা কারুকার্য খচিত, নানা আকৃতি। চট্টগ্রাম-সপ্তগ্রামের ময়ূর আর মকরমুখ বাণিজ্যপোত, ড্রাগনচিহ্নিত চৈনিক জাহাজ, বিপুলকায় মিশরীয় বাণিজ্যতরী, আরব আর পারস্য দেশীয় অর্ধচন্দ্রাঙ্কিত পোতবহর।

বন্দরের সঙ্গেই নগরের প্রধান বাণিজ্যাঞ্চল। ছোট বড় আচ্ছাদনের নিচে লবঙ্গ, দারুচিনি, আদা ও অন্যান্য মশলা স্তূপীকৃত, গন্ধে বাতাস সমাকুল। এইগুলিই প্রধানত কালিকটের বন্দর থেকে দেশে-বিদেশে রপ্তানি হয়। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্বন্ধের ফলে বন্দরের অসাধারণ সমৃদ্ধি। দূর সমুদ্রবক্ষ থেকে নগরের শিলারচিত প্রাসাদগুলি যেন স্বপ্নলোকের মতো দেখায়—দিগন্তরেখার ওপার থেকেই বিদেশীর লুব্ধতা একে লেহন করতে থাকে।

সমুদ্রতীরে খানিকটা প্রশস্ত শিলাচত্বরের ওপর একটি বিরাট মসজিদ। রক্তবর্ণে রঞ্জিত তার মহাকায় গম্বুজ—সমুন্নত মিনার দুটি কালিকটের সমস্ত প্রান্ত থেকেই চোখে পড়ে। ভেতরে নমাজ ও জমায়েতের জন্যে বিস্তীর্ণ অঙ্গন। বিভিন্ন দেশের মুসলমান বণিকেরা বহু অর্থ ব্যয় করে সমবেতভাবে এই মসজিদটি তৈরী করে দিয়েছেন।

অপরাহ্নে এরই চত্বরে আরব আর মোপ্‌লা বণিকদের একটি সভা বসেছে।

মসজিদের মর্মর ভিত্তিতে সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাস। মাথার ওপর সমুদ্র-পাখীর কান্না। বিকেলের আরক্ত সূর্যের পিঙ্গল রশ্মি দীর্ঘাকার আরব বণিকদের মুখে ছড়িয়ে পড়েছে।

সেই প্রবীণ বণিকনেতা বললেন, ক্রীশ্চানদের কী খবর?

অন্যতম বণিক সুলেমান জানালেন ঃ জামোরিণ তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

বণিকনেতার মুখের রেখাগুলি একবার আবর্তিত হল। অধৈর্যভাবে হাতে শূন্য মুঠিটিকেই একবার নিষ্পেষিত করলেন তিনি।

—হুঁ, তারপর?

অনাগ্রহে প্রশ্নটা একবার ছুঁড়ে দিয়েই নেতা ভ্রূকুটি-কুটিল চোখে তাকালেন আকাশের দিকে। মাথার ওপর প্রেতিনীর মতো আর্তনাদ তুলে কেঁদে বেড়াচ্ছে সমুদ্র-শকুন। কী চায় ওরা? এ কান্নায় কোন্ অশুভ সংকেত? অনেক উর্ধ্বে উড়তে উড়তে—দূর সমুদ্রে যেখানে মানুষের দৃষ্টি চলে না—ওরা কি কোনো আগামী অপচ্ছায়া দেখতে পাচ্ছে সেখানে?

আরব বণিক হাসান বললেন, অতি সামান্য উপহার নিয়ে ক্রীশ্চানেরা উপস্থিত হয়েছিল তাঁর কাছে। তিনি ব্যঙ্গ করে বলেছেন, তারা কাকে দেখতে এসেছে? কালিকটের রাজাকে, না একটা পাথরের মূর্তিকে? মক্কার একজন সাধারণ বণিকও যে এর চাইতে চতুর্গুণ উপহার দিয়ে থাকে।

উপস্থিত সকলে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। সুলেমান বললেন, তা হলে—

হাসান ভ্রূরেখা দুটি সংকীর্ণ করলেনঃ না, নিশ্চিন্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। অন্য লোক যে উপহার নিয়ে জামোরিণের সামনে গিয়েও দাঁড়াতে পারত না—সেই যৎসামান্য উপকরণ দিয়েই এই ক্রীশ্চান-ক্যাপিতান তাঁকে বশীভূত করেছে। বোধ হয় জাদু জানে লোকটা!—হাসান একবার থামলেন, কণ্ঠস্বর পরিচ্ছন্ন করে নিয়ে বললেনঃ তার রাজার সঙ্গে বাণিজ্য-চুক্তি করে জামোরিণ স্বয়ং তাকে পত্রও দিয়েছেন।

—বাণিজ্য-চুক্তি করে পত্র দিয়েছেন!—আকাশ ভেঙে যেন বজ্র পড়ল।

বিস্তৃত অঙ্গনে সেই রক্তিম আলো। সিন্ধু-শকুনের কান্না আর শোনা যাচ্ছে না—কিন্তু এই বিবর্ণ আলোর সমুদ্রে তার রেশ এখনো ঢেউয়ের মতো কেঁপে কেঁপে চলেছে যেন। মসজিদের পাষাণভিত্তিতে সমুদ্রের শ্রান্তিহীন গর্জন।

কিছুক্ষণ।

বণিকদের নেতাই স্তব্ধতা ভাঙলেন। তাঁর উত্তেজিত কণ্ঠ ভেঙে ভেঙে থেমে যেতে লাগল।

—এদেশের মাটিতে ক্রীশ্চানেরা এই প্রথম এল। ওরা শুধু দরিদ্র আর লোভীই নয়—যেমন সাহসী, তেমন কূট-কৌশলী। সময় থাকতে যদি আমরা সাবধান না হই—তা হলে হিন্দ্ থেকে শুরু করে আরব-মিশর সব জায়গাতেই এদের পতাকা উড়বে। আমাদের বাণিজ্যবহর তলিয়ে যাবে আরব সাগরের জলে।

—কখনোই তা হতে দেব না আমরা—একটা চাপা গর্জন উঠল সভায়।

—আমার মনে হচ্ছে—বণিক নেতা বললেন, আজ থেকে একটা নতুন প্রতিযোগিতা শুরু হল ক্রীশ্চানের সঙ্গে। হিন্দ্ থেকে মিশর পর্যন্ত এই পূব দেশের ওপর এখন থেকে মুসলমান আর ক্রীশ্চানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। জেরুজালেমের কথা আপনারা ভুলবেন না, মনে রাখবেন হিস্পানী দেশকে, স্মরণ রাখবেন গ্রানাডা আর আলহাম্রাকে।

—স্মরণ রাখব—বক্রাগ্র ছুরিগুলি একসঙ্গে ঝিলিকে উঠল।

আকাশ-সমুদ্রকে অকস্মাৎ চকিত করে তুলল জামোরিণের প্রাসাদ থেকে সন্ধ্যার তোপধ্বনি। মসজিদের মিনার থেকে মুয়াজ্জিনের তীব্র করুণ আজানের স্বর ছড়িয়ে পড়ল।

বণিক নেতা বললেন, তা হলে আজ এই পর্যন্তই থাক। নমাজের সময় হয়েছে।

* * * *

দু সপ্তাহ পার হয়ে গেছে।

কালিকটের উপকণ্ঠে—নির্জনপ্রায় সমুদ্রের তীরে একটি অর্ধ-ভগ্ন বাড়ি। বিদেশীরা এই বাড়িতেই তাঁদের গুদাম তৈরী করেছেন। এরই একটি কক্ষে খাঁচায় বন্দী বাঘের মতো পায়চারি করছেন ক্রীশ্চান সেনাপতি। কটিলগ্ন দীর্ঘ তরবারিটি চলার তালে তালে সাড়া দিয়ে উঠছে তাঁর।

বাতাসে লবঙ্গ আর দারুচিনির মিশ্রিত গন্ধ। নানাবিধ মশলার ঝাঁঝে যেন নিঃশ্বাস আটকে আসে। ঘরটি প্রায়ান্ধকার, তারই ভেতরে পদচারণা করতে করতে সেনাপতির চোখ থেকে থেকে আগুনের পিণ্ডের মতো জ্বলে উঠছিল।

—কী করা যায় পাউলো ?

পাউলো সেনাপতির সহোদর ভাই, অন্যদিকে আবার প্রধানতম সচিবও বটে। বিষণ্ণ মৃদু স্বরে পাউলো বললে, কোনো আশাই দেখতে পাচ্ছি না। এই মুরগুলি আমাদের শত্রুতা করতে বদ্ধপরিকর।

—কী ভাবে ঠকাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ ?—সেনাপতি ঘরের এক কোণা থেকে এক মুঠি আদা তুলে নিলেন। হাতের একটু চাপ দিতেই সবটা গুঁড়িয়ে গেল—আদা নেই—পুরোপুরিই মাটি।

—মাটি !

—হ্যাঁ, বারো আনাই এই। দল বেঁধে এরা যে-আক্রমণ আমাদের বিরুদ্ধে শুরু করেছে তাতে ব্যবসা করা অসম্ভব। এই মুরেরা অত্যন্ত হীন, শয়তানের চাইতেও জঘন্য। যেমন করে হোক আমাদের ব্যবসা বন্ধ করে দেবে—এই এদের সংকল্প।

—ব্যবসা বন্ধ !—এবার পাউলোর চোখ ভয়াল হয়ে উঠল ঃ তার আগে আমরা এই দেশকেই দখল করে নেব।

—চুপ—আস্তে ! ঠোঁটে আঙুল দিলেন সেনাপতি। দুটি সুতীক্ষ্ণ সতর্ক চোখে চারদিকে তাকিয়ে নিলেন একবার ঃ মুর আর মোপ্‌লারা আমাদের পেছনে লেগেছে। বাতাসেও তাদের কান পাতা। একবার জামোরিণ এ কথা শুনতে পেলে আমাদের আর প্রাণ নিয়ে বেলেমের বন্দরে যেতে হবে না।

—ইচ্ছে করে দেশ থেকে কামান এনে বন্দর উড়িয়ে দিই—নিচু গলায় রুদ্ধশ্বাসে বললে পাউলো।

—দরকার হলে তাও করতে হবে ; কিন্তু তার আগে আটঘাট শক্ত করে বেঁধে নেওয়া চাই। একটু চালে ভুল করলেই হাড় কখানা রেখে যেতে হবে সমুদ্রের তলায়। সেটা যেন খেয়াল থাকে।

পাউলো হিংস্রভাবে গোঁফের একটা প্রান্ত পাকাতে লাগল ঃ কিন্তু যা করে তুলেছে, কিছু কি এগোতে দেবে এই মুরেরা ? জামোরিণের কানে গিয়ে লাগিয়েছে আমরা বণিক নই,—জলদস্যু। আদার ভেতরে দিচ্ছে মাটি, মশলার মধ্যে মিশিয়ে দিচ্ছে মুঠো মুঠো ধুলো। আর শত্রুতা সে তো আছেই।

—আমরা জলদস্যু !—সেনাপতি আহত কেউটে সাপের মতো ফুঁসে উঠলেন ঃ এই মুরেরাই কি গোড়া থেকে আমাদের শত্রুতার চেষ্টা করছে না ? মোম্বাসার অভিজ্ঞতা কি তুমি এর মধ্যেই ভুলেছ পাউলো ?

—না—পাউলো জবাব দিলে।

সে অভিজ্ঞতা মনে রাখবার মতোই বটে। পূর্ব-পৃথিবীর দিকে যতই

তাঁদের জাহাজ এগিয়ে এসেছে, ততই তাঁদের সাক্ষাৎ হয়েছে আরব বণিকদের পণ্যতরীর সঙ্গে। এই বিদেশী জাহাজগুলির দিকে যে দৃষ্টিতে তারা তাকিয়ে ছিল, তাতে আর যাই-ই থাক বন্ধুত্বের আভাস মাত্র পাওয়া যায়নি।

দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার ফলে তখন সেনাপতির লোক-লস্কর প্রায় সকলেই অসুস্থ। মোম্বাসার বন্দরে নোঙর ফেলে তাঁরা বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় ঘটনা ঘটল একটা।

রাত্রি গভীর। সমুদ্রের জল সীসার পাতের মতো কালো। আকাশ মেঘ-স্তম্ভিত। শুধু উচ্চ তীরতটে নারিকেল বনের দীর্ঘশ্বাস। ডেকের এখানে-ওখানে রক্ষীরা পর্যন্ত ঝিমুচ্ছে। কিন্তু সেনাপতির চোখে ঘুম নেই—নেই বিন্দুমাত্র তন্দ্রার আচ্ছন্নতা। তাঁর সমস্ত ভবিষ্যৎও এই নিকষ-কৃষ্ণ সমুদ্রের মতোই অনিশ্চিত। কী আছে সেখানে জানা নেই—কী তাঁর করণীয় তাও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। হয় জয়—নয় মৃত্যু।

আতাম্র শ্মশ্রুগুচ্ছ মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন চিন্তামগ্ন পদক্ষেপে। সপ্ত-সমুদ্র পার হয়ে তাঁর এই সুদীর্ঘ যাত্রাপথের সে কি ভয়ঙ্কর ইতিহাস! মনে পড়েছিল সেই দুর্দিনের কথা—যেদিন আজোর দ্বীপের কাছে সমুদ্রের বুকের ওপর শুরু হয়েছিল আকস্মিক 'হৌলের' তাণ্ডব! একদিকে যে কোনো মুহূর্তে জাহাজ ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা, অন্যদিকে বিদ্রোহী নাবিকদের সমবেত দাবি ঃ আমরা দেশে ফিরে যাবো।

ঝড়ের গর্জন ছাপিয়ে সেনাপতির চিৎকার ধ্বনিত হয়েছিল ঃ না, হিন্দে না পৌঁছে আমাদের ফেরার পথ বন্ধ। রাজা মানোএলের জয় হোক—মা মেরী আমাদের রক্ষা করুন!

তারপরে আরো কত দুঃখের দিন পার হয়ে গেছে, কত দুঃসহ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছে তাঁদের। স্বহস্তে বিদ্রোহী নাবিকদের মস্তক ছেদন করেছেন তিনি—আধিব্যাধিতে দলে দলে বিশ্বস্ত লস্কর আশ্রয় নিয়েছে সমুদ্রের শীতল সমাধিতে। অনেক ঝড়ের ঝাপটা কাটিয়ে এতদিনে বুঝি সত্যিই বন্দরের আভাস পাওয়া গেল—তাঁর মন এই কথাই বলছিল বার বার।

এমন সময় অন্ধকারের মধ্যে একটা অদ্ভুত জিনিস তাঁর চোখে পড়ল। এক ঝাঁক মাছ সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে তাঁর জাহাজের দিকেই যে ভেসে আসছে; কিন্তু সেনাপতির মন মুহূর্তে সংশয়-গ্রস্ত হয়ে উঠেছিল ঃ এ কী রকমের মাছ? আর ঝাঁক বেঁধে এ ভাবে তাঁর জাহাজের দিকে এগিয়ে আসার অর্থই বা কী?

ততক্ষণে মাছগুলো জাহাজের একধারে কাছে ভেসে এসেছে। নিদ্রিত একজন পোতরক্ষীর বন্দুকটি তুলে নিয়ে ক্ষিপ্রবেগে গুলি করলেন পর্তুগীজ ক্যাপিতান।

একটা যন্ত্রণা-চিৎকার মথিত করে দিল রাত্রিকে। নিহত মুর সৈন্যের দেহটা কালো জলের ওপর রক্তের আরো কালো খানিকটা রঙ ছড়িয়ে হারিয়ে গেল সমুদ্রের অতলে। বাকি সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে তীরের দিকে সাঁতরে চলল।

রাত্রির বিশ্রামের সুযোগে জাহাজ লুঠ আর ক্রীশ্চানদের হত্যা করাই নিশ্চয় উদ্দেশ্য ছিল তাদের।

এই মুর! মশলার গন্ধে আমন্থর প্রায়ান্ধকার ঘটনার মধ্যে পায়চারি করতে করতে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন সেনাপতি। প্রথম থেকেই তাঁর শত্রুতা-সাধনে এরা বদ্ধপরিকর। দাঁতে দাঁত চেপে ভাবতে লাগলেন: কোনোদিনই এদের তিনি ক্ষমা করবেন না। একটা সুযোগ পেলেই—

—পাউলো।

—কী বলছ?

—চলো, একবার বন্দরের দিকে ঘুরে আসা যাক।

দুজনে বেরিয়ে পড়লেন।

বন্দরে তখন কেনা-বেচা চলেছে পুরোদমে। বহু দেশের বহু বিচিত্র কাকলিতে চারদিক মুখর। শুধু যেখানে পর্তুগীজেরা তাদের পণ্যদ্রব্য সাজিয়ে বসেছে সেখানে জনসমাগম নেই বললেই চলে।

—আজ কি রকম বিক্রি হল আন্তোনিয়ো?—সেনাপতি জানতে চাইলেন।

—কোথায় বিক্রী?—হতাশাভরে মাথা নাড়ল আন্তোনিয়ো: মুরেরা কাউকে এদিকে আসতেই দিচ্ছে না। তারা সকলকে ডেকে বলছে, আমাদের জিনিস অব্যবহার্য—বর্জনীয়।

সেনাপতি রুদ্রচক্ষে একবার অদূরে সমবেত আরব-বণিকদের দিকে তাকালেন। শিকারের গন্ধে উন্মত্ত নেকড়ের পালের মতো তাদের চোখগুলো জ্বলছে। সেখানে মিত্রতা কেন—সন্ধির সূচনা নেই পর্যন্ত।

'পোর্টো গ্র্যান্ডি' (মহাবন্দর) চট্টগ্রামের জনকয়েক সওদাগর বারে বারে বিস্মিত দৃষ্টিতে পর্তুগীজদের আনা বিচিত্র-দর্শন টুপিগুলিকে লক্ষ্য করছিলেন। সেনাপতি স্বয়ং তাঁদের আহ্বান করলেন। বললেন, এ লিসবোয়ার টুপি—রোদ-বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করতে এদের তুল্য আর নেই। আসুন, পরীক্ষা করুন।

হিন্দু বণিকেরা হয়তো এগিয়েও আসতেন, কিন্তু মুরদের সমবেত কোলাহলে থমকে গেলেন তাঁরা। একজন আরব শব্দ করে থুথু ফেললেন।

ঝলকে উঠলেন সেনাপতি। হাত দিয়ে চেপে ধরলেন তলোয়ারের বাঁট। প্রশ্ন করলেন, এর অর্থ?

আর একজন আরব বললেন, অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার। হারামখোর ক্রীশ্চানের টুপি হিন্দে কেউ মাথায় দেবে না, পায়ের তলায় মাড়িয়ে যাবে।—আর একবার ঘৃণাভরে থুথু ফেললেন তিনি।

—সাবধান শয়তান মুর—সেনাপতির সর্বাঙ্গ উদ্যত হয়ে উঠল। ধৈর্যের বাঁধ টলমল করছে তাঁর।

—একটা গুপ্তচর ক্রীশ্চান কুকুরের জন্যে বাঁ পায়ের নাগরাই যথেষ্ট—উত্তর এল আরবদের মধ্য থেকে।

—রাজা মানোএলের জয় হোক—পাউলো বাধা দেবার আগেই বিকট চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেনাপতি—হাতের দীর্ঘ তলোয়ার লকলক করে উঠল ; কিন্তু তিনি কাউকে আঘাত করার আগেই সমবেত আরব আর মোপ্‌লারা তাঁকে আক্রমণ করল।

সেনাপতির প্রাণ নিশ্চয়ই যেত, কিন্তু ভাগ্যক্রমে তিনজন নায়ার অশ্বারোহী তখন চলেছিল পথ দিয়ে। ঘটনা দেখে তারাই জনতার ক্রোধ থেকে রক্ষা করল ক্রীশ্চানকে। তাঁর সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত, রক্তে ভেসে যাচ্ছে নাক মুখ। পাউলোর কাঁধে ভর দিয়ে জাহাজের দিকে ফিরবার সময় শুধু তাঁর ঠোঁট দুটো অল্প অল্প নড়তে লাগল।

—রাজা মানোএলের জয় হোক—

আরো তিনদিন পরে।

দুঃসংবাদ আন্তোনিয়োই বহন করে আনল। তিন হাজার টাকার বাকি শুল্ক আদায়ের জন্যে জামোরিণের কর্মচারীরা তাঁদের গুদাম আটক করেছে।

সেনাপতি ঊর্ধ্বশ্বাসে রাজদরবারে ছুটলেন।

—কী তোমার বক্তব্য বিদেশী?—দৃষ্টি ভালো করে না তুলেই প্রশ্ন করলেন জামোরিণ।

—আমার গুদাম কি জামোরিণের আদেশেই ক্রোক করা হয়েছে?

—আমি তো জানি না!—জামোরিণ বিস্মিত হয়ে 'গুয়াজিল' অর্থাৎ শুল্ক-সচিবের দিকে তাকালেন : কী বলছে এরা?

সভাগৃহে উপবিষ্ট আরব বণিকদের মধ্যে যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় হয়ে গেল, সেনাপতির তা চোখ এড়ালো না। সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলেন, জামোরিণের কাছে এর প্রতিকার প্রার্থনা অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কিছুই নয়। পরম প্রতিপত্তিশালী আরব বণিকদের হাতে গুয়াজিল নিতান্তই একটি ক্রীড়নক।

জামোরিণের প্রশ্নের উত্তরে শ্লথ ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন সচিব। বললেন, প্রভু, রাজ্যের স্বার্থরক্ষার জন্যেই নিজের কর্তব্য করতে হয়েছে আমাকে। এই বিদেশীরা এখন পর্যন্ত তাঁদের নির্দিষ্ট বাণিজ্যশুল্ক দেননি।

—ক্রীশ্চান, এ সম্বন্ধে তুমি কী বলতে চাও? কৃষ্ণ ললাট কুঞ্চিত করে জামোরিণ জানতে চাইলেন।

ক্ষিপ্ত চোখে শুল্কসচিব আর আরবদের দিকে একবার তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন সেনাপতি।

—প্রথমত, এই তিন হাজার টাকার জন্যে আমাকে আগে থেকেই কোনোরকম সংবাদ জানানো হয়নি। দ্বিতীয়ত, মুর বণিকদের সংঘবদ্ধ প্রচারের ফলে আমার পণ্য বাজারে বিক্রি হচ্ছে না। যে-সমস্ত আদা, লবঙ্গ ও দারুচিনি আমি কিনেছি—তাদের শতকরা আশী ভাগই ভেজাল। এ অবস্থায়—

আরবেরা সমস্বরে কোলাহল করে উঠলেন। মরক্কো ছুরির বাঁটেও হাত পড়ল কারো কারো।

অধৈর্য ক্লান্তির রেখা দেখা দিল জামোরিণের চোখে মুখে। বিরক্তভাবে দু হাতের হীরক-বলয়ে আঘাত করলেন তিনি। চূড়াকার কেশগুচ্ছে ঝকমক করে উঠল পদ্মরাগের দীপ্তি। তাম্বুলিকের হাত থেকে যে পানের খিলিটি তুলে নিয়েছিলেন, মুখে না দিয়েই সেটিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন সোনার পিকদানিতে।

—তোমাকে দুদিন সময় দেওয়া হল ক্রীশ্চান। এর মধ্যে সমস্ত শুল্ক তোমাকে পরিশোধ করতে হবে। তা ছাড়া বাণিজ্যের ব্যাপারে আরবদের কোনো কাজেও আমি হস্তক্ষেপ করতে চাই না। ইচ্ছে হলে তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে প্রচার করতে পারো।

সেনাপতি ঠোঁট কামড়ে বললেন, এই-ই জামোরিণের বিচার ?

জামোরিণ উত্তর দিলেন না।

—এ যদি হয় তা হলে হিন্দে আমাদের বাণিজ্যের সুযোগ কোথায় ?

জামোরিণ হাসলেন ঃ সুদূর সমুদ্র পার হয়ে পর্তুগীজদের জাহাজ বন্দরে আসবে বৎসরে মাত্র একবার। আরবদের সঙ্গে ব্যবসা কালিকটের দৈনন্দিন। সুতরাং মক্কার সুবিধাই সবচেয়ে আগে আমাকে দেখতে হবে, লিসবোয়ার নয়।

—বুঝতে পেরেছি—পাথরের মতো কঠিন মুখে সেনাপতি জবাব দিলেন।

হাতের যুগল-বলয়ে আর একবার শব্দ তুলে আসন ত্যাগ করলেন জামোরিণ। আজকের মতো সভা ভঙ্গ হল।

লাথি-খাওয়া কুকুরের মতো মাথা নত করে বেরিয়ে এলেন সেনাপতি। পেছনে বিজয়ী আরবদের অট্টহাসি শোনা যাচ্ছে।

সেই রাত্রে হঠাৎ একটা কলরব উঠল কালিকটের বন্দরে। ক্রীশ্চানেরা নাকি একজন আরবকে হত্যা করেছে। কে কাকে হত্যা করেছে সে প্রশ্ন তখন অবান্তর। জনতার আক্রোশ বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়ল। হারামখোর ক্রীশ্চানের এত বড় স্পর্ধা ! হিন্দের মাটিতে পা দিয়ে মুসলমানের রক্তপাত !

আর এক মুহূর্ত কালিকটের স্থলে বা জলে অপেক্ষা করলে প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না। মিথ্যা জনরব তখন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে বন্দরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। নাগরিকেরা যে যা অস্ত্র হাতে পেয়েছে, তাই নিয়ে সন্ধান করে ফিরছে পর্তুগীজদের। তাদের বাধা দেবার কেউ নেই। অস্ত্রধারী নায়ারেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে নিশ্চিন্ত দর্শকের মতো—যেন এ ব্যাপারে কিছুমাত্র দায়িত্ব নেই তাদের।

তারপর—

রাত্রির সমুদ্র। ফস্‌ফরাস আর নক্ষত্রের দীপ্তিতে বিচিত্র আভামণ্ডিত। সেই জলের ওপর দিয়ে ক্রীশ্চানদের বাণিজ্যতরী কালো অন্ধকারে আরো কালো কতগুলি অতিকায় সামুদ্রিক জন্তুর মতো ক্রমশ দূরান্তে মিলিয়ে গেল।

—গুড়ুম্ গুম্—গুড়ুম্ গুম্

জলদস্যুদের কামান আগুন বৃষ্টি করল। দূরের পশ্চিমঘাট পাহাড়ের শৈলতট সে গর্জনে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হল, পাহাড়ের গা থেকে দলে দলে সিন্ধু-শকুন কাতর কান্নায় ডানা মেলল আকাশে।

মক্কাযাত্রী তীর্থকামী আরবদের জাহাজে হাহাকার উঠেছে। প্রায় চারশো নিরীহ, নিরস্ত্র নরনারী আর্তনাদ তুলছে বধ্য পশুর অসহায়তায়। জাহাজে শাদা পাল তুলে দিয়ে জানাচ্ছে বশ্যতার বিনয়। জুলিয়ো এসে বললে, ওরা সন্ধি চায়।

—সন্ধি? কতগুলো কুকুরের সঙ্গে?—দস্যুনেতা মাথা নেড়ে বললে: এবার ঋণ শোধের পালা। একবিন্দু দুর্বলতার প্রশ্ন নেই জুলিয়ো!

—তবু নারী হত্যা?—জুলিয়োর স্বরে দ্বিধা।

—শত্রুর ক্ষেত্রে কোনো আইনই নেই।—নেতার চোখে-মুখে জ্বলছে আদিম জিঘাংসা: আমার আদেশ মনে রেখো। জাহাজ লুঠ করে আগুন ধরিয়ে দেবে—একটি প্রাণীও যেন না রক্ষা পায়।

জুলিয়ো চলে যাচ্ছিল, পেছন থেকে আবার ডাক এল: শোনো।

আদেশের প্রতীক্ষায় নত মস্তকে দাঁড়ালো জুলিয়ো।

—শুধু শিশুদের হত্যা করবে না। তাদের তুলে আনবে আমাদের জাহাজে। ক্রীশ্চান করা হবে সেগুলোকে। রাজা মানোএলের আদেশে হিন্দ্ থেকে দুটি বস্তু সংগ্রহ করতে হবে আমাদের। এক মশলা আর ক্রীশ্চান। দুটিরই সমান প্রয়োজন জুলিয়ো।

আর্ত কান্নায় সুদূর পশ্চিমঘাটের শিলা-সৈকত কাঁপতে লাগল—মর্মরিত হতে লাগল তার ঘন-নিবন্ধ নারিকেলবীথি। জাহাজের মাথায় দাঁড়িয়ে দস্যুপতি দেখতে লাগল কেমন করে স্নিগ্ধ সামুদ্রিক বাতাসে কাঠ আর পোড়া মাংসের গন্ধ ছড়িয়ে জ্বলন্ত জাহাজখানা ডুবে যাচ্ছে সমুদ্রের জলে।

প্রতিশোধ! প্রতিশোধের এই প্রথম অধ্যায়!

চরম লাঞ্ছনা আর অবিচারে জর্জরিত হয়ে একদিন প্রাণপণে পালাতে হয়েছিল হিন্দের বন্দর থেকে। আরবদের চক্রান্তে সেদিন ক্লীব রাজার কাছ থেকে সুবিচার পর্যন্ত জোটেনি।

তারপর সে কি অভিজ্ঞতা! অর্ধেকের ওপর জাহাজ পথেরা মধ্যে অচল হয়ে পড়ল। ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে প্রাণ দিতে লাগল দলে দলে লস্কর। শুধু তা-ই নয়। সহোদর ভাই, শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও শ্রেষ্ঠ সচিব পাইলো-ডা-গামাকেও হারাতে হল সেই দুঃসহ অভিযানে।

এর সব মুসলমানের জন্যে—এই অভিশপ্ত মুর আর মোপ্‌লারাই এর জন্যে দায়ী। এদের ষড়যন্ত্র। এদেরই জন্যে কায়রো বন্দরের কাছে মিশরের সুলতান তাঁর বহরকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিল।

শুধু কি এই! কিছুদিন আগেই কালিকট বন্দরে এসেছিলেন আর একজন পোতাধ্যক্ষ—পেড্রো কাব্‌রাল। একই তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়েছে

তাঁকেও। পালাবার আগে চল্লিশজন পর্তুগীজকে তিনি রেখে গিয়েছিলেন কালিকটে, মুরেরা নাকি পৈশাচিক আনন্দে তাদেরও হত্যা করেছে।

এর প্রতিটি ঋণ শোধ করতে হবে। মিটিয়ে দিতে হবে কড়ায়-গণ্ডায়।

খানিকটা ধোঁয়া আর আগুন কে যেন মুঠো করে ছুঁড়ে দিলে আকাশের দিকে। বিশাল একটা দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দ করে সমুদ্রগর্ভে হারিয়ে গেল জ্বলন্ত জাহাজটা।

জুলিয়ো ফিরে এসেছে। পেছনে না তাকিয়েও টের পেলেন সেনাপতি।

—সেনাপতি ?

—সব কাজ শেষ ?

—হ্যাঁ, সব শেষ।

—শিশুদের তুলে আনা হয়েছে ?

মাথা নাড়ল জুলিয়ো। কঠোর দৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলেন সেনাপতি। সেখানে তখনও কিছু কিছু পোড়া কাঠ আর ছাই চারশো হজ যাত্রীর শেষ চিহ্নস্বরূপ দোলা খাচ্ছে তরঙ্গে তরঙ্গে। আর থেকে থেকে জলের ওপর এক ঝাঁক হাঙরের রূপালি পেট উলসে উঠছে—এতক্ষণে নরমাংসের ভোজ বসেছে তাদের।

—এরপর ?—জুলিয়ো জানতে চাইল।

—কালিকট!—তাম্রাভ শ্মশ্রুরাশির মধ্যে সেনাপতির দাঁত শ্বাপদের বন্যতায় ঝলকে উঠল ঃ এবার মুর শয়তানদের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া হয়ে যাবে !

* * * *

—কোনো উপায় নেই ?

মণিবলয়িত বাহুতে হতাশার ভঙ্গি করে মুখ আচ্ছাদন করলেন জামোরিণ। না—কোনো উপায় নেই। সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু চরম স্পর্ধিত উত্তর এসেছে সেনাপতির কাছ থেকে। রাজা মানোএল একটা কাঠের পুতুল দিয়েও জামোরিণের চাইতে ঢের ভালো করে কালিকটের শাসন চালাতে পারবেন।

—কোনো উপায় নেই ?—বণিকদের আর্তনাদ।

—না।

চারদিকে তখন অবিশ্বাস্য দুঃস্বপ্ন। বন্দরের বহু জায়গাই অগ্নিকুণ্ড। পোড়া লবঙ্গ, দারুচিনি আর আদার ধোঁয়ায় শ্বাসরোধ করে আনছে। কামানের গোলায় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মানুষের দেহ ছড়িয়ে আছে পথের ওপর।

বন্দরের এখানে ওখানে যারা আত্মগোপন করেছিল, এবার একটা বিচিত্র বস্তু তাদের চোখে পড়ল। সমুদ্রের ঢেউ একটার পর একটা জ্বলন্ত ভেলা বয়ে আনছে বন্দরের দিকে। আর সেই সব ভেলায়—

নিরীহ ধীবর আর হিন্দু-মুসলমান বণিকদের অর্ধমৃত স্তূপাকার দেহ। তাদের হাত, কান, নাক ইত্যাদি পৈশাচিক উল্লাসে ছিন্ন করে নেওয়া হয়েছে। তারপর ভেলার ওপর শক্ত করে বেঁধে শয্যাদ্রব্যের ইন্ধন দিয়ে করা হয়েছে

অগ্নিসংযোগ। দাঁত দিয়ে যাতে তারা হাত-পায়ের বাঁধন না কাটতে পারে, সেইজন্যে তাদের দাঁতগুলি এক-একটি করে উপড়ে নেওয়া হয়েছে নির্মমতম নিপুণতায়। কাজে কোথাও একবিন্দু ত্রুটি নেই সেনাপতির!

প্রতিটি ভেলার গায়ে এক-একখানি কাষ্ঠফলক। তাদের ওপর ক্রীশ্চান সেনাপতির স্বহস্তের অক্ষর ঃ, "মহামহিমান্বিত জামোরিণের নৈশভোজের জন্য যৎকিঞ্চিৎ মাংস উপহার—"

কামানের গোলা সমানে ফেটে পড়েছে বন্দরের ওপর। একটির পর একটি জ্বলন্ত মাংসের ভেলা ভেসে যাচ্ছে উপকূলের দিকে—জামোরিণের নৈশ ভোজের উপকরণ। মুমূর্ষুর গোঙানি আর আগুনের আলোয় সমুদ্র ধরেছে নরকের রূপ। ক্রীশ্চান সেনাপতির পরিতৃপ্ত চোখের দৃষ্টি দূরের দিকে নিবন্ধ; কিন্তু শুধু কি পশ্চিম-দক্ষিণ মুখেই তা বাঁধা পড়েছে? না, তা আরো এগিয়ে গেছে, এগিয়ে গেছে বিন্ধ্য-নর্মদা পার হয়ে সিন্ধু-গঙ্গা-শতদ্রু-ব্রহ্মপুত্রের উপবীতশোভিত হিমালয়শীর্ষ মহাভারতের রত্ন-সিংহাসনের দিকে?

—এর দায়িত্ব কি ভেবে দেখেছেন সেনাপতি?—জুলিয়োর স্বর সংশয়-জড়িত।

—কিসের দায়িত্ব?

—এর ফলে এ দেশের সমস্ত রাজা যদি একসঙ্গে আক্রমণ করে পর্তুগীজ বহর?

সেনাপতি তেমনি দূরযানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন জ্বলন্ত বন্দরের দিকে।

—না, তা করবে না।

—করবে না? কেন?

—কারণ এইটেই এ দেশের বিশেষত্ব। এরা বিচ্ছিন্ন, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষার শেষ নেই এদের। এই অস্ত্রে মুসলমান একদিন এ দেশ জয় করেছিল, আজ আবার ক্রীশ্চানের জয়ের পালা। কানানুর কোচিনের কাছ থেকে এর মধ্যেই আমি সন্ধির প্রস্তাব পেয়েছি জুলিয়ো।

—রাজা মানোএলের জয় হোক—জুলিয়োর সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

—হাঁ, রাজা মানোএলের জয় হবে—হা-হা-হা—

অমানুষিক কণ্ঠে হেসে উঠল পর্তুগীজ সেনাপতি ভাস্কো-ডা-গামা।

সেই হাসির শব্দেই যেন কামানের একটা অগ্নিপিণ্ড ছুটে গিয়ে সেই মস্‌জিদের উঁচু একটা মিনারকে আঘাত করল। বণিকদের প্রবীণ নেতা দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে। তাঁর ছিন্ন দীর্ণ দেহটাকে নিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ মিনারের চূড়ো খসে পড়ল সমুদ্রের জলে।

অন্ধকার কাঁপিয়ে আর একবার অট্টহাসি করল ভাস্কো-ডা-গামা। কোথা থেকে জেগে উঠল একটা চকিত ঝোড়ো হাওয়া—হাহাকার করে উঠল দারুচিনি আর এলাচলতার বন। আর আকাশের পুঞ্জিত মেঘে বিকীর্ণ হল খর-বিদ্যুতের

অসিধারা—যেন বিধ্বস্ত মুর-প্রতিষ্ঠার ভগ্ন দুর্গে অবারিত হল আর এক নতুন শক্তির তোরণ-দ্বার।

আর সেই অট্টহাসি রাত্রির আকাশে কেঁপে চলল কোটি অলক্ষ্য নিশি-বিহঙ্গের পাখার মতো। সেই তরঙ্গিত হাসির ছোঁয়ায় সুদূর বাংলার ঢাকায়, শান্তিপুরে, চন্দ্রকোনায় ঘুমন্ত তাঁতীরা একটা দুঃস্বপ্ন দেখল একসঙ্গে। স্বপ্ন দেখল, একটা লৌহময় রাক্ষস একখানা তীক্ষ্ণধার করাত দিয়ে একটির পর একটি করে তাদের আঙুল কেটে চলেছে!

এক

"Viemos buscar, Cristaos ē speciarias"

চাই ক্রীশ্চান, আর চাই মশলা।

এই মূলমন্ত্র নিয়েই বেলেমের ঘাট থেকে জাহাজ ভাসিয়ে ভাস্কো-ডা-গামা এসে পৌঁছেছিলেন কালিকটের বন্দরে। তার পরে চলল চক্রান্ত, দস্যুতা আর রক্তঝরার সুদীর্ঘ ইতিহাস। কোচিনের পাশা হাতে পর্তুগীজের ভাগ্যক্রীড়া শুরু হল কালিকটের ব্রাহ্মণ রাজা জামোরিণের সঙ্গে। আলবুকার্কদের হাতে গড়ে উঠল ভারতবর্ষের মাটিতে প্রথম পর্তুগীজদের দুর্গ। আর সেই দুর্গচূড়া থেকে কয়েকটা রক্তবর্ণ কামানের গোলা উড়ে গিয়ে পড়ল আরব সমুদ্রের নীল জলে।

ওদিকে ইয়োরোপে আরব-সাম্রাজ্যের ওপর ঘনাচ্ছিল সর্বনাশের ছায়া; টলমল করে উঠছিল মক্কা থেকে রোম পর্যন্ত প্রসারিত বিশাল প্রতাপের বনিয়াদ। একদিন তা ধ্বসে পড়ল কিউটার দুর্গে। মুসলমান জগতের বাছা বাছা আরব বীরদের নিয়ে সালাত্ বেন সালাত্ দুর্গ রক্ষার চেষ্টা করলেন; কিন্তু নতুন জাগ্রত হিস্পানিয়া—স্পেন আর পর্তুগালের মিলিত শক্তি মুর-সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দিলে। জিব্রাল্টার প্রণালীর রক্তমাখা জলে স্নান করে জন্ম নিল এক দুর্জয় জাতি।

রক্তাক্ত তলোয়ার হাতে যুবরাজ হেন্‌রী এসে যখন বিজয়গর্বে রাজা দোম জোয়ানের পদপ্রান্তে প্রণতি জানালেন; সেদিন তাঁকে রাজাই শুধু হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিলেন না; সমস্ত জাতিই এই জয়ের উল্লাসকে ভাগ করে নিলে।

শক্তির নেশায় মাতাল হয়ে উঠল নবজাগ্রত পর্তুগাল।

নতুন দেশ চাই—নতুন পৃথিবীর অধিকার। দুর্গম সাগর পেরিয়ে পাড়ি জমাতে হবে পূর্ব-পৃথিবীর দিকে। পার হয়ে যেতে হবে ঝড়ের অন্তরীপ—'কাবো টরমেণ্টোসে'—পৌঁছুতে হবে ঐশ্বর্যের জগৎ ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষ—সোনা দিয়ে গড়া স্বপ্নের দেশ; দারুচিনি আর লবঙ্গের সুগন্ধে যেখানে বাতাস মন্থর হয়ে থাকে—হীরা, মণি, মুক্তো—যেখানে পথে পথে ছড়ানো!

কোভিল্‌হান, বার্থোলোমিউ ডায়াস, কাবরাল, ভাস্কো-ডা-গামা। কোচিনের পাশা হাতে কালিকটের সঙ্গে ভাগ্য-পরীক্ষা। না—পুরোপুরি সাম্রাজ্য বিস্তার আমরা করব না। এত বড় বিশাল দেশকে আয়ত্তে রাখবার মতো শক্তি আমাদের নেই—আমরা একে রক্ষা করতে পারব না। মাঝখান থেকে বিরোধী শক্তির আক্রমণে আমরা চুরমার হয়ে যাব। তার চেয়ে মিত্রতা করা দরকার ভারতবর্ষের মানুষগুলোর সঙ্গে; তাদেরই সাহায্যে বিধ্বস্ত করব পূর্ব-পৃথিবী জোড়া আরব-বাণিজ্যের একাধিপত্য—প্রাচ্যের মশলা আর সোনার সঞ্চয়ে পূর্ণ করে তুলব লিস্‌বনের রাজভাণ্ডার।

পশ্চিমের বাণিজ্যলক্ষ্মী রক্তমুখিনী হয়ে পদক্ষেপ করলেন দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের উপকূলে। একটির পর একটি দুর্জয় দুর্গে প্রসারিত হল তাঁর পদ্মাসন, কামানের গর্জনে গর্জনে উঠল তাঁর শঙ্খধ্বনি।

প্রাচ্য-পৃথিবীর শাসনকর্তা হয়ে এলেন দোম ফ্রান্‌সিস্‌কো ডি আল্‌মীডা। লোহার মতো কঠিন হাতে আল্‌মীডা দণ্ডধারণ করলেন। ক্ষুরধার বুদ্ধি, তীক্ষ্ন দূরদৃষ্টি, বাঘের মতো নিষ্ঠুরতা। ভারতবর্ষের মাটিতে আরো গভীরে প্রবেশ করল পর্তুগীজের শিকড়।

১৫০৯ সালের তেসরা ফেব্রুয়ারী আর একবার রক্তের রঙ ধরল সুনীল মহাসাগর। ইউরোপ থেকে বিতাড়িত অপমানিত আরব শক্তি শেষবার চেষ্টা করল নিজের মর্যাদা ফিরে পাবার; চেষ্টা করল বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যের মাটি আঁকড়ে থাকতে। আল্‌মীডার নৌ-বাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়ালো মিলিত মুসলিম নৌ-বহর; এলো নুবিয়ান থেকে আরব, ইথিওপিয়ান থেকে আফ্‌রান, পারসিক থেকে আরব, এল মিশরীয় 'রুম'; আর সেই সঙ্গে ভারতীয় বণিকের দলও এসে দাঁড়ালো মুসলিম বহরের পাশাপাশি—দিউ থেকে—কালিকট থেকে।

সেই প্রচণ্ড যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত রণনিপুণ আল্‌মীডাই জয়লাভ করলেন। পর্তুগীজ কামানের সামনে পড়ে ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেল তীর-ধনুক, বল্লম-তলোয়ার, মুষ্টিমেয় বন্দুক। আরব শক্তি তার অর্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকা নিয়ে অতলে তলিয়ে গেল—ক্রুশ-চিহ্নিত নতুন পতাকায় এসে পড়ল নতুন সূর্যের আলো।

একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে যুদ্ধ জিতলেন আল্‌মীডা। চোখের জল ঝরতে লাগল আগুন হয়ে। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ চাই। শুধু যুদ্ধজয় করেই সে প্রতিশোধ চরিতার্থ হয়নি। আরো রক্ত চাই,—চাই আরো প্রাণবলি।

আল্‌মীডার আদেশে যুদ্ধবন্দীদের এনে বেঁধে দেওয়া হল কামানের মুখে। তারপর বারুদে দেওয়া হল আগুন। কামানের বীভৎস শব্দে তলিয়ে গেল বুকফাটা আর্তনাদ—বন্দীদের ছিন্ন মুণ্ড আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো শুকনো পাতার মতো কালিকটের পথে পথে ঝরে পড়ল।

আল্‌মীডার পরে এলেন আল্‌বুকার্ক। স্থির, ধীর, বিচক্ষণ। যে সাম্রাজ্যকে আল্‌মীডা অঙ্কুরিত করে গিয়েছিলেন, আল্‌বুকার্ক তাতে ধরালেন

নতুন পল্লব। রক্তপান শেষ করে পশ্চিমের বাণিজ্যলক্ষ্মী বসলেন বরদা হয়ে।

কিন্তু বাংলা দেশ তখন অনেক দূরে। ভাস্কো-ডা-গামা যে দেশের কাহিনী শুনেছিলেন স্বপ্নের মতো, তখনো সেই 'প্যারাডাইজ্ অব ইণ্ডিয়া' পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে তার আম-কাঁঠালের স্নিগ্ধ ছায়ায়; তখনো তার ধান ক্ষেতে ফলছে নিরুদ্বেগ সোনা, 'পোর্টো গ্র্যাণ্ডি' চট্টগ্রামে আরব বাণিজ্য-তরীর পাশাপাশি নোঙর ফেলছে বাঙালী বণিকের সপ্তডিঙা মধুকর। তার তাঁতী তখনো নিপুণ হাতে বুনছে অপূর্ব মস্লিন, আর তার আকাশে-বাতাসে ভাসছে চণ্ডীদাসের গান।

আর সাসারামের বাঘ শেরশাহ সবে সতর্ক পাদচারণা শুরু করেছেন ইতিহাসের অরণ্যে। তাঁর এক চক্ষু গৌড়ে, আর এক চক্ষু দিল্লীর দিকে স্থিরবদ্ধ!

*　　*　　*　　*

চট্টগ্রামের বন্দর পার হয়ে শঙ্খদত্তের বাণিজ্যবহর এগিয়ে চলল দক্ষিণ পাটনে।

চার-চারখানা বোঝাই ডিঙা। শুকনো লঙ্কা, মোম, লাক্ষা, আদা, হলুদ, চট, কাজকরা তামা-পিতলের বাসন, ঢাকাই মস্লিন। চড়া দামে বিক্রি হবে কালিকট, কোচিন, আর গোয়ার বন্দরে। মাঝখানে রয়েছে বিচিত্র দেশ সিংহল—যেখানে আদার বদলে পাওয়া যায় মুক্তো, চটের বদলে হাতীর দাঁত।

শীতের সমুদ্র। এলিয়ে পড়ে আছে শীতল-পাটির মতো। জলের রঙ কালীদহের মাতা নীল—ছোট ছোট ঢেউ দুলছে নাগশিশুর মতো। চারখানা ডিঙির ষোলোখানা পালে লেগেছে উত্তুরে হাওয়ার ঠাণ্ডা অলস আমেজ—ধীরে ধীরে জল কেটে এগিয়ে চলছে বহর। বাঙালী বণিকের বহর। নিয়ে চলেছে পাটের কাপড়, গৌড়ের গুড়, ঢাকার শঙ্খবলয়, কস্তুরী; নিয়ে চলেছে সীমন্তিনীর সৌভাগ্য সিঁদুর, প্রচুর পরিমাণে আফিং আর নানা সুগন্ধি। জাহাজ ভরে পণ্য যাচ্ছে—জাহাজ ভরেই ফিরিয়ে আনবে ঐশ্বর্য।

অন্যমনস্ক ভাবে শঙ্খদত্ত তাকিয়ে ছিল উত্তরের দিকে। কূল এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। চোখে কিছু দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু আকাশ জুড়ে এখনো সাগর-চিলের আনাগোনা।

দু বছর পরে পাটনে বেরিয়েছে শঙ্খদত্ত। কালো সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছে দক্ষিণের দিকে। এখন কেবল কূলকিনারাহীন জল আর জল। এই মুহূর্তে শান্ত নিথর ভাবে ঘুমিয়ে বিভোর হয়ে আছে বটে, কিন্তু কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই একে। কে জানে—কখন এই শীতের দিনেও ঘন হয়ে দেখা দেবে কালো মেঘের দল—ক্ষেপে উঠবে এই আদি-অন্তহীন কালীদহ, হাজার হাজার রাক্ষসী গজরে উঠবে এর অন্ধকার পাতাল থেকে। এই চারখানা ডিঙা গিলে ফেলতে এক লহমাও সময় লাগবে না তাদের।

এমনি অকূল সাগর পার হয়ে যেতে যেতে ঘরের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে দুধের মতো শাদা সরস্বতীর জল: তার দু ধারে কোমল ছায়া নেমেছে

আম-জাম-বাঁশবনের। বাঁধা ঘাটের ওপরে সপ্ত শিবের মন্দির—সোনার ত্রিশূল দেওয়া চূড়ো জ্বলছে রোদের আলোয়। তারপর সারি সারি নৌকোর ভিড়ে গঙ্গা-সরস্বতীর জল দেখা যায় না—সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী। তার দেশ, তার ঘর।

শঙ্খদত্তের সমস্ত চিন্তা আকুল হয়ে উঠল। মুখের সামনে ভেসে উঠল বুড়ো বাপ ধনদত্তের মুখ। মাথাভরা ধবধবে শাদা চুল—তোবড়ানো গালে-মুখে সংখ্যাতীত বলিরেখা।

সামনে একখানা কষ্টিপাথর নিয়ে সোনা ঘষছিলেন ধনদত্ত। চোখ তুলে ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চোখের জ্যোতিও অন্ধকার হয়ে আসছে—আজকাল খুব কাছের জিনিস ছাড়া দেখতে পান না।

আস্তে আস্তে ধনদত্ত বললেন, দক্ষিণ পাটনে যেতে চাও?

—হ্যাঁ বাবা। ঘরে বসে বসে কুঁড়ে হতে বসেছি।

—তা বটে।—ধনদত্ত বিড়বিড় করতে লাগলেন: সদাগরের ছেলে—সাগর পেরিয়ে না এলে জাত থাকে না।

—তা হলে সামনের মাসেই বেরিয়ে পড়ি বাবা।

—যাও—ধনদত্ত আবার কী বিড়বিড় করে বললেন স্বগতোক্তির মতো, ভালো করে শোনা গেল না। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কতদূর পর্যন্ত যেতে চাও?

—সিংহল। তারপর পশ্চিমে।

—সিংহল?—ধনদত্ত চমকে উঠলেন: ওদিকের গোলমাল সব মিটেছে?

—কিসের গোলমাল?

—সেই হার্মাদদের উৎপাত? শুনেছি, দক্ষিণের কূলে কূলে কেল্লা বসিয়েছে ওরা। দরিয়াতেও বহরগুলোর ওপর নাকি নানারকম উপদ্রব করছে?

—সে সব এখন মিটে গেছে বাবা। বাণিজ্য করতে এসেছে, লুটেরার কাজ করলে চলবে কেন ওদের। মুসলমান সওদাগরদের সঙ্গে ব্যবসা নিয়েই যা কিছু গোলমাল ছিল—সেগুলোর ফয়শালাও হয়ে এসেছে। তবে দরিয়ায় উপদ্রব এখনো মাঝে মাঝে যে করে না তা নয়; কিন্তু সে সব মুসলমানদের বহরের ওপর। আমাদের কোনো ভাবনা নেই বাবা। আমাদের ওরা শত্রু নয়।

—মুসলমানদের বহর, মুসলমানদের বহর।—ধনদত্ত আবার বিড়বিড় করতে লাগলেন: আমার কিন্তু ভালো লাগছে না শঙ্খ। এ হার্মাদদের মতলব ভালো নয়! শুনেছি, কথায় কথায় তলোয়ার বের করে—গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধায়—মিথ্যে ছুতোনাতা করে অন্যের সর্বস্ব লুটে নেবার ফিকির খোঁজে। ওরা একদিন সর্বনাশ করবে—গোটা দেশের সর্বনাশ করবে। আজ মুসলমানদের ঘাড়ে কোপ দিতে চাইছে কাল হিন্দুর মাথাও বাদ দেবে না।

—এসব মিথ্যে ভাবনা বাবা।—শঙ্খদত্ত বিরক্তি বোধ করল: আমাদের সঙ্গে কী সম্পর্ক ওদের? আরবেরা পয়সা দিয়ে আমাদের জিনিস কেনে—ওরাও তাই। বরং দাম ওরা বেশিই দেয়। ওদের সঙ্গে কাজ-কারবার করেই লাভ বেশি।

—বেশি যারা দেয়, তারা বেশি নিতেও জানে শঙ্খ—একবার দৃষ্টিহীন ঘোলা চোখ ছেলের মুখের দিকে তুলেই কষ্টিপাথরের ওপর নামিয়ে নিলেন ধনদত্ত—তাকিয়ে রইলেন সোনার আঁচড়ে আঁকা উজ্জ্বল আঁকাবাঁকা রেখাগুলোর দিকে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, কী জানি, কিছুই বুঝতে পারছি না।

…শঙ্খদত্ত ফিরে এল নিজের বাস্তব পারিপার্শ্বিকের ভেতরে। চারচারখানা পালে উত্তরে হাওয়ার আমেজে ডিঙা ভেসে চলেছে দক্ষিণের দিকে। ঘুমিয়ে আছে কালীদহের কালীয় নাগ—চারদিকে শুধু তার শিশুরা ছোট ছোট ফণা তুলে খেলা করে চলেছে। ডিঙার হাল ধরে 'কাঁড়ারেরা' ঝিমুচ্ছে নিরুদ্বেগ মনে।

এই সাগর। শঙ্খদত্তের কপালের রেখা হঠাৎ কুঁচকে এল। হঠাৎ মনে হল—এই সাগরের উপর যেন একটা নতুন শক্তির ছায়া পড়েছে—হার্মাদদের ছায়া। এই মানুষগুলোর দু-একজনকে দেখেছে চট্টগ্রামের বন্দরে—অসংখ্য কাহিনীও শুনেছে এদের সম্পর্কে। কঠিন লোহার মতো পেশী দিয়ে গড়া সব শক্তিমান মানুষ—রোদের আঁচ-লাগা ফুটফুটে গায়ের রঙ। মুখে তামাটে রঙের দাড়ি—উলটে দেওয়া হাঁড়ির মতো দু ভাঁজ টুপি বাঁ দিকে কাত করে পরা—বাঁ চোখটা তাতে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। ডান দিকের ধূর্ত চোখ ঈগলের দৃষ্টির মতো নিষ্ঠুর কঠিনতায় ঝকমক করে; গলার আর দু কাঁধের পোশাক বিচিত্র রকমে কুচি করা—বুকের শাদা জামার ওপর মোটা মোটা কালো ডোরাগুলো দেখে কোথায় যেন বাঘের সঙ্গে সাদৃশ্য মনে এসে যায়। কোমরে মস্ত বাঁটওয়ালা সরল সুদীর্ঘ তলোয়ার—সেই বাঁটের ওপর একখানা হাত রেখেই তারা পথ চলে। চলার সঙ্গে সঙ্গে শক্ত জুতোর আওয়াজে মাটির পথ কেঁপে উঠতে থাকে।

নতুন মানুষ—নতুন চেহারা। সর্বাঙ্গে একটা অদ্ভুত তীব্রতা। যেন সব সময় ভেতরে ভেতরে ছট্‌ফট্‌ করছে, যেন একটা শ্রান্তিহীন ক্ষুধা বাঘের থাবার মতো ওদের পাকস্থলী আঁচড়ে চলেছে।

কিসের ক্ষুধা ওদের এত? কী ওরা এমন করে চায়? এমন লোভীর মতো তাকায় কেন? ওদের দেশের মাটি কি ওদের ক্ষুধার খাদ্য দেয় না —ওদের নদী দেয় না তৃষ্ণার জল? কে জানে!

ভয় পেয়েছেন ধনদত্ত। শঙ্খদত্তের হাসি এল। না—এখনো ধনদত্ত সব খবর শুনতে পাননি। শুধু দিউ কিংবা গোয়ার বন্দরই তো নয়। চট্টগ্রামের দিকেও হাত বাড়িয়েছে হার্মাদেরা। কিছুদিন আগেই তাই নিয়ে যে সব কাণ্ড ঘটে গেছে, সপ্তগ্রাম পর্যন্ত তার ঢেউ পৌঁছোয়নি; আর পৌঁছুলেও বার্ধক্যে অবসন্ন ধনদত্তের কানে কেউ তোলেনি সে সব। সেগুলো শুনলে ধনদত্ত তাকে পাটনে বেরুতে দিতেন কিনা সন্দেহ।

চট্টগ্রামের বন্দরে জাহাজ নিয়ে এসেছিল হার্মাদ সিল্‌ভিরা। চেয়েছিল গৌড়ের বাদশা নসরৎশাহের সঙ্গে বাণিজ্য-চুক্তি করতে; কিন্তু নানা গণ্ডগোল

হয়েছে তাই নিয়ে। সমুদ্রে লুটতরাজ আর নানা উপদ্রব করে পালিয়েছে সিল্‌ভিরা। প্রায় অরাজক সৃষ্টি করেছিল। কোয়েল্‌হো বলে আর একজন হার্মাদ একটা মীমাংসার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। নবাব বলেছেন হার্মাদদের জাহাজ আর বন্দরে ঢুকতে দেবেন না; কিন্তু হার্মাদদের চেহারা দেখে একথা মনে হয়নি যে, এত সহজেই তারা ফিরে যাবে।

দক্ষিণ পাটনে বেরুবার আগে দেবতার কাছে একবার আশীর্বাদ চাইতে গিয়েছিল শঙ্খদত্ত। গিয়েছিল চন্দ্রনাথ পাহাড়ে সর্ববিঘ্নহারী শঙ্করকে প্রণাম করতে।

সেখানেই দেখা সোমদেবের সঙ্গে।

মন্দিরের অন্যতম পূজারী সোমদেব। শালগাছের মতো ঋজু দীর্ঘদেহ। গভীর কালো গায়ের রঙ—দুটি আরক্ত চোখ যেন সব সময় ঘুরছে। ললাটে ত্রিপুণ্ড্রকের রক্তরেখা।

মন্দির থেকে কিছু দূরে একটা ছাতিম গাছের তলায় একখানা বড় পাথরের ওপরে বসে ছিলেন সোমদেব। কালো মুখখানা চিন্তায় আরো কালো হয়ে গেছে তাঁর। উজ্জ্বল ভয়াল চোখ দুটো স্তিমিত। কপালে ভ্রূকুটি।

সেইখানে শঙ্খদত্তকে ডাকলেন সোমদেব।

সশঙ্ক শ্রদ্ধায় সামনে এসে দাঁড়ালো শঙ্খদত্ত। সোমদেব বললেন, বোসো।

নীরবে আদেশ পালন করল শঙ্খদত্ত।

কিছুক্ষণ নিজের ভেতরে মগ্ন থেকে সোমদেব চোখ মেললেন। একটা কঠিন দৃষ্টি ফেললেন শঙ্খদত্তের মুখের ওপর ঃ হার্মাদদের তুমি দেখেছ ?

—দেখেছি।

—কী মনে হয় ?—পরীক্ষকের ভঙ্গিতে জানতে চাইলেন কথাটা।

—মনে হয়, দুঃসাহসী জাত—ভেবেচিন্তে শঙ্খদত্ত জবাব দিলে।

—শুধু দুঃসাহসী নয়, দুরাকাঙ্ক্ষীও বটে। ওরা এতদূরে কেন এসেছে জানো ?

—ব্যবসা করতে। মশলা কিনতে।

—কেবল ব্যবসা করে আর মশলা কিনেই ওরা ফিরে যাবে ?—সোমদেব আবার ভ্রূকুটি করলেন ঃ ওদের দেখে তা তো মনে হয় না। সামনে ওরা যা কিছু দেখে তাতেই ওদের চোখ লোভে চকচক করে ওঠে। ওরা শুধু মশলা নেবে না—আরো কিছু নেবে। যদি চেয়ে না পায় ছিনিয়ে নেবে। চট্টগ্রামের বন্দরে কী হয়েছে সব জানো বোধ হয়।

—জানি।

অধৈর্য ভঙ্গিতে মাথার জটাবাঁধা ঝাঁকড়া চুলগুলো একবার ঝাঁকালেন সোমদেব ঃ সেদিনই আমি ওদের চিনেছি। দয়া নেই, বিবেকও নেই, বিশ্বাস-ঘাতকতা ওদের মজ্জায় মজ্জায়। দুর্বলের ওপর কথায় কথায় তলোয়ার নিয়ে তাড়া করে আসে, সবলের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে পোষা কুকুরের মতো। একটা কিছু করে তবে ওরা যাবে।

—কী জানি !—শঙ্খদত্ত নিঃশ্বাস ফেলল।

—তুমি জানো না, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি। ওদিক বাংলা আর বিহারের পাঠানেরা জোট বাঁধছে দিল্লীর বিরুদ্ধে। ভয়ঙ্কর গোলমাল দানা বেঁধে উঠছে চারিদিকে এই সুযোগে।—সোমদেবের স্বরে উত্তেজিত উদ্বেগ।

—কিসের সুযোগ ? সবিস্ময়ে জানতে চাইল শঙ্খদত্ত।

একবার চন্দ্রনাথের সমুচ্চশীর্ষ মন্দির, আর একবার অরণ্যময় পাহাড়গুলির ওপর দিয়ে সোমদেব দৃষ্টি বুলিয়ে আনলেন। তারপর নিচু গলায় বললেন, এই চন্দ্রনাথের মন্দির, এই দেব-বিগ্রহ, এ হিন্দুর ছিল না।

—সে কী কথা !—শঙ্খদত্ত চমকে উঠল।

—সত্যি কথাই আমি বলছি, আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই—সোমদেব আবার মন্দিরের চূড়োর দিকে তাকালেনঃ একদিন এই মন্দির ছিল বুদ্ধের—বৌদ্ধেরা এইখানে এসে 'সম্মা-সম্বোধি' লাভ করত। আজ এখান থেকে বুদ্ধের বিসর্জন হয়ে গেছে—হিন্দুর দেবতা এইখানে বিছিয়েছেন তাঁর আসন। বেদ-নিন্দকের দল যেমন একদিন বাংলা দেশ থেকে নির্বাসিত হয়েছে, তেমনি করে এই পাঠান-মোগলও যাবে। আর তারপরে হিন্দুর হিন্দুত্ব আমরা ফিরিয়ে আনব—ফিরিয়ে আনব তার বেদোজ্জ্বলা সভ্যতা।

শঙ্খদত্ত বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইল। সোমদেবের রক্তিম চোখ দুটো আরো রাঙা হয়ে উঠেছে, উত্তেজনায় ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়ছে। কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে মাথার জটাবাঁধা চুলগুলো অল্প অল্প দুলছে ; যেন একরাশ গোখরো সাপ ফণা ধরে আছে কঠিন ভয়ঙ্কর মুখখানার চার পাশে।

পাহাড়ের চূড়োয় সন্ধ্যা নামছে। নিচের সাদা মেঘগুলো ক্রমশ কালো হয়ে আসছে—ওপরের একখানা মেঘে ডুবে যাওয়া সূর্যের শেষ আলো জ্বলছে তখনো ; যেন ক্রুদ্ধ চন্দ্রনাথ ওইখানে মেলে ধরেছেন তাঁর আগ্নেয় তৃতীয় নেত্র। অশ্রান্ত কান্নার মতো কোথাও একটা ঝর্ণা চলেছে অবিরাম। নির্জন পাহাড়ের বুকের ওপর কী একটা আসন্ন হয়ে আসছে—তীব্র ঝিঁঝির ঝঙ্কারে যেন সেই অনাগত সম্ভাবনার উদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছে কেউ।

স্তব্ধতা ভেঙে চন্দ্রনাথের মন্দিরে ঘণ্টা বেজে উঠল।

সোমদেব ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, পাটনে যাচ্ছ, খুব ভালো কথা ; কিন্তু চোখ-কান খোলা রাখবে। লক্ষ্য রাখবে হার্মাদদের ওপর। কী ওরা করে, কী ওরা বলে, কী ভাবে ওরা চলে। তোমার কাছ থেকে সব খবরই আমরা চাই।

শঙ্খদত্ত সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল। তারপর সোমদেবকে অনুসরণ করে মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলল। দেবতার আরতি শুরু হয়ে গেছে।

সোমদেব আবার বললেন, বেশ বুঝতে পারছি—চট্টগ্রামের ওপরে বিপদ আসবে। এখানকার দুর্বল নবাব হার্মাদকে রুখতে পারবে না। মনে রেখো শঙ্খদত্ত, এই আমাদের সুযোগ—এই আমাদের সুযোগ—

…আর একবার চমক ভাঙল শঙ্খদত্তের। চন্দ্রনাথের পাহাড় নয়—সপ্তগ্রাম

ত্রিবেণীর বন্দরও নয়। বঙ্গোপসাগর। অল্প অল্প ঢেউয়ের ওপর দিয়ে তার বহর একদল রাজহাঁসের মতো দক্ষিণে ভেসে চলেছে—উত্তরের বাতাস লক্ষ্যপথে নিয়ে চলেছে তাকে।

আর দূরে—

দূরে একখানি ছোট্ট জাহাজ আসছে। অত্যন্ত দীনহীন তার চেহারা। সমুদ্রের ঢেউয়ে অসহায়ভাবে দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে। শঙ্খদত্ত দেখেও দেখতে পেলো না।

কিন্তু শঙ্খদত্ত জানত না ওই সামান্য জাহাজটিকে আশ্রয় করেই বাংলার ঘাটে আসছে পশ্চিমী বাণিজ্য-লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট। আর যে সেই ঘট বয়ে আনছে, সে মানুষটি ডি-মেলো। মার্টিম অ্যাফোন্সো ডি-মেলো জুসার্তে—আগামী এক মহানাটকের সে মহানায়ক।

দুই

"Os mares são azues. Quanto mais vivo, melhor."

গভীর নীল সমুদ্র। আরো উজ্জ্বল, আরো সুন্দর।

মার্টিম অ্যাফোন্সো ডি-মেলোর চোখ তলিয়ে গিয়েছিল সেই সমুদ্রের সৌন্দর্যে। সপ্ত-সাগর পাড়ি দিয়ে আসা মানুষটির কাছে নীল জল কিছু নতুন কথা নয়; কিন্তু আজকের এই সকালের মধ্যে মিশেছে একটা অদ্ভুত মাটির গন্ধ—একটা অপরিচিত পৃথিবীর সংবাদ।

তার স্বপ্ন বার বার দেখেছেন ডা-গামা, দেখেছেন কোয়েল্হো। বেঙ্গালা। মাটিতে সোনার খনি আছে সেখানে। অথবা তাও নয়। বেঙ্গালায় খনি খুঁড়বার কষ্টটুকুও স্বীকার করতে হয় না। পথে পথেই তা ছড়িয়ে আছে—শুধু মুঠি ভরে সে ঐশ্বর্য কুড়িয়ে নিলেই চলে।

আর তার তোরণদ্বার চট্টগ্রাম। পোর্টো গ্র্যান্ডি। শুধু গ্র্যান্ডিই নয়। কোয়েল্হো বলেছিল, সিডাডি গ্র্যান্ডিই বনিটা। শুধু বিরাট নয়—সুন্দর, মনোরম শহর। কোচিন, কালিকটের চাইতেও মনোরম, এমন কি সে রূপ মাতৃভূমি লিসবোয়াতেও বুঝি দেখতে পাওয়া যায় না।

পোর্টো গ্র্যান্ডি! সিডাডি বনিটা!

বেশি আশা নেই আপাতত। শুধু দাও বাণিজ্যের অধিকার। রাজাকে এনে দেব তাঁর উপযুক্ত রাজকর। বেঙ্গালার সঙ্গে বন্ধুত্বই এখন কাম্য আমাদের। নিয়ে যাব মস্‌লিন, পট্টবস্ত্র, রেশম, কস্তুরী, 'জাবাদ', ঢাকাই শঙ্খ, নেব গৌড়ের গুড়, মোম, লাক্ষা, শুকনো লঙ্কা। এনে দেব মালদ্বীপ থেকে নানা আকারের খোলা তিনেভেলীর শঙ্খ, মালাবারের গোলমরিচ, সিংহলের দারুচিনি, মুক্তা আর হাতী। পেগু থেকে নিয়ে আসব মুক্তো, সোনা রুপো—

আরও নানারকমের রত্ন। অবাধ বাণিজ্য চলুক আমাদের মধ্যে—সহযোগিতা দিয়েই আমরা পরস্পর সমৃদ্ধ হয়ে উঠব।

শত্রু আমাদের নেই তা নয়। সে হল কালো মুরের দল—অর্ধেক ইউরোপ জুড়ে যারা একদিন সাম্রাজ্যের পত্তন করেছিল ঘোড়ায় আর তলোয়ারে। তাদের সেই প্রতাপের ওপর আমরা শেষ যবনিকা টেনে দিয়েছি কিউটার দুর্গে। হিস্‌পানিয়ার তাড়া খেয়ে ইয়োরোপের দরজা থেকে দূরে ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়েছে তারা। এইবার সেই শত্রুদের আমরা পূর্ব-পৃথিবী থেকেও দূর করে দেব। তাদের বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নেব যেমন করে হোক এবং তারপর Vamos ester muito bem aqui—'এইখানে আমরা আরামে বসব হাত পা ছড়িয়ে'।

কিন্তু আজ পর্যন্ত ফল পাওয়া গেল না। বার বার চেষ্টা করেছে সিলভিরা—চট্টগ্রামের নবাবের কাছে বার বার মাথা খুঁড়েছে কোয়েলহো; কিন্তু ওই গোলাম আলী! তার জাহাজগুলোকে ক্যাম্বেতে যেতে না দিয়ে সিলভিরা পাঠিয়েছিল কোচিনের বন্দরে—আশা ছিল, এইভাবে ব্যবসার একটা সম্বন্ধ গড়ে উঠবে পর্তুগীজদের সঙ্গে; কিন্তু গোলাম আলী সমস্ত ব্যাপারটাই ভুল বুঝিয়েছিল নবাবকে। সেই জন্যেই নবাব হয়ে উঠলেন খড়্গহস্ত। ব্যর্থ নিরাশ সিলভিরার সঙ্গে দিনের পর দিন বেড়ে চলল তিক্ততার সম্পর্ক, পর্তুগীজের জাহাজ পোর্টো গ্র্যাণ্ডিতে এসে নোঙর পর্যন্ত ফেলতে পারল না! ঝড়-বৃষ্টি দুর্যোগের মধ্যে সিলভিরা মাঝ-সমুদ্রে ভেসে বেড়াতে লাগল। তারপর আরাকানের বিশ্বাসঘাতক রাজার হাত থেকে কোনোমতে মৃত্যুর ফাঁদ এড়িয়ে সিলভিরা ফিরে চলে গেছে। ভারতবর্ষের স্বর্ণভূমি—বেঙ্গালার মাটিতে আজও পর্তুগীজদের পদসঞ্চার ঘটল না।

মনের মধ্যে স্বপ্ন ভাসে। গ্র্যাণ্ডি! বনিটা!

সেই সুযোগ বুঝি এসেছে ডি-মেলোর হাতে। নিতান্তই কুমারী জননীর আশীর্বাদ ছাড়া কী আর বলা যায় একে। তাই সমুদ্রের নীলিমাকে আরো বেশি নীল মনে হচ্ছে, আরো বেশি প্রসন্নতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আকাশের দৃষ্টি।

—অ্যাগ্রাডাভেল্‌! আনন্দের অভিব্যক্তি বেরিয়ে এল ডি-মেলোর মুখ দিয়ে।

এই সময় দূর সমুদ্রে দেখা গেল ছোট একটি বাণিজ্য বহর, বেঙ্গালাদের বহর। শাদা পাল তুলে একরাশ রাজহাঁসের মতো ভেসে চলেছে দক্ষিণে। চোখ-ভরা ঔৎসুক্য নিয়ে বহরটির দিকে তাকিয়ে রইলেন ডি-মেলো। মুঠো মুঠো সোনা নিয়ে চলেছে ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার। যদি কোনোমতে ওদের সঙ্গে একবার মিত্রতা করা যেত, যদি হাতের মধ্যে আসত বাঙালি বণিকের দল—

শঙ্খদত্তের চারটি ডিঙার দিকে যতক্ষণ চোখ চলে, ততক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ডি-মেলো। তারপর আস্তে আস্তে বহরটা অদৃশ্য হয়ে গেল চক্ররেখার ওপারে, রাজহাঁসের মতো পালগুলো 'ঝোড়ো' পাখির পাখার

চাইতেও ছোট হয়ে এল ; কিন্তু আর কতদূরে বাংলার মাটি ? আরাকান নদীর শুভ্র জলের কোলে কোথায় সেই শ্যামলে-সুনীলে একাকার দেশ ? যেখানকার মসলিন পরে রোমার সেরা সুন্দরীদের যৌবনমত্ত রূপ রেখায় ফুটে উঠত, অ্যাফ্রোদিতের উৎসবের দিনে যেখানকার মশলা-সুরভিত ব্যঞ্জনের গন্ধে আকীর্ণ হয়ে উঠত অ্যালেক্‌জান্‌ড্রিয়ার আকাশ-বাতাস।

—কাকা !

ডি-মেলো ফিরে তাকালেন। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তাঁরই কিশোর ভাইপো গঞ্জালো।

—কি হয়েছে গঞ্জালো ?

—আর কত দূর ? কবে আমরা পৌঁছবো ?

ডি-মেলো হেসে উঠলেন ঃ সে খবরটা জানবার জন্যে আমিও কম ব্যস্ত নই ; কিন্তু আর বেশি দেরি নেই—আমি যেন বাতাসে বাংলার মাটির গন্ধ পাচ্ছি।

—ওরা কি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে কাকা ?

আশঙ্কাটা নিজের মনেও একেবারে যে নেই তা নয়। যে অভ্যর্থনা সিল্‌ভিরার অদৃষ্টে জুটেছিল, তাঁর জন্যেও তা অপেক্ষা করছে কিনা বলা শক্ত। অবশ্য সে জন্য ডি-মেলোও পিছপা হবেন না ? পর্তুগীজের সন্তান তিনি—যুদ্ধের দোলা তাঁর রক্তে রক্তে। ঝড়ের মুখে পাল উড়লে, শত্রু সামনে এসে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করলে, সমস্ত চেতনা আনন্দে উৎকীর্ণ হয়ে ওঠে। দুর্গমের ডাক জাগিয়ে দেয় দুঃসাহসের ঘুমন্ত মত্ততাকে ; কিন্তু তবুও যুদ্ধ চান না ডি-মেলো। ডামা—কাব্‌রাল—আল্‌মীডার যুগ শেষ হয়ে গেছে আজ। এখন আর রক্তপাত নয়—তলোয়ারে তলোয়ারে বিরোধকে জাগিয়ে রাখাও নয়। শান্তি চাই—চাই মিত্রতা। গোয়ার শাসনকর্তা নুনো ডি-কুন্‌হারও সেই নির্দেশ।

—না, না—যুদ্ধ করবে কেন ? বেঙ্গালারা লোক খারাপ নয়। তারা মুরদের চাইতে অনেক ভালো।

—কিন্তু সিল্‌ভিরা—

—গোলাম আলীর সঙ্গে ঝগড়া করে ভুল করেছিল সিল্‌ভিরা। তা ছাড়া নবাবের একটা চালের জাহাজও লুট করেছিল সে। আমরা ও সব গণ্ডগোলের দিকে তো পা বাড়াব না।

—কিন্তু সিল্‌ভিরার ওপর রাগ থেকে যদি ওরা আমাদের আক্রমণ করে ? —উৎসুক চোখ মেলে আবার জানতে চাইল গঞ্জালো।

—তা হলে আর আমরাও কি পিছিয়ে যাব ? আমাদের রাজার নামে, মা মেরীর নামে আমরাও রুখে দাঁড়াব। কী বলো, পারব না ?

—নিশ্চয় পারব।—আস্তে আস্তে জবাব দিলে গঞ্জালো।

কিছুক্ষণ ডি-মেলো তাকিয়ে রইলেন গঞ্জালোর দিকে। হিস্‌পানিয়ার সন্তান। সারা পৃথিবীতে যারা বয়ে নিয়ে যাবে ক্রুশ চিহ্নিত সূর্যদীপ্ত

পতাকা—পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে গড়ে তুলবে এক অখণ্ড বিশাল ক্রীশ্চান সাম্রাজ্য—যাদের আকাশ-ছোঁয়া 'ইগ্রেঝা'র (গীর্জার) চূড়োয় চূড়োয় ঝরে পড়বে খ্রীষ্টের প্রসন্ন আশীর্বাদ—তাদেরই একজন প্রতিনিধি সে।

তবু কোথায় যেন সায় দেয় না ডি-মেলোর মন। পর্তুগীজের সন্তান, তলোয়ার হাতে বীরের মৃত্যুই সবচেয়ে বড় কামনার জিনিস; কিন্তু কিশোর গঞ্জালোর মুখের দিকে তাকিয়ে সেকথা কিছুতেই ভাবতে পারেন না ডি-মেলো। বড় বেশি সুন্দর সে—বড় বেশি সুকুমার। কেমন যেন মনে হয়ঃ এমন করে সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে বেড়ানো তার কাজ নয়—এমন করে তাকে টেনে আনা উচিত নয় প্রতিদিনের কঠিন মৃত্যুর মধ্যে; তার চাইতে ঢের ভালো হত—তাকে 'সুন্দা'র দুর্গে রেখে এলে, সমুদ্রের ধারে, নারকেল বনের কাঁপা কাঁপা ছায়ার ভেতরে। তার হাতে তলোয়ার নয়—গীটারই সেখানে মানায় ভালো; তার কাব্য 'লুসিয়াদাস' নয়—তার জন্যে ওপোর্টোর দুরো নদীর ধারে ধারে লাল আঙুর বনের গান!

কিন্তু ডি-মেলো তাকে ছাড়তে পারেন না—এক মুহূর্ত রাখতে পারেন না দৃষ্টির অন্তরালে। ডি-মেলো আবার তাকালেন গঞ্জালোর দিকে। সোনালি চুলের ভেতরে আধো ঘুমন্ত মুখ। সৈনিকের কঠোরতা নেই—আছে কবির করুণতা।

ডি-মেলো মৃদু গলায় বললেন, থুন্দ্ সানকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

গঞ্জালো চলে গেল। আবার দিনের উজ্জ্বল আলো—তরল নীলার মতো সমুদ্র। **Os mares sāo azues!** কতদূরে বেঙ্গালা—আরাকান নদীর ধারে সেই মায়াবতীর দেশ!

অনিশ্চয়ে বুক কাঁপছে। সরকারী দৌত্য নিয়ে আসেননি ডি-মেলো, নিতান্তই যোগাযোগ—নিতান্তই মেরীর আশীর্বাদ। কালিকটের সঙ্গে সিংহলের একটা ঘরোয়া বিরোধে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল ডি-মেলোকে। কালিকটের সেনাপতি নৌবহর নিয়ে কলম্বো আক্রমণ করতে আসছে এই খবর পেয়ে তিনি যুদ্ধ-জাহাজ নিয়ে আসছিলেন আশ্রিত সিংহলের রাজাকে রক্ষা করতে। তাঁর বহর দেখেই ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে বাঁচল কালিকটের সেনাপতি প্যাটে মারকার; কিন্তু ডি-মেলো আর ফিরে যেতে পারলেন না সুন্দার দুর্গে। নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে একটা উন্মত্ত ঝড় উঠল সমুদ্রে। দুখানা জাহাজ সেই ঝড়ের হাওয়ায় কোথায় ভেসে গেল, তার সন্ধানও করতে পারলেন না ডি-মেলো।

তারপরে সে কী দুর্ভাগ্যের ইতিহাস!

কোনোমতে অবশিষ্ট একখানি ছোট জাহাজ আশ্রয় করে সঙ্গীদের নিয়ে ডি-মেলো এসে পেঁছুলেন একটা বালির চড়ায়।

দাঁড়াবার জায়গা পাওয়া গেল, কিন্তু প্রাণ বাঁচাবার উপায় কোথায়! চারদিকে ধু-ধু জল, জোয়ারের সময় চড়াতে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায়। কাছাকাছি কোথাও তীরের চিহ্ন চোখেও পড়ে না। একটুকরো খাদ্য নেই কোথাও।

নদীর অসহ্য নোনা জল পিপাসার যন্ত্রণাকে যেন ব্যঙ্গ করে।

সমুদ্রের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া গেছে; কিন্তু ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মৃত্যু অনিবার্য। জাহাজে সামান্য যা খাবার ছিল, প্রথম দিনেই তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। এইবার?

জাহাজটারও বেশ কিছু ক্ষতি হয়েছে। সারিয়ে নিতেও তিন-চার দিন সময় লাগবে। এই চারদিন কেমন করে কাটবে? তারপর সমুদ্রে ভাসলেও যে কোথাও কোনো ডাঙা পাওয়া যাবে—এসব ভরসাই বা কোথায়! অজানা দেশ—অপরিচিত সমুদ্র। ডি-মেলো চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন।

ক্ষুধায় আর পিপাসায় জর্জরিত হয়ে দুদিন কাটল। জাহাজ সারাইয়ের কাজ কিছু কিছু চলছিল, তৃতীয় দিনে তাও বন্ধ হল। ক্লান্ত কাতর মানুষগুলোর মধ্যে আর এতটুকু উদ্যমও অবশিষ্ট নেই এখন।

সর্বনাশের প্রহর গুণতে গুণতে অনুগ্রহ করলেন মা-মেরী।

একখানা কাঠে আশ্রয় করে ভাসতে ভাসতে চড়ায় এসে লাগল তিনজন আরাকানী জেলে। মাছ ধরতে বেরিয়েছিল, নৌকো ডুবে যাওয়ায় এখানে এসে পৌঁছেছে তারা।

তিনজন জেলের মধ্যে যে লোকটি সবচেয়ে বিচক্ষণ, তার নাম থুন্দ্ সান। লোকটার চুলে পাক ধরেছে—চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, রেখাঙ্কিত মুখ, চাপা ঠোঁট; দেখলেই বুঝতে পারা যায় লোকটা স্বল্পভাষী; কিন্তু একটুখানি আলাপ করতে গিয়েই ডি-মেলো বুঝলেন—তিনি যা ভেবেছিলেন, তার চাইতেও ঢের বেশি অভিজ্ঞ থুন্দ্ সান। বহুদিন সে জাহাজে জাহাজে ঘুরেছে—ভারতবর্ষের সব অঞ্চলের ভাষা তার জানা—পর্তুগীজ সে বুঝতে পারে, এমন কি বলতেও পারে কিছু কিছু। আগ্রহভরে তাকেই আশ্রয় করলেন ডি-মেলো।

থুন্দ্ সান বললে, আমরা পর্তুগীজ ক্যাপিতানকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারি। বাঙলা দেশের কূলের কাছাকাছি আমরা আছি এখন।

বাঙলা! ডি-মেলোর বুকে যেন ঝড় উঠল। বেঙ্গালা! তাঁর স্বপ্নের দেশ! এত কাছে! দুর্যোগের মধ্য দিয়ে মা-মেরী তাঁকে এ কোথায় এনে পৌঁছে দিলেন!

অবরুদ্ধ গলায় ডি-মেলো বললেন, আমরা চট্টগ্রামে যেতে চাই।

থুন্দ্ সান একবার মাথা হেলাল কিনা বোঝা গেল না। চাপা ঠোঁট দুটো তার খুলল না—প্রায় ভ্রূ-রেখাহীন চোখ দুটো সামান্য কুঞ্চিত হয়ে এল মাত্র।

—পথ চেনো তুমি?

—চিনি।

—নিয়ে যেতে পারবে সেখানে?

—কেন পারব না?—তেমনি সংক্ষিপ্ত উত্তর।

—বেশ, তবে তুমিই পথ দেখাও। বকশিশ দেব খুশি করে—ডি-মেলো আশ্বাস দিলেন।

তারপর থেকেই অনিশ্চিত দিনগুলো কাটছে আশায়-উত্তেজনায়। প্রত্যেকটি সকালে ঘুম ভেঙেই ডি-মেলো এসে দাঁড়ান জাহাজের মাথার ওপর—ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে দেখতে চান, বাঙলার উপকূলের সোনালি-শ্যামলতা অপরূপ হাতছানি নিয়ে ভেসে উঠল কিনা চোখের সামনে; কিন্তু নীল আর নীল জল। আকাশ ফুরোয় না—সমুদ্র অফুরন্ত। পোর্টো গ্র্যান্ডি ক্রমশঃ একটা সমুদ্রের মরীচিকার মতোই পেছনে সরে যাচ্ছে!

খুন্দ্‌ সানকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে কোনো স্পষ্ট জবাব দেয় না। শুধু মাথা নাড়ে।

—আমরা পথ ভুল করিনি তো?

—না—না।

—তবে দেরি হচ্ছে কেন?—নিজের অধৈর্য আর চেপে রাখতে পারেন না ডি-মেলো।

—সময় হলেই পৌঁছুব।—এর বেশি আর কিছু বলতে চায় না খুন্দ্‌ সান।

আশ্চর্য স্বল্পভাষী এই আরাকানীরা। কথা বলে না—কেমন অদ্ভুত শাণিত চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে স্থির ভঙ্গিতে। লোকগুলোকে কেমন দুরবগাহ দুর্বোধ্য মনে হয়, ফলে থেকে থেকে অনুভব করেন একটা অস্বস্তির অন্তর্জ্বালা।

কিন্তু কাল আশ্বাস দিয়েছে খুন্দ্‌ সান। ভরসা দিয়েছে, সমুদ্র এই রকম স্থির থাকলে হয়তো পরের দিনই—

তাই হয়তো আজ থেকে থেকেই বাঙলার মাটির গন্ধ পাচ্ছেন ডি-মেলো। অনুভব করছেন নিজের প্রতিটি রক্তরন্ধ্রে; কিন্তু কোথায় তা, কতদূরে?

চমকে উঠলেন। কাছে এসে দাঁড়িয়েছে খুন্দ্‌ সান। জানিয়েছে অভিবাদন।

—চট্টগ্রাম কই? কূল কোথায়?

তামাটে রঙের কয়েকগাছা সংক্ষিপ্ত দাড়ি হাওয়ায় দুলে উঠল খুন্দ্‌ সানের। এতদিন পরে—এই প্রথম যেন তার মুখে হাসি দেখলেন ডি-মেলো; কিন্তু তার মুখের কথার মতোই সে হাসি বিদ্যুৎ-চমকে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

—হাসছ কেন?—হঠাৎ একটা ক্রুদ্ধ সন্দেহে ডি-মেলোর মনটা চকিত হয়ে উঠল। হাতখানা সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে পড়ল কোমরের তলোয়ারের বাঁটের ওপর।

খুন্দ্‌ সান আঙুল বাড়িয়ে দিলে উত্তর-পূর্ব দিগন্তের দিকে। ওই তো দেখা যাচ্ছে!

—দেখা যাচ্ছে!—অদ্ভুত গলায় প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন ডি-মেলো।

—ওই তো নদীর মোহানা—উত্তর এল খুন্দ্‌ সানের।

তার আঙুল লক্ষ্য করে চোখ দুটোকে যেন চক্ররেখার পারে ছুঁড়ে দিতে চাইলেন ডি-মেলো। সামনে সূর্যের বাধা ছিল না, তবু হাতখানাকে বাঁকিয়ে

ধরলেন কপালের ওপর। দেখা যায়—সত্যিই দেখা যায়! অত্যন্ত ক্ষীণ—অত্যন্ত আবছা, তবু যেন চোখে পড়ছে তীরতরুর সুস্পষ্ট একটা কৃষ্ণরেখা, আর তারই পাশ দিয়ে বিস্তীর্ণ মোহনায় একরাশ শুভ্র জল এসে নীলসমুদ্রের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে!

বিশ্বাস হয় না—ভরসা হয় না বিশ্বাস করতে। হয়তো এখনি দিবাস্বপ্নের মতো মিলিয়ে যাবে! মরীচিকা! মরুভূমির মতো কখনো কখনো সমুদ্রেও যে মরীচিকা দেখা দেয়—সে অভিজ্ঞতা আছে দুঃসাহসী নাবিক ডি-মেলোর। কত সুদূর তট, কত দূরান্তের জাহাজ সমুদ্রের ওপরে এসে ছায়া ফেলে, নাবিকেরা হঠাৎ চমকে দেখতে পায়ঃ একটু আগেই চলেছে একখানা বিরাট জাহাজ—পরক্ষণেই মিলিয়ে যায় তা। কুসংস্কার মনে করে ভৌতিক জাহাজ। মেসিনা প্রণালীর আকাশে দূর মেসিনা নগরীর ছায়া পড়ে—জাহাজের লোক ভাবে যেন প্রেতপুরী ঝুলে আছে মেঘের গায়ে। এও কি তাই?

স্পন্দিত বুকে—রক্ত-তরঙ্গিত হৃৎপিণ্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ডি-মেলো। না—মরীচিকা নয়। ওই তো দুধের মতো শাদা জল—ওই তো নারকেল বনের চঞ্চল রেখা! ওই তো তাঁর সেই স্বপ্নস্বর্গের হাতছানি!

—ওই—ওই ওদিকে। ঘুরিয়ে দাও জাহাজের মুখ—কূল দেখা যাচ্ছে—

অস্বাভাবিক স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন ডি-মেলো। সমুদ্রের কলধ্বনি ছাপিয়ে তাঁর সে উৎকট চিৎকার শূন্যতায় ফেটে পড়ল। সারা জাহাজের লোক চমকে উঠল তাঁর সেই প্রচণ্ড অভিব্যক্তিতে।

—কাকা!

কোথা থেকে ছুটে এল গঞ্জালো। তার ঘুমন্ত মুখ জেগে উঠেছে উত্তেজনায়।

—গঞ্জালো!—দু হাত দিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ডি-মেলো। আবেগরুদ্ধ স্বরে বললেন, কূল দেখা যাচ্ছে গঞ্জালো—পোর্টো গ্র্যাণ্ডি—সিডাডি বনিটা!

কিন্তু ওই উপকূলে যে ভয়াল অভিজ্ঞতা তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে, তা কি ভুলেও ভাবতে পেরেছিলেন ডি-মেলো? যদি ভাবতে পারতেন, তা হলে আরো জোরে—আরো কঠিন বন্ধনে গঞ্জালোকে তিনি বুকের পাঁজরে আঁকড়ে ধরতেন, আর্তনাদ করে উঠতেনঃ এখানে নয়, এখানে নয়! পালাও—পালাও—ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাও। ওই খুন্দ্‌সানকে জলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যাও যত দূরে হয়—

কিন্তু!

*   *   *   *

সোমদেব ঠিক লোকালয়ে বাস করেন না। সাধারণ মানুষকে সহ্যই করতে পারেন না তিনি। সাংসারিক জীবগুলোর প্রতি কেমন একটা অদ্ভুত ঘৃণা দিনের পর দিন দহন করে তাঁকে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন—শান্ত নির্বোধের

দল, দিনগত পাপক্ষয় করে কোনোমতে কাটিয়ে চলেছে—অভিযোগ নেই, প্রতিবাদ নেই! এই দেশ একদিন হিন্দুর ছিল—শক্তি থাকলে, সাধনা থাকলে আবার তা হিন্দুরই হবে। আজকের বিধর্মী শাসন থেকে আবার মুক্তি হবে তার, জ্বলবে হোমের অগ্নি, উঠবে বেদমন্ত্রের সুর, আবার আর্যধর্ম ফিরে আসবে তার সগৌরব মর্যাদায়।

কিন্তু কোথায় সেই বিশ্বাস? কোথায় সেই সাধনা?

শান্তিপ্রিয় নিশ্চিন্ত মানুষের দল। আঘাত পেলে দেবতার দরজায় এসে মাথা খোঁড়ে, অন্যায়-অত্যাচারকে মেনে নেয় ভগবানের দান বলে। মূর্খেরা জানে না, পঙ্গু—দুর্বলচিত্তদের ভগবানও কখনো করুণা করেন না!

একটা কিছু করতে ইচ্ছে করে সোমদেবের। চন্দ্রনাথের মন্দিরে সুপ্ত হয়ে আছেন মহারুদ্র। তাঁকে প্রচণ্ডভাবে নাড়াচাড়া দিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, শোনো—শোনো। আর কতদিন তুমি এমন করে ঘুমোবে? এখনো কি তোমার লগ্ন আসেনি? আর যদি তুমি সত্যিই চিরমৃত্যুর মধ্যেই ডুবে গিয়ে থাকো, তা হলে তো এমন করে বসে বসে পুজো পাওয়ার অধিকার তোমার নেই। তার চেয়ে তোমার বিসর্জনই ভালো—পাহাড়ের ওপর থেকে গড়িয়ে ফেলে দিয়ে মহাসমুদ্রের অতলে তোমার চিরবিরাম।

একটা তীক্ষ্ম মর্মজ্বালা সোমদেবের দুটো রক্তবর্ণ ভয়ঙ্কর চোখের মধ্য দিয়ে যেন ফুটে বেরুতে থাকে। মানুষ তাঁকে সভয়ে পথ ছেড়ে দাঁড়ায়, তাঁর সামনে পড়লে প্রাণপণে ছুটে পালায় ছেলেমেয়েরা। নিজের চারদিকে যেন কতগুলো অশুভ-অপার্থিব প্রেত-ছায়াকে বহন করে চলেন সোমদেব।

চন্দ্রনাথ থেকে আরো খানিক দূরে—পাহাড়ের কোলে বাস করেন তিনি—সামনের দিকে একটুখানি কুটিরের ছাউনি—তার পেছনে অন্ধকার একটা কালো গুহা। সেই গুহাতেই সোমদেবের আশ্রয়।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বন্ধুর পাহাড়ী পথে এগিয়ে চললেন তিনি। শীতের কুয়াশার থমথমে অন্ধকার চারিদিকে। পা ফেলে ফেলে সোমদেব চলতে লাগলেন। একটা শুকনো কাঁটা-গাছের আঁচড়ে বাঁ পায়ের খানিকটা কেটে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল, ভ্রূক্ষেপও করলেন না সেদিকে।

থেমে দাঁড়ালেন একবার। কুয়াশাঘেরা স্তব্ধ অন্ধকারে একটা ঘনীভূত দুর্গন্ধ। বাঘের গায়ের গন্ধ! চারদিকের তীব্র ঝিঁঝির ডাক ছাপিয়ে একটা প্রেতকণ্ঠ কান্না বেজে উঠল : ফেউ—ফেউ—উ—

কাছাকাছি বাঘ আছে। সোমদেব জানেন। দু-একবার এ পথে তাদের সঙ্গে তাঁর দেখাও হয়েছে; কিন্তু তারাও তাঁকে চেনে। সসম্মানে পথ ছেড়ে দেবে।

সোমদেব আবার পথ চললেন। পেছনে ফেউয়ের সতর্ক বাণী; কিন্তু তাঁর উদ্দেশে নয়। তিনি এই রাজ্যের অধীশ্বর। এই পাহাড়—এই অরণ্য তাঁকে ভয় করে।

একটা উৎরাই নেমে আবার থেমে দাঁড়ালেন সোমদেব। তাঁর রক্তাভ

চোখ এবার সন্দেহে কঠিন হয়ে উঠেছে। কী যেন একটা দেখতে পেয়েছেন সম্মুখে।

একটু দূরেই তাঁর কুটির। তার সামনে দুটো জ্বলন্ত মশাল—অন্ধকারের বুকে উছ্‌লে-ওঠা রক্তের মতো দপ্‌দপ্‌ করছে তারা।

কে এল? আজ রাত্রে কারা তাঁর অতিথি?

উদ্গত প্রশ্নটার তাড়নায় এবার দ্রুতগতিতে নিচের দিকে নেমে চললেন সোমদেব। তাঁর কঠিন পায়ের আঘাতে আঘাতে পাথরের টুকরোগুলো আছড়ে পড়তে লাগল ঢালু পথ বেয়ে। পেছনে পাহাড়ের ভয়ার্ত প্রতিহারী সামনে ডেকে চলল : ফেউ—ফেউ—উ—

তিন

"Que Cidade ē esta ?"

গুহার সামনে এসে দাঁড়াতেই প্রসন্ন হল সোমদেবের মুখ। কঠিন চোখ দুটোয় পড়ল কোমলতার ছায়া। কপালের যে রেখাগুলো এতক্ষণ কুণ্ডলী পাকাচ্ছিল, তারা ধীরে ধীরে সরল হয়ে এল।

আগুনের সম্মুখে যারা প্রতীক্ষা করছিল, তারা আগে থেকেই ছিল উৎকর্ণ হয়ে। জ্বলন্ত আগুনের কম্পিত রক্তবৃত্তের ভেতর সোমদেবের দীর্ঘ ছায়া পড়তেই তারা উঠে দাঁড়ালো। এগিয়ে এসে সভয়ে প্রণাম করলে সোমদেবকে।

অব্যক্ত ভাষায় কিছু একটা আশীর্বাদ করলেন সোমদেব। পেছনে জঙ্গলের ভেতর ফেউয়ের ডাক আর ঝিঁঝির তীব্র ঝঙ্কারে সেটা ভাল করে শোনা গেল না। একটি মধ্যবয়সী পুরুষ, আর একটি তরুণী মেয়ে শঙ্কিতভাবে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

সোমদেব বললেন, বোসো রাজশেখর। এটি কে? তোমার মেয়ে বোধ হয়?

—হ্যাঁ গুরুদেব। এর নাম সুপর্ণা। ছেলেবেলায় আপনি অনেকবার দেখেছেন।

—তাই তো, কত বড় হয়ে গেছে।—ভয়ঙ্কর মুখে সোমদেব একটুখানি সস্নেহ হাসি ফোটাতে চাইলেন : বহুদিন দেখিনি বোধ হয়।

—তা প্রায় পাঁচ বছর হবে! এর মধ্যে আপনি তো আমাদের ওদিকে পায়ের ধুলো দেননি আর।

—হুঁ, তাই বটে। তা তোমরা দাঁড়িয়ে আছো কেন? বোসো—বোসো। বোসো মা সুপর্ণা—

রাজশেখর আর সুপর্ণা একখণ্ড হরিণের ছালের ওপর বসে ছিলেন, সেইখানার ওপরেই আবার ধীরে ধীরে বসে পড়লেন তাঁরা। সোমদেব

একখানা বাঘের চামড়ার আসন টেনে নিলেন। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইলেন তিনজন। সুপর্ণা নতদৃষ্টি মেলে রাখল মাটির দিকে, রাজশেখর আগ্রহভরে লক্ষ্য করতে লাগলেন সোমদেবকে—আর সোমদেব ধ্যানস্থের মত কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন গুহার দেওয়ালে শীতল অন্ধকারের দিকে। সামনের আগুনটা মাঝে মাঝে নতুন ইন্ধনের সন্ধান পেয়ে রক্তশিখায় চমকে উঠছে, সেই ক্ষণ-দীপ্তিতে অলৌকিক দেখাচ্ছে সোমদেবের অস্বাভাবিক মুখ। বাইরের পুঞ্জিত কুয়াশা ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আরো ঘন হতে লাগল, সমতালে বেজে চলল অরণ্য-ঝিল্লীর তীক্ষ্ম আর্তনাদ। দূরে ফেউটা এখনো বাঘের সঙ্গ ছাড়েনি—থেকে থেকে তার এক-একটা বুকফাটা কাতরোক্তি যতিপাত করতে লাগল ঝিঁঝিঁর কলধ্বনির ওপর।

রাজশেখরের ভয় করতে লাগল। ঝুঁকে পড়ে একমুঠো শুকনো পাতা কুড়িয়ে নিয়ে তিনি ছুঁড়ে দিলেন আগুনটার ওপরে। একবার থমকে গিয়েই আবার লক্‌লকিয়ে উঠল আগুনটা। পট পট করে উঠল পাতা পোড়ার শব্দ, একটা উগ্র জান্তব গন্ধ ছড়িয়ে গেল চারপাশে; পাতার ভেতরে একটা বড় গোছের পোকা ছিল নিশ্চয়।

ওই গন্ধটাতেই বোধ হয় সজাগ হয়ে উঠলেন সোমদেব ঃ সঞ্জয়ের সঙ্গে তোমাদের দেখা হয়েছিল বোধ হয় ?

রাজশেখর বললেন, সেই-ই আমাদের বসিয়ে, আগুন জ্বেলে দিয়ে গেল। বললে, সন্ধ্যা হলেই আপনি ফিরবেন।

সঞ্জয় সোমদেবের সেবক ; কিন্তু এখানে সে থাকে না, আসে পাহাড় পার হয়ে দূরের গ্রাম থেকে। সন্ধ্যা লাগতে না লাগতেই এক হাতে একখানা ধারালো বল্লম, আর এক হাতে একটা মশাল জ্বেলে নিয়ে পা বাড়ায় বাড়ির দিকে। প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসেই পালায়। সন্ধ্যার পরে এই পাহাড়ে একমাত্র সোমদেবই বাস করতে পারেন, সাধারণ মানুষের স্নায়ুর পক্ষে তা দুঃসহ।

সোমদেব বললেন, মন্দিরে গিয়েছিলে ?

—গিয়েছিলাম ; কিন্তু আপনার দেখা পাইনি। তাই অতিথিশালায় জিনিসপত্র রেখে এখানে আপনার খোঁজ করতে এসেছিলাম। সঙ্গে মেয়েটা রয়েছে, ভেবেছিলাম বেলাবেলিই ফিরে যাব—

—খুব ভয় করছে বুঝি এখানে ?—করুণামেশানো কৌতুকের হাসি হাসলেন সোমদেব।

—ঠিক ভয় নয়—রাজশেখর দ্বিধা করতে লাগলেন। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন শীতার্ত অন্ধকারে ঢাকা পাহাড়-বন নিবিড় ঘন কুয়াশা আর ধোঁয়ার আড়ালে অবগুণ্ঠিত হয়ে গেছে। হাঁ-করে-থাকা রাক্ষসের মতো কালো পাহাড়ের কদর্য রূপটা যেন সহ্য করতে পারছিলেন না তিনি। বললেন, ঠিক ভয় নয়, তবে—

—বাঘ ? ভালুক ?—তাচ্ছিল্যের স্বরে সোমদেব বললেন, এখানে তারা আসে না। নিশ্চিন্তে রাত কাটাতে পারো। আমার কাছে কম্বল আছে,

শীতে কষ্ট হবে না। তবে পেট ভরে খেতে দিতে পারব কিনা সন্দেহ। সঞ্চয় যা সামান্য কিছু রেখে গেছে—

রাজশেখর বাধা দিয়ে বললেন, সে আপনিই গ্রহণ করুন। আমরা আসবার আগেই খেয়ে এসেছি—রাত্রে আর কিছু দরকার হবে না আমাদের।

—কিন্তু আমার অতিথি হয়ে উপবাসে থাকবে ?

—তা হলে আপনার এক কণা প্রসাদ দেবেন, তাতেই হবে। কী বলিস মা ?—রাজশেখর সুপর্ণার দিকে তাকালেন, নিঃশব্দ সমর্থনে মাথা নাড়ল মেয়েটি।

রাজশেখরের সঙ্গে সোমদেবের দৃষ্টিও সরে এল সুপর্ণার ওপর। বাস্তবিক, এই কয়েক বছরের ভেতরেই বেশ সুন্দরী হয়ে উঠেছে মেয়েটি ; উজ্জ্বল দীর্ঘ শরীর, সুলক্ষণা ললাট। রাজশেখরের মতো কালো কুরূপ মানুষের ঘরে শ্রীমতী এই মেয়েকে কেমন প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হল।

নিজের ওপরে সোমদেবের দৃষ্টি অনুভব করে আরো সংকুচিত হয়ে গেল সুপর্ণা। নিঃশব্দে হাতের কঙ্কণের দিকে তাকিয়ে, তার অসংখ্য দর্পণের মধ্যে সে আগুনের প্রতিচ্ছবি দেখতে লাগল।

সোমদেব বললেন, কিন্তু এত কষ্ট করে এখানে কেন যে এলে, সেইটেই এখনো জানতে পারিনি রাজশেখর।

রাজশেখর বললেন, কারণ অনেকগুলো আছে। গত বছর প্রবল জ্বর-বিকার হয়েছিল সুপর্ণার—বেঁচে উঠবে এমন ভরসাই ছিল না। বৈদ্যেরা সকলেই জবাব দিয়ে গিয়েছিলেন। নিরুপায় হয়ে মানত করলাম চন্দ্রনাথের কাছে। দেবতা দয়া করলেন, সেরে উঠল মেয়েটা। সেইজন্যেই পুজো দিতে এসেছি। তা ছাড়া আপনার কাছেও একটা নিবেদন আছে আমার। ভরসা রাখি, নিরাশ করবেন না।

সোমদেবের কপালে কয়েকটা সংশয়ের রেখা দুলে উঠল।

—আমার কাছে ? কী চাও আমার কাছে ?

—বহুদিন আপনি আমাদের ওদিকে পদধূলি দেননি। এইবারে আমি আপনাকে সঙ্গে করে চাকারিয়ায় নিয়ে যাব।

—চাকারিয়ায় ?—সোমদেব আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন ঃ আমি তো আজকাল আর কোথাও যাই না।

—সে কি কথা !—রাজশেখরের চোখমুখ নৈরাশ্যে কাতর হয়ে উঠল ঃ আমি যে বিশেষ করে আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যেই এসেছি। আপনি না গেলে ওদিকের সমস্ত আয়োজন যে পণ্ড হয়ে যাবে !

—কিসের আয়োজন ?

রাজশেখর বললেন, সেই নিবেদনই করতে যাচ্ছিলাম। অনেক দিন ধরে, বহু অর্থ ব্যয় করে একটি মন্দির গড়ে তুলছি আমি। সেটা শেষ হয়ে এল। আপনি সিদ্ধপুরুষ—আমাদের সকলের ঐকান্তিক ইচ্ছা যে আপনিই সে মন্দিরে বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করে আসবেন।

—বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা !—সোমদেব হঠাৎ আর্তনাদ করলেন যেন। তাঁর আকস্মিক হুংকারে সমস্ত গুহাটা গমগম করে উঠল, আগুনের শিখাগুলো একরাশ সাপের মতো লকলক করে দুলে গেল, সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল রাজশেখরের, সুপর্ণা সভয়ে সরে এল বাপের কাছে।

—বিগ্রহ ! প্রতিষ্ঠা !—এবার গলার স্বর নামিয়ে পুনরুক্তি করলেন সোমদেব। বললেন, আর প্রতিষ্ঠা নয়—বিসর্জন। হিন্দুর রাজত্ব গেছে, একপাল ভেড়ার মতো দিন কাটাচ্ছে দেশের মানুষ। তার ধর্মকর্ম সব গেছে, সেই সঙ্গে দেবতারও অপমৃত্যু হয়েছে। শোনো রাজশেখর, আর মন্দির প্রতিষ্ঠা নয় ! মন্দির টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলো, আর প্রকাণ্ড একটা চিতা তৈরি করে সে চিতায় জ্বালিয়ে দাও তোমার বিগ্রহকে।

বাপ আর মেয়ে সভয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন, সমস্ত গুহাটাও নিস্তব্ধ হয়ে রইল তার সঙ্গে। আচমকা সমস্ত পাহাড় আর শীতার্ত রাত্রির ধূমলকৃষ্ণ অরণ্যকে কাঁপিয়ে দিয়ে পর পর তিনবার বাঘের নাদধ্বনি উঠল। একটা অস্ফুট ভয়াতুর আর্তনাদ করলে সুপর্ণা, কুয়াশা-সরে-যাওয়া গুহার মুখে ধরা পড়ল দূরের একটা নিকষ-কালো আকাশ—তার ওপর দিকে ছিটকে চলে গেল উল্কার খানিক শাণিত ফলক। কোথায় একটা বড় পাথর স্থানচ্যুত হয়ে সশব্দে আছড়ে আছড়ে নামতে লাগল কোনো পাহাড়ী খাদের মহাশূন্যতার ভেতর দিয়ে।

রাজশেখরের ঠোঁট কেঁপে উঠল থর থর করে। শিথিল গলায় বললেন, গুরুদেব !

সোমদেবের চোখ দুটো তখনো ভয়ংকর দেখাচ্ছিল। বলে উঠলেন, কিসের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে চাও তুমি ?

তেমনি ভয়ার্ত স্বরে রাজশেখর বললেন, রূপোর একটি শিবলিঙ্গ। রজতেশ্বর।

—রজতেশ্বর !—সোমদেব ভ্রূকুটি করলেন ঃ কিছু হবে না রজতেশ্বরকে দিয়ে। আজ চামুণ্ডাকে চাই। প্রতিষ্ঠা করতে পারো মহাকালীর মূর্তি ? হাতে খড়্গ, খর্পরে করে নররক্ত পান করছেন ?

রাজশেখর শিউরে উঠলেন। কেঁপে উঠল সুপর্ণা—একটা অস্পষ্ট কাতরোক্তি বেরুল তার গলা দিয়ে।

—এ কি কথা বলছেন গুরুদেব ? আপনি শৈব !

—শিব এবার শব হয়েছেন। তাঁর বুকে মহাকালীকে স্থাপন করতে হবে আজ।

রাজশেখর বললেন, কিন্তু—

—কোনো কিন্তু নেই। আমি যা বলছি তুমি যদি তাতে রাজী থাকো, তবেই আমি তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারি।

রাজশেখর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

—মনে মনে একটা সংকল্প করেছিলাম—তবে ঃ রাজশেখর বাইরের

অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ ঃ আপনি গুরুদেব, যদি আদেশ করেন—

—শুধু আমার আদেশ বলে নয়। নিজেই ভেবে দেখো ভালো করে। যদি মনঃস্থির করতে পারো, তোমার আহ্বান আমি গ্রহণ করব ; কিন্তু সে সব কথা কাল হবে। আপাতত তোমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিই।

সোমদেব আর একবার তাকালেন সুপর্ণার দিকে।

উজ্জ্বল গৌরকান্তি—আশ্চর্য সুলক্ষণা। বিস্মিত কৌতূহলের সঙ্গে আর একবার মনে হল, রাজশেখরের ঘরে এমন একটি সুন্দরী মেয়ে জন্মালো কী করে ?

* * * *

কিন্তু এ কোন্ বন্দরে এসে ভিড়ল ডি-মেলোর জাহাজ ?

এই কি চট্টগ্রাম—বহুশ্রুত পোর্টো গ্র্যান্ডি ? যার কথা উচ্ছ্বসিত ভাষায় বলেছেন সিল্ভিরা, বলেছেন কোয়েল্হো ? যে চট্টগ্রাম স্বপ্নপুরী হয়ে দেখা দিয়েছিল ডা-গামার দৃষ্টির সামনে, যার স্তুতি এমনভাবে মুখরিত হয়েছিল ডা-গামার সহযোদ্ধা সৈনিক কবি ক্যামোয়েন্সের 'লুসিয়াদাস্' কাব্যে ?

ডি-মেলোও পড়েছেন 'লুসিয়াদাস্'। বার বার পড়েছেন বীরের গর্ব নিয়ে —পড়েছেন মুগ্ধ হৃদয়ে। স্মৃতির মধ্যে পংক্তিগুলো যেন গাঁথা হয়ে গেছে ঃ

"Ve Cathigão, Cidade des melhores
De Bengala, provincia que se preza
De abundante—"

সোনার দেশ বাংলা, ভারতের স্বর্গ এই বেঙ্গালা—তার উচ্চতর চূড়োয় আসন এই চট্টগ্রামের। De abundante ! মস্লিন, মশলা আর মণি-মাণিক্যের কল্পলোক। এই কি সেই চট্টগ্রাম ?

অতি সাধারণ একটি বন্দর। ইতস্তত সামান্য কয়েকটি নৌকো। কয়েকখানি বাড়ি। দূরে একটা মস্জিদের আকাশ-ছোঁয়া রক্তবর্ণ মিনার। এখানেও মুরদেরই জয়ধ্বজা উড়ছে ! ডি-মেলোর কপালে ভ্রূকুটির রেখা ফুটে উঠল।

—এ-ই পোর্টো গ্র্যান্ডি ?

—হাঁ, ক্যাপিতান !—খুন্দ্ সান জবাব দিলে, অদৃশ্যপ্রায় ভ্রূরেখার নিচে চোখ দুটো মিটমিট করে উঠল তার।

ততক্ষণে নদীর ধারে ধারে কৌতূহলী মানুষ জড়ো হয়েছে একদল। ডি-মেলো তাকিয়ে দেখলেন, তাদের মধ্যে মুর আর জেন্টুরের এক বিচিত্র সমাবেশ। এখানেও এত মুর ! ডি-মেলোর ভালো লাগল না—কেমন একটা তীব্র অস্বস্তিতে মন তাঁর সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল।

আরাকানী জেলেদের সঙ্গে ডি-মেলো নামলেন বন্দরের মাটিতে। কিন্তু এ-ই চট্টগ্রাম ! এরই এত খ্যাতি—এত প্রতিষ্ঠা ! কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। আর একবার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তিনি খুন্দ্ সানের দিকে তাকালেন—কিন্তু তার

কঠিন আরাকানী মুখে মনোভাবের এতটুকু প্রতিফলন কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না। একটা তামার মূর্তির মতোই সে নির্বিকল্প।

জনতার বৃত্ত তাঁদের চারদিকে আসতে লাগল সংকীর্ণ হয়ে। উত্তেজিত ভাষায় কী যেন আলোচনা করছে তারা। কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ডি-মেলো। কী করবেন স্থির করতে পারলেন না।

দূরে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা গেল। উৎকর্ণ হয়ে তাকালেন ডি-মেলো—দুপাশের জনতা সরে গিয়ে পথ করে দিলে সশ্রদ্ধ শঙ্কায়।

একজন নয়, দুজন নয়, দশজন অশ্বারোহী পুরুষ। তারা মুর নয়, কিন্তু মুখের কালো দাড়ি আর মাথার পাগড়িতে মুরদের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে তাদের। পরনে তাদের ঝলমলে জরির পোশাক—কোমরে ঝুলন্ত বক্রফলক তলোয়ার।

আগে আগে যে আসছিল, সে তার সাদা তেজী ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল মাটিতে। অশান্ত, উত্তেজিত তার চোখমুখ। তলোয়ারের বাঁটে হাত রেখে কী যেন চিৎকার করে বললে দুর্বোধ্য ভাষায়।

যেন আত্মরক্ষার সহজ প্রেরণাতেই ডি-মেলোর হাতও চলে গেল কোমরবন্ধের দিকে। সঙ্গী সৈনিকেরা একই সঙ্গে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল একটা আসন্ন সংঘর্ষের সম্ভাবনায়।

কিন্তু ভুলটা ভেঙে দিলে থুন্দ্ সান। বললে, ইনি নগরের কোতোয়াল। আপনারা কে এবং কেন এখানে এসেছেন কোতোয়াল সাহেব তা জানতে চান।

সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানালেন ডি-মেলো।

—ওঁকে জানাও, আমাদের কোনো দুরভিসন্ধি নেই। আমরা পর্তুগীজ। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে আমরা নবাবের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

উত্তর শুনে কোতোয়ালের হাত তলোয়ার থেকে সরে এল—কিন্তু তার মুখের মেঘ কাটল না। আবার তেমনি দুর্বোধ্য ভাষায় কতগুলো কথা বলে গেল সে।

থুন্দ্ সান জানালো: কোতোয়াল সাহেব ইচ্ছা করেন, তা হলে এখনি পর্তুগীজ ক্যাপিতানকে সমস্ত সৈনিক সমেত নবাবের দরবারে আসতে হবে।

ডি-মেলো বললেন, আমরাও এই সুযোগের জন্যেই অপেক্ষা করছি।

ধুলিধুসর পথ। দুদিকে ছাড়া ছাড়া ঘরবাড়ি—তাদের চেহারায় কোথাও কৌলীন্য নেই কোনো। এই পথ দিয়ে যেতে যেতে বারে বারেই একটা কুটিল জিজ্ঞাসায় ভরে উঠতে লাগল ডি-মেলোর মন। কোথায় একটা ভুল হয়ে গেছে—কোথায় যেন সঙ্গতি মিলছে না। এই পোর্টো গ্র্যাণ্ডি—এই সিডাডি বনিটা? এরই প্রশংসায় এমনভাবে পঞ্চমুখ কোয়েল্হো সিল্ভিরা? নাকি আসল শহর আরো দূরে—এ তার সূচনা মাত্র?

নিজের মনের কাছেই তাঁর প্রশ্ন জাগতে লাগল: **Que cidade e esta**? 'এ কোন্ শহরে এলাম'?

থুন্দ্ সান সঙ্গেই চলেছে দ্বিভাষী হয়ে। লোকটাকে কিছুতেই যেন

বিশ্বাস হচ্ছে না। কোথায় একটা গলদ আছে—কী যেন গোপন করে চলেছে ক্রমাগত। আর থাকতে পারলেন না ডি-মেলো।

—এ কোথায় এলাম ?

কিন্তু থুন্দ্ সান জবার দেবার আগেই চোখের সামনে ভেসে উঠল নবাবের প্রাসাদ। প্রকাণ্ড বাড়ি—সামনে মুক্ত সিংহদ্বার। কোতোয়াল আর প্রহরীদের ঘোড়া ধুলো উড়িয়ে প্রবেশ করল সেই সিংহদ্বারের ভেতরে।

মিলছে না—কিছুই মিলছে না। চট্টগ্রামের নবাবের সাতমহলা যে বিরাট বাড়ির বর্ণনা শুনেছিলেন, তার সঙ্গে এর যেন কোথাও মিল নেই। থুন্দ্ সানের দিকে একবার তাকালেন ডি-মেলো। চোখ ফিরিয়ে নিলে থুন্দ্ সান—বেশ বুঝতে পারা গেল, এখন আর একটি শব্দও বেরুবে না তার চাপা কঠিন ঠোঁটের নেপথ্য থেকে।

যা হবার হবে—নিজের সাতজন সেনানীকে সঙ্গে নিয়ে ডি-মেলো সিংহদ্বার অতিক্রম করলেন। প্রশস্ত চত্বরের দুপাশে সারিবন্ধ প্রহরীর দল। সামনে সাদা পাথরের সিঁড়ি। সিঁড়ি ছাড়িয়ে একখানা প্রকাণ্ড ঘর। দরবার।

অনেক লোক জমা হয়েছে দরবারে। ডি-মেলো তাকিয়ে দেখলেন, তাদের অধিকাংশই মুর। অদ্ভুত তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তারা লক্ষ্য করছে পর্তুগীজদের। সে দৃষ্টিতে আর যাই থাক, বন্ধুত্বের আমন্ত্রণ নেই কোথাও !

ঘরের একদিকে একটা উঁচু বেদী। সেই বেদীর ওপরে জাফ্‌রি-কাটা শ্বেতপাথরের সিংহাসন—মখমল দিয়ে মোড়া। সে আসনে যিনি বসে আছেন নিঃসন্দেহে তিনিই নবাব। পরনে জরির কাজ করা মস্‌লিনের পোশাক—মাথার পাগড়িতে ঝলমল করছে একখণ্ড কমল-হীরা, সাদা দাড়ি জাফ্‌রাণের রঙে রাঙানো। স্ফটিকের তৈরি একটা প্রকাণ্ড আলবোলা থেকে সোনা-জড়ানো সুদীর্ঘ নল এসে নবাবের ওষ্ঠ স্পর্শ করেছে। দুপাশে দুজন সমানে ময়ূরের পাখা দুলিয়ে চলেছে—এই শীতের দিনেও গরম কাটানো চাই ! মুর সৈনিকরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে দু-ধারে।

—একদল বিদেশী ক্রীশ্চান বণিক চাকারিয়ার নবাব খান্‌খানান খোদাবক্স খাঁর দর্শনপ্রার্থী—

নকীব চিৎকার করে উঠল।

চাকারিয়ার নবাব ! এদেশের ভাষা জানেন না ডি-মেলো, কিন্তু চাকারিয়ার নবাব কথাটা তীরের মতো বিঁধল তাঁর কানে। তবে এ চট্টগ্রাম নয় ! থুন্দ্ সান ঠকিয়েছে তাঁকে—বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আরাকানী জেলের দল ! খর-দৃষ্টিতে চারদিকে একবার খুঁজলেন তিনি—কিন্তু কোথাও আর দেখতে পাওয়া গেল না থুন্দ্ সানকে। দরবারের ভিড়ের মধ্যে কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে সে। ডি-মেলোর কিছু বুঝতে বাকি রইল না। আরাকানী জেলেরা তাঁদের চট্টগ্রামে নিয়ে যেতে চায়নি—নিজেদের ঘরে ফিরতে চেয়েছিল পর্তুগীজ জাহাজে। তাই তাদের এই কৌশল।

কিন্তু ফেরবার পথ নেই আর। তবুও এ বেঙ্গালার মাটি। এসেই যখন

পড়েছেন, সাধ্যমতো এইখানেই ভাগ্য পরীক্ষা করবেন ডি-মেলো। পর্তুগালের সন্তান তিনি—কোনো অবস্থাতেই বিচলিত হলে চলবে না তাঁর।

সম্মুখের আসনে যারা বসেছিল, তাদের মধ্য থেকে একজন মুর উঠে দাঁড়ালো। অভিজাত চেহারার লোক—দুই চোখে সন্দেহের কুটিলতা। ভাঙা ভাঙা পর্তুগীজ ভাষায় সে প্রশ্ন করলে, কী চাও তোমরা—কেন এসেছ এখানে ?

অভিবাদন করে পর্তুগীজেরা নতমস্তকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ডি-মেলো মাথা তুললেন এবারে।

—জননী মেরীর আশীর্বাদে ধন্য পর্তুগালের প্রজা আমরা। গোয়ার শাসনকর্তা নুনো-ডি-কুন্‌হা আমাকে তাঁর প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। নবাবের জন্যে এই আমাদের সামান্য উপহার।

সম্মুখে এগিয়ে গেলেন ডি-মেলো। নবাবের বেদীর সামনে মেলে দিলেন একখণ্ড মূল্যবান ভেলভেটের কাপড়, একছড়া মুক্তোর মালা, মালদ্বীপের তৈরি হাতীর দাঁতের একটি সুন্দর কৌটো। জাহাজডুবির পরে সামান্যই কিছু অবশিষ্ট ছিল।

প্রহরী অর্ঘ্য তুলে ধরল নবাবের সামনে। নবাব প্রসন্ন মুখে ফিরে তাকালেন। কী যেন বললেন মৃদুকণ্ঠে।

অভিজাত মুরটি পর্তুগীজ ভাষায় নবাবের বক্তব্য অনুবাদ করে চলল।

—নুনো-ডি-কুন্‌হার এই উপহারে আমি প্রীত হলাম ; কিন্তু আমার কাছে কী তাঁর বক্তব্য ?

—আমরা বেঙ্গালায় বাণিজ্য করতে চাই। সেই কারণেই নবাবের সাহায্য এবং অনুগ্রহ প্রার্থনা করি।

নবাব তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিলেন না। কিছুক্ষণ তিনি জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইলেন ডি-মেলোর দিকে, কয়েকটা রেখা কুণ্ডলিত হয়ে উঠল তাঁর কপালে। হাতের মৃদু ইঙ্গিত করে অভিজাত মুরটিকে কাছে ডাকলেন তিনি, কী যেন আলোচনা করলেন চাপা গলায়।

দ্বিভাষী মুর গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করলে, নবাব জানতে চাইছেন, পর্তুগীজেরা যুদ্ধ করতে পারে কি ?

প্রশ্নটা এমন আকস্মিক যে ডি-মেলো তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে পারলেন না ; কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সংহত করলেন তিনি। সন্দেহ-কুণ্ঠিত স্বরে বললেন, তলোয়ার পর্তুগীজের নিত্য সঙ্গী—যুদ্ধ তার প্রিয়বন্ধু ; কিন্তু এখন এই প্রশ্ন কেন ?

মুর বললে, চাকারিয়ার মহামান্য নবাব খান্‌খানান খোদাবক্স খাঁ ক্রীশ্চান বণিকদের সব রকম সুবিধেই করে দিতে রাজী আছেন। কিন্তু একটা শর্ত আছে তাঁর।

—কী সেই শর্ত ?

—নবাব সম্প্রতি তাঁর এক শত্রুরাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

পর্তুগীজেরা যদি এই যুদ্ধে নবাবকে যথাযোগ্য সাহায্য করেন—তাঁদের জাহাজ দিয়ে, তাঁদের সৈন্য দিয়ে—তা হলেই নবাব এই প্রস্তাব বিবেচনা করতে পারেন।

ডি-মেলোর মুখ কালো হয়ে উঠল।

—আমরা এ দেশে ব্যবসা করতে এসেছি। এখানে সকলেই আমাদের বন্ধু, কারো সঙ্গে যুদ্ধ করা—কারো সঙ্গে শত্রুতা করা আমাদের কাজ নয়। নবাব আমাদের মার্জনা করবেন।

—তা হলে ক্যাপিতান এই শর্ত মেনে নিতে রাজী নন?

—না। এদেশের সব রকম বিরোধ-বিশৃঙ্খলা থেকে আমরা দূরেই সরে থাকব—আমাদের প্রতি মাননীয় নুনো-ডি-কুনহার এই আদেশই রয়েছে।

নবাবের প্রখর চোখ হঠাৎ ক্রুদ্ধ জ্বালায় দপ্‌ করে উঠল। তীব্র স্বরে কী একটা কথা উচ্চারণ করলেন তিনি। ভাষা বুঝতে না পারলেও সঙ্গে সঙ্গেই ডি-মেলো-উচ্চকিত হয়ে উঠলেন।

দ্বিভাষী মুরের মুখে একটা অদ্ভুত বাঁকা হাসি দেখা দিল: তা হলে সে-ক্ষেত্রে পর্তুগীজ ক্যাপিতানকে তাঁর সমস্ত অনুচরসহ বন্দী করা হল। তাঁর জাহাজও চাকারিয়ার নবাব সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হবে।

তীরগতিতে তলোয়ারের বাঁটে থাবা দিয়ে ধরলেন ডি-মেলো—তাঁকে অনুসরণ করলে তাঁর সাতজন সহচর; কিন্তু তখন আর কিছুই করবার ছিল না। ডি-মেলো তাকিয়ে দেখলেন, খোলা তলোয়ার হাতে তাঁদের ঘিরে ফেলেছে ত্রিশজন সৈনিক এবং তাদের ব্যূহ রচনা করতে উপদেশ দিচ্ছে কোতোয়াল।

চার

"Maa nã o posso. Tenho que voltar"

সাত দিন—সাত রাত। নীল নিতল সমুদ্র এখনো ঘুমে অচেতন। উত্তরের হাওয়া বইছে মৃদু মন্থর নিঃশ্বাসের মতো। শঙ্খদত্তের চারটি ডিঙাতেও সেই ঘুমের ছোঁয়া লেগেছে—এগিয়ে চলেছে তন্দ্রাতুরের ভঙ্গিতে। হাল ধরে উদাস চোখ মেলে বসে থাকে কাঁড়ার; মাল্লাদেরও হৈ-হল্লা নেই। পাগল উচ্ছৃঙ্খল সাগরে ডিঙার দাঁড়-পাল সামলাতে কাউকে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতে হয় না—'জৈমিনির' নাম স্মরণ করে তুষ্ট করতে হয় না আকাশের বজ্রধর রুদ্র দেবতাকে। হাল্‌কা ঢেউয়ের দোলায় সাগর এখন দুলিয়ে দুলিয়ে নিয়ে চলেছে। সে দোলা ভয় জাগায় না—নেশা ধরায়।

এই সাত দিন—সাত রাত্রে একাদশীর চাঁদ কলায় কলায় মধুচক্রের মতো ভরে উঠল। শীতের কুয়াশামাখা রাত্রির সমুদ্রের ওপর দেখা দিল পূর্ণিমার রাত—উজ্জ্বল কুয়াশাকে মনে হল কার অপরূপ মুখের ওপর সোনালি মস্‌লিনের এক বিচিত্র অবগুণ্ঠন। ভোরবেলা সেই চাঁদ সামুদ্রিক

শঙ্খের মতো বিবর্ণ হয়ে অস্ত গেল—তার পরে চলল অভ্যস্ত ক্ষয়ের ইতিহাস। পূর্ণিমা রাতের ম্লান তারাগুলি ক্রমশ দীপিত হয়ে উঠতে লাগল—মুমূর্ষু চাঁদ দিনের পর দিন নিজের আয়ুর ইন্ধন দিয়ে নিভে-আসা নক্ষত্রদের জ্বালিয়ে তুলতে লাগল ধীরে ধীরে।

আজ তৃতীয়া।

আজও সন্ধ্যায় সমুদ্রের দিকে চোখ মেলে দাঁড়িয়ে ছিল শঙ্খদত্ত। কিন্তু চাঁদ এখনো দেখা দেয়নি—তার শূন্য বাসরের চারপাশে এখন তারার প্রদীপ সাজানো। জরির কাজ-করা নীল মসলিনের মতো সমুদ্র—চাঁদের ওড়না বিষণ্ণ কুয়াশায় হাওয়ায় উড়ে চলেছে। পালের শব্দ, জলের কলধ্বনি, কখনো কখনো দূরে-কাছে মালার মতো ছড়ানো এক-আধখানা ডিঙা থেকে দাঁড়ের আওয়াজ।

খানিকটা আগে আগেই চলেছে কাঞ্চনমালা ডিঙা। তার হালের কাছে কালো পাথরের মূর্তির মতো বসে-থাকা কাঁড়ার হঠাৎ গান গেয়ে উঠল ঃ

বিষম ঢেউয়ের ফণায় ফণায়
মরণ নাচে দিন-রজনী
তোমারি মুখ বুকে নিয়া
দিলাম পাড়ি—ও সজনী!

পালের শব্দ যেন আর শোনা গেল না, দাঁড়ের আওয়াজ থেমে এল, ঝিমিয়ে পড়ল জলের শব্দ। হাওয়ার নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে গানটা যেন শঙ্খদত্তের ওপরেই তরঙ্গিত হয়ে আসতে লাগল ঃ দিলাম পাড়ি—ও সজনী! মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল। ঘরে শঙ্খদত্তের কোনো সজনী নেই; তার সমবয়সীদের এর মধ্যেই দু'তিনবার বিয়ে হয়ে গেছে—শঙ্খদত্ত আজও অবিবাহিত। কোনো কারণ আছে তা নয়—কিন্তু মনের দিকে সে যেন কোনো উৎসাহই অনুভব করেনি। ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম-নবদ্বীপ-কালনার অনেক বড় বড় বণিক পরিবার থেকে বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে তার—বহু সুলক্ষণা সুরূপা কন্যা তার গলায় বরমাল্য পরিয়ে দেবার জন্য অপেক্ষা করে আছে; কিন্তু গঙ্গামৃত্তিকায় শিবমূর্তি তৈরি করে তারা যে শঙ্কর-সাক্ষাৎ পতি প্রার্থনা করেছিল, সে প্রার্থনার ফল শঙ্খদত্ত পর্যন্ত এসে পৌঁছোয়নি; গঙ্গার স্রোতে যে প্রদীপ তারা ভাসিয়েছিল, তা দূর-দূরান্তে চলে গেছে, কিন্তু তাদের একটিও এসে শঙ্খদত্তের ঘাটে লাগল না।

ধনদত্ত প্রায়ই দুঃখ করেন ঃ আমার পিণ্ডলোপ হবে, আমার বংশ থাকল না।

শঙ্খদত্ত পিতৃভক্ত—কিন্তু এই একটি জায়গায় পিতৃ-আজ্ঞা সে রাখতে পারেনি। কোনো কারণ নেই—শুধু প্রবৃত্তি হয় না। ত্রিবেণী আর সপ্তগ্রামের বন্দর, বড় বড় শিবমন্দির, তার শঙ্খ-ঘণ্টা, তার বণিক আর বাণিজ্যের কোলাহল। ভালোই লাগে—তবু যেন তৃপ্তি হয় না। শঙ্খদত্তকে হাতছানি দেয় সমুদ্র, ডাক দেয় দক্ষিণ পাটন—দক্ষিণ ছাড়িয়ে আরো দূর—আরো দুর্গম

তার মনকে চঞ্চল করে তোলে। আরো যেদিন থেকে সে হার্মাদদের জাহাজ দেখেছে, সেদিন থেকে অস্থিরতা অনেক বেড়ে গেছে তার। কত দূর থেকে এসেছে ওদের জাহাজগুলো! ওদের পালে কত ঝড়ের চিহ্ন—কত নোনা জলের রেখা ওদের জাহাজের গায়ে। শঙ্খদত্তেরও অমনি করে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে—দেখতে ইচ্ছে করে দিকে দিকে দেশে দেশে ছড়ানো সংখ্যাতীত নাম-না-জানা নগরকে, পত্তনকে, দিগদিগন্তের আশ্চর্য অপরিচিত মানুষকে। যতদিন বুড়ো ধনদত্ত বেঁচে আছেন, ততদিন অবশ্য এ আশা তার মিটবে না—একমাত্র ছেলেকে কিছুতেই এ পাগলামির ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেবেন না তিনি। ধনদত্ত চোখ বুজলে আর ভাবনা নেই তার—তখন সে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে যেখানে খুশি ভেসে পড়তে পারবে; কিন্তু আজ যদি সে বিয়ে করে—স্ত্রী-পুত্র নিয়ে জড়িয়ে পড়ে সংসারের বাঁধনের মধ্যে, তা হলেই ফুরিয়ে গেল সমস্ত। সেই পিছু টানে সে বাঁধা পড়ে থাকবে—আর ছুটে বেড়াবার উৎসাহ থাকবে না। নিজের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেই শঙ্খদত্ত তা দেখেছে। দক্ষিণ-পত্তন দূরে থাক, আজ তারা সপ্তগ্রাম থেকে চট্টগ্রামের বন্দর পর্যন্ত আসতেও অনিচ্ছুক। দিন-রাত নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে বসে আছে, টাকা আর মোহর গুনছে, অবসর সময়ে জুয়া খেলছে কিংবা গান-বাজনা করছে, আর মোটা হচ্ছে লক্ষ্মী প্যাঁচার মতো। কার কটি সুন্দরী গণিকা আছে—এ নিয়ে তারা গর্ব করে সাড়ম্বরে।

শঙ্খদত্তের আশ্চর্য লাগে। বিয়ে করে যারা ঘরমুখো হয়েছে—গণিকার ওপরে তাদের এই আসক্তির অর্থ সে বুঝতে পারে না; কিন্তু এটা বোঝে, বিয়ে করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার এই-ই পরিণাম। বাইরের কর্মশক্তি বন্ধ হয়ে গেছে—তাই যত দুর্বুদ্ধি এসে বাস্তু বেঁধেছে মনের ভেতরে। তাই যারা কুমার, তাদের চাইতে ঢের বেশি তারা মদ্যপ, তাই কালী পুজোর রাত্রে অমনভাবে তারা ভৈরবীচক্র তৈরি করে, তাই কোজাগরীর রাত্রে স্ত্রীকে পর্যন্ত পণ রেখে তারা জুয়া খেলতে বসে!

এই সব কারণেই শঙ্খদত্ত বিয়ে করেনি এতদিন। হয়তো আর একটা পরোক্ষ কারণও আছে তার। গুরু সোমদেব। ধিক্কার দিয়ে বলেন, মানুষ নয়—এরা মানুষ নয়। শুয়োরের পালের মতো বংশ-বৃদ্ধিই করে চলেছে কেবল—জীবনের আর কোনো দিকে একবার চোখ মেলে দেখতে পর্যন্ত শিখল না।

যত দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই হোক—কখনো কখনো কি মন টলেনি শঙ্খদত্তের? বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে শোনা কত বাসর-রাতের আশ্চর্য কাহিনী কি তার রক্তকে উদ্বেল করে তোলেনি? বিকেলের রাঙা আলোয় কোনো বাড়ির অলিন্দে দাঁড়ানো একজোড়া কালো চোখ, একটি শাড়ির আঁচল, একগুচ্ছ কালো চুল কখনো কি মনের মধ্যে কোমল ছায়া ঘনিয়ে আনেনি তার?

কিন্তু ওই পর্যন্তই। তারপরেই দেখছে তিনদিকে গঙ্গার ত্রিধারা—সমুদ্রযাত্রী নৌকোর ভিড়। ছায়া মুছে গেছে—কানে এসেছে দূর কালীদহের

কালো জলের ডাক ; চোখের সামনে ভেসে উঠেছে নারকেলের বন—পাহাড়ের বুকে আছড়ে-পড়া ঢেউয়ের ফণায় ফণায় ফেনার উল্লাস, দক্ষিণ-পত্তনের অদ্ভুত সব মন্দিরের আকাশ-ছোঁয়া চূড়ো—জ্ঞানবাপীর ধারে নীল পাথরের বিশাল বৃষভমূর্তি। দূর থেকে আরো দূর—দক্ষিণ থেকে আরো দক্ষিণ—

তবু এই রাত। কান্ডারের গলায় এই গানের সুর। তারায় ভরা আকাশের সীমান্তে চাঁদের রঙ!

ও সজনী
মরণকালে দেখি যেন
তোমারি মুখ, নয়নমণি—

শঙ্খদত্তও অমনি কারো মুখ দেখতে পেলে খুশি হত ; কিন্তু কে সে—কোথায় সে ? এই রাতের সাগর পাড়ি দিতে গিয়ে অমনি কারো কথা ভাবতে তারও ভালো লাগত। জীবনে সে থাকুক বা না-ই থাকুক, অন্তত এখনকার মতো কাউকে ভাবতে পারলে মন্দ হত না একেবারে।

কতগুলো সম্ভব-অসম্ভব, বাস্তব-অবাস্তব মূর্তি ভাসতে লাগল শঙ্খদত্তের মনের সামনে। স্নানের ঘাটে দেখা কারো মুখ মিলে যাচ্ছে মন্দিরে দেখা কারো চোখের সঙ্গে, পরিচিত কারো ওপরে মন দুলিয়ে দিচ্ছে কোনো কল্পিতার সৌন্দর্যের চিত্রকণ্ডুক। সে আছে—তবু সে নেই! এই-ই ভালো। থাকবে অথচ থাকবে না—কখনো কখনো আকুল করে তুলবে, অথচ বাঁধবে না। ভালো—এই ভালো।

রাত ঘন হতে লাগল—তারাগুলো নতুন সোনার মতো উজ্জ্বল হতে থাকল, ঢেউয়ের ওপর ছড়িয়ে যাওয়া রক্তাভার ভেতর থেকে তৃতীয়ার চাঁদ দেখা দিল। তখন চোখে পড়ল বাঁ দিকে কিছু দূরেই সমুদ্রবেলার বিস্তার—আলোছায়া-স্তব্ধ মৃত্তিকার নিশ্চলতা। তৃতীয়ার চাঁদের আলোতেও দেখা গেল নারিকেল-বনের ঘন বিন্যাস—আর সকলের মাথার ওপর মন্দিরের চূড়ো। ডাঙা এখান থেকে এক ক্রোশও দূরে নয়।

—পুরীধাম!

কে যেন চিৎকার করে উঠল।

পুরীধাম! তা হলে একবার দেবদর্শন করে যাওয়াই উচিত। একবার প্রার্থনা করা উচিত নীলমাধবের আশীর্বাদ।

গম্ভীর গলায় ডাক দিয়ে শঙ্খদত্ত বললে, জগন্নাথের প্রসাদ নিয়ে যাব আমরা। ডিঙা ভেড়াও।

শীতের দিন। অগভীর ডাঙার ওপর ঢেউয়ের মাতলামি নেই। ডিঙাগুলো একেবারে কূলের কাছাকাছি চলে এল। ভোরের আলোয় চোখ জুড়িয়ে গেল শঙ্খদত্তের। সামনে বালির ডাঙা পার হয়ে ঘন বনের সারি—তার ওপরে মন্দিরের চূড়ো। যেন সমুদ্রের ওপর দিয়ে দারুব্রহ্ম তাঁর আনত বিশাল দৃষ্টি মেলে রেখেছেন—যেন পাহারা দিচ্ছেন দুর্বিনয়ী অশান্ত নীলিমাকে। যে

ভক্ত—যে বিশ্বাসী, সমুদ্রের ওপরে সমস্ত ঝড়-ঝঞ্ঝা-দুর্বিপাকেও তাকে তিনি রক্ষা করবেন, সংকট মোচন করবেন তার। আর স্পর্ধিত অবিশ্বাসী যে—তার ওপর ফেলবেন তাঁর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি—তুফানের ঘায়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে তার বহর, হাঙর-মকরের পেটে যাবে তার রক্ত-মাংস, তার কঙ্কাল ছড়িয়ে থাকবে কালো জলের অতলে।

ডিঙা থেকে নেমে ডাঙায় এল শঙ্খদত্ত। চলল মন্দিরের দিকে।

মন্দিরের সামনেই বাজার—পান্থশালা। কত দেশ-বিদেশের তীর্থযাত্রী এসে যে জড়ো হয়েছে! এসেছে বাংলা দেশ থেকে কুলীনগ্রাম যাজপুর সাক্ষীগোপাল পার হয়ে—নর্মদা বিন্ধ্য পার হয়ে এসেছে দক্ষিণের মানুষ। নীলমাধবের দর্শনের আশায় পথের সমস্ত কষ্ট হাসিমুখে সয়ে এসেছে তারা। কতজন রোগের আক্রমণে পথেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে—দস্যুর হাতে প্রাণ দিয়েছে কতজনে—বনের হিংস্র জন্তুর মুখেও কত মানুষ চলার ওপর ছেদ টেনে দিয়েছে! যারা শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছোতে পেরেছে, তাদেরই বা ক'জন ঘরে ফিরে যাবে তীর্থের ফল সঞ্চয় করে!

তবু মানুষ এসেছে। তবু মানুষ আসবে। নীলমাধবের আহ্বান কেউ উপেক্ষা করতে পারবে না।

তীর্থযাত্রীর ভিড়—নারী-পুরুষের কোলাহল—পান্ডাদের চঞ্চলতা। মন্দিরের প্রধান দরজার সামনে আসতেই পরিচিত পান্ডা উদ্ধব এসে হাসিমুখে অভিনন্দন করলে।

—সপ্তগ্রামের শেঠ যে! কবে এলেন?

সপ্তগ্রামের বণিকদের অত্যন্ত মর্যাদা এখানে। তারা সকলেই শেঠ নয়, কিন্তু শেঠের মতোই দরাজ তাদের মন, তাদের কোমরে যে মোহরের থলি থাকে—তার উদারতা এখানে বিখ্যাত। দক্ষিণের চেট্টিরা আসেন—পশ্চিম থেকে দোলা-চৌদোলা হাতী-তাঞ্জাম নিয়ে আসেন রাজা-মহারাজারা, কখনো কখনো রথযাত্রার সময় কৌতূহলবশে মুসলমান নবাবেরাও দেখতে আসেন। তবু কাছের মানুষ বাঙালী বণিকেরাই এখানে সবচেয়ে প্রিয়।

—আজই সকালে এসেছি। দক্ষিণে চলেছি—ভাবলাম একবার জগন্নাথের প্রসাদ নিয়ে যাই।

—ভালো করেছেন, অত্যন্ত সৎকাজ করেছেন। দূরের পথ, দেবতাকে একবার পুজো দিয়ে যাওয়ার দরকার বইকি। চলুন—চলুন। বড় ভালো দিনে এসেছেন আজ।

—কেন?

—কাল অন্নকূট হয়ে গেছে। আজকের তিথিও অত্যন্ত শুভ। সন্ধ্যার পরে বিশেষ পুজোর আয়োজন আছে। চলুন।

শঙ্খদত্ত এগিয়ে চলল উদ্ধবের সঙ্গে। মন্দিরের সামনেই ডান দিকের উঁচু চত্বরের ওপর অন্নের বিশাল পর্বত। তার অনেকটাই এখন ক্ষয় হয়ে এসেছে—তবু এখনো তার বিরাট স্তূপ। অন্ন, ডাল, ঘি, লবঙ্গ, আদা আর

নানা মশলার মিশ্রিত গন্ধে চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সন্ন্যাসী, তীর্থযাত্রী, ভিক্ষুক আর কাকের ভিড়, এরই মাঝখানে হনুমান নেমে আসছে—মুঠো করে নিয়ে যাচ্ছে, দূরের একটা প্রাচীরের ওপর বসে খাচ্ছে জগন্নাথের প্রসাদ। ওদের এখন তাড়া করছে না কেউ। জগন্নাথ আজ জগতের সকলের জন্যই খুলে দিয়েছেন অন্নের উদার ভাণ্ডার ; সেখানে কেউই বঞ্চিত নয়—সকলেরই সমান অধিকার।

জটাধারী কে একজন সন্ন্যাসী এগিয়ে এল—একমুঠো প্রসাদ গুঁজে দিলে শঙ্খদত্তের মুখে। হঠাৎ চমকে উঠল শঙ্খদত্ত। এই রকম বিশাল জটা—রক্তবর্ণ চোখ—সোমদেব নয় তো ?

না, সোমদেব নয়। 'জয় জগন্নাথ' বলে ভৈরব-কণ্ঠে ধ্বনি তুলে লোকটা এগিয়ে গেল জনতার মধ্যে।

উদ্ধব নীচু স্বরে বললে, আজই চলে যাবেন ?

—না। একদিন থেকে যাব ভেবেছি। হাওয়া যদি পাই, কাল সকালেই বেরিয়ে পড়ব।

—ভালোই হল। আজ রাত্রেই বিশেষ আরতি দেখাব আপনাকে। সাধারণের সেখানে ঢোকবার নিয়ম নেই—তবে আমি আপনাকে নিয়ে যেতে পারব।

শঙ্খদত্ত বললে, সে পুজোর কথা আমি শুনেছি। কখনো দেখবার সুযোগ হয়নি।

—আজ দেখাব। সে জন্যেই তো বলেছিলাম, বড় শুভদিনে এসেছেন আপনি।

মন্দির দর্শন করে ফেরবার সময় উদ্ধব বললে, জলে আর রাত্রিবাস করে লাভ কী—আমার ওখানেই আজ থাকুন। আমাদের এখানে আপনাদের তিন পুরুষের আট্‌কে বাঁধা আছে—আলাদা ভোগ নিয়ে আসব আপনার জন্যে।

—তাই হবে। আচ্ছা, আমি ঘুরে আসছি একটু—

শঙ্খদত্ত বাজারের দিকে এগিয়ে চলল। খানিকটা বেড়ানোর জন্যেই বটে, তবু অস্পষ্ট লক্ষ্যও একটা আছে। কিছু বালি-হরিণের চামড়া কিংবা বন-গরুর শিঙের খেলনা নিয়ে গেলে মন্দ হয় না সঙ্গে। ভালো দাম পাওয়া যায় জিনিসগুলোর। তা ছাড়া কিছু কড়িও সংগ্রহ করতে হবে—ভিক্ষুকদের উৎপাতে কড়ির থলি প্রায় শূন্য হয়ে গেছে।

—এই যে, তুমি, এখানে ?

কে যেন কাঁধে হাত রাখল। চমকে উঠল শঙ্খদত্ত।

একটি বিরাট পুরুষ। মাথায় পাগড়ি। সাদা আচকানের ওপর কালো মলমলের জামা, তার ওপর ঝলমল করছে সোনালি জরির কাজ। কোমরবন্ধে বাঁকা একখানা সুদীর্ঘ ছুরি চকচক করছে, তার হাতীর দাঁতের বাঁটে মুক্তো বসানো। মুখের সাদা দাড়ির নিম্নাংশ মেহেদীর গাঢ় তাম্রবর্ণে রঞ্জিত। রোদে পোড়া মুখের রঙ, শাদা ভ্রূর তলায় ছোট ছোট চোখে মর্মভেদী সুতীক্ষ্ন দৃষ্টি।

একজন আরব বণিক। শুধু শঙ্খদত্ত কেন, উত্তরে-দক্ষিণে এক ডাকে সকলেই তাকে চেনে। গোলাম আলী।

—খাঁ সাহেব? আপনি এখানে?

—কেন? আসতে নেই?—গোলাম আলী হাসলেন: আমরা এখানে এলেও কি তোমাদের দেবতা অপবিত্র হয়ে যাবে?

—না, সে কথা নয়।—শঙ্খদত্ত শুধু অপ্রতিভ হল না, কেমন অস্বস্তিও বোধ করতে লাগল। গোলাম আলীকে সে ভয় করে। তা ছাড়া হার্মাদদের সঙ্গে চট্টগ্রামের নবাবের যে বিরোধ, তাতে কোথায় যেন গোলাম আলীর হাত আছে এমনি একটা জনশ্রুতিও আগে সে শুনেছিল।

গোলাম আলী বললেন, দক্ষিণ থেকে ফিরছি। পথে খাবার ফুরিয়ে গিয়েছিল, ভাবলাম কিছু সংগ্রহ করে নিয়ে যাই এখান থেকে। সকালে জাহাজ ভেড়ালাম। দেখলাম, চারখানা ডিঙা, সপ্তগ্রামের বহর। খোঁজ নিয়ে জানলাম তুমি এসেছ। ভাবলাম, তোমার সঙ্গে একবার দেখা হলে মন্দ হয় না।

—বলুন।

—এখানে নয়, চলো ঘুরে আসি একটু।

গোলাম আলীর চোখ দুটোকে কেমন অদ্ভুত মনে হল শঙ্খদত্তের। কোথায় একটা কঠিন জিজ্ঞাসা আছে সেখানে, আছে একটা খরধার তীব্রতা। একবার একান্তভাবে ইচ্ছে করল, যে-কোনো ছুতোয় পাশ কাটিয়ে চলে যায়, কিন্তু পারল না কিছুতেই। অস্বস্তিভরে বললে, তবে চলুন।

*　　*　　*　　*

ডি-মেলো পারলে তখনই ঝাঁপ দিয়ে পড়তেন এই শয়তান মানুষগুলোর ওপর। আর ভিড়ের মধ্যে কোথায় গেল থুন্দ্ সান! একবার তাকে যদি কখনো হাতে পান ডি-মেলো—

সিল্‌ভিরাই ঠিক বলেছিল। এই 'বেঙ্গালারা' অত্যন্ত অধম জীব—বিশ্বাস-ঘাতকতা এদের রক্তে রক্তে।

ভুল করেছেন মহান্ আল্‌বুকার্ক—ভুল করেছেন নুনো-ডি-কুন্‌হা। এদের সঙ্গে সখ্যের সম্পর্ক নয়; হতেই পারে না তা। মিত্রতা হতে পারে মানুষের সঙ্গেই—কিন্তু এরা অমানুষ! কেবল কামানের মুখেই বশ করতে হবে এদের। যে-শয়তানের নিয়ন্ত্রণে এদের আত্মা আজ অভিশপ্ত—একমাত্র জননী মেরীর নামেই তাকে দূর করা সম্ভব। তাই দিকে দিকে চাই গগনস্পর্শী 'ইগ্রেঝা' চাই Christaos!

অগ্নিগর্ভ পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলেন ডি-মেলো।

—কী বলছে ওরা?—কিশোর গঞ্জালোর প্রশ্ন শোনা গেল। সব বুঝেও যেন সে বুঝতে পারেনি এখনো। দাঁতে দাঁত চেপে ডি-মেলো বললেন, আমরা ওদের বন্দী।

—যুদ্ধ না করে আমরা কিছুতেই ওদের বন্দী হব না—শঙ্কিত গঞ্জালো সমর্থনের আশাতেই যেন কাকার মুখের দিকে তাকালো।

সে কথা কি ডি-মেলোও ভাবেন নি ? এ-ভাবে অস্ত্র হাতে থাকতেও কুকুরের মতো বশ্যতা স্বীকার—ভাবতেও মাথার ভেতরে আগুন জ্বলে ওঠে ; কিন্তু উত্তেজিত হয়ে সব কিছু পণ্ড করার সময় নয় এটা। চারিদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে মুক্ত-তরবারি নবাবের সৈনিকের দল—উদ্ধত হয়ে উঠলে হয়তো তাঁদের শব ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে কুকুরের দল। না এভাবে—ভুল করা চলবে না এখন।

দ্বিভাষী মুর এবার বললে, এখনো সময় আছে। ক্রীশ্চান ক্যাপিতান ভেবে দেখুন।

ডি-মেলো মনের উত্তাপকে প্রাণপণে শমিত করতে করতে বললেন, আমি চাকারিয়ার নবাব খান্‌খানান খোদাবক্স খাঁকে ভালো করে ভেবে দেখবার জন্যে অনুরোধ করছি। আমরা শুধু এই কজন মাত্রই নই। আমাদের প্রভু মহামান্য নুনো-ডি-কুন্‌হা যখন এ সংবাদ পাবেন, তখন নবাবের পরিত্রাণ নেই। এই খবর পাওয়া মাত্র তিনি সশস্ত্র সৈনিক পাঠাবেন, পাঠাবেন কামান—তারপরে যা ঘটবে, তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ নবাবেরই।

মুর নবাবকে ডি-মেলোর বক্তব্য জানাল। ক্রুদ্ধভাবে আসনের ওপর নড়ে উঠলেন খোদাবক্স খাঁ—একটা প্রকাণ্ড কিল মারলেন পাশে। তারপর তীব্র উচ্চকণ্ঠে কী যেন ঘোষণা করলেন।

সভার যে-যেখানে ছিল, সবাই চকিত চোখে ফিরে তাকালো ডি-মেলোর দিকে। তাদের দৃষ্টিতে ঘৃণা এবং বিস্ময়ের মিলিত অভিব্যক্তি। যেন ক্রীশ্চানদের কল্পনাতীত স্পর্ধা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছে তারা।

মুর বললেন, নবাব এই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছেন যে তাঁকে ভয় দেখাবার মতো সাহস পর্তুগীজ ক্যাপিতানের এল কোথা থেকে !

ডি-মেলো বললেন, ভয় দেখাবার প্রশ্ন নয়। নিজের ভালোর জন্যেই আমরা নবাবকে সতর্ক হতে বলছি।

—নবাবের ভালো নবাব নিজেই দেখতে জানেন, সেজন্য ক্রীশ্চানদের চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই। নবাবও নিরস্ত্র নন—তাঁরও দু-একটা কামান আছে।

—কিন্তু আমরা এদেশের অতিথি। আমাদের সঙ্গে এই ব্যবহার কি সঙ্গত হচ্ছে ? এই কি নবাবের আতিথ্য ?

—অতিথি ! মুরের গলায় উত্তেজনা প্রকাশ পেল ঃ এর আগে আরো দু-একজন ক্রীশ্চান অতিথি যারা এসেছিল, তারা অতিথির মর্যাদা খুব ভালো করেই রেখেছে। তাদের অনেকেই সমুদ্রে নিরীহ বণিকদের ওপর লুটতরাজ করেছে, কয়েকজনকে জোর করে বিধর্মে দীক্ষা দিয়েছে বলেও জানতে পারা গেছে। এমনি যাদের ব্যবহার, তারা এখানে আসা মাত্রই তাদের কারাগারে পাঠানো উচিত ছিল। তার পরিবর্তে নবাব যে দাক্ষিণ্য দেখাচ্ছেন, সে-জন্যে তাদের বরং কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

—কৃতজ্ঞ !—ডি-মেলোর মুখ লাল হয়ে উঠল।

—হাঁ—কৃতজ্ঞ—নবাবের অনুগ্রহ অসীম, তাই—দ্বিভাষী আবার বললেন,

পর্তুগীজদের তিনি একটা সুযোগ দিতে রাজী হয়েছেন। সে সুযোগ তারা কি গ্রহণ করতে প্রস্তুত ?

"—Mas não posso. Tenho que voltar—" আর্তস্বরে ডি-মেলো বললেন, আমি পারব না। আমরা ফিরে যেতে চাই। আমার জাহাজ নিয়ে আমি এখনি ভেসে পড়ব সমুদ্রে।

—ফেরার পথ তো অত সহজ নয় ক্যাপিতান ?—বিচিত্র শান্ত হাসিতে উদ্ভাসিত লোকটার মুখ : এ ছাড়া আর কোনো উপায়ই নেই এখন। হয় শর্ত মানতে হবে—নইলে পা বাড়াতে হবে কারাগারের দিকেই।

ডি-মেলো সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

—সেই ভালো। তা হলে কারাগারেই যাব আমরা।

ক্রুদ্ধ উত্তেজিত কণ্ঠে আবার যেন চিৎকার করলেন নবাব। প্রহরীরা ঘন হয়ে এল পর্তুগীজদের চারিদিকে।

—সসৈন্যে অস্ত্র ত্যাগ করুন ক্যাপিতান—মুরের গলা থেকে ভেসে এল একটা সুকঠিন নির্দেশ।

শৃঙ্খলিত বাঘের মতো ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে পর্তুগীজেরা মেঝের ওপর তলোয়ার ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। মর্মদাহী জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে ডি-মেলো ভাবতে লাগলেন, এর জের এখানেই মিটবে না। একদিন কড়ায় গণ্ডায় এর ঋণ শোধ করতেই হবে এই অভিশপ্ত হিদেনগুলিকে।

কোতোয়াল একটা বিকৃত মুখভঙ্গি করে আদেশ জানালো : চলো।

মাথা তেমনি সোজা করেই সঙ্গীদের নিয়ে অগ্রসর হলেন ডি-মেলো ; কিন্তু বেশি দূর যেতে হল না। সামনেই কারাগারের অন্ধকার করাল মুখ—দুজন প্রহরী তার বিশাল দরজা দুধারে মেলে ধরল সাদর সম্ভাষণের মতো।

সেই অন্ধকারের গহ্বরে পা বাড়াবার আগে ডি-মেলোর একবার মনে হল আলমীডাই ঠিক করেছিলেন—রক্ত আর আগুন ছাড়া এখানে আর কোনো চুক্তিই অসম্ভব !

পাঁচ

"Estou cansado ; gostaria de descansar."

মন্দির, বাজার আর তীর্থযাত্রীদের ভিড় পার হয়ে গোলাম আলীর সঙ্গে সঙ্গে চলল শঙ্খদত্ত। ক্রমে চারদিক ফাঁকা হয়ে এল, সমুদ্রের হু হু হাওয়া অভ্যর্থনা করল দুজনকে। দু-তিনটে ছোট ছোট বালিয়াড়ী, অজস্র কাঁটাবন, দূরে ঝাউজঙ্গলের মেঘরেখা আর সামনে জোয়ার-লাগা ক্ষুব্ধ সমুদ্র।

গোলাম আলীর কোমরবন্ধে হাতীর দাঁতের বাঁটে মুক্তো বসানো ছুরিখানা, চোখের ভ্রূকুটিভরা দৃষ্টি, আর বালির ওপর দিয়ে চলবার সময় তার ভারী পায়ের একটা অদ্ভুত শব্দ—সব মিলিয়ে তেমনি বিপন্ন জিজ্ঞাসা জাগিয়ে রেখেছে শঙ্খদত্তের মনে। কোথায় তাকে নিয়ে চলেছে এ লোকটা—কী তার মতলব ?

শঙ্খদত্ত চোখ তুলে তাকালো ঃ আমরা কোথায় চলেছি খাঁ সাহেব ?

গোলাম আলী বললেন, বেশি দূরে নয়। আর একটু এগিয়ে।

—কিন্তু এমন কী গোপন কথা যে এত নির্জনেও বলা যায় না ?

—বিশেষ কিছু নয়। এমনি বেড়াতে চলেছি তোমার সঙ্গে। তোমার কি কোনো জরুরী কাজ আছে নাকি ?

—না—এমন আর কি ! শঙ্খদত্ত বিব্রত হয়ে জবাব দিলে।

—তবে আর একটু চলো। একটা ভালো জায়গা দেখে বসা যাক।

আরো কয়েক পা এগিয়ে একটা বালিয়াড়ীর তলায় বসল দুজনে। পেছনে বালিয়াড়ীর উঁচু প্রাচীর, দু পাশে ঘন কাঁটাবন, সামনে কয়েক হাত দূরেই সমুদ্র ঢেউ ভাঙছে। অকারণেও কেউ এদিকে আচমকা চলে আসবে এমন সম্ভাবনা নেই। নিরিবিলি আলাপ করবার জায়গাই বটে।

—বোসো। দাঁড়িয়ে আছো কেন ?

শঙ্খদত্ত আঙুল বাড়িয়ে দিলে ঃ ওই যে।

পাশেই কাঁটা ঝোপের নিচে টাট্‌কা একটা সাপের খোলস পড়ে রয়েছে। সদ্য ছেড়ে-যাওয়া—এখনো ভিজে ভিজে মনে হচ্ছে সেটাকে। প্রায় হাত চারেক লম্বা বিশালকায় গোক্ষুরের খোলস।

—ওঃ, খোলস ?—পা দিয়ে সেটাকে বালির মধ্যে মাড়িয়ে দিয়ে গোলাম আলী হাসলেন ঃ সাপ তো আর নয় যে ছোবল দেবে।

—কিন্তু কাছাকাছি সাপ আছে বলেই মনে হচ্ছে।

—থাকে থাক। এসো, এসো, বসে পড়ো।—মুসলমান বণিক হাসলেন ঃ কিছু ভেবো না, মুঠো করে আমি সাপ ধরতে পারি। তারপরেও আছে আমার কোমরের ছোরাখানা। নেহাৎ মরবার ইচ্ছে না থাকলে সাপ এদিকে আসবে না কখনো।

আর দ্বিধা করা যায় না। খোলসটা থেকে সাধ্যমতো দূরত্ব বাঁচিয়ে ওপরে বসে পড়ল শঙ্খদত্ত।

কুঞ্চিত মুখে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলেন গোলাম আলী। জোয়ারের উচ্ছলতায়, হাওয়ার মাতলামিতে চঞ্চল ঢেউ লক্ষ লক্ষ সাপের মতো হিস্‌ হিস্‌ করে ছোবল দিয়ে যাচ্ছে। বহু দূরান্তে কাদের একখানা জাহাজ ভেসে চলেছে, তাকে দেখা যায় না—শুধু চোখে পড়ছে একটা ছোট্ট বকের মতো তার বিরাট সাদা পালটা। মাথার ওপরে থমকে থেমে আছে একটুকরো রক্তরাঙা মেঘ।

মেহেদী-রঙানো মোটা মোটা আঙুলে গোপাল আলী খুঁড়তে লাগলেন বালির ভেতরে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, একটা কিছু ঘটতে চলেছে।

শঙ্খদত্ত চমকে উঠল ঃ কোথায় ?

গোলাম আলী হাসলেন ঃ এখানে—এই বালিয়াড়ীর তলায় নয়। আমি বলছি,—সারা হিন্দুস্তানে।

—কি রকম ?

—ঝড় উঠবে। সে ঝড়ে হয়তো তুমি আমি সবাই উড়ে যাব। যেমন করে শুকনো পাতা উড়ে যায়, ঠিক সেই রকম।

—কথাটা বুঝতে পারছি না। কী এমন ভয়ানক ব্যাপার?

—ক্রীশ্চান আসছে। হার্মাদ।

—সে তো জানি।

—না, কিছুই জানো না—গোলাম আলীর কপালে মেঘের ছায়া ঘনাতে লাগল: ব্যাপারটা এখনো তোমরা কিছুই বুঝতে পারোনি। না চট্টগ্রামের বণিকেরা—না সপ্তগ্রামের।

—কী বুঝতে পারিনি?

গোলাম আলী তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালেন: ওরা বিদেশী। ওরা বিধর্মী।

একটু চুপ করে থেকে শঙ্খদত্ত বললে, তাতেই বা কী ক্ষতি? আপনারাও তো বিদেশী—আপনাদের ধর্মের সঙ্গেও আমাদের মিল নেই। সেজন্যে কোথাও কিছু তো আটকাচ্ছে না। আপনারা যেমন এখানে বাণিজ্য করেন ওরাও তাই করবে। এর মধ্যে ভয় পাওয়ার মত কিছু তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।

—হয় তুমি কিছুই বোঝো না, নইলে বুঝেও না বোঝার ভান করছ শঙ্খদত্ত—চাপা গলায় গোলাম আলী ভ্রূভঙ্গি করলেন—থাবার মধ্যে একমুঠো বালি শক্ত করে আঁকড়ে ধরে বললেন, ক্রীশ্চানদের মতলব অত সোজা নয়। বাণিজ্যের নাম করে ওরা মাটিতে পা দেয়, তারপর তলোয়ার দিয়ে দখল করে তাকে। এক হাত দিয়ে ওরা মশলা কেনে, আর এক হাত দিয়ে গলা কাটে। এবার ওরা শকুনের মতো নজর দিয়েছে বাংলা দেশের দিকে। এদেশের ওপরে ওদের বহুকালের লোভ। এখন থেকে সাবধান হও শঙ্খদত্ত। নইলে গোয়া-কালিকটের বণিকদের যে দশা হয়েছে, সে দুঃখ তোমাদের জন্যেও অপেক্ষা করছে।

নীরবে কথাগুলো শুনে গেল শঙ্খদত্ত, তখনই কোনো জবাব দিল না। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেছে চন্দ্রনাথ মন্দিরের সেই পাগলা সন্ন্যাসী সোমদেবের কথা। ক্রীশ্চানেরা দেশ জয় করবে—মানুষের তাজা রক্তের ওপর দিয়ে পদসঞ্চার করবে গৌড়ের সিংহাসনের দিকে, তারপর সেখান থেকে গিয়ে পৌঁছুবে দিল্লীর শাহী-তখ্ত পর্যন্ত; কিন্তু হিন্দু বণিকদের কী আসে যায় তাতে? এ কাজ কি এর আগে কেউ করেনি? করেনি গোলাম আলীর স্বজাতি, তারই আত্মজন? মুসলমানও তো এসেছে বিদেশ থেকেই!

আসলে বাধছে স্বার্থে। আরবের অধিকারে আজ ভাগ বসাতে এসেছে ক্রীশ্চান। এতকাল বাইরের একচেটিয়া কারবার ছিল আরবদেরই হাতে; তারা ইচ্ছেমতো দাম দিয়ে জিনিস নিয়েছে, তারপর সাত দরিয়ার শহরে শহরে বিক্রি করে মুনাফা নিয়েছে নিজেরা। এবার প্রতিযোগিতার পালা। বরং পর্তুগীজদের সঙ্গে যারা কারবার করছে, তারা বলে, আরবদের চাইতে ঢের বেশি দাম দেয় ওরা, এক বস্তা শুকনো লঙ্কার বদলে বের করে দেয় এক মুঠো মুক্তো।

শঙ্খদত্তের কাছে দুই-ই সমান। কেউই বন্ধু নয়। সোমদেবই ঠিক

বুঝেছেন। এ বরং ভালোই হবে, এক কাঁটা দিয়ে আর এক কাঁটার উৎপাটন। সোমদেবের রক্তাক্ত ভয়ঙ্কর চোখ দুটো মনে পড়ে যাচ্ছে।

—এতটা ভাববার সময় কি এখনি এসেছে?—সাবধানে জবাব দিল শঙ্খদত্ত।

—এখনি এসেছে।—গোলাম আলীর দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠল : ক্রীশ্চান যেখানে পা দেবে, সেখানে আর কাউকেই মাথা তুলতে দেবে না। কিভাবে ওরা কালিকটের রাস্তায় কামান দিয়ে মানুষের মাথা উড়িয়ে দিয়েছে, সে কি শোনোনি? শোনোনি মাত্র কিছুদিন আগেই কেমন করে ওরা হামলা বাধিয়েছিল চট্টগ্রামের বন্দরে! ওদের চাইতে ওই গোখরো সাপটাও অনেক নিরাপদ তা মনে রেখো।

—চট্টগ্রামে যা হয়েছে, তার জন্য ওদের খুব দোষ ছিল না, বরং কৌশল করে—

গোলাম আলী কথাটাকে থামিয়ে দিলেন : তুমি সিল্‌ভিরাকে চেনো না, আমি চিনি। আদত একটা বদমায়েশ সে-লোকটা। যদি কল-কৌশল কিছু করা হয়ে থাকে সে ভালোর জন্যেই। গৌড়ের সুলতানের কাছে ওরা আর সহজে ভিড়তে পারবে না, সে পথ বন্ধ করে দিয়েছি।

শঙ্খদত্ত চুপ করেই রইল। গোলাম আলীর কপালের ওপরে মেঘের ছায়াটা আরো ঘন হয়ে এল : আমি এখনো বলছি শঙ্খদত্ত, ঘর সামলাও। নইলে তোমাদেরও দিন আসবে। কামানের গোলায় চুরমার হয়ে যাবে তোমাদের ওই সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণীর বন্দর, রক্তে রাঙা হয়ে যাবে গঙ্গা আর সরস্বতীর জল, আজ যেখানে তোমাদের মন্দিরের চূড়ো আকাশে মাথা তুলেছে, সেখানে দাঁড়িয়ে উঠবে ওদের ইগ্রেঝা—ঘণ্টা বাজবে মেরীর নামে। তলোয়ারের মুখে দেশকে দেশ ক্রীশ্চান করে দেবে ওরা।

কথাগুলো একেবারে অমূলক নয়। হাঁ, হার্মাদদের দেখেছে বইকি শঙ্খদত্ত। অদ্ভুত টুপির নিচে চোখের এক দিকটা ঢাকা—আর একটা পিঙ্গল চোখ বন্যজন্তুর মতো চকচক করে। বাঘের গায়ের মতো ডোরাদার আংরাখা। রোদ-পোড়া তামাটে রঙ। কোমরের তলোয়ারগুলো অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ।

—হুঁ, কিছু কিছু বুঝতে পারছি।—তা হলেও সমস্ত জিনিসটাকে কি কিছু বাড়িয়ে ভাবছেন না খাঁ সাহেব?—শঙ্খদত্ত হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল।

—তোমরা বাঙালী বণিকেরা জেগে ঘুমোও—গোলাম আলী ভ্রূকুটি করলেন : ওরা যদি সদুদ্দেশ্য নিয়েই আসত, তাহলে কারো কিছু বলবার ছিল না। সারা দেশে ওরা ক্রীশ্চানদের সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চায়। গোয়ায় কালিকটে দলে দলে মানুষকে ওরা দীক্ষাও দিয়েছে, গড়ে তুলেছে গীর্জা। আমি আরো শুনেছি ওদের পর্তুগীজের রাজা নাকি এর মধ্যেই উপাধি নিয়ে বসে আছে : "ইথিওপিয়া, আরব, পারস্য আর ভারতবর্ষের বাণিজ্য আর বিজয়ের অধিপতি!"

শঙ্খদত্ত চমকে উঠল : সেকি!

—হাঁ, গল্প নয়। ওদের লোকের কাছ থেকেই আমার খবরটা শোনা।

দুঃসাহস !—গোলাম আলীর মুখ ঘৃণায় কর্কশ হয়ে উঠল ঃ ইথিওপিয়া, আরব—পারস্য, ভারতবর্ষের রাজা ! উন্মাদের স্বপ্ন !

—স্বপ্ন ছাড়া আর কি !—শঙ্খদত্ত জবাব দিলে।

—কিন্তু তোমরা যদি ঘুমিয়ে থাকো, তা হলে ওদের স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থাকবে না। আরব-পারস্যের জন্য আমাদের ভাবনা নেই, সেখানে দাঁত ফোটাবার সাহসও ওরা কোনোদিন পাবে না। ভয় এই দেশেই। সুযোগও ওদের আসছে। বিহারের শের খাঁ মাথা চাড়া দিচ্ছে, গৌড়ের সঙ্গে আজ হোক কাল হোক তার বিরোধ নিশ্চিত। আবার ওদিকে দিল্লীতেও নানা গোল-মাল চলছে। সেই দুর্বলতার ফাটল দিয়েই ওরা পথ করে নেবে। সুঁচ হয়ে ঢুকবে—ফাল হয়ে বেরিয়ে আসবে।

উত্তেজনায় কিছুক্ষণ বড় বড় নিঃশ্বাস ফেললেন গোলাম আলী, তারপর আবার বলে চললেন, গায়ে পড়ে কেউ ওদের শত্রুতা করেনি, ওরা নিজেরাই তা ডেকে আনছে। যখন-তখন সমুদ্রে দস্যুতা করা ওদের অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে —তার প্রমাণ ওই শয়তান সিলভিরাই। শুধু সিলভিরা নয়—ওদের অনেকেরই ওই পেশা এখন। ছলে-বলে-কৌশলে মানুষকে ক্রীশ্চান করা ওদের আর একটা কাজ। বাণিজ্য করতে এসেছ, করো—কারো তাতে আপত্তি ছিল না ; কিন্তু ওরা কালকেউটে—যখনি সুযোগ পাবে, তখনি ছোবল দেবে।

শঙ্খদত্ত শুনে যেতে লাগল।

গোলাম আলী বলে চললেন, শুধু এই ? ওদের শয়তানীর কোনো সীমা-সংখ্যাই নেই। পশ্চিম সাগরের কূলে কত জায়গায় যে কত মানুষকে জোর করে ওরা নিজেদের ধর্মে দীক্ষা দিয়েছে, তার হিসেব পাওয়া যায় না। মসজেদ ভেঙে গড়ে তুলছে ওদের 'ইগ্রেঝা'। আফ্রিকায় হানা দিয়ে ওরা সে দেশের মানুষকে জাহাজ ভর্তি করে ধরে নিয়ে গেছে—ক্রীতদাস করে বিক্রি করেছে ওদের দেশে। দয়া নেই—মায়া নেই—মনুষ্যত্বও নেই। ওরা শুধু লুট করতে জানে—আর জানে ক্রীশ্চান করতে। গোয়ায়-কালিকটে ওদের মূর্তি ধরা পড়ে গেছে। এখন আর ওদের সঙ্গে কোনো ভদ্রতা, কোনো বন্ধুত্বই করা চলে না।

শঙ্খদত্ত তেমনি চুপ করে রইল। সামনে সমুদ্রে ঢেউ ভাঙছে। নীল জলের ওপরে রজনীগন্ধার মত গুচ্ছে গুচ্ছে ফেনার ফুল ফুটে উঠছে। ঝড়ের মতো হাওয়ায় কাঁটা গাছগুলোতে অদ্ভুত শব্দ উঠছে খর খর করে। গোখরো সাপের শুকনো খোলসটা একটু একটু করে উড়ে যাচ্ছে হাওয়ায়—হঠাৎ সেটাকে যেন একটা জীবন্ত প্রাণী বলে ভুল হতে থাকে।

—নবাবেরা যা করবার সে তো করবেনই।—গোলাম আলী বললেন, কিন্তু তোমার আমারও চুপ করে থাকা চলবে না। ওদের সঙ্গে সাধ্যমতো লেনদেন বেচাকেনা বন্ধ করতে হবে, বাধা দিতে হবে সবরকম ভাবে। তোমার বাপ ধনদত্তের তো বেশ প্রভাব আছে—আমি তাঁকেও জানাব। ত্রিবেণীর উদ্ধারণ দত্তের খোঁজও আমি করেছিলাম। শুনেছি তাঁর ধর্মে মতি হয়েছে, ছেলের হাতে সব তুলে দিয়ে তিনি আজকাল জপ-তপ করেন ; কিন্তু মা মেরীর

সেবকেরা যেভাবে এদেশে পা বাড়াচ্ছে, তাতে বেশিদিন তিনি যে নিশ্চিন্তে ধর্মচর্চা করতে পারবেন এমন মনে হচ্ছে না!

—দেখা যাক—কী হয়।—শঙ্খদত্ত অবসন্নভাবে জবাব দিলে।

গোলাম আলী উঠে দাঁড়ালেন: হাঁ, দেখতে হবে বই কি। ভাবনার সবে তো শুরু; কিন্তু এটা কিছুতেই ভুললে চলবে না যে যেমন করে হোক, খ্রীস্টানদের রুখতেই হবে আমাদের। বুঝিয়ে দিতে হবে বাংলা দেশ কালিকট নয়। এখন চলো, শহরের দিকে ফিরে যাই।

—তাই চলুন। আমিও বড় ক্লান্ত, আমার বিশ্রাম দরকার—বিবর্ণ মুখে জবাব দিলে শঙ্খদত্ত।

—উদ্ধব পাণ্ডার বাড়িতে আপ্যায়নের ত্রুটি হল না; কিন্তু শঙ্খদত্তের মাথার মধ্যে ক্রমাগতই যেন সমুদ্রের ঢেউ ভাঙছে। মনের ওপর ভাসছে আকাশের রক্তমেঘের ছায়া। ঝড় আসছে।

কোথায় গিয়ে পৌঁছুবে এ শেষ পর্যন্ত? মোগল—পাঠান—পর্তুগীজ। সারা দেশের ওপরে ঘনাচ্ছে গ্রাহস্পর্শের দুর্লগ্ন। ভাবনাগুলো একটা অন্ধকারের গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে।

কাছেই কোথায় একটা জুয়োর আড্ডার চিৎকার শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল শঙ্খদত্ত। খোলা জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে বয়ে আসা সমুদ্রের হাওয়ায় আরো নিটোল হয়ে এসেছিল ঘুমটা। তারপর কানের কাছে কে যেন ডাকল, শেঠ—শেঠ!

তখন অনেক রাত। শঙ্খদত্ত চমকে চোখ মেলল। ঘরের কোণায় প্রদীপটা নিবু-নিবু হয়ে এসেছে। দাঁড়িয়ে আছে উদ্ধব।

—কী হল উদ্ধব ঠাকুর? কী হয়েছে এত রাত্রে?

—মন্দিরে বিশেষ পুজো দেখতে যাবেন বলেছিলেন না? সময় হয়েছে।

শঙ্খদত্ত ধড়মড় করে উঠে বসল: চলুন।

দুজনে যখন বেরিয়ে এল, তখন স্তব্ধ রাত্রি। পথে লোকজন নেই। বিষণ্ণ চাঁদের আলোয় যেন শ্মশানের শূন্যতা। শুধু তিন-চারজন লোক মাধ্বী খেয়ে পথে মাতলামি করছে, আর তাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে একটা শীর্ণকায় কুকুর।

মৃত পাণ্ডুর আলোয় প্রেতপুরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে মন্দির, তার চূড়োগুলো আকাশে তুলে রেখেছে ভৌতিক বাহু। সারা ভারতবর্ষের পরম পুণ্যতীর্থ এই মন্দিরকে দেখেও কখনো কখনো এমন ভয় করে কে বলবে! দরজার প্রহরী উদ্ধবকে দেখে পথ ছেড়ে দিল। দুজনে নিঃশব্দে পার হয়ে চলল প্রহরীর পর প্রহরী—দরজার পর দরজা, তারপর এসে পৌঁছুল একেবারে মূল মন্দিরের সম্মুখে।

দ্বারপ্রান্তে একজন দীর্ঘদেহ পাণ্ডা। ললাটে চন্দন আঁকা, পট্টবস্ত্রপরা বিশালমূর্তি পুরুষ। যেন প্রতিহারী কালভৈরব। সবল বাহুতে দরজা

রোধ করে রেখেই সে তীব্র দৃষ্টিতে উদ্ধব আর শঙ্খদত্তের দিকে তাকালো।

উদ্ধব মৃদু গলায় বললে, সপ্তগ্রামের শেঠ শঙ্খদত্ত। এঁর কথা আমি বলেছিলাম।

—ওঃ!

বাহু সরে গেল।

মন্দিরের মধ্যে পা দিতেই ধাঁধা লেগে গেল শঙ্খদত্তের। দিনের বেলাতেই যা তমসাচ্ছন্ন হয়ে থাকে, এ সে মন্দিরই নয়। যেখানে একটিমাত্র প্রদীপ জ্বলে তারই অত্যন্ত ক্ষীণ আলোকে দেব দর্শন করতে হয়—আজ সম্পূর্ণ বদলে গেছে তার রূপ। চারদিকে খরদীপ্ত উজ্জ্বল আলো। দেবতার ত্রিমূর্তি ফুলে ফুলে সাজানো, রুদ্ধশ্বাস ঘরখানি চন্দনের সুগন্ধে নিবিড় সুরভিত হয়ে উঠেছে। বাঁশী আর বীণার একটা সুমিষ্ট আলাপ শোনা যাচ্ছে। এখানে ওখানে কয়েকটি মানুষ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিস্পন্দ প্রতীক্ষায়।

একটা স্তম্ভের পাশে দাঁড়াতে নীরব ইঙ্গিত করলে উদ্ধব। শঙ্খদত্ত দাঁড়ালো। বিহ্বলভাবে তাকিয়ে রইল বিগ্রহের দিকে, কান পেতে শুনতে লাগল বাঁশী আর বীণার স্বপ্নমেদুর ঝঙ্কার।

হঠাৎ কোথা থেকে শোনা গেল নূপুরের গুঞ্জন। এবার শঙ্খদত্তের চোখ একবার চমকে উঠেই নিষ্পলক হয়ে গেল। অপূর্ব একটি দৃশ্যের যবনিকা উঠল দৃষ্টির সামনে।

বাঁশী আর বীণার তালে তালে পূজোর অর্ঘ্য নিয়ে প্রবেশ করল দেবদাসী।

গলায় ফুলের মালা, বাহুতে ফুলের কঙ্কণ, পায়ে নূপুর। নির্মল শ্বেতপদ্মের মতো সুঠাম শুভ্র দেহে কোথাও কোনো আবরণ নেই; সংসারের সমস্ত লৌকিক লাজ-লজ্জাকে বিসর্জন দিয়ে দেবতার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে নগ্নিকা দেবদাসী। উজ্জ্বল আলোয় সুকুমার শরীরের প্রতিটি অংশ মায়ালোকের মতো একটা অবিশ্বাস্য সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইল শঙ্খদত্ত। কোথা থেকে একটা মৃদঙ্গের গম্ভীর ধ্বনি সমস্ত অনুষ্ঠানের সূচনা করে দিলে—হাওয়ার দোলা-লাগা শ্বেতপদ্মের মতো উজ্জ্বল দেহখানি প্রণামের ছন্দে নত হয়ে পড়ল দেবতার পায়ের সম্মুখে।

ছয়

"O que ? Nos e possivel !"

রাজশেখর শেঠ চাকারিয়ার একজন বিশেষ ব্যক্তি। অনেকগুলি বহর আছে তাঁর—প্রায় সারা বছরই তারা বাইরের সমুদ্রে বাণিজ্য করে বেড়ায়। রাজশেখর নিজে যে কত সহস্র সহস্র যোজন সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছেন, তার কোনো হিসেব তিনি নিজেও করতে পারেন না। উদার মহাসাগর—অফুরন্ত তার বিস্তার।

কোথাও নীল জলের ভেতর থেকে উঠে এসেছে নগ্ন কালো পাহাড়; তার মাথার ওপরে কলধ্বনি করে পাখির ঝাঁক—তার ফোকরের ভেতর থেকে জ্বলজ্বলে চোখ মেলে শিকারের প্রতীক্ষা করে অষ্টভুজ রাক্ষস—ওর হাতীর শুঁড়ের মতো করাল বন্ধনে পড়লে আর নিষ্কৃতি নেই কারো। কোথাও ডুবো পাহাড় জোয়ারে তলিয়ে যায়—ভাঁটায় ভেসে ওঠে; ওর ওপরে একবার জাহাজ গিয়ে পড়লে তার অবধারিত বিনাশ। কোথাও কোনো নির্জন দ্বীপের কূলে কোনো অভিশপ্ত জাহাজের ধ্বংসাবশেষ; কোথাও দুটি একটি মানুষের মৃতদেহ—তাদের ওপর হাজার হাজার লাল কাঁকড়া আর ইঁদুরের ভোজ বসেছে। কোথাও অগভীর জলের তলায় মুক্তার ঝিলিক, কিন্তু নামবার উপায় নেই—ওৎ পেতে আছে মানুষ-খাওয়া হাঙ্গর—শঙ্কর মাছের চাবুকের ঘায়ে ছিন্ন ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে পুঞ্জ পুঞ্জ জলজ শৈবাল। কোথাও বা বালির ডাঙার ওপর অজস্র কড়ি—সমুদ্রের ঢেউয়ে ছিটকে পড়া এক-আধটা শঙ্খ মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করছে, কিন্তু তুলে আনার জো নেই, ওখানে চোরা বালির মৃত্যুফাঁদ—বালির ওপরে ছড়ানো কয়েকটা কঙ্কালেই তার প্রমাণ। আবার কোথাও নারকেল-বনের ছায়া-দোলা দ্বীপ—মিষ্টি জলের ঝর্ণা, পাখি, নানা রঙের রাশি রাশি ফুল।

রাজশেখর বলেন, সমুদ্রের মায়া যাকে টেনেছে তার আর কিছুতেই মন বসবে না। তাছাড়া সমুদ্রই তো লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। ওখান থেকেই তো লক্ষ্মী উঠেছিলেন।

অতএব সমুদ্রের টানে রাজশেখর যে বেরিয়ে পড়েছেন বার বার, তাতে তাঁর দুদিক থেকেই লাভ হয়েছে! একদিকে যেমন তিনি এই বিরাটের আশ্চর্য লীলাকে দেখতে পেয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি অঞ্জলি ভরে পেয়েছেন মহালক্ষ্মীর দান। এ অঞ্চলে তিনিই সবচেয়ে ধনী। উদার হাতে অর্থব্যয় করাতেও কার্পণ্য নেই তাঁর। দুটি বড় বড় দীঘি কাটিয়েছেন—পর পর কয়েকটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন—সারা গ্রীষ্মকালে চারদিকে জলসত্র ছড়িয়ে দেন তিনি। চাকারিয়ার নবাব খানখানান খোদাবক্স খাঁ তাঁকে যথেষ্ট খাতির করেন—দরকার পড়লে ঋণও করেন তাঁর কাছ থেকে।

এই রাজশেখর এবার রজতেশ্বরের মন্দির গড়তে চেয়েছিলেন সুপর্ণার কল্যাণ কামনায়। এমন একটি মন্দির, যার চূড়ো ধবলগিরির মতো আকাশ ফুঁড়ে উঠবে—যার গভীর ঘণ্টাধ্বনি এক ক্রোশ দূর থেকেও লোকে শুনতে পাবে। যেখানে তিনি মন্দিরটি পত্তন করেছেন, তার কাছেই একটি বৌদ্ধবিহার, একটি ছোট টিলার ওপরে তার উদ্ধত মাথা। রাজশেখর তার চাইতেও বড় একটি টিলা বেছে নিয়েছেন—বৌদ্ধবিহারকে ম্লান করে দেবে এমনি একটি মন্দির গড়ার সংকল্প তাঁর।

কিন্তু এ কী বললেন সোমদেব? এ কী অদ্ভুত আদেশ?

সোমদেব বলেছিলেন, এই তো স্বাভাবিক। শক্তি তো শিবেরই গৃহিণী।

—তা বটে—তা বটে। তবে—

—তবে নেই এতে। আর শিব তো নির্বিকার পুরুষ, শক্তিই হলেন

কর্মরূপিণী। তাই শিব শব হয়ে পড়ে থাকেন, আর মহাকালী লীলা করেন তাঁর বুকের ওপরে।

—সে তো ঠিক, তবুও—

—মিথ্যেই তুমি দ্বিধা করছ রাজশেখর—সোমদেবের চন্দনমাখা ললাটে দেখা দিল ভ্রূকুটি, রক্তাভ চোখে চকিত হয়ে উঠল জ্বালা: ভেবে দেখো কোন্ নিয়মে চলছে সৃষ্টি। শিব হলেন আদি দেবতা, যোগমগ্ন, চিরশান্ত। তাঁর নিজেরই প্রয়োজনে তিনি শক্তির সৃষ্টি করেছেন। বিনাশের লগ্ন যখন আসে, তখন এই অন্ধকাররূপিণীকে তিনি দেন সংহারের আদেশ—কালীর তাণ্ডব নৃত্যের জন্যে বেদী রচনা করেন নিজের বুক পেতে দিয়ে। আজ সেই লগ্ন উপস্থিত। আজ শঙ্করের শবে চামুণ্ডার অভ্যুত্থান।

রাজশেখর কিছুক্ষণ বিবর্ণ হয়ে বসে ছিলেন। তারপর বলেছিলেন, এই একটা কথা কিছুদিন থেকেই আপনি বলছেন। বলছেন সময় হয়েছে—আর দেরি করা চলবে না; কিন্তু আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কিসের সময়? কিসের জন্য চামুণ্ডার সাধনা করতে চান আপনি?

—তাও কি বুঝতে পার না—সোমদেবের স্বরে ধিক্কার ফুটে উঠেছিল: দেশ থেকে বিধর্মীদের দূর করতে চাই আমি।

—কারা তারা?

—মুসলমান।

—মুসলমান?—রাজশেখর সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন: তাদের প্রতি কেন এমন বিদ্বেষ আপনার?

—বিধর্মীর প্রতি বিদ্বেষ কেন, তারও কারণ জানতে চাও? পাহাড়ের ওপর বাঘের ডাক যেমন গমগম করে কাঁপে, তেমনি মনে হয়েছিল সোমদেবের স্বর: দেশ যারা অধিকার করে নিয়েছে—মন্দির ভেঙে মসজিদ বসিয়েছে, হাজার হাজার মানুষের ধর্মান্তর ঘটিয়েছে—

আরো বিব্রত হয়ে উঠেছিলেন রাজশেখর: অপরাধ ক্ষমা করবেন প্রভু, আমি তো এর মধ্যে অসঙ্গত কিছু দেখছি না। আমাদের পূর্বপুরুষেরাও তো অনার্য-শবর-কিরাতদের পরাজিত করে তাদের মধ্যে নিজের ধর্ম প্রচার করেছে। পরধর্ম সম্পর্কে আমাদেরও যে যথেষ্ট সহিষ্ণুতা আছে একথা আমরাও বলতে পারি? আমি নিজের চোখেই কতবার দেখেছি, ব্রাহ্মণদের নেতৃত্বে নিষ্ঠুরভাবে কত বৌদ্ধকে হত্যা করা হয়েছে। আজ দলে দলে যারা ইসলামের দীক্ষা নিচ্ছে, তাদের অধিকাংশই যে সেই সব নির্যাতিত বৌদ্ধের দল—প্রভু তা নিজেও তো জানেন।

—হুঁ।

সোমদেবের স্তব্ধ-ঝড় মুখের দিকে আর একবার তাকিয়ে দেখেছিলেন রাজশেখর। গুরু তাঁর কথাগুলো কীভাবে গ্রহণ করছেন তিনি বুঝতে পারছিলেন না। কষ্টিপাথরে খোদাই-করা বজ্রডাকিনীর মতো বিকারহীন তাঁর নিষ্ঠুর মুখশ্রী—তার মধ্যে থেকে কখনো কোনো কিছু তিনি উদ্ধার করতে

পারেননি। তাই সোমদেবের মৃদু গম্ভীর শব্দটাকে প্রশ্রয়ের ইঙ্গিত মনে করে তিনি আরো বলে গিয়েছিলেন ঃ তা ছাড়া সমাজের যারা অন্ত্যজ আর অস্পৃশ্য, তাদেরও মর্যাদা দিচ্ছে। সকালে উঠে যাদের মুখ দেখলে বিষ্ণুমন্ত্র জপ করি আমরা, মাথায় গঙ্গাজল দিই—ইস্‌লামে তাদেরও জায়গা হয়ে গেছে। আমাদের চাকারিয়াতেই এক চণ্ডাল মুসলমান ধর্মগ্রহণ করলে। বললে বিশ্বাস করবেন না প্রভু, ঈদ্‌গাহের নামাজের দিনে স্বয়ং নবাব খোদাবক্স খাঁ সেই চণ্ডালকে আলিঙ্গন করলেন।

—হুঁঃ।

এবার সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন রাজশেখর, কিন্তু কথার ঝোঁকটা সামলাতে পারেননি ঃ আমরা যাদের ঠাঁই দিইনি, ইসলাম তাদের কাছে টেনে নিয়েছে।

—আর নারীহরণ ?

—দুর্জন চিরদিনই ছিল প্রভু, চিরকালই থাকবে। তাই বলে—

—যথেষ্ট হয়েছে, থামো।—আর ধৈর্য রাখতে পারেননি সোমদেব ঃ তোমার মতো নির্বোধ তার্কিকের সঙ্গে কথা বলাই আমার ভুল হয়েছে। ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, তুমিও কোনোদিন মুসলমান হয়ে যাবে। তা হলে আর মন্দির প্রতিষ্ঠা দিয়ে কী হবে ? তার জায়গায় তুমি মসজিদ তৈরি করো গে। আমাকেও আর তোমার দরকার নেই—তুমি কোনো মৌলভীকেই বরং ডেকে নাও !

কিছুক্ষণ পাথর হয়ে বসে ছিলেন রাজশেখর—কয়েক মুহূর্ত মুখ দিয়ে একটি শব্দও আর উচ্চারণ করতে পারেননি ; পাষাণে-গড়া বজ্রমূর্তি এক বিন্দুও করুণা জানে না !

তারপর তিনি লুটিয়ে পড়েছিলেন সোমদেবের পায়ের তলায় ঃ অপরাধ হয়ে গেছে প্রভু, বাচালতা হয়ে গেছে। আমাকে মার্জনা করুন।

অনেক কষ্টে অনেক সাধ্য-সাধনার ফলে, শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েছেন সোমদেব—প্রসন্ন হয়েছেন ; কিন্তু ওই এক শর্তে। রজতেশ্বরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা দুদিন পরে হলেও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই ; কিন্তু মহাকালীর জাগরণ অবিলম্বে প্রয়োজন, আজই—এই মুহূর্তেই।

তবু মনের সংশয় কাটেনি রাজশেখরের।

দেশে বিধর্মী না থাকলে হয়তো সবাই-ই খুশি হয় ; কিন্তু থাকলেই বা ক্ষতি কী ? প্রথম যারা অপরিচিত শত্রু হয়ে এসেছিল—আজ তারা ঘরের লোক হয়ে দাঁড়িয়েছে, আস্তে আস্তে আত্মীয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে যে সব পাঠান এ দেশে এসে বাসা বেঁধেছে—এক ধর্ম ছাড়া তাদের সঙ্গে আর তো কোনো ব্যবধানই নেই। এমন কি, নিজেদের ভাষা পর্যন্ত ভুলতে বসেছে তারা। সুখে-দুঃখে-বিপদে-সম্পদে ডাক পড়লেই এসে দাঁড়ায় পাশে। এই লোহার মতো জোয়ান মানুষগুলোর হাতে যেমন চলে লাঠি, তেমনি ঘোরে তলোয়ার। এদের ভয়ে ডাকাতের উৎপাত পর্যন্ত কমে এসেছে আজকাল। মাইনে দিয়ে যারা পাঠান রেখেছে ঘরে, তারা যেন বাস করে পাহাড়ের আড়ালে। নিজের শেষ রক্তকণা দিয়েও রক্ষা করবে অন্নদাতাকে—এমনি এদের ইমান।

এমনভাবে যারা ঘরের মানুষ হয়ে গেছে—তারা বিদেশীই হোক, বিধর্মীই হোক—তাদের ওপর কোনো বিদ্বেষের স্পষ্ট হেতু যেন পান না রাজশেখর। এই তো কিছুদিন আগে সুলতান হোসেন শাহ ছিলেন গৌড়ের সিংহাসনে। হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে মাথা নুইয়েছে তাঁর নামে, তাঁকে বলেছে "নৃপতি-তিলক"। চট্টগ্রামেরই ছুটি খাঁ—পরাগল খাঁর মতো কজন মহাপ্রাণ হিন্দুর সন্ধান মিলবে আশেপাশে ?

তবু সোমদেব। সেই অসামান্য ভয়ংকর লোকটি। তাঁর জ্বলন্ত দু চোখে যেন ত্রিকালদৃষ্টি। হয়তো তিনিই ঠিক বুঝেছেন। তাঁর কথার প্রতিবাদ করবেন এমন শক্তি কোথায় রাজশেখরের—মনেই কি সে জোর আছে তাঁর ?

রাত্রি। মেঘ আর কুয়াশা-ঢাকা জ্যোৎস্নার ছায়ামায়া দুলছে কর্ণফুলীর জলে। দুখানি বজরা চলছে পাল তুলে। একখানিতে সোমদেব, আর একখানিতে রাজশেখর আর সুপর্ণা।

কাচের আবরণের মধ্যে একটি প্রদীপ দুলছে বজরার ভেতরে। সেই আলোয় তিনি দেখলেন ঘুমন্ত সুপর্ণাকে। পাণ্ডু মুখখানা ক্লান্ত করুণতা দিয়ে ছাওয়া—এখনো শরীর থেকে তার অসুস্থতার ঘোর কাটেনি। গভীর স্নেহে আর শান্ত করুণায় মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চমকে উঠলেন রাজশেখর। কোথা থেকে একটা কঠিন দুর্ভাবনা এসে আঘাত করেছে তাঁকে।

এই মন্দির প্রতিষ্ঠা, এই আয়োজন—সবই তো সুপর্ণার জন্যে ; কিন্তু সূচনাতেই কেন এমন করে বিঘ্ন বাধিয়ে বসলেন সোমদেব—এমন করে সব কিছুকে বিস্বাদ করে দিলেন ? একটা অকল্যাণ ঘটবে না তো—আসন্ন হবে না তো কোন অশুভ যোগ ?

একবার বলতে ইচ্ছে করল রাজশেখরের ঃ গুরুদেব, ফিরে যান আপনি। আপনাকে আমার প্রয়োজন নেই ; কিন্তু বলতে পারলেন না, সে শক্তি কোথায় তাঁর ? শুধু রোমাঞ্চিত দেহে, উৎকর্ণভাবে তিনি শুনতে লাগলেন গভীর মন্ত্রোচ্চারণ—কর্ণফুলীর কলধ্বনি ছাপিয়ে, বাতাস-লাগা পালের শব্দকে অতিক্রম করে—সেই অমানুষিক অলৌকিক মন্ত্ররব ছড়িয়ে পড়ছে—যেন সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে সুদূর আকাশের নীরব গম্ভীর তারায় তারায়।

* *

কারাগারের ভেতরে সাতজন পর্তুগীজই নিশ্চল নিশ্চুপ হয়ে বসে ছিল।

দিনের বেলাতেও কঠিন অন্ধকার দিয়ে ছাওয়া ঘর। তারি মধ্যে দু-দিক থেকে চিত্র-করা সাপের মতো দুটো প্রলম্বিত আলো ছড়িয়ে রয়েছে। ওই আলো এসেছে ঘরের দু ধারের প্রায় ছাদ-ঘেঁষা দুটি অর্ধচন্দ্রাকার জানালা থেকে। মেঝে থেকে প্রায় দশ হাত উঁচুতে আলো-হাওয়া আসবার ওই দুটিই যা কিছু রাস্তা। মোটা মোটা লোহার গরাদ দিয়ে এমনভাবে সুরক্ষিত যে তাদের ভেতর দিয়ে একটি পায়রার পক্ষে গলে-আসা পর্যন্ত কষ্টকর।

পায়ের নিচে স্যাঁতসেঁতে মেঝে। এখানে ওখানে দু-একটা ছোট ছোট গর্ত

—কত বন্দী অসহায়ভাবে ওখানে মাথা খুঁড়ে মরেছে কে জানে। শ্যাওলা-ধরা পাথরের দেওয়াল শীতের স্পর্শে মৃত্যুহিম। চারদিকে বড় বড় পাথরের থাম, তাদের গায়ে ঝুলছে ভারী ভারী লোহার কড়া। ডি-মেলো দেখেই বুঝতে পারলেন। যে সব বন্দীরা কারাগারে থেকেও যথেষ্ট বাগ মানে না—ওই সব কড়ায় বেঁধে তাদের চাবুক মারার বন্দোবস্ত।

এখানে ওখানে কয়েকটি ছোট বড় আধভাঙা বেদী, কয়েদীদের শোয়া-বসার জন্যে। তারই ওপরে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পর্তুগীজেরা বসে ছিল নিঃশব্দে। কেউ কেউ জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে ছিল দরজার দিকেও; কিন্তু দরজা বলে কিছু আর দেখা যাচ্ছে না—দুখানা লোহার প্রাচীরের ভেতর দুটি কালো ফোকর ছাড়া আর কিছুই নেই সেখানে।

পাশেই চুপ করে আছে গঞ্জালো। দেবদূতের মতো মুখ—সোনার মতো চুল, চোদ্দ বছরের কিশোর। কেমন আর্তদৃষ্টি ফেলে থেকে থেকে তাকাচ্ছে ডি-মেলোর দিকে। আবছা অন্ধকারে ডি-মেলো দেখতে পারছেন না ভালো করে, কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছেন তার দু চোখের অব্যক্ত যন্ত্রণা। হিংস্র ক্রোধে সমস্ত শিরাগুলো জ্বলে যাচ্ছে তাঁর। যদি কখনো দিন আসে, যদি কখনও আসে অনুকূল অবসর—তো একবার ওই নবাবকে তিনি দেখিয়ে আনবেন লিসবোয়ার কারাগার। সেখানে আছে লৌহকুমারীর আলিঙ্গন—সেই আলিঙ্গনে তাকে পাঠিয়ে লোহার দরজাটা বন্ধ করে দিলেই দু দিক থেকে আসবে তীক্ষ্ন ইস্পাতের ফলক—পলকের মধ্যে হাড়-মাংসসুদ্ধ বিদীর্ণ করে দেবে।

বিশ্বাসঘাতকদের জন্যে ওই-ই উপযুক্ত জায়গা—উপযুক্ত শাস্তি।

ঠাণ্ডা ঘর থেকে কনকনে শীত উঠছে—শুকনো পাতার মতো ঝরে যেতে চায় নাক-মুখ। চারদিকের অস্পষ্ট অন্ধকারে যেন প্রেতের ছায়া দুলছে। উগ্র বিষাক্ত দুর্গন্ধ ভেসে উঠছে থেকে থেকে—কোথাও ইঁদুর মরেছে খুব সম্ভব। অথবা, কিছু বিশ্বাস নেই মুরদের—এই ঘরেই কোনো ছায়াঘন একান্তে কোনো দুর্ভাগা বন্দীর গলিত দেহ-শেষ পড়ে আছে কিনা তাই বা কে জানে।

—কাকা!—একটা ক্ষীণ স্বর শোনা গেল গঞ্জালোর।

—কোনো ভয় নেই—চলতে চলতে থেমে দাঁড়ালেন ডি-মেলো, আশ্বাস দিয়ে বলতে চাইলেন ঃ কিছু ভয় নেই গঞ্জালো—সব ঠিক হয়ে যাবে।

ঠিক হয়ে যাবে! কী ভাবে ঠিক হয়ে যাবে? একমাত্র মুরদের শর্ত মানলেই তা সম্ভবপর। তাঁরা পর্তুগীজ—একমাত্র পর্তুগালের সিংহাসন ছাড়া আর কারো কাছে তাঁরা মাথা নত করতে জানেন না। সারা হিন্দে তাঁরা মানতে পারেন একমাত্র নুনো-ডি-কুন্‌হার নির্দেশ। আজ যদি খোদাবক্স খাঁর শর্ত তাঁরা মেনে নেন, কী হবে তা হলে? তাঁদের স্বাধীনতা থাকবে না, তাঁদের স্বাতন্ত্র্য থাকবে না—তাঁরা হবেন নিতান্তই এই মুরদের আজ্ঞাবহ সৈনিক। তারা যা হুকুম দেবে—তাই মানতে হবে, প্রতি কথায় বশ্যতা মেনে চলতে হবে তাঁদের!

কিন্তু তাতেই যে নিষ্কৃতি আছে— কে বলতে পারে সে-কথা?

সিল্‌ভিরার সতর্কবাণী মনে পড়ছে—মনে পড়ছে কোয়েলহোর কথা।

মুরদের বিশ্বাস নেই ; এক দাসত্ব থেকে আর এক দাসত্বে তারা ঠেলে দেবে—ঘুরিয়ে মারবে নিষ্ঠুর পাপচক্রে। কী করে বিশ্বাস করবেন ডি-মেলো ?

—ক্যাপিতান !—কে একজন এসে সামনে দাঁড়ালো।

—কে ? পেড্রো ? কী বলতে চাও ?

—এভাবে বন্দী হয়ে থাকার কোনো অর্থই হয় না ক্যাপিতান।

—সে আমিও জানি ; কিন্তু কী করা যাবে বলো ?

পেড্রো বললে, আমরা, আমরা শুধুই গোঁয়ার্তুমি করছি। এর কোনো প্রয়োজন ছিল না।

ডি-মেলো শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন সন্দেহে।

—তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না পেড্রো।

—নবাবের প্রস্তাবে আমাদের সম্মত হওয়া উচিত ছিল।

—সম্মত ?—ডি-মেলো গর্জন করে উঠলেনঃ **O que ? Nos e possivel** ! (কী ? না—সে অসম্ভব।)

—কেন অসম্ভব ?—পেড্রো প্রশ্ন করলে।

—তার কারণ, আমরা খোদাবক্স খাঁর সৈন্য নই—স্বাধীন পর্তুগীজ। তার হুকুম তামিল করার জন্যেই আমরা বেঙ্গালাতে আসিনি।

—তা বটে !—পেড্রো ব্যঙ্গের হাসি হাসলঃ স্বাধীন যে সে চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি।

সন্দিগ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পেড্রোর দিকে তাকালেন ডি-মেলোঃ তুমি কি আমাকে ব্যঙ্গ করছ পেড্রো ? মনে রেখো, আমি তোমাদের অধিনায়ক—আমার সঙ্গে তোমাদের পরিহাসের সম্বন্ধ নয়।

পেড্রোর চোখ সাপের মতো চকচক করে উঠলঃ যে অধিনায়ক নিছক নির্বুদ্ধিতার জন্যে কারাগার বেছে নেয়, তার সঙ্গে শ্রদ্ধার ভাষায় কথা বলা কঠিন।

—পেড্রো !

তীব্র স্বরে পেড্রো বললে, এই বন্দীত্ব মানতে আমরা রাজী নই। ক্যাপিতান ইচ্ছে করলে যত খুশি কারাবাসের সুখভোগ করতে পারেন, কিন্তু আমরা নবাবকে জানাতে চাই—তাঁর শর্তেই আমরা রাজী।

—বিদ্রোহ ?—আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠলেন ডি-মেলো, হাত চলে গেল কোমরবন্ধের দিকে ; কিন্তু সেখানে তলোয়ার ছিল না।

ডি-মেলো আবার বললেনঃ বিদ্রোহ ? তোমরা সবাই ?

—না, সবাই নয় ক্যাপিতান !—চক্ষের পলকে তিনজন উঠে এল, আড়াল করে ধরল ডি-মেলোকে। অন্য দিক থেকে এল আরো তিন-চারজন—দাঁড়াল পেড্রোর পাশাপাশি।

—পেড্রো শয়তান, পেড্রো মুরদের দলে যোগ দিয়েছে !—কিশোর গঞ্জালোর তীক্ষ্ণস্বর ভেসে উঠল।

হয়তো পরক্ষণেই ঝাঁপ দিয়ে পড়তো পেড্রো, পরক্ষণেই মারামারি শুরু হয়ে

যেত দুই দলের ভেতরে ; কিন্তু সেই মুহূর্তেই একটা ঘটনা ঘটল। হঠাৎ আর্তনাদের মতো শব্দ তুলে দুদিকে সরে গেল লোহার প্রাচীরের মতো দরজা দুটো। গরাদের বাইরে প্রহরীর পাশে দেখা গেল দুজন পর্তুগীজের মূর্তি।

চক্ষের পলকে দু দলই ভুলে গেল বিদ্বেষ—ভুলে গেল এতক্ষণের ক্ষিপ্ত হিংস্রতা। এক সঙ্গেই সকলের গলা থেকে বেরিয়ে এল আর্তস্বরঃ ভ্যাস্‌কন্‌সেলস ! কোয়েল্‌হো !

ঝড়ে ডি-মেলোর যে দুখানি জাহাজ নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল, তাদেরই দুজন নায়ক শেষ পর্যন্ত চাকারিয়ায় এসে পৌঁছেছে। শুধু এসেই পৌঁছোয়নি—সেই সঙ্গে এনেছে মা মেরীর আশীর্বাদ—মুক্তির বাণী।

সেই কথাই শোনা গেল ভ্যাস্‌কন্‌সেলসের কাছ থেকে।

—কোনো ভয় নেই বন্ধুগণ। নবাবের সঙ্গে আলোচনা করে এখনি তোমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করছি।

কিন্তু মুক্তি ! কী ভয়ংকর—কি নিষ্ঠুর মূল্য যে তার জন্যে দিতে হবে, সে দুঃস্বপ্ন কি কল্পনাতেও ছিল অ্যালফন্‌সো ডি-মেলোর ?

সাত

"Como voce esta bonito"

মন্দির নয়—মায়ালোক।

বীণা, বাঁশি আর মৃদঙ্গের ধ্বনিতে যেন গন্ধর্বলোকের ঐকতান। ঘরের উজ্জ্বল আলোগুলো পরিণত হয়েছে জ্যোতিঃর তরঙ্গে—ফুল আর ধূপগন্ধ আবর্তিত হচ্ছে সুরের রেণু রেণু পরাগের মতো। চারদিক থেকে সরে গেছে মন্দিরের দেওয়াল—দূরের সমুদ্র যেন সঙ্গীতের তরল তরঙ্গ হয়ে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেছে ; আর সেই সমুদ্রের শীর্ষে ধ্বনি-গন্ধের একটি সহস্রদল শুভ্র পদ্মের ওপর দেবদাসীর দেহ লীলায়িত হচ্ছে বিষ্ণুমানসী উর্বশীর মতো।

একটি ফেন-বুদ্বুদের মতো আলোক-তরঙ্গের চূড়ায় জেগে রইল শঙ্খদত্তের চেতনা।

দক্ষিণ হাতে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধরে শঙ্খ মুদ্রায় পূজোর শুভ-সংকেত জানাল দেবদাসী—সংযুক্ত দশাঙ্গুলির যোগচিহ্নে কর্কট মুদ্রায় তুলল শঙ্খরব ; যুক্তপাণির পুষ্পপুট মুদ্রায় দেবতাকে অর্ঘ্য দিয়ে অঞ্জলি মুদ্রায় জানাল ভক্তিনত প্রণাম।

তারপর চামর হাতে নিয়ে চলতে লাগল তার ছন্দিত পদক্ষেপ।

বাতাসে দুলছে রজনীগন্ধার মঞ্জরী। নির্মল, নিষ্পাপ। শঙ্খদত্ত স্বপ্ন দেখছে। একটা সুগন্ধ পদ্মের ওপরে মাথা রেখে সঙ্গীতময় মহাসমুদ্রে ভেসে চলেছে সে। তার আদি নেই—সে অনন্ত।

—শেঠ !

উদ্ধবের ছোঁয়ায় তার চমক ভাঙল। নৃত্যোৎসব শেষ হয়েছে। দেবতার পায়ে লুটিয়ে পড়েছে দেবদাসী। একটা করুণ মূর্ছনায় ভেসে আসছে মৃদঙ্গ আর বীণার আওয়াজ। বিহ্বল মাদকতায় সমস্ত মন্দির স্বপ্নার্পিত।

উদ্ধব বললে, চলুন !

শরীরের কোথাও আর কোনো ভার নেই—ধূপের ধোঁয়ার মতোই তা লঘু হয়ে গেছে। এখনো যেন একটা পদ্মের ওপরে মাথা রেখে অলস মায়ায় ভেসে চলেছে সে।

প্রাঙ্গণ পেরিয়ে পথে নামতে খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে এল মন। রাত্রির শেষ প্রহর। সমুদ্রের হাওয়ায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে শীতের কুয়াশা। নিষ্প্রাণ নির্জনতা চারদিকে—কুকুরগুলো পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে ক্লান্ত হয়ে। মাধ্বী পান করে যে জুয়াড়ীরা পথের ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করছিল, তাদের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও।

নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল দুজনে।

খানিক পরে উদ্ধবই জিজ্ঞাসা করলে, কেমন লাগল ?

—অপূর্ব।

—দেবদাসীর যে নাচ সাধারণে দেখতে পায় এ তা নয়।

—নাঃ !—একটা মৃদু নিঃশ্বাস ফেলে শঙ্খদত্ত জবাব দিলে।

—এখানে সকলের প্রবেশাধিকার নেই কেন, আশা করি বুঝতে পারছেন।

—হুঁ—আন্দাজ করছি।

উদ্ধব বলে চলল, সব মানুষের মন সমান নয়। এখানেও মন্দিরের গায়ে যেসব মিথুন-মূর্তি আছে, সাধারণে তার তাৎপর্য বুঝতে পারে না। তাই এ নাচও তাদের মনে কুভাব জাগাবে।

একবার চমকে উঠল শঙ্খদত্ত, বুকের মধ্যে শিউরে গেল একবার। তারপর জবাব দিলে, অসম্ভব নয়।

—দেবদাসী দেবতার বধূ। তাই দেবতার কাছে তার কোনো সংকোচ নেই—কোনো আবরণ নেই। নিজের দেহমন, লাজলজ্জা—সব নিঃশেষে নিবেদন করে দিয়েই সে ধন্য।

শঙ্খদত্ত এতক্ষণে আত্মস্থ হয়ে উঠল। মৃদু গলায় বললে, দক্ষিণের মন্দিরে মন্দিরে আমি অনেক দেবদাসী দেখেছি। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারি না।

উদ্ধব বললে, সে অনেক কথা। যৌবন আসবার আগেই কুমারী কন্যাকে দেবতার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়,—তারপর গুরুর কাছে নৃত্যগীত শিখে সে দেবতাকে আত্মনিবেদন করে, বন্দনা করবার অধিকার পায়।

—এরা কোথা থেকে আসে ?

—নানা ভাবে। সে-সব ভারী বিচিত্র কাহিনী, শেঠ। কেউ বা নিজেকে মন্দিরের কাছে দান করে দেয়—তাকে বলে দত্তা। কেউ বা দেবতার পায়ে নিজেকে বিক্রি করে দেয়—সে হয় বিক্রীতা। কেউ ভক্তিভরে মন্দিরের সেবায়

নিজেকে নিয়োগ করে—সে হল ভক্তা। রাজা-মহারাজেরা বহুমূল্য অলংকারে সাজিয়ে কাউকে মন্দিরে দান করেন—সে অলংকৃতা। কেউ বেতন নিয়ে মন্দিরে নৃত্যগীত করে—সে হয় গোপিকা। আবার যাকে অপহরণ করে এনে মন্দিরে নিবেদন করে দেওয়া হয়, সে হৃতা—

শঙ্খদত্ত বললে, থাক। ও দীর্ঘ তালিকা শুনে আর লাভ নেই। আজ যাকে মন্দিরে দেখলাম, সে—

শঙ্খদত্তের অসমাপ্ত কথাটা তুলে নিয়ে উদ্ধব বললে, ওর নাম শম্পা। মন্দিরের শ্রেষ্ঠ দেবদাসী ও। হৃতা।

—হৃতা!—শঙ্খদত্তের বুকের মধ্যে একটা ঘা লাগল যেন।

—সেই রকমই শুনেছিলাম। উজ্জয়িনীর কোন্ এক গ্রাম থেকে নাকি একদল তীর্থযাত্রী শৈশবে ওকে হরণ করে আনে, তারপর পুণ্যের আশায় সঁপে দেয় জগন্নাথের মন্দিরে। এখানকার একজন প্রধান পুরোহিত ওকে লালন-পালন করেছেন—সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত আর নৃত্য-গুরু রায় রামানন্দ ওকে শিক্ষা দিয়েছেন ললিতকলা। শম্পা এ মন্দিরের গৌরব।

গৌরব। তা নিঃসন্দেহ। শঙ্খদত্তের চোখের সামনে অম্লান রজনীগন্ধার মতো নিষ্কলংক দেহখানি ভেসে উঠল। সুকুমার নগ্ন দেহটি সুরে-ছন্দে অতীন্দ্রিয় হয়ে গেছে—উজ্জ্বল কালো চোখে যেন স্বর্গের দীপ্তিরেখা; কিন্তু হৃতা! কোন্ মায়ের কোল থেকে, কোন্ সুখের সংসার থেকে ওকে নিষ্ঠুর হাতে ছিনিয়ে আনা হয়েছে কে জানে! সংসারের প্রেমে ভালোবাসায় যে সার্থক হতে পারত, তার নিষ্ফল যৌবন এখানে একটি একটি করে শুকনো পাপড়ির মতোই ঝরে যাবে—কেউ একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলবে না কখনো!

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করলে শঙ্খদত্ত।

—যখন ওর যৌবন চলে যাবে, আর নাচতে পারবে না, তখন?

উদ্ধব হাসল ঃ তখন এই মন্দির থেকেও ওকে বিদায় নিতে হবে। ওর জায়গায় নতুন দেবদাসীর অভিষেক হবে।

—তারপর ওর চলবে কি করে?

—যতদিন বাঁচবে কিছু কিছু সাহায্য করা হবে মন্দির থেকে।

—ওঃ?—শঙ্খদত্ত চুপ করে গেল। তারপর চোখ তুলে দেখল, উদ্ধবের বাড়ির সম্মুখে এসে পৌঁছেছে দুজনে।

রাত সামান্যই বাকি—ঘুমোনোর আর চেষ্টা করল না শঙ্খদত্ত। প্রদীপটা নিবিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে রইল জানালার পাশে। একটু একটু করে সরে যেতে লাগল চাঁদের আলো—হাওয়ায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে লাগল কুয়াশার ক্ষণবৃতি। অখণ্ড নীরবতার মধ্যে শুধু কানে আসতে লাগল দূরের সমুদ্রগর্জন—শীতের প্রভাবে অনেকখানি নির্জীব হয়ে গেলেও তার আকৃতির বিরাম নেই।

দেবলোকের শূন্যপট থেকে শঙ্খদত্ত একটু একটু করে নামতে লাগল

মাটিতে। তারও চোখের সামনে থেকে এখন সরে যাচ্ছে সুরের কুয়াশা—রক্তমাংসের একটি নারীমূর্তি আত্মপ্রকাশ করছে তার মধ্য থেকে। দেবদাসী নয়—একটি মানবী ; সোনার ফলে-ভরা চলন্ত দ্রাক্ষালতা।

হৃতা।

ধারালো অস্ত্রের আঘাতের মতো শব্দটা। বুকের মধ্যে তীক্ষ্ন যন্ত্রণা জাগিয়ে তুলছে বার বার। কোথা থেকে একটা অক্ষম ঈর্ষা সঞ্চারিত হতে লাগল শংখদত্তের মনে। এই মন্দিরের ওপরে ঈর্ষা—দেবতার ওপরে ঈর্ষা। মানুষের প্রাপ্য কেড়ে নিয়েছে মন্দির—জোর করে অধিকার করেছে দেবতা। স্বেচ্ছায় আসেনি—পুণ্য-কামনায় নিজেকে সঁপে দেয়নি দেবসেবায়। ও যেন দস্যুর লুট করা ধন।

মন্দিরের পবিত্রতা নয়—একটা সম্পূর্ণ নতুন অনুভূতি তার মস্তিষ্কের ভেতরে পদক্ষেপ করতে লাগল এইবার। তার দেহে-মনে মোহের ঘোর ঘনাতে লাগল। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল শরীর, কপালে দেখা দিতে লাগল ঘামের বিন্দু। মাত্র কিছুক্ষণ আগেকার স্বর্গীয় পরিবেশ এমন করে বদলে যাবে কে জানত সে কথা!

ওই মেয়েটিকে আর একবার অন্তত দেখা চাই—ওর কাছে আসা চাই যেমন করে হোক। তার দক্ষিণ পাটন, তার বহর, মোগল পাঠানের আসন্ন সংঘর্ষ, গোলাম আলীর কথাগুলো সব যেন এক সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল। নেশাটা ক্রমেই বেড়ে চলল, রক্তের মধ্যে শুরু হল অস্থির মাতলামি। জীবনের এতগুলো বৎসর শংখদত্ত সযত্নে যার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে এসেছে, আজ সেই ব্যাধিই যেন সংক্রামিত হতে লাগল তার মধ্যে।

দেবদাসী ; কিন্তু দেবতার কাছে এই দাসীত্বের ভেতর দিয়ে কী পায় সে—কতটুকুই বা পায় ? এত রূপ, এত পূর্ণতা, সারা দেহে এমন আশ্চর্য ছন্দ! পাথরের বিগ্রহ কী প্রতিদান দেয় তাকে ? স্বর্গের প্রেমে কতখানি পূর্ণ হয় রক্তমাংসের মানুষের জীবন ?

নিদ্রাহীন রাত। উত্তেজিত স্নায়ু। বাইরে রাত্রিশেষের পিঙ্গলতা। একটা ঝোড়ো হাওয়ার দমক থেকে থেকে ভেঙে পড়ছে মাথার মধ্যে। চোখের সামনে ক্রমাগত দুলছে রজনীগন্ধার মঞ্জরীটি। বৃন্তছিন্ন। প্রাণহীন পাথরের পায়ে একটি একটি পর্ণ শুকিয়ে ঝরে পড়ছে তার। যেদিন জরা আসবে, অক্ষমতা এসে স্পর্শ করবে শরীর, নাচের ছন্দে, মুদ্রার বিন্যাসে যেদিন প্রতিটি অঙ্গ আর দীপ-শিখার মতো দুলে উঠবে না, সেইদিন—

সেইদিন তার মুক্তি, তার বিশ্রাম। ব্যর্থতার মধ্যে চিরনির্বাসন। অথচ—

শম্পা! নামটি গানের মতো কানে বাজছে। তার উজ্জ্বল রূপ একটা জ্বালার মতো ঘুরে ফিরছে রক্তে! শংখদত্ত আর থাকতে পারল না। উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে, পার হয়ে এল পাথরের সিঁড়ির শীতল অন্ধকার—দাঁড়াল বাইরে।

হু হু করে বইছে সমুদ্রের হাওয়া। তীর্থযাত্রীরা চলেছে স্নানের

উদ্দেশে। রাজার একটা হাতী চলে গেল গলায় ঘণ্টা বাজিয়ে। মন্দিরের দিক থেকে শঙ্খের গভীর ধ্বনি।

বাঙলা দেশের একদল বৈষ্ণব চলে গেল হরি-সংকীর্তন করতে করতে। নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্য প্রচার করেছেন এই হরি-সংকীর্তন—তিনি নাকি আছেন এই জগন্নাথ ধামেই। বৈষ্ণবদের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে দিনের পর দিন, ত্রিবেণীর উদ্ধারণ দত্তের মতো বণিকেরা পর্যন্ত আকৃষ্ট হচ্ছেন ওতে। উড়িষ্যাতেও নাকি চৈতন্যের অনেক ভক্ত সৃষ্টি হয়েছে, এমন কি রাজারাও নাকি—

কিন্তু বৈষ্ণবদের সম্পর্কে শঙ্খদত্তের কোনো কৌতূহল নেই। লোকগুলোকে দেখলে তার হাসিই পায়। কতগুলো পুরুষমানুষ সমস্ত দিন নপুংসকদের মতো আকাশে হাত তুলে নেচে নেচে বেড়ায়, কথায় কথায় মেয়েদের মতো পথের ওপর মূর্ছিত হয়ে পড়ে। লোকে বলে, ও নাকি 'দশাপ্রাপ্তি'। কেমন হাসি পায় শঙ্খদত্তের। সপ্তগ্রামের পণ্ডিতেরা ঠাট্টা করেন :

'ইন্ধনমালা বলয়িত বাহু—
পরধন গ্রহণে সাক্ষাৎ রাহু'—

পরের পংক্তিটি অকথ্য! তারপরে আছে 'কীর্তনে পতনে মল্ল শরীর।' তাতে সন্দেহ নেই, লোকগুলোর আছড়ে পড়বার ক্ষমতা অদ্ভুত।

আর এই বৈষ্ণবদের নাম শুনলেই ক্ষেপে ওঠেন গুরু সোমদেব।

মাথার ওপরকার জটাগুলো যেন সাপের মতো ফণা তোলে। চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরিয়ে আসে।

—ক্লীবের দেশকে আরো ক্লীব করে দিচ্ছে ওরা। যেটুকু পৌরুষ অবশিষ্ট ছিল, ওরাই তা শেষ করবে। এই পাষণ্ড বৈষ্ণবগুলোকে ধরে একটার পর একটা মহাকালীর পায়ে বলি দেওয়া উচিত।

সোমদেব। হঠাৎ ভয় পেল শঙ্খদত্ত—হঠাৎ বিভীষিকা দেখল চোখের সামনে। রাত্রের সেই মোহ-মাদকতা তাকে যেন চাবুক মারল। দেশে, সমাজে ঘরে-ঘরে ব্রাহ্মণের লুপ্ত অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার স্বপ্ন দেখছেন সোমদেব, আর সেই কাজে তাঁর সহযোগিতা করবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে সে। এই কি সেই সহযোগিতা? একটা দেবদাসীর আকর্ষণে অগ্নিপ্রলুব্ধ পতঙ্গের মতো এই অস্থিরতা? সোমদেব যদি কখনো এই দুর্বলতার খবর পান, আর মুখ-দর্শনও করবেন না তার। হয়তো অভিশাপ দেবেন—হয় তো—

কোথা থেকে নির্মম একটা চাবুকের ঘা পড়ল পিঠে। না—আর এখানে নয়। এখান থেকে আজই নোঙর তুলতে হবে তাকে। অনেক দূরের পথ দক্ষিণ পাটন, অনেক সমুদ্র এখনো তাকে পাড়ি জমাতে হবে—এখনো তার অনেক কাজ বাকি।

ধীরে ধীরে সে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলল।

দল বেঁধে স্নানার্থীরা আসছে যাচ্ছে। চকিতের জন্যে মনে আশঙ্কার ছায়া পড়ল : আবার গোলাম আলীর সঙ্গে দেখা হবে না তো? লোকটাকে সে ঠিক বুঝতে পারে না—দেখলেই কেমন একটা অদ্ভুত ভয়ে কাতর হয়ে

ওঠে। মোগল-পাঠান-ক্রীশ্চান। থমথমে কিছু একটা ঘনিয়ে আসছে আকাশ-বাতাসে। গোলাম আলীর মুখে চোখে তারই সংকেত। সমুদ্রে ভয়ঙ্কর কোনো ঝড় আসবার আগে যেমন এক-আধটা অশুভ সিন্ধু-শকুন দেখা দেয়—সেই রকম।

স্নানের ঘাট পেরিয়ে নির্জন বালিডাঙার ওপরে এসে সে দাঁড়াল। দূরে-কাছে রাশি রাশি কেয়াবন আর কাঁটা ঝোপের অসংলগ্ন ব্যাপ্তি। জলের কাছাকাছি নুড়ি আর ঝিনুকের সারির মধ্যে বসন্তের হাওয়ায় ঝরা গাঢ়রক্ত কৃষ্ণচূড়া ফুলের মতো লাল কাঁকড়ার আনাগোনা। আর একটু ওপাশে সেই বালিয়াড়ীটা দেখা যাচ্ছে—যেখানে কাল সে এসে বসেছিল গোলাম আলীর সঙ্গে।

চকিতে সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলে সে—তাকালো দূরে সমুদ্রে। শান্ত শীতের সাগরে অল্প অল্প ঢেউ ভাঙছে—সেই ঢেউয়ের রেখার ওপারে তার বহর দাঁড়িয়ে। নীল জলে রক্তস্নান করে এখন সবে উঠে পড়েছে সূর্য, তার রক্তাভ সোনালী আলোয় বহরটাকে চিত্রপটে আঁকা ছবির মতো দেখাচ্ছে। আজই কি বহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া যাবে ?

শঙ্খদত্ত ভ্রূকুটি করলে। বাতাসের গতি উপকূলমুখী—তাকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হবে। তা ছাড়া আর একটু এগোলেই কূলের কাছাকাছি আছে ডুবোপাহাড়, তার ওপর গিয়ে পড়লে বিপদের সীমা থাকবে না। যতদূর মনে হচ্ছে, আজও বোধহয় এখানেই থেকে যেতে হবে। যাই হোক—'কাঁড়ার'দের কাছে এ সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে হবে একবার।

রাত্রির ক্লান্তি আর অবসাদে জর্জরিত শরীর। নেশার রেশটা এখনো তাকে বিস্বাদ করে রেখেছে। সামনে স্নিগ্ধ নীল জলের হাতছানি। অবগাহন স্নানের প্রলোভনে তার মন চঞ্চল হয়ে উঠল।

আঘাটায় স্নান করা নিরাপদ নয়। হাঙ্গরের আনাগোনা আছে—শঙ্কর মাছের চাবুকের ভয়ও আছে। তা ছাড়া কখনো কখনো করাত মাছেও আক্রমণ করতে পারে। তবু সমুদ্রের লোভানিটাকে দমন করতে পারল না শঙ্খদত্ত। গায়ের জামা খুলে সে নেমে পড়ল জলে।

স্নিগ্ধ জলের কবোষ্ণ আলিঙ্গনে দেহের আগুনটা নিভে এল—ছোট ছোট ঢেউয়ের লীলাস্পর্শে মুছে নিতে লাগল সঞ্চিত অবসাদের গ্লানি। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলে সে। পায়ের তলা দিয়ে একটা মস্ত বড় শঙ্খ খলবল্ করে পালিয়ে গেল—ইতস্তত সঞ্চরণ করতে লাগল দলে দলে ঝিনুক। চিন্তাহীন—কর্মহীন নিবিড় বিরামের মধ্যে মগ্ন হয়ে রইল শঙ্খদত্ত।

তারপর সূর্যের রোদ যখন প্রখর হল, যখন তীক্ষ্ন নোনা জলে চোখ মুখ জ্বালা করতে লাগল, তখন জল ছেড়ে উঠে পড়ল সে। অজস্র উচ্ছ্বসিত হাওয়ায় আধখানা করে নিংড়ে-নেওয়া ভিজে কাপড়টা শুকিয়ে নিতে তার দেরি হল না, তারপর মন্থর পায়ে সে ফিরে চলল উদ্ধবের বাড়ির দিকে।

অন্যমনস্কভাবে সে আসছিল—আসছিল চারদিকের মানুষগুলো সম্পর্কে

সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে। হঠাৎ কানে এল বাজনার শব্দ—আর সম্মিলিত নারী-কণ্ঠের তীব্র মধুর গানের উচ্ছ্বাস।

তাকিয়ে দেখল, পথের দুধারে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে অনেক লোক। অলস কৌতূহলে কী যেন দেখছে।

শঙ্খদত্তও দাঁড়ালো। একটা বিয়ের শোভাযাত্রা আসছে।

—খুব সমারোহ দেখছি। কোনো বড়লোকের বিয়ে বুঝি?—স্বগতোক্তির মতো উচ্চারণ করলে শঙ্খদত্ত।

—হুঁ। মন্দিরের প্রধান পাণ্ডার ছেলের বিয়ে—পাশ থেকে কে উত্তর দিলে।

শঙ্খদত্ত দেখতে লাগল। দীর্ঘ শোভাযাত্রা আসছে। আগে আগে চলেছে বাদ্যকরের দল। মাঝখানে মঙ্গলগান গাইতে গাইতে চলেছে মেয়েরা। তাদের পেছনে সোনা-রূপোর কাজকরা খোলা পাল্‌কিতে কিশোর বর—তার পাশে বালিকাবধূ।

শঙ্খদত্তের শিথিল দৃষ্টি হঠাৎ তীক্ষ্ন হয়ে উঠল—থমকে গেল এক জায়গায়। হৃৎপিণ্ডের ভেতরে আছড়ে পড়ল উচ্ছলিত রক্ত। মুহূর্তের জন্যে মনে হল, অলস-অসুস্থ কল্পনায় সে স্বপ্ন দেখছে। দিবাস্বপ্ন।

কিন্তু স্বপ্ন নয়—মায়াও নয়। সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় রাত্রের সেই রজনীগন্ধা কোমল পত্রপুটে ঘেরা কেতকীর মতো ফুটে উঠেছে। নীল-শাড়ি-পরা যে অপূর্ব রূপবতী মেয়েটি দলের সকলের আগে গান গাইতে গাইতে চলেছে—সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে যার কণ্ঠহার, যার হাতের কঙ্কণ, যার কর্ণাভরণ, সে আর কেউই নয়! আর কেউ সে হতেই পারে না!

তীব্র উত্তেজনায় সে বলে ফেলল, ও কে? নীল-শাড়ি-পরা কে ও?

পাশের লোকটি জবাব দিলে, ওকে চেন না?—ও যে মন্দিরের শ্রেষ্ঠ দেবদাসী—ও শম্পা।

শঙ্খদত্তের ঠোঁট কাঁপতে লাগল—তুফান ছুটে চলল রক্তে। কয়েক মুহূর্ত একটা শব্দও সে উচ্চারণ করতে পারল না—উদ্‌ভ্রান্ত চোখ মেলে চেয়ে রইল ঘননীল পত্রাবৃত কেতকীর দিকে।

—কিন্তু এখানে কেন? কেন এই শোভাযাত্রার সঙ্গে?

—বা রে, তাই তো প্রথা!—যে লোকটি জবাব দিচ্ছিল, সে একবার সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে শঙ্খদত্তের দিকে। কেমন অস্বাভাবিক মনে হল তার। নিশ্চয় বিদেশী এবং সেই সঙ্গে নির্বোধ।

—প্রথা কেন?—নির্বোধের মতোই জানতে চাইল শঙ্খদত্ত।

লোকটি অনুকম্পার হাসি হাসল: দেবদাসী চিরসধবা, তার কখনো বৈধব্য হয় না।

—ওঃ!

—তাই এই সব শুভকাজে দেবদাসীকে সমাদর করে ডেকে আনা হয়। সবাই আশা করে, দেবদাসীর মতো নববধূও চিরসধবা থাকবে—কখনো তাকে বৈধব্যের দুঃখ ভোগ করতে হবে না।

শোভাযাত্রা ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। জনতার ভিড়ে আর দেখা যাচ্ছে না শম্পাকে। ঐকান্তিক আগ্রহে চোখের দৃষ্টিকে যথাসাধ্য প্রসারিত করেও নয়।

হঠাৎ অসুস্থের মতো অর্থহীন প্রশ্ন করে বসল শঙ্খদত্ত।

—কোথায় থাকে ওই দেবদাসী? ওই শম্পা?

লোকটা হঠাৎ হেসে উঠল।

—কোথাকার মানুষ হে তুমি? পাগল হয়ে গেলে নাকি? ও-সব মতলব ছেড়ে দাও। বরং স্বর্গে যাওয়া সোজা—কিন্তু শম্পার কাছেও কোনোদিন পৌঁছুতেও পারবে না।

শঙ্খদত্ত কোনো জবাব দিলে না। আস্তে আস্তে সরে গেল লোকটার পাশ থেকে। তারপর মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেইদিকেই পা চালালো—যেদিকে শোভাযাত্রা এগিয়ে গেছে।

আট

"E' um pouco caro."

খোদাবক্স খাঁর মুখ দেখে কিছু অনুমান করা কঠিন। সে মুখে ভাবের বিন্দুমাত্র অভিব্যক্তি আছে বলে মনে হয় না। শুধু চোখের কোণায় ক্লান্তির কলঙ্করেখা—একটা উত্তাপহীন ঘুমন্ত দৃষ্টি। কাল সমস্ত রাত উদ্দাম আনন্দের মধ্যে কাটিয়েছেন তিনি—দুটি নতুন সুন্দরী নর্তকী এসেছে তাঁর রংমহলে।

ঘুম-জড়ানো চোখে খোদাবক্স খাঁ দিবাস্বপ্ন দেখছিলেন।

পর্তুগীজদের তাঁর পছন্দ হয় না। ওদের মিত্রতা তিনি চান না—শত্রুতাও না। দূরে আছে, দূরেই থাক। তাই যখন ডি-মেলোর জাহাজ এসে তাঁর ঘাটে লাগল, তখন তিনি সংক্ষেপেই ওদের বিদায় করতে চেয়েছিলেন। বিলাসী শান্তিপ্রিয় মানুষ খোদাবক্স খাঁ—রাজনীতির চাইতে নারীতত্ত্বই তিনি বেশী পছন্দ করেন; কিন্তু উজীর জামান খাঁর জন্যেই এই বিপদে তিনি পড়েছেন।

তাঁর শত্রুর সঙ্গে বিরোধ চলছে—নিষ্পত্তি তিনি নিজেই করবেন। তার মাঝখানে এরা আবার কেন? চট্টগ্রামের বন্দর ভুল করে এখানে এসে পৌঁছেছে—বেশ তো, চট্টগ্রামের রাস্তা বাতলে দিলেই তো চুকে যায় সমস্ত। এমন কি—প্রয়োজন হলে তিনি না হয় দু ছত্র পরিচয়ও লিখে দিতে রাজি ছিলেন চট্টগ্রামের সুলতানকে; কিন্তু যা কিছু গণ্ডগোল সৃষ্টি করে বসলেন জামান খাঁ।

—এসেই যখন পড়েছে খোদাবন্দ, তখন কাজে লাগানো যাক ওদের।

—কিন্তু উজীর সাহেব, ওদের ঘাঁটানো কি উচিত? শেষে আবার ফ্যাসাদে না পড়ি।

—আপনি মিছেই ভয় পাচ্ছেন। ওরা জলজ্যান্ত শয়তান। ওদের ভাল করা যা ক্ষতি করাও তাই। তাই যখন পাওয়া গেছে কাজে লাগিয়ে নেওয়া যাক।

খোদাবক্স খাঁ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।

—যদি গোলমাল করে? যদি বহর নিয়ে আসে?

—মাঝ দরিয়ায় ভরাডুবি করে দেব—ভাববেন না।

—কিন্তু ওরা ভাল লড়ে—ভারী ভারী কামান আছে ওদের—

—আমাদের পেছনে আছেন চাটগাঁয়ের নবাব, আছেন গৌড়ের সুলতান, আছে সারা হিন্দুস্থান। ভয় নেই জনাব, ওরা ঘাঁটাতে সাহস পাবে না।

ঠিকই বুঝেছিলেন জামান খাঁ। সাহস যে পাবে না, তারই প্রমাণ আজ কোয়েলহো আর ভ্যাসকনসেলসের দৌত্য। দুজন নবাগত পর্তুগীজ সেনানী এসে দাঁড়িয়েছে সদলে ডি-মেলোর মুক্তির প্রার্থনা নিয়ে। মুর দোভাষীর মুখে তাদের নিবেদন শুনছিলেন খোদাবক্স খাঁ।

কিন্তু শুনতে শুনতে তাঁর বিরক্তি ধরে গেছে। কাল রাতের স্মৃতি উন্মনা করে দিয়েছে তাঁকে। বিশেষ করে যে মেয়েটির নাম জরিনা, এখনো যেন সর্বাঙ্গে তার কামনাতপ্ত সুঠাম দেহের স্পর্শ পাচ্ছেন তিনি!

কিন্তু স্বপ্ন ভাঙল জামান খাঁর আহ্বানে।

—খোদাবন্দ, ওরা মুক্তিপণ দিতে চাইছে।

—কিসের মুক্তিপণ?—চটকা ভেঙে জানতে চাইলেন খোদাবক্স খাঁ।

—পর্তুগীজ সেনাপতির জন্যে।

মুক্তিপণ। মন্দ কী! খোদাবক্স খাঁ যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কিছু অর্থাগম হয়—সে তো ভালই। এ বিড়ম্বনা যত তাড়াতাড়ি মিটে যায়, ততই নিশ্চিন্ত হতে পারেন তিনি।

একবার সম্পূর্ণ চোখের দৃষ্টি ফেলে তিনি তাকালেন পর্তুগীজদের দিকে। দুটি ঋজু-দেহ মানুষ স্থির অচঞ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে। কপালে সেই এক-চোখ-ঢাকা বাঁকা টুপি, গায়ে ডোরাকাটা বাঘের মতো আঙিয়া—কোমরবন্ধে সরল দীর্ঘাকার তলোয়ার। বিনয়ের বশ্যতা নিয়ে এসেছে বটে, তবু ওদের চোখের দিকে তাকিয়ে স্বস্তি পেলেন না খোদাবক্স খাঁ। কঠিন পিঙ্গল চোখ, সে চোখে উচ্চারিত ঘৃণা, সুস্পষ্ট জ্বালা। হঠাৎ মনে হল—ডোরাদার বাঘের স্বধর্মী এ নতুন মানুষগুলো সম্পূর্ণ মানুষ নয়—ওদের অর্ধেকটা জান্তব। ওদের না খোঁচালেই হত ভাল। ক্রীশ্চানদের সম্পর্কে যে-সব কাহিনী শুনেছেন, সব তাঁর মনে পড়তে লাগল। ওরা এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বী—যার সঙ্গে এর আগে কোনো পরিচয় তাঁর হয়নি—ভবিষ্যতেও না হলেই তিনি সুখী হবেন। কালিকটের পথ যে ভাবে রক্তে ওরা স্নান করিয়েছিল, যে কাহিনী বিভীষিকার মতো শুনেছেন খোদাবক্স খাঁ, এখানে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটলেই তিনি খুশি হবেন।

কোয়েলহোর গম্ভীর কণ্ঠ বেজে উঠল গম গম করে: এক হাজার 'ক্রুজাডো'।*

---

* মোটামুটি এক হাজার টাকার সমান। অবশ্য এ নিয়ে মতভেদ আছে।

খোদাবক্স খাঁ কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, চোখের ইঙ্গিতে বাধা দিলেন জামান খাঁ। চাপা গলায় কী একটা জানালেন দোভাষীকে।

দোভাষী বললে, না—নবাব ওতে রাজী নন।

পর্তুগীজেরা একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। তারপর আবার শোনা গেল কোয়েলহোর গম্ভীর স্বর : এক হাজার আর পাঁচশো ক্রুজাডো।

—না।—জামান খাঁর নির্দেশ এল।

খোদাবক্স খাঁ অস্বস্তিতে ছটফট করে উঠলেন।

—অনর্থক আর গোলমাল বাড়িয়ে লাভ নেই উজীর সাহেব। মিটিয়েই ফেলুন।

—আপনি বুঝতে পারছেন না নবাব। ওরা বানিয়ার জাত। আস্তে আস্তে দর চড়াবে।

ব্যক্তিত্বহীন খোদাবক্স খাঁ চুপ করে রইলেন। নিজের ওপর জোর নেই তাঁর, জোর করে কোনো কথা বলবার ক্ষমতাও নেই। নিরুপায়ভাবে আবার তলিয়ে যেতে চাইলেন দিবাস্বপ্নের মধ্যে। মনে আনতে চাইলেন জরিনার তপ্ত সুরভিত আলিঙ্গন।

—না—এতেও নবাব সন্তুষ্ট নন।

ল্যাজে পা-পড়া সাপের মতো একবার মোচড় খেয়ে উঠল ভ্যাসকনসেল-সের শরীর। হাত চলে যেতে চাইল কোমরবন্ধের দিকে ; কিন্তু পেছনেই মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে মুর সৈনিকের দল। তাদের তলোয়ার আর বন্দুক মাত্র একটি আঙুল তোলবার প্রতীক্ষায়।

যথাসাধ্য আত্মসংযম করে কোয়েলহো বললেন, দু হাজার ক্রুজাডো।

খোদাবক্স খাঁ আর থাকতে পারলেন না। ডাকলেন, জামান খাঁ ?

—আপনি ব্যস্ত হবেন না নবাব। দর আরো চড়বে।

দোভাষী বললে, না, দু হাজারেও হবে না।

তামাটে চাপ-দাড়ির আড়ালে এবার ঠোঁট কামড়ে ধরলেন কোয়েলহো। নবাবের উদ্দেশ্য একটু একটু করে প্রকট হয়ে উঠছে ক্রমশ। এ ভাবে হবে না, এ পথে নয় ; লোভকে যতই প্রশ্রয় দেওয়া যাবে ততই বেড়ে চলবে সে—তার বিষাক্ত জাল থেকে কিছুতেই মুক্তি নেই। ত্রিশ হাজার ক্রুজাডো দিলেও না।

অন্য উপায় দেখতে হবে।

ক্রোধে ক্ষোভে আত্মহারা হয়ে গেলেন ক্রীশ্চানেরা ; কিন্তু আপাতত ধৈর্যহারা হয়ে লাভ নেই, সেটা শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছুবে। সময় আসুক—দেখা যাবে তখন।

দুর্বিনীত মাথাটাকে অতি কষ্টে নত করলেন কোয়েলহো।—আপাতত এর বেশি দেবার সামর্থ্য আমাদের নেই। নবাব অনুগ্রহ করে প্রসন্ন হোন।

মুর দোভাষীর কণ্ঠে এবার ব্যঙ্গবাণী বেজে উঠল : নবাব খানখানান খোদাবক্স খাঁ বিশ্বাস করেন, পর্তুগীজ ক্যাপিতানদের জাহাজগুলো বাজেয়াপ্ত

করলেও এর চাইতে দশগুণ লাভবান হবেন তিনি।

দুজন পর্তুগীজই স্তব্ধ হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর কোয়েল্‌হো বললেন, নবাবের কত দাবি ?

—পাঁচ হাজার ক্রুজাডো। এবং সেই সঙ্গে নবাবের সেনাবাহিনীতে পর্তুগীজদের সহায়তা।

কোয়েল্‌হো আর একবার ঠোঁট কামড়ালেন। তারপর ভ্যাস্‌কন্‌সেলস্‌কে মৃদু একটা আকর্ষণ করে বললেন, আমরা ভেবে দেখতে চাই। আশা করি, নবাব আর একদিন আমাদের সময় দেবেন।

—একদিন কেন, সাতদিন সময় দিতেও রাজী আছেন নবাব। তাঁর তাড়া নেই।

—বেশ তাই হবে।—অভিবাদন করে বেরিয়ে গেলেন পর্তুগীজেরা। দরবার-সুদ্ধ সমস্ত লোক সকৌতুক কৌতূহলভরা জিজ্ঞাসু চোখে তাঁদের গতিপথের দিকে তাকিয়ে রইল।

খোদাবক্স খাঁ নড়ে উঠলেন একবার।

—উজীর সাহেব, আমার ভাল লাগছে না। ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেললেই হত।

জামান খাঁ প্রাজ্ঞের হাসি হাসলেন ঃ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন খোদাবন্দ্‌। যা চেয়েছেন, সবই পাবেন। বলা যায় না, আরো কিছু বেশিই পাবেন হয়তো।

দরবার ভেঙে উঠে দাঁড়ালেন খোদাবক্স খাঁ।

রাত এল।

কারাগারের নিষ্ঠুর অন্ধকার। বরফের পিণ্ডের মতো জমাট শীত।

বন্দী পর্তুগীজেরা কেউ কেউ ওরই মধ্যে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে পড়েছে—কেউ বা ছায়ার আড়ালে আরো এক এক পুঞ্জ ছায়ার মতো বসে আছে। কোথা থেকে সেই পচা মাংসের কটু গন্ধটা তেমনি ছড়িয়ে চলেছে—প্রথম প্রথম দম আটকে আসত, এখন গা-সওয়া হয়ে গেছে অনেকখানি। অন্ধকারে গুটিকয়েক ক্ষুদ্রাকার সচল প্রাণী ইতস্তত ছুটোছুটি করছে—তারা ইঁদুর ; বিকেলে বন্দীদের যে খাদ্য দেওয়া হয়েছিল, তারই ধ্বংসাবশেষের সন্ধানে এসেছে ওরা।

এই অসহ্য অপমানিত বন্ধনের ভেতর ওদের মুক্ত জীবন মনে যেন হিংসার জ্বালা ধরায়। নিরুপায় ক্রোধে কে একজন একটা ইঁদুরকে সজোরে লাথি মারল, ধপ্‌ করে সেটা ছিটকে গিয়ে পড়ল দেওয়ালে, তারপর আহত-যন্ত্রণায় মানুষের মতো চ্যাঁ-চ্যাঁ করে উঠল।

সেই শব্দে আত্মমগ্ন অ্যাফোন্‌সো ডি-মেলো একবার মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। বুকের কাছে ঘন হয়ে আছে গঞ্জালো—একবার সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিলেন তার মাথায়। সেই সঙ্গে হঠাৎ চমকে ওঠা ঘরের অন্যান্য সমস্ত জাগ্রত অর্ধ-জাগ্রত মানুষগুলোর মতো একই প্রশ্ন জাগল তাঁর মনে ঃ এল ?

মুক্তির দূত কি এল ? ভ্যাসকনসেলস আর কোয়েলহো কি তাঁদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে পেরেছে ?

কিন্তু প্রত্যাশায় ভরা দীর্ঘ দিন কেটে গেছে—তারপর এই ঘরের মধ্যে ঘনিয়ে এসেছে শীতক্লান্ত জর্জর রাত্রি। এখনো কোনো খবর এল না। ওদেরই বা কী হয়েছে কে বলতে পারে ? হয়তো তাঁদের মতো ওরাও এখন কোনো অন্ধকার কারাগারে প্রহর গুনছে। সিলভিরাই ঠিক বুঝেছিল। মুরদের বিশ্বাস নেই।

—Aluz !—কে যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তাই বটে। আলো—একটুখানি আলো থাকলেও যেন আশার চিহ্ন থাকত কোথাও। কি অদ্ভুত—অস্বাভাবিক অন্ধকার। চারদিকে যেন প্রেতাত্মাদের নিঃশব্দ কান্না বাজছে।

আর নিজের দেশের কথা মনে পড়ছে তাঁর। তাঁদের পর্তুগালকে বিদেশীরা বলে সূর্যালোকের দেশ। ডি-মেলো উন্মনা হয়ে উঠলেন। কত আলো সেখানে। সেরা-ডা-এসট্রেলার চূড়োয়, টেগাস আর দুরোর জলে—আলেমতেজোর জলপাইবনে আর ওপোর্টোর আঙুরক্ষেতে। একটা রুদ্ধ আবেগ যেন উঠে আসতে লাগল গলার কাছে।

পেড্রোই কি ঠিক বুঝেছে ? আত্মসমর্পণ করবেন ? রাজী হয়ে যাবেন নবাবের প্রস্তাবে ? নিজের মনের মধ্যে কথাটা আবার নতুন করে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন ডি-মেলো। যদি সোজাসুজি হত্যার আদেশ দিত, টেনে নিয়ে যেত বধ্যভূমিতে, ডি-মেলো তা সহ্য করতে পারতেন—বীর পর্তুগালের সন্তান মৃত্যুবরণ করতেন বীরের মতো ; কিন্তু এই কারাগার অসহ্য ! এর অন্ধকার, এর শীতলতা, এর কোনো অলক্ষ্য অংশ থেকে পচা মড়ার গন্ধ—সব একসঙ্গে মিশে যেন টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে তাঁর স্নায়ুগুলোকে। এ যেন তিলে তিলে মানুষকে উন্মত্ততার মধ্যে ঠেলে দেবার ব্যবস্থা। না—মুরদের অনুষ্ঠানে ত্রুটি নেই কোথাও। তবু এর মধ্যেই কে গান গেয়ে উঠল। কার গলায় বেজে উঠল মাতা মেরীর নামগান। যারা ঘুমোচ্ছিল অথবা ঘুমের ভান করছিল, নড়ে উঠল তারা—কেউ কেউ উঠেও বসল। সঙ্গে সঙ্গে গভীর আশ্বাসে ভরে উঠল ডি-মেলোর মন। Aluz ! হ্যাঁ—আলোই পেয়েছেন তিনি। যে মাতা মেরীর নামে পর্তুগালের বুক থেকে মুরদের শেষ দুর্গও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে, সেই শক্তিই এ সংকটেও তাঁদের রক্ষা করবে। Conosco—Conosco—গায়ক গেয়ে চলেছে। ঠিক কথা, মেরী আমাদের সঙ্গেই আছেন—তিনিই আমাদের পথ দেখিয়ে দেবেন।

আর মনে পড়ছে বেলেমের জয়স্তম্ভ—যেখানে ভারতীয় ভাস্কর্যের অনুকরণে বিরাট স্তম্ভ পর্তুগীজ ক্যাপিতানদের জয় ঘোষণা করছে। তার কথাই বা কী করে ভুলবেন ডি-মেলো !

সেই সময় একটা অদ্ভুত শব্দ হল বাইরে। চাপা গোঙানির আওয়াজ—ঝন্ ঝন্ করে তলোয়ারের ধ্বনি। গান বন্ধ করে একসঙ্গে কারাগারের সমস্ত মানুষগুলো দরজার দিকে তাকাল। আর কয়েক মুহূর্ত অনন্ত সময়ের

গাঁড পার হয়ে নিঃশব্দে খুলে গেল ইস্পাতের পাত দিয়ে গড়া বিরাট দরজা দুটো।

বন্দী পর্তুগীজেরা একসঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠল। বাইরে থেকে একফালি আলো এসে পড়েছে ঘরে। **Aluz**! আর সেই আলোয় চারজন পর্তুগীজের ছায়ামূর্তি স্পষ্ট হয়ে দেখা দিলে। কোয়েলহো, ভ্যাসকনসেলস আর সেই সঙ্গে আরো দুজন সৈনিক।

কেউ কিছু বলবার আগেই তীব্র চাপা স্বর এল ভ্যাসকনসেলসের গলা থেকে।

—চুপ! প্রহরীদের খুন করে আমরা দরজা খুলে দিয়েছি। এখনি পালাতে হবে। **Pronto**?

—**Pronto**!—সমবেত স্বরে তেমনি চাপা প্রতিধ্বনি উঠল ঃ 'প্রস্তুত'।

—তা হলে আর দেরি নয়। এখুনি পালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু একটু শব্দ না হয়।

নিঃশব্দ পায়ে নিজেদের বুকের স্পন্দন শুনতে শুনতে সদলবলে বেরিয়ে এলেন ডি-মেলো। দরজার সামনেই পড়ে আছে মৃত প্রহরীরা—এ জীবনের মতো পাহারা দেওয়া শেষ হয়ে গেছে ওদের। নিজেদের রক্তে স্নান করছে ওদের দেহ।

ভ্যাসকনসেলস বললেন, এই পথে।

কারাগারের ঠিক পেছনেই উঁচু দেওয়াল। দেওয়ালের ওপারে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ পিশাচমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। সেই বটগাছের ডাল থেকে সারি সারি দড়ি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে নিচে। ওই পথ দিয়ে ওরা নেমেছে—ওই পথ দিয়েই বেরিয়ে যেতে হবে সকলকে।

নিঃশব্দে দড়ি বেয়ে এক একজন উঠতে লাগল ওপরে, কিন্তু বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। এতগুলি মানুষের আকর্ষণে বার বার বিশ্রী শব্দ হতে লাগল গাছের ডালে—গাছের ওপর কতকগুলো কাক আচমকা তারস্বরে আর্তনাদ করে উঠল।

আর ভীতি-বিহ্বল পর্তুগীজেরা দেখল, দূরে-কাছের অন্ধকারে আচমকা কতগুলো মশাল দুলে উঠছে। শোনা যাচ্ছে প্রচণ্ড চিৎকার ঃ পালায়—পালায়—

নবাবের রক্ষীরা টের পেয়েছে।

দড়ি ধরে যারা ঝুলছিল, তারা পাথর হয়ে রইল। কোয়েলহো ভ্যাসকনসেলসের সঙ্গে যে দু-একজন প্রাচীরের ওপর উঠতে পেরেছিল, তারা অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

ওদিক থেকে দুমদাম করে কয়েকটা বন্দুকের আওয়াজ এল। আর্তনাদ তুলে প্রাচীরের ওপর থেকে একজন ডি-মেলোর পায়ের কাছে আছড়ে পড়েই স্থির হয়ে গেল। এগিয়ে আসা মশালের আলোয় ডি-মেলো তার রক্তাক্ত মৃতদেহটাকে চিনতে পারলেন ঃ সে পেড্রো!

অসহায় আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে অবশিষ্ট পর্তুগীজদের সঙ্গে ডি-মেলোও হাত তুলে দাঁড়িয়ে রইলেন। পালাবার পথ নেই আর—আর উপায় নেই। চারিদিক থেকে খোদাবক্স খাঁর সৈন্যদল তাঁদের ঘিরে ফেলেছে। আর মশালের আলোয় কোতোয়ালের হাতে ঝকমক করছে নগ্ন খরধার তলোয়ার।

Aluz! সে আলো নিভে গেছে। তবু একটা সান্ত্বনা আছে এখনো। সকলের আগেই প্রাচীরের বাইরে চলে যেতে পেরেছে গঞ্জালো। সে অন্তত মুক্তি পেয়েছে এই অসহ্য কারাগারের অমানুষিক দুঃস্বপ্ন থেকে। এর পরে তাঁদের যা হওয়ার তাই হোক।

পায়ের কাছে নিজের রক্তের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে পেড্রো। বিদ্রোহী হয়েছিল—এবার তার নিঃশব্দ আত্মসমর্পণ; কিন্তু তারও মুক্তি হয়ে গেছে—আর দুঃখ করবার মতো কিছুই নেই এখন।

* * * *

মুক্তি!

গঞ্জালোও তাই ভেবেছিল হয়তো; কিন্তু বাইরে নেমে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। প্রাচীরের ওপারে যে বন্দুকের আওয়াজ চলছে—বাইরেও সে বিভীষিকা থেকে ত্রাণ নেই। কোলাহল তুলে এদিকেও ছুটে আসছে নবাবের সৈন্য।

অভ্যাসবশেই যেন একবার আশ্রয় আর আশ্বাসের আশায় তাকাল—খুঁজতে চাইল কাছাকাছি কোথাও ডি-মেলো আছেন কিনা; কিন্তু ডি-মেলো কেন—কোয়েলহো, ভ্যাসকনসেলসকেও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। পরক্ষণেই পেছনে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনতে পেল সে। ঊর্ধ্বশ্বাসে গঞ্জালো ছুটে চলল।

অচেনা দেশ, অচেনা মাটি। কোথায় যাবে জানে না, কোথায় তার শত্রু-মিত্র তাও বোঝাবার ক্ষমতা নেই। কৃষ্ণপক্ষের কালো অন্ধকার চারদিকে। এলোমেলো হাওয়ায় হু হু করছে দীর্ঘকায় নারিকেল-বন, প্রতি পায়ে পায়ে হোঁচট লাগছে, বিচ্ছিন্ন জঙ্গলে পথ আটকে যাচ্ছে বার বার। আর তারই মধ্যে শোনা যাচ্ছে ঘোড়ার পায়ের নিষ্ঠুর শব্দ। এসে পড়ল—এসে পড়ল বুঝি!

কতক্ষণ ছুটেছে জানে না। প্রবল শীতের হাওয়াতেও কপাল বেয়ে টপ টপ করে ঘাম পড়ছে তার। পা ভেঙে আসছে—আর সে ছুটতে পারে না। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ অন্যদিক দিয়ে চলে গেল—ওকে খুঁজে পায়নি। একবার থেমে দাঁড়াল গঞ্জালো, বড় বড় শ্বাস ফেলতে ফেলতে তাকিয়ে দেখল চারদিকে।

এতক্ষণ চারপাশে ছিল নীরন্ধ্র অন্ধকার—এইবার আলো দেখা যাচ্ছে একটা। শত্রু, না মিত্র? কিন্তু আর বিচার করবার উপায় নেই তার। মিত্র হলে আশ্রয় চাইবে, শত্রু হলে আত্মসমর্পণ করবে। বলবে, এবার আমাকে নিয়ে তোমাদের যা খুশি কর।

আলোর রেখাটা লক্ষ্য করেই এগিয়ে চলল।

খানিক দূরে যেতেই দেখা গেল আলো আসছে একটা টিলার ওপর থেকে। সেই টিলার গায়ে দুধের মতো শাদা একটি বাড়ি—তার তীক্ষ্ণাগ্র চূড়ো উঠেছে আকাশে। অনেকটা 'ইগ্রেঝা'র মতোই দেখতে। গঞ্জালো বুঝতে পারল। এর আগেও সে কিছু কিছু ও-রকম বাড়ি দেখেছে, ও আর কিছু নয়—'জেস্টুর'-দের ধর্মমন্দির।

ওখানে অন্তত আশ্রয় পাওয়া যাবে। অন্তত ওখানে নবাবের সৈন্য তার জন্যে থাবা গেড়ে অপেক্ষা করছে না। আশ্বাস আর আশায় ক্লান্ত পা দুটোকে টেনে টেনে চলতে লাগল গঞ্জালো।

আর রাজশেখর শেঠের নতুন মন্দিরের চাতালে, গুরু সোমদেব বসে ছিলেন নিজের মধ্যে তন্ময় হয়ে। যেন ধ্যানের মধ্যে দেখতে পাচ্ছিলেন, মহাকালী সাক্ষাৎ তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর হাতে বরাভয়, তাঁর মুখে স্মিত হাসি।

দেবী বললেন, তোমার স্বপ্ন সফল হবে বৎস, যা চেয়েছ, তাই পাবে।

—আর কত দেরি মা, আর কত দেরি?—সোমদেব জিজ্ঞাসা করলেন আকুল হয়ে।

—সময় এগিয়ে আসছে তার, কিন্তু তার জন্যে পুজো চাই, চাই বলি—বলি!

হঠাৎ কাছেই কেমন একটা শব্দ হল। চমকে চোখ মেললেন সোমদেব। সামনে যে প্রদীপের শিখাটি জোরালো হাওয়ায় নিবু নিবু হয়ে আবার দপ্ করে জ্বলে উঠছিল—আকস্মিক দীপ্তিতে শিখায়িত হয়ে উঠল সেটা। সেই আলোয় সোমদেব একটা বিচিত্র জিনিস দেখতে পেলেন।

একটি কিশোর এসে দাঁড়িয়েছে। শুভ্র তার গায়ের রঙ—মাথায় রক্তিম চুল। দুটি উদ্‌ভ্রান্ত চোখে, সমস্ত মুখের চেহারায় ভয়ের কালো ছায়া জড়িয়ে রয়েছে। শ্রান্তিতে বড় বড় শ্বাস ফেলছে সে। সোমদেব চিনতে পারলেন: হার্মাদ।

—কী চাও তুমি এখানে?

অপরিচিত ভাষা গঞ্জালো বুঝতে পারল না, কিন্তু বক্তব্য বুঝতে পারল। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলে, সে তৃষ্ণার্ত, জল চায়; আর চায় একটি রাতের মতো কোথাও নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন সোমদেব। মনে পড়ে গেল, চাকারিয়ার নবাবের সঙ্গে কী একটা গোলমাল হয়েছে হার্মাদের, শুনেছিলেন, তাদের জাহাজ আটক করা হয়েছে, দশজনকে বন্দী করা হয়েছে কয়েদখানায়। তা ছাড়া আর একটু আগেই যেন দূর থেকে বন্দুকের শব্দের মতো কী একটা শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি।

তবে তাই। বন্দী হার্মাদের একজন। পালিয়ে এসেছে। হঠাৎ একটা প্রসন্ন হাসিতে ভরে গেল সোমদেবের মুখ। কানের কাছে মহাকালীর আদেশ বেজে উঠছে তাঁর। চাই পুজো—চাই বলি!

চত্বর থেকে নেমে এলেন সোমদেব। প্রদীপের আলোয় তাঁর রক্তাক্ত চোখ আর সাপের মতো ফণাধরা চুলের দিকে তাকিয়ে একবার যেন পিছিয়ে যেতে চাইল গঙ্গালো ; কিন্তু তার আগেই সোমদেব এগিয়ে এসে হাত ধরলেন তার।
কঠিন কর্কশ স্বরকে যথাসাধ্য কোমল করে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে এস।

নয়

"Ela penteia a cabelo"—

এ কোন্ মোহ ? এ কি সর্বনাশা আকর্ষণ ?

কোথা থেকে এ কী হয়ে গেল শঙ্খদত্তের ? দক্ষিণ পাটনে যাওয়ার পথে তীর্থদর্শনে এসে এ কোন্ ভয়ংকর দুর্বলতা তাকে জড়িয়ে ধরল নাগপাশের মতো ? দেবতার পায়ে নিবেদিত—আকাশের তারার মতো সুদূর অ-ধরা দেবদাসীর প্রতি এ কোন্ মুগ্ধতা তার রক্তের মধ্যে ছড়াচ্ছে তীব্র বিষক্রিয়া ?

রূপ ? রূপ সে তো অনেক দেখেছে। সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণীর ভাগ্যবান বণিকদের ঘরে অসংখ্য রূপবতীর উজ্জ্বল মুখ ফুটে আছে ফুলের মতো। শ্রেষ্ঠী ধনদত্তের সে একমাত্র বংশধর—কত মুগ্ধ কালো চোখ জানালার মধ্য দিয়ে তার দিকে অনিমেষ হয়ে তাকিয়ে থেকেছে সে তা জানে।…শঙ্খদত্ত ফিরেও চায়নি। তার পৌরুষের উদ্দেশে সমর্পিত অর্ঘ্য সে গ্রহণ করেছে দেবতার মতো—নিয়েছে নিজের প্রাপ্য হিসেবে ; কোনো দিন কিছু যে ফিরে দিতে হবে এমন কথা কখনো মনেও জাগেনি তার। না—রূপ নয় ! সপ্ত-গ্রামের অনেক কুমারীই লাবণ্যে-সুষমায় শম্পার চাইতে শ্রেষ্ঠ।

তবে কি নগ্ন নারী ? তাও নয়। কত উদ্দাম বসন্ত-উৎসবের দিন প্রত্যক্ষ করেছে সে। সারাদিন আবীর-কুঙ্কুমের খেলায় কেটে গেছে, তারপর সন্ধ্যা হলে পূর্ণিমার চাঁদ ঝলমল করেছে জলে। শ্রেষ্ঠীদের নৃত্যশালায় শুরু হয়েছে বাসন্তী-পূর্ণিমার উৎসব। হাজার ডালের ঝাড়-বাতি জ্বলে উঠেছে—মাধ্বীর গন্ধে মদির হয়েছে বাতাস, নেশায় রাঙানো চোখগুলো ভারী হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। আর সেই নেশা-জড়ানো রাত্রিতে বেজেছে নর্তকীর পায়ের নূপুর ; মন্দিরের গায়ে গায়ে খোদাই-করা মূর্তিগুলির মতো নগ্ন সুন্দরীরা লাস্যের বিভ্রম জাগিয়েছে প্রত্যেকটি দেহ-ভঙ্গিমায়। উৎসবের আসরের ওপর দিয়ে তাদের সেই দেহকান্তি এক একখানি ধারালো ঘুমন্ত তলোয়ারের মতো আবর্তিত হয়ে গেছে।

একটি শ্বেতপদ্ম। নাচের ভঙ্গি তো নয় ! প্রতিটি মুদ্রার মুদ্রায়, প্রতিটি অঙ্গ-বিক্ষেপে কী আশ্চর্য করুণতা ! শরতের পদ্মের ওপর যেন শীতের শিশির ঝরছে। শঙ্খদত্তের মনে হয়েছে এ দেবতার প্রতি ভক্তির তন্ময়তা নয়—এ যেন আহত-প্রাণের বিষন্ন বিলাপ ! তার প্রতিটি দেহরেখা যেন নিঃশব্দ ভাষায়

বলতে চাইছে ঃ এ আমার কারাগার—এ আমার অভিশাপ ! এখান থেকে তুমি উম্ধার কর আমাকে—এই অসহ্য বন্ধন থেকে মুক্তি দাও !

কিন্তু কে শঙ্খদত্ত ? কেমন করেই বা সে মুক্তি দেবে ? একটি শ্বেতপদ্মকে জড়িয়ে রয়েছে উদ্যত-ফণা কালনাগ, রাজা স্বয়ং তাকে অনুগ্রহ করেন, তার দ্বারপ্রান্তে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত দাঁড়িয়ে রয়েছেন রুদ্রপাণি কালভৈরবের মতো। রাঢ় দেশের একজন শ্রেষ্ঠী কেমন করে সেই সাপের মাথা থেকে মণি খুলে নেবে—কেমন করে অতিক্রম করবে সেই বজ্রব্যূহ !

স্তুতা !

ওই শব্দটাকে তো কোনোমতেই সে ভুলতে পারছে না। মানুষের ঘর যে আলো করতে পারত—মন্দিরের কঠিন পাথরে একটি একটি করে পাপড়ি তার ঝরে যাচ্ছে চূড়ান্ত অবহেলার মধ্যে ; মানুষের প্রেমে যে পরিপূর্ণ হতে পারত—নিষ্ঠুর হাত বাড়িয়ে দেবতা ছিনিয়ে নিয়েছে তাকে।

—রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়াও ! এমন করে দাঁড়িয়ে আছ কেন পথ জুড়ে ?

একজন পথিক ধমকে উঠল। সংকুচিত হয়ে শঙ্খদত্ত সরে গেল একপাশে।

দাঁড়িয়েই সে আছে বটে। সামনে একটি বিরাট প্রাসাদ। তার সিংহদ্বারের ভেতর দিয়ে সেই শোভাযাত্রা ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে অদৃশ্য হয়েছে রাত্রির সেই শ্বেতপদ্ম, আর দিনের সেই নীলাঞ্জলা অপরাজিতা। ভেতর থেকে আসছে মানুষের কোলাহল—উৎসবের মুখরতা ; মাঝে মাঝে সেই কোলাহল ছাপিয়ে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে বাঁশির সুরে সুরে বিহ্বল মদিরতা ; উঠছে মৃদঙ্গের গুরু গুরু ধ্বনি, তার সঙ্গে মিলিত নারীকণ্ঠের গানের গুঞ্জন। যেন এক ঝাঁক মধুমত্ত মৌমাছি উড়ছে।

ওখানে শঙ্খদত্তের প্রবেশ নিষেধ।

—সর—সর—সরে যাও—

—আসাসোঁটাধারী একদল মানুষ আসছে এগিয়ে। স্পষ্টই বোঝা যায়—রাজার সৈন্য। শঙ্খদত্ত তাকিয়ে দেখল, একটি বিশাল হাতী আসছে তাদের পেছনে। পতাকা উড়ছে, হাতীর হাওদায় সোনা-রুপোর দীপ্তি ঝলমল করছে সূর্যের আলোয়। তার ওপরে জরিদার এক বিরাট মখমলের ছাতা।

রাজা আসছেন।

বাড়িটার সামনে শুধু শঙ্খদত্তই নয়—একপাল ভিখারীও আশায় আশায় অপেক্ষা করছিল। তাদের লক্ষ্য রূপের দিকে নয়—তাদের প্রয়োজন অত্যন্ত স্থূল। ভাগ্যবানের উৎসব-বাড়িতে নিশ্চয় কিছু দান-ধ্যান হবে—কিছু খাদ্যও হয়তো বিতরণ করা হবে এই শুভ উপলক্ষ্যে। লুব্ধ চোখ মেলে তাকিয়ে ছিল তারা।

রাজার সৈন্য আর হাতীর আবির্ভাবে দু দিকে সভয়ে ছিটকে গেল তারা। একজনের গায়ের ধাক্কা লেগে অপ্রস্তুত শঙ্খদত্ত হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। যখন উঠে দাঁড়াল, তখন হাঁটুর কাছটায় ছড়ে গেছে অনেকখানি—দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পড়ছে।

শম্পা!

কত দূরের সে—কত দুর্লভ—এই রূঢ় আঘাতে যেন সে প্রথম উপলব্ধি করল সেই কঠিন সত্যটাকে। সামনের সিংহদ্বারটা শব্দ করে খুলে গেল। মাথা নত করে দু ধারে এসে দাঁড়ালেন অনেকগুলি সুসজ্জিত মানুষ—আজকের ভাগ্যবান গৃহস্বামী স্বয়ং রাজাকে অতিথিরূপে পেয়েছেন তাঁর বাড়িতে। গলায় সোনার ঘণ্টার ধ্বনি তুলে—দামী হাওদার ঝলকে চারদিক চকিত করে দিয়ে—বিরাট মখমলের ছাতার বিপুল গৌরব ঘোষণা করে রাজার হাতী প্রবেশ করল ভেতরে। ভয়াতুর ভিখারীদের সঙ্গে দুর্ভাগা শঙ্খদত্তও সেদিকে তাকিয়ে রইল রবাহূতের মতো।

এখন ওখানে হয়তো আবার নতুন করে নাচ শুরু হবে শম্পার, রাজ-অতিথির সম্মানে নতুন সুর বাজবে বাঁশিতে, নতুন তালে গুরু গুরু করে উঠবে মৃদঙ্গ। নতুন মুদ্রায়, নতুন দেহছন্দে দেবদাসী দেবতার প্রতিনিধি রাজাকে জানালে তার বন্দনা।

এর মাঝখানে সে কোথায়?

মুখে একটা লবণাক্ত স্বাদ। দাঁতের গোড়া দিয়ে বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়ছে। ছড়ে-যাওয়া হাঁটুটায় একটা তীক্ষ্ণ জ্বালার চমক। নিরুপায় ক্ষোভে একবার ঠোঁট কামড়ালে শঙ্খদত্ত—তারপর ফিরে চলল।

উদ্ধব পাণ্ডা কিছু কি অনুমান করেছিল? বোঝা গেল না।

—শেঠ আর কতদিন থাকবেন পুরীধামে?

শঙ্খদত্ত একবার চকিত চোখ তুলল। কিছু একটা অনুমান করতে চাইল উদ্ধবের অভিব্যক্তিতে।

—আরো দিন কয়েক।

উদ্ধব মৃদু হাসল ঃ ভালই তো। দেবস্থান—যে কদিন থাকবেন, সে কদিনই পুণ্যলাভ হবে। তা হলে কার ভোগ আনাব আজ? জগন্নাথের, না বলভদ্রের?

—যার খুশি।

উদ্ধব একটু চুপ করে রইল ঃ আপনার কি এখানে কোনো বাণিজ্যের কাজ আছে?

—হাঁ। কিছু পাথরের জিনিস, ঝিনুকের মালা আর কড়ি নিতে হবে। তা ছাড়া হরিণের চামড়াও কিনব ভাবছি।

—তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।—উদ্ধব সরে গেল।

ঠিক কথা। পাথরের জিনিস—ঝিনুকের মালা। শঙ্খদত্তের মনে পড়ে গেল। এ কোন্ পাগলের মতো একটা অর্থহীন মন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে? নিজের কাজকর্ম সব পড়ে আছে—সেগুলো এর মধ্যেই সেরে নেওয়া উচিত ছিল। তা ছাড়া সামনে দুস্তর দক্ষিণ-পার্টনের পথ—সিংহল এখনো কত দূরে! মাঝখানে নিতল কালো মৃত্যুর মতো সমুদ্র। এভাবে কি এখানে পড়ে থাকা চলে!

সারা শরীরে মনে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে শঙ্খদত্ত উঠে দাঁড়াতে চাইল। ঠোঁটের কোণা এখনো একটুখানি ফুলে রয়েছে—হাঁটুতে যন্ত্রণার চমক দিচ্ছে থেকে থেকে। এই আঘাত—এই লাঞ্ছনা—এ যেন তারই ভবিষ্যতের প্রতীক। আর নয়—আর নয়। দক্ষিণের অসংখ্য মন্দিরে এ-রকম সংখ্যাতীত দেবদাসী আছে; তাদের সকলের জন্যে দুর্ভাবনার ভার বইতে পারে—এমন শক্তি তার নেই।

দক্ষিণ পাটন। গোলাম আলি। আর—আর সোমদেব।

আকস্মিক ভয়ের আঘাতে রোমাঞ্চিত হয়ে শঙ্খদত্ত উঠে দাঁড়াল। এ দুঃস্বপ্ন তার দূর হোক—এই মোহ ছিন্ন হোক তার।

এক ঝলক হাওয়া এল তার ঘরে। শীতল, লবণাক্ত হাওয়া। সমুদ্রের ডাক। পাটনের হাতছানি। দূর-দূরান্ত যার জন্যে প্রসারিত হয়ে আছে—তাকে এভাবে এক জায়গায় নোঙর ফেলে থাকলে চলবে না।—কাল—কালই যাত্রা শুরু করতে হবে তাকে।

কিন্তু!—

শঙ্খদত্ত ঝিনুকের মালা কিনছিল। সারাটা বেলা কেটে গেল ব্যস্ততার মধ্যে। সবচেয়ে আনন্দের কথা, এই ব্যস্ততার তাড়ায় আর একবারও শম্পার কথা তাকে পীড়া দেয়নি। আস্তে আস্তে তার ব্যাধিটা সেরে আসছে, সে স্বাভাবিক হয়ে উঠছে—এই-ই তার প্রমাণ।

কিন্তু!

—ওই যে বাড়িটা দেখছ না? ওই যে মাথার ওপরে কবুতরের ছোট ঘরটি ওই বাড়িতেই শম্পা থাকে।

শম্পা! যেন পেছন থেকে একটা ছুরির ঘা লাগল শঙ্খদত্তের। ফিরে তাকাল তৎক্ষণাৎ।

নিতান্তই সাধারণ মানুষ। রাজার হাতী আর মন্দিরের সেরা নর্তকীর মধ্যে যাদের কৌতূহলে কিছুমাত্রও তারতম্য ঘটে না কখনো। জ্বলন্ত চোখ মেলে সে চেয়ে রইল তাদের দিকে।

—হাঁ, ওইটেই শম্পার বাড়ি!—একজন সাধারণ মানুষ আর একজনকে বলে চলল।

—কে শম্পা?—মূঢ় দ্বিতীয় জনের জিজ্ঞাসা। অসীম হিংসায় শঙ্খদত্তের ইচ্ছে হল, লোকটাকে সে প্রবলভাবে একটা আঘাত করে বসে।

—শম্পাকে চেনো না? মন্দিরের প্রধান দেবদাসী। রূপে যৌবনে তার তুলনা নেই।

দ্বিতীয় জন এবার নির্বোধের মতো রসিকতা করে বলল: সে কি হে! তোমার নিজের স্ত্রীর চাইতেও? বাড়িতে গিয়ে কথাটা যেন আর দ্বিতীয় বার উচ্চারণ কোরো না।

—কেন, ভয় কিসের?

দ্বিতীয় জন অল্প অল্প হাসল ঃ একবার বলে দেখলেই বুঝতে পারবে।

অসহ্য। শঙ্খদত্ত আর দাঁড়াল না। চকিতে অদৃশ্য দুর্নিবার টান পড়েছে নাড়ীতে। সারা দিন যাকে সে অবদমনের মধ্যে চেপে রেখেছিল—দ্বিগুণ বেগে মুক্তি পেয়েছে সে।

—কী হল বণিক? নেবেন না জিনিসগুলো?—দোকানদার বিস্মিত প্রশ্ন করল।

—আসছি—

শঙ্খদত্ত দ্রুত পা চালাল। আর সে থাকতে পারছে না! যা চেয়েছে তা পেয়েছে। ওই বাড়িটা!—যার মাথার ওপরে কবুতরের ছোট ঘরটি! ডাইনির দৃষ্টি। দুর্বার আকর্ষণ।

বেলা পড়ে এসেছে। চারদিকে শীত-সন্ধ্যার পাণ্ডুর ছায়া। নেশাগ্রস্ত পায়ে হাঁটতে লাগল শঙ্খদত্ত। এই তো বাড়ি! এখানেই শম্পা থাকে!

পিতলের মোটা মোটা কীলক-বসানো দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। নৃত্যগুরু এবং প্রধান পুরোহিত ছাড়া আর কারো ঢোকবার অধিকার নেই এখানে।

শঙ্খদত্ত বাড়িটার চারদিকে ঘুরতে লাগল আচ্ছন্নের মতো। তারপর পেছন দিকে—যেখানে দুটি উঁচু দেওয়ালের মাঝখানে একটুখানি ফাঁকা জায়গা—সেইখানে গিয়ে সে দাঁড়াল। চোখ মেলে তাকাল ওপর দিকে। আশ্চর্য! এও কি সম্ভব! এতখানি আশা কি স্বপ্নেও করেছিল?

ওপরে জানালায় বসে যে মেয়েটি চুল বাঁধছিল—সে শম্পাই! না—আর কেউ হতেই পারে না! তার পরনে এখন বাসন্তী রঙের শাড়ি— দেহের কনকচাঁপা রঙের সঙ্গে সে শাড়ি যেন একাকার হয়ে মিশে গেছে। তার মুখের ওপর বেলাশেষের রক্ত-রৌদ্র পড়েছে—যেন নিশীথ-মন্দিরের সেই আশ্চর্য প্রদীপের আলো। রাশি রাশি কালো সাপের মতো বিসর্পিল অজস্র চুল তার চাঁপার কলির মতো আঙুলগুলির মধ্যে খেলা করছে।

শঙ্খদত্ত সম্মোহিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল সেখানে।

মেয়েটি কি দেখতে পেল তাকে? একবারও কি তার মুখের ওপর দুটি অতল চোখের দৃষ্টি এসে পড়ল? শঙ্খদত্ত বুঝতে পারল না। একটা গভীর ঘুমের মধ্যে সময় কেটে চলল—আলো নিভল, নামল অন্ধকার। শঙ্খদত্ত ভাল করে জানতেও পারল না—কখন চুল বাঁধা শেষ হয়ে গেছে মেয়েটির—কখন বন্ধ হয়ে গেছে জানালাটা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে যাবে, এমন সময় ঘটল পরমতম আশ্চর্য ব্যাপার।

সামনের প্রাচীরের গায়ে একটি ছোট দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল। দেখা দিল একটি তরুণী। চাপা গলায় ডাকল, শেঠ!

শঙ্খদত্তের সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল থরথরিয়ে।

মেয়েটি ঠোঁটে আঙুল দিলে ঃ কোনো কথা বলবেন না। আপনি আমার সঙ্গে ভেতরে আসুন। দেবদাসী শম্পা আপনার দর্শন প্রার্থনা করে।

শঙ্খদত্ত অস্বচ্ছ ঘোলাটে চোখ মেলে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। পার হয়ে গেল কয়েকটা অসাড় নিশ্চেতন মুহূর্ত। সমস্ত ব্যাপারটা কি স্বপ্নের মধ্যে ঘটে চলেছে? অথবা এমন স্বপ্নও কি সম্ভব? স্বপ্নেরও একটা সীমা আছে—সেই সীমা ছাড়িয়ে যেখানে পৌঁছনো যায়—একমাত্র বাতুলতাই তার নাম।

এ উদ্ধব পাণ্ডার বাড়ি নয়। মধূক রসের নেশায় সে অভ্যস্ত নয়—পৈষ্টীও না। এই বেলাশেষের আলোয়—এই শীত-তীক্ষ্ণ বাতাসে, শ্যাওলাধরা একটা অতিকায় প্রাচীরের পাশে সে ঘুমের ঘোরেই পথ হেঁটে আসেনি! প্রায় নিঃশব্দে সামনের যে ছোট দরজাটি খুলে গেছে আর একটি তরুণী মেয়ে যেন শূন্য থেকে আবির্ভূত হয়েছে সেখানে—এও তো মরীচিকা বলে বোধ হচ্ছে না!

মেয়েটি আবার কথা বললে। মৃদু হাওয়ায় ফুলের পাপড়ি যেমন নড়ে—তেমনি শিথিলভাবে অল্প একটু নড়ল ঠোঁট দুটি।

—শেঠ, শুনতে পাচ্ছেন না? দেবদাসী শম্পা আপনার পদধূলি চাইছে।

রুদ্ধ কণ্ঠনালীর ভেতরে এতক্ষণে কথার আবেগ স্ফুরিত হয়ে আসতে চাইল। একটা অস্ফুট শব্দ করল শঙ্খদত্ত।

মেয়েটি আবার সতর্কতার একটা আঙুল তুলল ঠোঁটের ওপরে।

—কোনো শব্দ করবেন না। ভেতরে চলে আসুন।

পুতুল নাচের খেলনার সুতোয় টান পড়ল। শরীরে নয়—তার বুকের শিরাগ্রন্থিতে। চোরাবালির ওপরে পা পড়লে যেমন হয়—তেমনি ভাবেই বুঝি তরল হয়ে গেল মাটিটা। যেন জলের ওপর দিয়ে হেঁটে চলল শঙ্খদত্ত—প্রত্যেকটি পদক্ষেপ এক একটা ঢেউ লেগে টলে টলে যেতে লাগল তার।

যেমন নিঃশব্দে খুলেছিল, তেমনি নীরবেই বন্ধ হয়ে গেল পেছনের দরজাটি। একটা পাথর-বাঁধানো প্রশস্ত অঙ্গন পার হয়ে—একটি ঊর্ধ্বগামী সিঁড়ি আশ্রয় করে মহাশূন্যে উঠতে উঠতে অবশেষে একটি দীর্ঘ বারান্দায় পৌঁছে যেন খানিকটা স্বাভাবিক হল শঙ্খদত্ত। মনের অসাড় অবস্থাটা পার হয়ে গেছে—বুকের ভেতরে শুরু হয়েছে ঝড়ের পালা। রক্তে সমুদ্র দুলছে এখন। যে মেয়েটি পথ দেখিয়ে এনেছিল, আর একটি বড় দরজার সামনে এসে সে থেমে দাঁড়াল। সমুদ্র-নীল রেশমী পর্দাটি লঘু হাতে সরিয়ে দিয়ে বললে, শেঠ, ভেতরে যান।

—ভেতরে?—রক্তে যে সমুদ্র দুলছিল এবার সে মাথার মধ্যে ভেঙে পড়ল। সংশয়ক্লান্ত ক্ষীণ গলায় শঙ্খদত্ত বললে, না, থাক।

রক্তপ্রবাল রেখার মতো পাতলা ঠোঁট দুটি অল্প একটু বিকশিত হল মেয়েটির। কৌতুকে চকচক করে উঠল চোখ।

—বাইরের দরজায় তো ভিখারীর মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন, পাওয়ার সময় যখন হল তখনই ভয়?

—না, ভয় নয়। শঙ্খদত্ত উদ্‌ভ্রান্ত গলায় বললে, আমি বরং ফিরেই যাই।

—তা হলে আগেই যাওয়া উচিত ছিল।—মেয়েটি হাসল ঃ বাড়ির ভেতরে যখন ঢুকেছেন, তখন আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত চলে যাওয়ার পথ নেই। ভেতরে যান শেঠ, ভয় নেই। দেবদাসী শম্পাকে লোকে আর যা খুশি ভাবতে পারে, কিন্তু তাকে কখনো কারুর বাঘ ভালুক বলে মনে হয়নি।

বাঘ-ভালুক নয়। তার চাইতেও ভয়ঙ্কর। দেবতার ফুল। তার দিকে মানুষের চোখ পড়লে দেবতার ক্রোধ অগ্নি-শলাকার মতো অন্ধ করে দেবে চোখকে।

সমুদ্র-সুনীল রেশমী পর্দাটিকে আরো একটু ফাঁকা করে ধরল মেয়েটি।

যা হওয়ার হোক। শঙ্খদত্ত যেন পাহাড়ের চূড়ো থেকে নিচের শূন্যতায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

প্রথমে কয়েক লহমা কিছুই চোখে পড়ল না তার। একরাশ সুগন্ধির ঘূর্ণির ভেতরে যেন তলিয়ে গেল সে। ধূপের গন্ধ—ফুলের গন্ধ। নিশীথ-রাত্রিতে রহস্যময় মন্দিরের সেই আশ্চর্য পরিবেশ যেন আবার ফিরে এসেছে তার কাছে। একটি শব্দও যেখানে উচ্চারণ করা যায় না—একটি নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলা যায় না—শুধু বিমূঢ় বিস্ময় বয়ে কোনো অভাবনীয়ের জন্যে প্রতীক্ষা করতে হয়।

—নমস্কার, আসুন।

স্বর নয়—সুর। সুগন্ধি ধূপের আড়ালটা সরে গেছে একটু একটু করে। রুপো দিয়ে গড়া একটি সাপের প্রসারিত ফণার ওপরে মণির মতো প্রদীপ জ্বলছে; জালিকাটা শ্বেত-পাথরের ধূপাধার থেকে ঝলকে ঝলকে উঠে আসছে সুরভির কুয়াশা; দারুব্রহ্মের একখানি পটচিত্রের ওপরে শুভ্র একছড়া মালা দুলছে। রক্তরঙের শাড়ি আর নীল কাঁচুলির আবরণে, বুকের ওপর দুটি নিবিড় কালো বেণী দুলিয়ে দেবদাসী শম্পা দাঁড়িয়ে।

—বসুন, শেঠ।

পাশেই চন্দনকাঠের চিত্রকরা একটি চৌকি। যন্ত্রের মতো শঙ্খদত্ত তার ওপরে বসে পড়ল। বসতে না পারলে মাথা ঘুরেই পড়ে যেত হয়তো।

কিন্তু লাল শাড়ি, নীল কাঁচুলি, আর দুটি কালো বেণীর দিকে শঙ্খদত্ত আর চোখ তুলে চাইতে পারল না। এ সে করেছে কী? এ কোথায় এসে দাঁড়াল? হীরার বিষের মতো যে জ্বালা এতক্ষণ তার স্নায়ুতে জ্বলছিল—যে নেশার উগ্রতা কীটের মতো কেটে কেটে খাচ্ছিল তার মস্তিষ্ক—এই মুহূর্তে তাদের এতটুকু অস্তিত্বও আর অনুভব করছে না শঙ্খদত্ত। চক্ষের পলকে যেন মুক্তিস্নান হয়ে গেছে তার। আত্মহত্যা করার ঝোঁকে একটা মানুষ যেমন একটু একটু করে তার ছুরিতে শান দেয়, তারপর তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল ফলাটাকে নিজের বুকে বসিয়ে দেবার আগে যেমন হঠাৎ জীবনের মূল্যটা ধরা পড়ে তার কাছে—ঠিক তেমনি একটা চমক বিদ্যুতের মতো খেলে গেল শঙ্খদত্তের শরীরে। রাজার হাতীর সামনে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েছিল সে—অনুভব করেছিল দেবদাসী শম্পা কত দূরের তারা

—কোন্ অ-ধরা দিগন্তের ইন্দ্রধনু। কাছে এসে মনে হল —সামনে সে এক ছায়ামূর্তিকে দেখতে পাচ্ছে। ইন্দ্রধনু নয়—ইন্দ্রজাল। হয়তো চোখ তুলে চাইলেই শঙ্খদত্ত দেখবে শম্পা নেই—এই প্রাসাদ নেই, কোথাও কিছুই নেই। শুধু একটা ঘন-অন্ধকার নিবিড় অরণ্যের ভেতরে অন্ধের মতো দাঁড়িয়ে আছে সে।

অবিশ্বাস্য কয়েকটা নীরব মুহূর্ত। সুরভিত কুহেলিকার মতো ধূপের গন্ধ ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরময়। দুধরাজ সাপের ফণার ওপর মণির মতো রূপালি আধারে দীপ জ্বলছে। মায়ামূর্তিটা স্থির দাঁড়িয়ে আছে—যে-কোনো সময় ধূপের ধোঁয়ার ভেতর নিঃশেষ হয়ে মিলিয়ে যেতে পারে।

—শেঠ কোন্ দেশের মানুষ?

মায়াময়ীর গলায় বাস্তব প্রশ্ন।

এবারে শঙ্খদত্ত চোখ তুলল। অপরূপ রূপবতী দেবদাসীর দিকে তাকিয়ে রইল অপলক চোখে। শ্বেত পদ্ম? অপরাজিতা? না, রক্তজবা?

আর একটি চৌকি টেনে আসন নিলে শম্পা। স্বপ্নসম্ভবা ক্রমশ ধরা দিচ্ছে বাস্তবের বৃত্তরেখায়। লাল শাড়ির সীমান্তে যেখানে দুটি নৃত্য-চঞ্চল পায়ের পাতা আপাতত স্তব্ধ হয়ে আছে, তারই দিকে দৃষ্টি নামিয়ে এই প্রথম সহজ গলায় সে উত্তর দিতে পারল।

—আমি গৌড় দেশের বণিক। আমার বাড়ি সপ্তগ্রাম।

—আপনার চেহারা দেখেই তা বুঝতে পেরেছিলাম। তা ছাড়া বেশ-বাস, কানের বীরবৌলি।—শম্পার স্বরে তেমনি সুর ঝরে পড়তে লাগল: এখন তো বাণিজ্য বায়ু বইছে। আপনি কি তীর্থদর্শনে এসেছেন, না বাণিজ্যের জন্যে বেরিয়ে পড়েছেন?

—আমি বাণিজ্যে চলেছি। যাব সিংহলে।

—কী আনতে যাচ্ছেন বণিক?

আশ্চর্য, এই কি আলোচনার ধারা? এই ধরনের বৈষয়িক আলাপ শোনবার জন্যেই কি তাকে ডেকে এনেছে মেয়েটা? স্নায়ুর ওপরে অসহ্য চাপ পড়া কতগুলো ভয়ঙ্কর অদ্ভুত মুহূর্ত কি সে কাটিয়েছে এরই জন্যে? এ কোন্ কৌতুক? এর উদ্দেশ্যই বা কী?

শঙ্খদত্ত বললে—মুক্তা আনতে যাব সিংহলে। আর আনব কর্পূর। হাতীর দাঁত।

চৌকির ওপরে শম্পা নড়ে বসল একবার। বাম দিক থেকে সরে গেল শাড়ির আঁচল—নীল পর্বতচূড়া দেখা দিল রক্তমেঘের আড়াল থেকে। পর্বতের পাশে সোনালি ঝর্ণার মতো ঝলকে উঠল মণিহার।

একটা আশ্চর্য হাসি ফুটে উঠল শম্পার ঠোঁটে। স্বপ্ন-কল্পনার অতলে হারিয়ে গিয়ে যে-হাসিকে রূপায়িত করে তুলতে চায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী; যে সুতনুকার হাসির ধ্যানে কল্পান্ত তন্ময় হয়ে থাকে রূপদক্ষ দেবদত্তের দল।

—পট্টবস্ত্রের বিনিময়ে শ্রেষ্ঠী সিংহল থেকে নিয়ে আসবেন চাঁদের টুকরোর

মতো এক একটি অতুলনীয় মুক্তো ; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর দৃষ্টি কোন্ ঝুটা মুক্তোর ওপর ? আর যে ঝুটা মুক্তোর চারদিকে তিমি আর হাঙর পাহারা দিচ্ছে—শেঠকে যা আয়ত্ত করতে হবে জীবনের বিনিময়ে ?

নীল পাহাড়ের কোলে যে সোনালি ঝর্ণায় শঙ্খদত্তের মন ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিল, তড়িৎগতিতে তা ফিরে এল সেখান থেকে। পাহাড়ের চূড়োয় একটি ঘন কালো বেণী ফণা তুলল কাল-অজগরের মতো।

—আমি—

শঙ্খদত্ত কথাটা শুরু করল মাত্র, শেষ করতে পারল না। জানালা দিয়ে হাওয়া এল খানিকটা। মণির নিষ্কম্প শিখাটা দুলে উঠল—জলের ওপর কাঁপতে থাকা জ্যোৎস্নার মতো একটা অলৌকিক আভা দুলল শম্পার চোখে-মুখে।

—অনেক সমুদ্র পাড়ি দিয়েছেন আপনি। অনেক বাণিজ্য করেছেন। আজ আপনার এ-ভুল করা উচিত ছিল না।

—ভুল কেন ?—যে-নিবিড় অন্ধকার অরণ্য থেকে কাল-অজগর নেমে এসেছে, যার প্রান্তরেখায় জ্বলছে সন্ধ্যা-তারার মতো কুঙ্কুম-কণা, তারই ভেতরে যেন নিরুপায় ভাবে হারিয়ে যেতে লাগল শঙ্খদত্ত, প্রশ্ন করলে নিতান্ত অর্বাচীনের মতো ঃ কিসের ভুল ?

আবার সেই হাসি ফুটল শম্পার মুখে। সেই আশ্চর্য হাসি—যার কল্পনায় তুলিতে স্বপ্নের রঙ মিলিয়ে প্রলেপ টেনেছে ধীমান—যাকে প্রকাশ করবার পথ না পেয়ে অন্ধকার পাহাড়ে প্রেতাত্মার মতো রাত্রি জাগরণ করে বেড়িয়েছে শিল্পী বীতপাল !

শম্পা বললে, তা হলে আর একটু স্পষ্ট ভাষায় জানাতে হল। আজ যে প্রাচীরের পাশে এসে আপনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, আসলে ওটা একটা মৃত্যুর ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

—মৃত্যুর ফাঁদ ?—শঙ্খদত্তের চোখ চকিত হয়ে উঠল। শম্পার মুখের কোনো অংশই যেন সে দেখতে পাচ্ছে না এখন। শুধু রাত্রির অরণ্যের প্রান্ত থেকে সন্ধ্যাতারাটি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে ; যেন তারই একটি আলোকরেখাকে আশ্রয় করে নেমে আসছে শম্পার স্বর। আকাশ থেকে—মৃত্যুর ওপার থেকে। তার স্বরে যেন কোথাও কোনো ধ্বনি নেই ; একটা সূচিসূক্ষ্ম আলোকরেখা হয়ে তা তার মস্তিষ্কের কোষগুলিকে বিদ্ধ করে চলেছে !

—শ্রেষ্ঠী কি জানেন না—এই নগরে প্রাচীরের পাশের ওই নির্জন জায়গাটিই সব চাইতে ভয়ঙ্কর ? ওখানে একটি দুটি নয়,—শত শত মৃত-আত্মার দীর্ঘশ্বাস আর অভিসম্পাত মিশে রয়েছে ? না জেনে আপনি প্রেতপুরীতে পা দিয়েছেন শ্রেষ্ঠী—আত্মিকেরা আপনার হাত ধরে মৃত্যুর মধ্যে আকর্ষণ করে নিয়ে যাবে।

সন্ধ্যাতারাও আর দেখা যাচ্ছে না। শুধু কালো অরণ্য। শুধু মৃত্যু-

লোকের ইঙ্গিত। আর একবার প্রদীপের শিখাটা দুলে উঠল—ডান দিকের বেণীটা দুলে উঠল এইবার—ঘুম ভেঙে জাগল আর একটা কাল-অজগর।

শম্পার স্বর তেমনি সূচিমুখ আলোকের মতো এসে বিঁধছে মস্তিষ্কের কোষে কোষে; কিন্তু সূচি নয়—সূচিকাভরণ। বিন্দু বিন্দু সাপের বিষ ক্ষরিত হচ্ছে তা থেকে—একটু একটু করে ছড়িয়ে যাচ্ছে রক্তের ভেতরে।

শম্পা বলে চলল, শুধু আজই নয়। এক বছর, দু বছর, দশ বছরও নয়। কতকাল থেকে কে জানে—মন্দিরের প্রধান দেবদাসী দিন কাটিয়ে গেছে এই প্রাসাদে। এই জানালায় বসে সে চুল বেঁধেছে, এই নাগ-প্রদীপে আলো হয়েছে তার ঘর—এরই মর্মর-বিস্তারের ওপর মৃদঙ্গের গুরু গুরু তালের সঙ্গে আর বীণার ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে সে নাচের পা ফেলেছে। তাকে দেখে কত মানুষ লোভে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আলেয়ার ডাক শুনে ছুটে এসেছে এখানে—দাঁড়িয়েছে এই প্রাচীরের পাশে, দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। তারপর যথাসময়ে রাজার প্রহরী এসে শিকলে বেঁধেছে তাকে। দেবতার দাসীর প্রতি পাপদৃষ্টি ফেলবার অপরাধে বিচার হয়েছে তার—কুঠারের ঘায়ে তার ছিন্নমুণ্ড গড়িয়ে গেছে মাটিতে। শেঠ, আপনি যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, ওটা সেই শ্মশান। ওখানে সেই সব অতৃপ্ত প্রেতের আনাগোনা। তাদের সেই বিভীষিকার আতঙ্কে এই নগরের সাধারণ মানুষ দিনের আলোয় পর্যন্ত কখনো ওখানে আসে না।

শঙ্খদত্ত তাকিয়ে রইল। পাহাড়ের পাশে রক্তমেঘে যেন অগ্নিঝড়ের পূর্বাভাস। কাল-অজগরের ফণা দুলছে সোনালি ঝর্ণার ওপরে; কিন্তু ওই পর্বতচূড়োটা কি একটা নিশ্চল সমাধি? মৃত্যুর ঘন নীল অবগুণ্ঠন টেনে দাঁড়িয়ে?

কিন্তু—কিন্তু—মন্দিরের সেই রাত! সেদিন এ-দেহে কোথাও তো মৃত্যু ছিল না! সুরে-বাঁধা সোনার বীণার মতো প্রতিটি অঙ্গে অঙ্গে সঙ্গীত জাগছিল তখন। সেই রাত!

শম্পা বললে, এই কথাটা জানিয়ে দেবার জন্যেই আপনাকে ডেকেছিলাম। গোপনেই ডাকতে হয়েছে। প্রধান পুরোহিত যদি জানতে পারেন তাহলে এর জন্যে কঠিন শাস্তি নিতে হবে আমাকে; কিন্তু তার চাইতেও বড় দায়িত্ব অজ্ঞকে সাবধান করে দেওয়া। সেই কর্তব্যই আমি করলাম।

রাত্রির শ্বেতপদ্ম—সকালের অপরাজিতা। সন্ধ্যায় সে রক্তজবা। শোণিত-ভরা খর্পরের মধ্যেই সে শোভা পায়। কত ছিন্নমুণ্ড লুটিয়ে গেছে তার পায়ের তলায়! আজ নয়—কাল নয়—কত বৎসর, কত শতাব্দী! সেই সব আত্মার শ্মশান ওই প্রাচীরের পাশে নয়—সে শ্মশান ছড়িয়ে রয়েছে এই শম্পারই সর্বদেহে। দেবদাসী-পরম্পরায় সেই সব অভিশপ্ত বৎসর আর নিরর্থক কামনাকে নিজের মধ্যে আহরণ করে নিয়েছে শম্পা। তার কালো চুলে তাদের শূন্যময় হতাশা তিমির-স্তব্ধ; সন্ধ্যাতারা কুঙ্কুম-বিন্দু তাদেরই রক্ত দিয়ে রাঙানো; তার হৃদয়ে তাদেরই উত্তুঙ্গ বাসনার বিকাশ; তার সমস্ত শরীরের

ছন্দোময় রেখায় রেখায় তারাই জড়িয়ে আছে সরীসৃপ-ভঙ্গিতে।

কিছুক্ষণ সেই শ্মশানকে প্রত্যক্ষ করল শঙ্খদত্ত। তবু সেই আলো। সেই বীণা। সুকুমার তনুতে সদ্য-ফোটা পদ্মের প্রথম বিস্ময়। নির্মল। নিষ্পাপ। সেই রাত্রি।

কোন্‌টা সত্য? কোন্‌টা মিথ্যা?

শঙ্খদত্ত হঠাৎ মাথা তুলল। চুলে নয়—কপালে নয়—কালো মুক্তোর মতো চোখের দিকে নয়—রক্ত-মেঘের দিকেও নয়। সেই চন্দন-মূর্তি।

শ্মশান নয়—মন্দিরই বটে! অনেক বলির পরে একজনের সিদ্ধিলাভ।

নিজের স্তব্ধ বিমূঢ় ভাবটা আচমকা কাটিয়ে উঠল শঙ্খদত্ত।

—তারা ভীরু! তাদের সাহস ছিল না।

—কিসের সাহস? এবার বিস্ময়ের পালা শম্পার। সূক্ষ্ম ভ্রূরেখা দুটি জিজ্ঞাসায় সংকীর্ণ হয়ে এল।

—তারা শুধু প্রার্থনাই করেছে। কেড়ে নিতে পারেনি।

—কেড়ে নেবে কাকে? দেবদাসীকে?

—দেবতার দাসী নেমে আসুক স্বর্গ থেকে; কিন্তু মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার কী অধিকার দেবতার? মানুষ তার ন্যায্য পাওনায় দেবতাকে ভাগ বসাতে দেবে না। প্রতিবাদ জানাবে সে।

হঠাৎ তীক্ষ্ন গলায় হেসে উঠল শম্পা। সেই হাসির শব্দে ধূপের গন্ধটা পর্যন্ত চমকে উঠল, দুধরাজ নাগের মাথার মণির মতো প্রদীপের শিখাটা দুলে উঠল চকিত হয়ে; নীল পাহাড়ের চূড়ো থেকে রক্তমেঘের আবরণটা আবার স্খলিত হয়ে পড়ল—চিক চিক করে উঠল গলার সোনার হার।

শম্পা বললে, শ্রেষ্ঠী, অত সহজ নয়। দারুব্রহ্ম নিজের হাত দুটিকে বিসর্জন দিয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর চারিদিকের সশস্ত্র বাহুর অভাব নেই। পেছনের দরজা একবারই খুলেছে—বারে বারে তা আর খুলবে না। সামনে দাঁড়িয়ে সাক্ষাৎ মৃত্যু। অন্ধের মতো সাপের গর্তে হাত ঢুকিয়ে দিলে তার একটি মাত্র পরিণামই ঘটতে পারে।

শঙ্খদত্ত এইবার—এই প্রথম তাকালো শম্পার চোখের দিকে। দুর্লভ দামী কালো মুক্তোর মতো সেই চোখ। সুতনুকার চোখের কথা ভাবতে গিয়ে এই চোখেরই তো ধ্যান করছে রূপদক্ষ দেবদত্ত; এই চোখের আলোটিকে ফোটাবার জন্যই তো ব্যর্থ ক্ষোভে রঙের পর রঙ মিশিয়েছে ধীমান; এই চোখের হাতছানিতেই তো নিশি-পাওয়ার মতো অন্ধকার পাহাড়ে পাহাড়ে অভিশপ্ত আত্মার অভীপ্সায় ঘুরে বেড়িয়েছে বীতপাল!

শঙ্খদত্ত বললে, কিছুই বলা যায় না।

শম্পা আবার তীক্ষ্ন স্বরে হেসে উঠল: গৌড়ের শ্রেষ্ঠী কি আমাকে এখান থেকে কেড়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন?—কিন্তু মাঝপথেই একটা শান্ত করুণায় তার হাসির স্বর থেমে গেল: তিনি হয়তো আজও কুমার। তাই একটা রোমাঞ্চকর কিছু করবার কল্পনা তাঁকে উত্তেজিত করে তুলেছে;

কিন্তু এসব ভাবতে যাওয়াও আত্মহত্যার সমান। শ্রেষ্ঠী রূপবান—দেখে মনে হচ্ছে ঐশ্বর্যেরও তাঁর অভাব নেই। নিজের দেশে ফিরে গিয়ে একটি সুন্দরী মেয়ের পাণিগ্রহণ করুন তিনি—এসব বিকার দেখতে দেখতেই কেটে যাবে। তা ছাড়া গৌড়দেশ তো তন্বী-শ্যামাদের জন্যে বিখ্যাত।

শঙ্খদত্ত বললে, যাদের সহজে পাওয়া যাবে তারা তো রইলই; কিন্তু যাকে পাওয়া সবচেয়ে দুষ্কর —তারই জন্যে আমি চেষ্টা করে দেখব।

—কিন্তু বাণিজ্য?

—লক্ষ্মীর আশাতেই লোক বাণিজ্য করে। তাকে পেলে আর কিছুরই দরকার নেই। না মুক্তো—না কর্পূর—না হাতীর দাঁত।

শম্পা তেমনি গভীর গলায় বললে, লক্ষ্মী নয়, আপনার ভুল হচ্ছে। এ অলক্ষ্মী—এ ঝুটা মুক্তো।

—আমি বণিক। কোন্‌টা খাঁটি আর কোন্‌টা মেকী সে আমি সহজেই চিনতে পারি।

শম্পা হঠাৎ আর্তস্বরে বললে, বণিক, আর নয়। আপনি ফিরে যান। এখনো সময় আছে। মৃত্যুকে নিয়ে খেলা করবারও সীমা আছে একটা।

—সেই সীমাটাই আমি দেখতে চাই।

—কিন্তু পেছনের ওই দরজাটা আর খুলবে না।

—দেওয়াল পার হয়েই আমি আসব।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল শম্পা। তার ঠোঁট দুটো অল্প কাঁপতে লাগল।

—বণিক, আপনি গৌড়ের মানুষ। মহাপ্রভু চৈতন্যের নাম শুনেছেন নিশ্চয়?

কোথা থেকে কোথায়! শঙ্খদত্ত চমকে উঠল অপরিমিত বিস্ময়ে। নিজের অসহ্য আবেগকে অনেকখানি সংযত করে নিয়ে বললে, একথা কেন?

—এমনিই জিজ্ঞাসা করছিলাম। যে-দেশের চৈতন্য মানুষের মন থেকে সব পাপ আর গ্লানি মুছে দিতে এসেছেন, সে-দেশের মানুষ হয়ে শ্রেষ্ঠীর কেন এই নির্লজ্জ লোভ।

শঙ্খদত্তের চোখ ক্রোধে আর অপমানে দপ দপ করে উঠল।

—কে চৈতন্য? নবদ্বীপের ওই উন্মাদটা?—সোমদেবের ভয়ংকর হিংস্র মুখ শঙ্খদত্তের চোখের সামনে ভেসে উঠল: একটা ভণ্ড, একটা বিকৃতবুদ্ধি—

দীপ্ত কণ্ঠে শম্পা বললে, আর নয় শ্রেষ্ঠী, আর আপনাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। পুরীর রাজা স্বয়ং যাঁর পায়ে মাথা নিচু করেছেন, আমার গুরু রায় রামানন্দ যাঁর সেবক, তাঁর সম্পর্কে একটি নিন্দার কথাও আর শুনতে চাই না আপনার মুখ থেকে। আপনি একটা লুব্ধ হতভাগ্য—তার বেশী কিছুই নন। এবার আপনি যেতে পারেন শ্রেষ্ঠী—

রক্তমেঘ নয়, নীল পর্বতের চূড়া নয়—একটি আশ্চর্য সুন্দরীর স্বপ্ন নেই কোথাও। একটা হিংস্র বিদ্বেষ যেন ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে সামনে।

শম্পা ঘন ঘন শ্বাস ফেলতে ফেলতে বললে, আমার গুরু আমাকে মহাপ্রভুর

সেই মন্ত্র শুনিয়েছেন। আমি জগন্নাথের মতোই শ্রদ্ধা করি তাঁকে। তাঁকে যে অপমান করে, তাঁর মুখ দেখাও পাপ। বণিক, আপনি যান—

অপমানে জর্জরিত হয়ে শঙ্খদত্ত উঠে দাঁড়াল। চৈতন্য! সোমদেব ঠিকই বুঝেছিলেন। ওই চৈতন্য—ওই বৈষ্ণবেরা সারা দেশকে মোহের ঘোরে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তাদের জালে জড়িয়ে পড়েছে দেবদাসী শম্পাও।

আচ্ছা, দেখা যাক। শাক্তের শক্তিরও পরিচয় দেবার সময় এসেছে।

শম্পাই আবার কঠিন গলায় বললে, চিত্রা, শেঠকে বাইরে রেখে এস। একটু পরেই রামানন্দ এসে পড়বেন।

* * * *

বিকৃত কামনা আর বীভৎস ক্রোধ জ্বলছে মাথায়। শুধু রাজা নয়, শুধু জগন্নাথ নয়—চৈতন্য! আর এক শত্রু!

মহাকালীকেই জাগানো দরকার। বৈষ্ণবের বিষাক্ত প্রভাব মুছে দিতে হবে দেশ থেকে। সোমদেবই ঠিক বুঝেছিলেন।

"পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল,
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল—"

শঙ্খদত্ত উৎকর্ণ হয়ে উঠল। একটা সংকীর্তনের দল আসছে। খোল-করতালের শব্দে মুখরিত হচ্ছে পথ। দলের মাঝখানে নাচতে নাচতে আসছেন একটি মানুষ। চাঁপা ফুলের মতো উজ্জ্বল স্বর্ণাভ তাঁর গায়ের রঙ, কোমরে একটি গৈরিক কটিবাস ছাড়া আর কোনো আবরণ নেই। অপূর্ব সুপুরুষ মানুষটি। মুহূর্তের জন্যে মুগ্ধ হয়ে রইল শঙ্খদত্তের দৃষ্টি।

"ন সো রমণ না হাম রমণী
দুঁহু মন মনোভাব পেষল জানি—"

একটা নিবিড় আবেগের উচ্ছ্বাসে চকিতে আকুল হয়ে উঠল মন। অদ্ভুত সঙ্গীতের সুর—অদ্ভুত এই নাচ! যেন বুকের শিরা ধরে আকর্ষণ করে। আগুনের প্রলোভনে চঞ্চল পতঙ্গের মতো ওর মধ্যে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়!

"এ সখি! সো সব প্রেমকহানী,
কানুঠামে কহবি কিছুরহ জানি—"

পথের দুপাশে মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে আছে মানুষ। দেখছে এই ভাবাবেগের লীলা।

একজন বললে, এই গান লিখেছেন বিদ্যানগরের রামানন্দ নিজেই।

—রামানন্দের দোষ কী? রাজা নিজেই তো বৈষ্ণব হয়ে বসেছেন।

—কেউ বাদ নেই। মুসলমান পর্যন্ত ছুটে এসেছে ওঁর কাছে। দলের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ না? ওই যে মাথায় খাটো, মুখে দাড়ি? ওই তো যবন হরিদাস। ওই যে ভগবান আচার্য আর স্বরূপের ঠিক মাঝখানে?

—মুসলমানকে বশ করেছে কী মন্ত্রে?

—সে ভারি মজার মন্ত্র!—আর একজনের গলায় উচ্ছ্বাস ফুটে বেরুল:

চৈতন্যদেব কী বলেন জান ? রাম নাম করলেই তো মুক্তি। মুসলমান রাতদিন কথায় কথায় বলে 'হারাম, হারাম।' রাম নাম না হোক, নামাভাস তো বটেই। তার জোরেই ওরা তরে যাবে। কী চমৎকার যুক্তি !

দু পাশে মানুষ শুধু এখন আর দর্শক মাত্র নয়, তাদের চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে ঝরছে প্রেমাশ্রু। হঠাৎ জনতার মধ্য থেকে কে যেন চিৎকার করে উঠল ঃ হরি হরি !

সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিধ্বনি উঠল হাজার হাজার গলায় ঃ হরি—হরি !

অপরূপ মানুষটি নাচতে নাচতে এবার মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

চারিদিকে চলল ভক্তদের আকুল কীর্তন ঃ

"না সো রমণ না হাম রমণী—"

শঙ্খদত্তের যেন চমক ভাঙল। ওই তবে সেই চৈতন্য ! আর তার এক প্রতিদ্বন্দ্বী। ওই গান, ওই নাচ, ওই অপূর্ব রূপ, এ শুধু ইন্দ্রজাল বিদ্যা, শুধু সম্মোহিনী শক্তি। তৎক্ষণাৎ সমস্ত মানসিক আবেগ আবার পরিণত হয়ে গেল সেই বিষাক্ত অন্তর্জ্বালায়। বিদ্যুৎগতিতে পেছন ফিরে বিপরীত দিকে চলতে শুরু করে দিল সে।

দশ

"O-sol da nesta janela de manha"

সূর্যের আলো পড়ল ঘরের জানালা দিয়ে।

ক্লান্ত অবসাদে তখনো ঘুমের মধ্যে তলিয়ে আছে গঞ্জালো। সে চোখের দিকে তাকিয়ে প্রথমটা একটা গভীর আশঙ্কায় ভরে উঠেছিল মন। মাথায় ফণাধরা জটা, আরক্তিম চোখ, কপালে মস্ত বড় চন্দনের তিলক—সব কিছু একসঙ্গে মিলে একটা অশুভ চেতনায় তাকে চকিত করে তুলেছিল। মনে হয়েছিল, এখানেও সে খুব নিরাপদ নয় —এই মানুষটির দৃষ্টিতেও যা আছে, তাকেও প্রীতির নিমন্ত্রণ বলা চলে না।

তবু !

তবু আর তো উপায় নেই। পা আর তার চলছে না—পরিশ্রমে আর আতঙ্কে ফেটে যাচ্ছে তার হৃৎপিণ্ড। একটু আশ্রয় চাই—একটু জল। বিভীষিকার মতো সেই ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ এখন আর শোনা যাচ্ছে না বটে—কিন্তু বুকের ভেতরে এখনো তাদের নিয়মিত প্রতিধ্বনি বেজে চলেছে ; বন্দুকের আওয়াজ—মানুষের আর্ত চিৎকার আর ক্রুদ্ধ অভিশাপ এখনো ঘুরপাক খাচ্ছে তার চারপাশে।

কাকা ? আ্যাফনসো ডি-মেলো ? কোথায় তিনি ? এখনও কি বেঁচে আছেন ? বুকের ভেতর থেকে করুণ কান্নার উচ্ছ্বাস ঠেলে উঠতে চাইল

তার ; কিন্তু কাঁদতে পারল না গঞ্জালো। বীর পর্তুগীজের সন্তান চোখের জল ফেলতে পারল না অপরিচিত বিদেশীদের সামনে।

—এস আমার সঙ্গে—আবার ডাকলেন সোমদেব।

ফুঁ দিয়ে প্রদীপটা তিনি নিবিয়ে দিয়েছেন—অন্ধকারে কোনো বিরাট সমাধিভূমির মতো এখন মনে হচ্ছে মন্দিরটাকে। বহু দূর-দূরান্ত থেকে ধারাবাহিক একটা রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাসের মতো আওয়াজ আসছে—জোয়ার আসছে সমুদ্রের। একটা রহস্যঘন তরঙ্গিত ভবিষ্যতের পূর্বসংকেত যেন!

গঞ্জালোর কিশোর বাহুর ওপরে বাঘের থাবার মতো একখানা কঠিন হাত—সোমদেবের। গঞ্জালো এগিয়ে চলল। পার হল একরাশ অন্ধকার আর শিশিরে ভেজা পথ। তারপর সামনে ভেসে উঠল মস্ত একখানা বাড়ি—একটা প্রকাণ্ড দরজা।

নবাবের প্রাসাদ?

একবার থমকে গেল গঞ্জালো—একবার কুঁকড়ে উঠল শরীর। না নবাবের প্রাসাদ নয়। আরো কয়েকটি বিদেশী মানুষ এসে ঘিরে দাঁড়াল তাকে। তাদের কেউ সৈনিক নয়—কোনো অস্ত্র নেই তাদের সঙ্গে। দুই চোখে তাদের পুঞ্জিত বিস্ময় আর জিজ্ঞাসা।

কিছুক্ষণ কী আলোচনা হল তাদের মধ্যে। গঞ্জালো তার একটি শব্দও বুঝতে পারল না। শুধু লোকগুলো বার বার তাকিয়ে দেখতে লাগল তার দিকে—বিস্ময় কেটে গিয়ে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল তাদের চোখে মুখে।

ভয়াল-দর্শন মানুষটি কী যেন বললেন কর্কশ কণ্ঠে। একসঙ্গে চুপ করে গেল সবাই। একটা আদেশ।

আর একজন গঞ্জালোর দিকে এগিয়ে এল। প্রৌঢ়, শান্ত চেহারার মানুষ। স্নিগ্ধ চোখের দৃষ্টি। কোনো কথা বললে না, গঞ্জালোকে তার সঙ্গে যাওয়ার জন্যে ইঙ্গিত করলে শুধু।

মনের মধ্যে খানিকটা স্বস্তিই অনুভব করলে গঞ্জালো। ওই ভয়াল-দর্শন মানুষটির চাইতে এ আলাদা। একে যেন বিশ্বাস করা চলে—অন্তত অনেকখানিই করা চলে। অনুসরণ করে চলল গঞ্জালো।

বড়লোকের বাড়ি। প্রশস্ত পাথরের অঙ্গন; দু দিকে সারি সারি আলোকিত ঘর। সামনে যারা পড়ল—তারা অভিবাদন করে সরে সরে যেতে লাগল। মনে হল—এই মানুষটি এ বাড়ির কোনো বিশিষ্ট জন—হয়তো বা গৃহস্বামী নিজেই।

তাই বটে। রাজশেখর।

গঞ্জালোকে নিয়ে রাজশেখর অগ্রসর হলেন। অস্বস্তি আর আশঙ্কায় তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অতিথিকে আশ্রয় দিতে তাঁর কার্পণ্য নেই—দৈনিক তাঁর অতিথিশালায় অনেক ক্ষুধার্তই অন্ন পায়। আসলে, গঞ্জালো নবাবের কারাগার থেকে পলাতক। খানিকক্ষণ আগে যে ঘটনাটা ঘটে গেছে—এর মধ্যেই তা কানে এসেছে তাঁর। তাই গঞ্জালোকে আশ্রয় দিতে সংকোচটা তাঁর

স্বাভাবিক।

কিন্তু না দিয়েই বা কী উপায় ছিল? একটি সুকুমার কিশোর মুখ। সে মুখে কোনো অপরাধের চিহ্নই কোথাও নেই। তা ছাড়া নবাব খোদাবক্স খাঁর রীতি-নীতিও তাঁর অজানা নয়; বিলাসী এবং অকর্মণ্য—চারদিকে ঘিরে আছে স্বার্থপর পারিষদের দল। তাঁর হাতে পড়লে এর আর নিষ্কৃতি নেই। হয় কঠিন কারাবাস, নইলে মৃত্যু।

অস্বস্তি সেখানে নয়। গুরু সোমদেবের ভাবে-ভঙ্গিতে কেমন একটা সন্দেহ হয়েছে তাঁর মনে। বলেছেন, আর কদিন পরেই অমাবস্যা। একটা মস্ত শুভ-সুযোগ এসে গেছে। তখন এই ছেলেটিকে তাঁর দরকার।

কিসের দরকার? কী সেই শুভ-সুযোগ?

শীতল সরীসৃপের মতো ভয় নড়ে বেড়াচ্ছে তাঁর বুকের ভেতরে। কী উদ্দেশ্য সোমদেবের? ঠিক কথা—তাঁকে নিয়ে আসবার পর থেকেই এক ধরনের অনুতাপ বোধ করছেন রাজশেখর। কী যেন বিশৃঙ্খলার দুর্বোধ সম্ভাবনা বয়ে এনেছেন সোমদেব—সঙ্গে করে এনেছেন একটা বিপর্যয়ের ইঙ্গিত। শিবের প্রতিষ্ঠা নয়—শক্তির বোধন।

—শিব আজ শব হয়ে পড়ে আছেন, তাঁর বুকে লীলা চলছে চামুণ্ডার—

সোমদেব বলেছিলেন। কথাটা ভাল লাগেনি। আজও ভাল লাগছে না তাঁর চাল-চলন। এই পর্তুগীজ কিশোরটিকে আশ্রয় দেওয়া কি নিরাপদ হল? ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

রাজশেখর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। একজন ভৃত্যকে ইঙ্গিত করে ডাকলেন তিনি।

—পুরনো মহলে একেবারে কোণার দিকের ঘরটা খুলে দে। আলো জেলে দে ওখানে। শোবার ব্যবস্থা কর্। দৌড়ে যা।

প্রকাণ্ড বাড়ির অঙ্গনের পর অঙ্গন পার হয়ে—বাইরের মহল থেকে অন্দর মহলের একেবারে শেষপ্রান্তে এসে থামলেন রাজশেখর। একটা খোলা আর খাড়া পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে ওপর দিকে। দুজন লোক দুটি আলো হাতে অপেক্ষা করছে সেখানে।

রাজশেখর সিঁড়িতে পা দিলেন। গঞ্জালো অনুসরণ করে চলল।

সিঁড়ি যেন আর ফুরোয় না। শ্যাওলাধরা—অসমতল। বেশ বোঝা যায়—বহুদিন ধরে এ সিঁড়ি কেউ ব্যবহার করে না। জায়গায় জায়গায় তার ফাটল ধরেছে—ছোট ছোট গাছ গজিয়েছে তাদের ভেতরে, ভবিষ্যতে একদা হয়তো এক-একটি বিশাল বনস্পতি উঠে সব কিছুকে গ্রাস করে বসবে। বোঝা যায়—বহুদিন এ সিঁড়ি ব্যবহার হয়নি। আর যদিও বা হয়ে থাকে, তা হলে কালে-ভদ্রে।

কিন্তু ক্লান্ত পা নিয়ে আর উঠতে পারছে না গঞ্জালো। ঝিম ঝিম করছে মাথা। চোখ বুজে আসছে থেকে থেকে। যেন নেশার ঘোরে উঠছে সে। যে কোনো সময় পা টলে সে নিচে গড়িয়ে পড়তে পারে।

তবু এক সময় শেষ হল এই দীর্ঘ সিঁড়ির পালা। ফাটধরা একটা দীর্ঘ বারান্দার পরে দেখা দিল সার বাঁধা কয়েকখানা ঘর। তাদের খান-দুই ধ্বসে পড়েছে—সঙ্গী লোকগুলির মশালের আলোয় ইট-পাথর কড়ি-বরগার ভীতিকর ধ্বংসস্তূপ চোখে পড়ল গঞ্জালোর।

কোথায় চলেছে এরা তাকে নিয়ে? এবং কী প্রয়োজনে?

সামনে একটি ছোট ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে। রাজশেখর তারই ভেতরে প্রবেশ করার জন্যে ইঙ্গিত করলেন গঞ্জালোকে; কিন্তু গঞ্জালো তবু নিঃসংশয় হতে পারল না, তাকিয়ে রইল বিমূঢ় চোখে।

রাজশেখর অভয়ের হাসি হাসলেন। আবার ইঙ্গিত করে বললেন, যাও।

গঞ্জালো ভেতরে পা দিলে। একটা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি অবশেষে। প্রদীপ জ্বলছে। মেঝেতে ছোট একটি শয্যা বিছানো হয়ে গেছে এর মধ্যেই—একটি গায়ের আবরণ।

ঘরের ভেতর ঢুকে তেমনি শঙ্কিত ভাবে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর অনুভব করলে, এ আয়োজন নিশ্চয় তারই জন্যে; কিন্তু তারই হোক কিংবা অন্য যে-কোনো অতিথির জন্যেই হোক—আর দাঁড়াবার শক্তি ছিল না কণামাত্র। শিথিল দেহ-মন নিয়ে সে বিছানাটার ওপরেই লুটিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ সে এলিয়ে রইল চোখ বুজে। মৃত্যু যেখানেই থাক—অন্তত এই রাত্রিতে সে কাছাকাছি আসবে না এ প্রায় নিশ্চিত। আর যদি আসেই—তাতেই বা কী করা যাবে। নিঃশব্দে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই তার।

কিন্তু কাকা? অ্যাফন্‌সো ডি-মেলো?

সেই বন্দুকের শব্দ। সেই আর্তনাদ। সেই ক্রুদ্ধ অভিসম্পাত। এখনো এক-একটা প্রকাণ্ড ঘূর্ণির মতো পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে তার চারপাশে ঃ গঞ্জালো উঠে বসল।

তারপরে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনায় বসল সে। বুকে এঁকে নিলে ক্রুশচিহ্ন—প্রার্থনা করে চলল ভার্জিন মেরীর কাছে—মানবপুত্রের কাছে। সমস্ত বিপদ দূর করুন তাঁরা—মুছে দিন সমস্ত সংকট—

প্রার্থনা শেষ করতে করতে তার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। একটা আকস্মিক শব্দে চমক ভাঙল।

দু'জন মানুষ এসেছে ঘরের ভেতরে। হাতে খাবারের থালা। জলের পাত্র। খাদ্য—জল!

কদিন ধরে সে পেট ভরে খেতে পায়নি—কতদিনের পিপাসা মরুভূমির মতো জমে উঠেছে বুকের ভেতর! গঞ্জালো আর ভাবতে পারল না। কুমারী মায়ের দান! সঙ্গে সঙ্গেই থালাটা টেনে নিলে নিজের কাছে।

সুস্বাদু ফল—সুন্দর মিষ্টান্ন। এদের অনেকগুলির স্বাদই তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। তবুও মনে হল যেন অমৃত। কিছুক্ষণের মধ্যেই থালা নিঃশেষ হয়ে গেল—ফুরিয়ে গেল জলের পাত্র।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল লোক দুটি। খাওয়া শেষ হতে উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে নিলে তারা। তারপর তাকে শুয়ে পড়বার জন্যে ইঙ্গিত করলে।

কিন্তু কোনো প্রয়োজন ছিল না তার। ক্লান্ত, উত্তেজিত, কয়েকদিনের বিনিদ্র শরীর-মন খাবার পেটে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙে পড়তে চাইছে। মাথার ভেতরে ঝিঁঝিঁর ডাকের মতো শব্দ উঠছে—চোখে কুয়াশা ঘনাচ্ছে—ঘরটা আবছা হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে ক্রমে। গায়ের আবরণটা টেনে নিয়ে সে এলিয়ে পড়ল। বন্ধ দৃষ্টির সামনে কিছুক্ষণ ধরে একটা সমুদ্র দুলতে লাগল—কালো ঢেউয়ের ওপরে ফেটে পড়তে লাগল ফেনার অঞ্জলি—উদ্দাম বাতাসের হু হু শ্বাস বাজতে লাগল বার বার। সেই ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঝাপসা ছবির মতো থেকে থেকে ভাসতে লাগল অ্যাফন্‌সো ডি-মেলোর মুখ। তার পর কোথা থেকে প্রকাণ্ড পাল তুলে একখানা জাহাজ এল; পালটা হাওয়ায় কাঁপছে—হাওয়ায় নড়ছে বিরাট একটা শবাচ্ছাদনের বস্ত্রের মতো—ধীরে ধীরে সেটা নেমে এসে গঞ্জালোর মুখের ওপরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

তেল পুড়ে পুড়ে কখন নিবে গেল ঘরের প্রদীপটা। কখন পেছনের ঘন অন্ধকার জঙ্গলটার ভেতরে আকাশে মুখ তুলে বার তিনেক আর্তকণ্ঠে ডেকে উঠল শেয়াল; কখন পুরনো মহলের অজস্র ফাটলের আড়াল থেকে যেন ঘুমের ঘোরে ঠক্‌-ঠক্‌ করে কথা কইল বনেদী তক্ষক; কখন ঝোপের আড়ে কাতর-শীর্ণ বোড়া সাপকে মুখ তুলতে দেখে ঝম্‌ঝম্‌ শব্দে কাঁটা তুলে থেমে দাঁড়াল একটা সজারু; কখন তার ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে একটা প্রকাণ্ড জোয়ান লোক এসে চৌকাঠে চেপে বসল পুরনো মহলের কোনো প্রেতাত্মার মতো; আর কখন নিজের ঘরে বসে প্রদীপের সলতেটা আরো উজ্জ্বল করে দিয়ে একখানা তন্ত্রগ্রন্থের তুলোট পাতা ওল্টালেন সোমদেব—গঞ্জালো এসবের কিছুই জানতে পারল না।

আর সেই সময় শাদা পালটা ক্রমশ দূরে সরে গেল। একটা নয়—পর পর কয়েকখানা। রাত্রির অন্ধকারে প্রাণপণে দূরের সমুদ্রে পালিয়ে গেল সিলভির আর ভ্যাস্‌কন্‌সেলসের জাহাজ।

তার পর—

তার পর রাত বাড়ল—রাত শেষ হল। শেষ ডাক দিয়ে গর্তের মধ্যে ঘুমুতে গেল শেয়াল; গায়ের কাঁটা মুড়ে একটা পুরনো গাছের শেকড়ের তলায় ঢুকলো সজারু। শীতক্লান্ত বোড়া সাপটা এক ঝলক ভোরের হাওয়ায় কী একটা টাট্‌কা ফোটা ফুলের গন্ধ পেল—আস্তে আস্তে আচ্ছন্নের মতো এগিয়ে চলল সেই দিকে। ফাটলের ভেতর গাছে এক টুকরো শুকনো বাকলের মতো নিশ্চুপ ভাবে লেপ্‌টে রইল তক্ষকটা। দরজার গোড়ায় বসে সমস্ত রাত যে লোকটা রাত্রি আর অরণ্যের শব্দ শুনেছিল—পুরনো মহলের আনাচে-কানাচে প্রেতের মতো চোখ মেলে রেখে দেখছিল প্রেতাত্মাদের ছায়া—সে একটা হাই তুলে উঠে গেল তার পাহারা ছেড়ে। নিজের ঘরে সোমদেব উঠে দাঁড়ালেন—উদার গলায় মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন স্নানের উদ্দেশ্যে।

জঙ্গলে সাড়া দিলে পাখিরা—গঞ্জালোর ঘরের খোলা জানালার ওপরে একটা বুলবুল এসে বসল—শিস্ দিয়ে জাগাতে চাইল এই বিদেশী মানুষটিকে।

গঞ্জালো জাগল আরো কিছুক্ষণ পরে।

পাতায় পাতায় জমাট শিশিরে টুকরো টুকরো রামধনু সৃষ্টি করে সূর্যের আলো পড়ল ঘরে। যে-জানালাটায় এসে বুলবুল এতক্ষণ গঞ্জালোকে ডাকাডাকি করছিল, সেই জানালার মধ্য দিয়েই খানিকটা প্রথম আলো মধুতপ্ত প্রভাতী অভিবাদন ছড়িয়ে দিলে তার মুখের ওপরে।

গঞ্জালো একবার এপাশ-ওপাশ ফিরল। আস্তে আস্তে উঠে বসল তার পরে।

এখনো সব অস্পষ্ট—সব ধোঁয়া-ধোঁয়া। গত রাত্রির সমস্ত গ্লানি আর উত্তেজনা কেটে গিয়ে একটা নিঃসাড় শান্তি জমে আছে স্নায়ুতে। মস্তিষ্ক অনুভূতিহীন। সদ্যোজাত শিশুর মতো নির্মল মানসিকতা।

ধোঁয়াটা কেটে যেতে লাগল ক্রমশ। নিরনুভব শূন্যতার বোধটা ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসতে লাগল চারটি দেওয়ালের নির্ভুল সীমারেখার ভেতরে। শ্যাওলাপড়া দেওয়ালের কতগুলো অসংলগ্ন রেখা যেন চোখে এসে আঘাত করল। মনে পড়ে গেল সব—মনে পড়ল গত রাত্রের সমস্ত দুঃস্বপ্নের স্মৃতি।

বিছানা ছেড়ে সে উঠে পড়ল। এসে দাঁড়ালো রৌদ্র-ঝরা জানালাটার সামনে। বাইরে যতদূর চোখ যায় একটা অসংলগ্ন জঙ্গল চলেছে—মাঝে মাঝে ভাঙা ইটের স্তূপ। গঞ্জালো জানতে—না এদেশের লোকে জানে, ওর নাম 'যখের জঙ্গল'। রাজশেখরের বাড়ির পেছনে এই ঘন বনের ভেতরে যখের ঐশ্বর্য লুকোনা রয়েছে এমনি প্রবাদ আছে এ-অঞ্চলে। ওই ঐশ্বর্যের সন্ধানে নিশি রাত্রে কত লোক ওখানে এসে কেউটের বিষে প্রাণ দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

গঞ্জালো কিছুক্ষণ চেয়ে রইল জঙ্গলটার দিকে। একটা শিমুল গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে রোদের টুকরো এসে পড়েছে তার চোখে মুখে। এখান থেকে কত দূরে নবাবের বাড়ি? কোথায় এখন বন্দীত্ব যাপন করছেন ডি-মেলো।

চিন্তাটা মনে জাগতেই ওখান থেকে সরে এল সে। এল দরজার কাছে। কবাট দুটো ভেজানো ছিল, একটু আকর্ষণ করতেই খুলে গেল। গঞ্জালো বেরিয়ে এল বাইরে।

সামনে একটা লম্বা বারান্দা। এখানে ওখানে ভেঙে গেছে—কোথাও কোথাও বিপজ্জনকভাবে ঝুলে পড়েছে শূন্যে। সারি বাঁধা কতগুলো ঘর ছিল পাশাপাশি—অধিকাংশই এখন ধ্বংসস্তূপ। একটু দূরেই সেই ফাটধরা পাথরের খোলা সিঁড়িটা। বোঝা যায়—এ অঞ্চলটা এখন সম্পূর্ণই পরিত্যক্ত। অর্ধ-চন্দ্রাকার এই ভাঙা বাড়িটার মাঝখানে এলোমেলো ঘাস আর ঝোপ-গজানো একটা বিরাট চত্বর—সেইটে পার হলেই একটা নতুন প্রাসাদ মাথা তুলেছে। রাজশেখরের তৈরি নতুন মহল।

তারই ছাতের দিকে চোখ পড়তে দৃষ্টিটা খুশি হয়ে উঠল গঞ্জালোর। আকাশ থেকে মুঠো মুঠো সোনার মতো শীতের রোদ ঝরছে। আর সেই রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সোনা দিয়ে গড়া মেয়ে। বয়সে তারই মতো হবে—নিবিড় কালো চুল—মুগ্ধ উদাস ভাবে বনের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

গঞ্জালোর ঠিক পেছনে—ঘরের কার্নিশের ওপরে এসে সেই বুলবুলটা শিস্ দিয়ে উঠল। অত দূরে কি শিসের সেই শব্দটা গিয়ে পৌঁছুল? কে জানে! মেয়েটি হঠাৎ চোখ নামাল। গঞ্জালোকে দেখতে পেল সে।

কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে সুপর্ণা চেয়ে রইল। এই পুরনো প'ড়ো মহলে কে এমন অপরিচিত মানুষ? প্রেতাত্মা? কিন্তু এর তো পরিষ্কার একটা ছায়া উজ্জ্বল রোদে পায়ের তলায় এসে এলিয়ে পড়েছে; তা ছাড়া বিদেশী। অদ্ভুত বেশবাস। সুন্দর কিশোর কান্তি। মাথায় চুল নয়—যেন একগুচ্ছ সোনা। কিশলয়ের মতো গায়ের রঙ। যখের জঙ্গল থেকেই কি উঠে এল কেউ?

—O-L-A!

চমকে উঠল সুপর্ণা! ওই নতুন মানুষটি যেন তাকেই ডাকছে।

—O-L-O! Boz dias!

আবার সেই ডাক! একটা আকস্মিক ভয়ে সুপর্ণা বিবর্ণ হয়ে গেল। পরক্ষণেই গঞ্জালো দেখতে পেল ছাতের ওপরে কেউই নেই। যাকে সে সম্ভাষণ করে **boz dias**—অর্থাৎ 'সুপ্রভাত' জানাচ্ছিল—সে কোথায় নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে।

—Bonito!

আর একবার মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলল গঞ্জালো।

সকালের আলোয় বাড়ির সামনে পায়চারি করছিলেন রাজশেখর। রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি। এলোমেলো ভাবনার তাড়নায় মনটা অত্যন্ত চঞ্চল। এই বিদেশী ছেলেটা—

খট—খটাং—খটাং খট—

ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা গেল। রাজশেখর উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন—মুখ শুকিয়ে গেল আশঙ্কায়। একটু দূরেই ধুলোর ছোট একটা ঝড় দেখা যাচ্ছে।

ওই তো—এদিকেই আসছে। তাঁরই বাড়ির দিকে। আসছে দুজন দীর্ঘদেহ ঘোড়সোয়ার—সকালের রোদে তাদের তলোয়ারের বাঁট আর বেশবাসের সমস্ত ধাতব জিনিসগুলো চকচক করে উঠছে।

নবাবের সৈন্যই বটে!

কী বলবেন? ধরিয়ে দেবেন ছেলেটাকে? বুকের ভেতর হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগল রাজশেখরের। বিশ্বাসঘাতকতা করবেন আশ্রিতকে শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে? এই একান্ত একটি কিশোর—অম্লান সুন্দর মুখ—

কিন্তু বাড়ির চাকর-বাকরদের মুখে মুখে যদি জানাজানি হয়ে যায়? নবাব যদি একবার শুনতে পান যে তাঁর কারাগার থেকে পলাতক ক্রীশ্চানকে লুকিয়ে রেখেছেন তাঁরই একান্ত অনুগত শেঠ রাজশেখর? তা হলে?

বেশিক্ষণ ভাববার সময় পেলেন না তিনি। তার আগেই দ্রুতগ্রামী দুটি ঘোড়া এসে থামল তাঁর সামনে। তলোয়ারের ঝঙ্কার তুলে নেমে পড়ল নবাবের দুজন সৈনিক।

—সেলাম শেঠজী!

—সেলাম।

—আপনি বুঝি কিছুদিন এখানে ছিলেন না?

ভয়ার্ত মুখে, নিজের হৃৎস্পন্দনের শব্দ শুনতে শুনতে রাজশেখর বললেন, না। দিন কয়েকের জন্যে চট্টগ্রামে গিয়েছিলাম আমার গুরুদেবকে আনতে। আমার নতুন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হবে দিন কয়েক পরে।

—ও।

সৈনিকেরা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল—বোধ হয় তৈরি করে নিলে প্রশ্নের ভূমিকা। তারপর একজন বললে, কাল নবাবের কয়েদখানা থেকে জনকয়েক শয়তান ক্রীশ্চান পালিয়ে গেছে। শেঠ কি কিছু জানেন?

প্রায় নিঃশব্দ গলায় রাজশেখর বললেন, শুনেছি।

—তাদের দু-একটা আপনার এদিকে এসেছে নাকি?

মুহূর্তের জন্যেই হয়তো একবার দ্বিধা করলেন রাজশেখর। শুকনো ঠোঁট চেটে নিলেন জিভ দিয়ে।

—না। সেরকম কিছুই জানি না।

—কেউ আসেনি আপনার বাড়িতে?

ওরা কি খবরটা জানে? জেনে-শুনেই কি কৌতুকের সাহায্যে এই ভাবে নির্যাতন করতে চাইছে তাঁকে?

রাজশেখর আবার কান পেতে নিজের হৃৎস্পন্দন শুনতে লাগলেন কিছুক্ষণ। বললেন, না, কেউ নয়।।

—আপনার বাড়ির পেছনে আশ্রয় নিতে পারে তো? ওই যখের জঙ্গলে?

রাজশেখর জোর করে শুকনো হাসি হাসলেনঃ তা হয়তো পারে; কিন্তু সে-দুর্বুদ্ধি যদি কারো হয়, তা হলে স্বেচ্ছায় নিজের মৃত্যুই ডেকে আনবে সে। গোখরো আর চিতি বোড়া কিলবিল করছে ওখানে। নবাবের সৈন্যর কাছ থেকে যদি বা নিস্তার মেলে, তাদের কাছ থেকে পরিত্রাণ নেই।

—তা বটে!—সৈন্য দুজনও এবার হাসলঃ তা হলে কেউ আসেনি বলছেন আপনি?

—না।

—আচ্ছা, চলি তা হলে। কিছু মনে করবেন না—সেলাম!

কোমরের তলোয়ারে আর রেকাবে ঝঙ্কার তুলে আবার দুজনে লাফিয়ে উঠলা ঘোড়ায়। যেমন দ্রুতবেগে এসেছিল, তেমনি দ্রুতগতিতেই ফিরে চলল ঘোড়া। অন্যদিকে কোথাও খুঁজতে চলল নিশ্চয়। আবার দুটো ধুলোর ঘূর্ণি উঠল—তলোয়ারের বাঁট আর পোশাকের অন্যান্য ধাতব অংশগুলো শেষবার ঝিকমিক করে উঠে মিলিয়ে গেল দিগন্তে।

রাজশেখর তখনো সেইভাবেই দাঁড়িয়ে। বুকের আন্দোলনটা বন্ধ হয়নি—হৃৎপিণ্ডের উচ্চকিত ধক্ধকানি শোনা যাচ্ছে এখন পর্যন্ত। বহুক্ষণ ধরে চেপে রাখা দীর্ঘশ্বাসটাকে এবার সশব্দে মুক্তি দিলেন রাজশেখর। আপাতত একটা ভয়াবহ সংকটের হাত থেকে পরিত্রাণ মিলল তাঁর।

কিন্তু এ তো সবে আরম্ভ—শেষ নয়। এত বড় ব্যাপারটা কখনোই চাপা থাকবে না। যা হোক একটা ব্যবস্থা করতে হবে এবং করতে হবে অবিলম্বেই। গঞ্জালোকে নবাবের হাতে তুলে দেওয়া হোক বা না হোক, অন্তত এখান থেকে সরিয়ে দিতেই হবে। এমন একটা বিপজ্জনক দায়িত্ব মাথায় নিয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনতে পারেন না তিনি। অপদার্থ খোদাবক্স খাঁর কাছে মান-সম্মানের প্রশ্ন নেই কারো।

অতএব, এখনই একবার সোমদেবের সঙ্গে এ-সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার।

রাজশেখর অন্দর-মহলে এলেন; কিন্তু সোমদেবের সঙ্গে দেখা হল না। গুরু তখন পুজোয় বসেছেন। তাঁর গম্ভীর গলার মন্ত্ররব বাড়ির ভেতরে ভেসে বেড়াচ্ছে মেঘমন্দ্র ধ্বনিতে। আপাতত তাঁকে বিরক্ত করবার উপায় নেই।

চিন্তিত পায়ে রাজশেখর আবার বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, পেছন থেকে কে এসে তাঁকে স্পর্শ করল। ফিরে দাঁড়ালেন। সুপর্ণা।

—কিরে?

—পুরনো মহলে ওটা কি বাবা? অদ্ভুত চেহারা—অদ্ভুত কথা বলে?

রাজশেখর সভয়ে বললেন, তুই দেখেছিস বুঝি? কেমন করে?

—ছাত থেকে। ওটা কী বাবা?

—বিদেশী মানুষ। ক্রীশ্চান; কিন্তু এ নিয়ে কাউকে কোনো কথা বলিসনি মা। ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়।

—কেন? কী হয়েছে?

—সে অনেক কথা। তোর শুনে কাজ নেই।

সুপর্ণা চুপ করল, রাজশেখর ভাবলেন মিটে গেল সমস্ত।

কিন্তু সেইখানেই শুরু হল নতুন অধ্যায়।

সকাল শেষ হয়ে যখন দুপুর এল, কাঁচা সোনার মতো রোদ যখন গিলটির সোনার মতো রঙ ধরল; যখের জঙ্গলে যখন সজারুটা হঠাৎ উঠে বসল গায়ের কাঁটাগুলোয় ঝাঁকুনি দিয়ে; একটা কাক যখন লম্বা শিমুল গাছটার ডালে বসে বিশ্রী গলায় ডেকে উঠল, তখন—

তখন, একটা মৃদু শব্দে পেছন ফিরে তাকালো গঞ্জালো।

দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে সুপর্ণা। কৌতূহলের পীড়নে এই নির্জন দুপুরে চুপি চুপি দেখতে এসেছে অভিনব চেহারার এই বিদেশী মানুষটিকে।

এগার

"Os senhores estao em sua casa—"

আবার ডাক পড়েছে নবাব খোদাবক্স খাঁর দরবারে।

কিন্তু এ ডাকের অর্থ এবারে দুর্বোধ্য নয় আর। আহত সঙ্গীদের নিয়ে নির্ভয়েই কারাগার থেকে বেরিয়ে এলেন ডি-মেলো। যা হবে তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারছেন। ধূর্ত নবাব এখন খোঁচা-খাওয়া গোখরো সাপের মতো ভয়ংকর হয়ে আছেন। পালানোর ব্যর্থ চেষ্টার পরে এখন একটি মাত্র পরিণামই সম্ভব। এইবার তাঁদের নিয়ে যাওয়া হবে বধ্যভূমিতে। হয় বন্দুকের গুলিতে হত্যা করা হবে, নয় তলোয়ারের মুখে মুণ্ডচ্ছেদ করা হবে, আর নতুবা মাটিতে গলা পর্যন্ত পুঁতে দিয়ে খাওয়ানো হবে কুকুর দিয়ে। আরো কত নিষ্ঠুরতা আছে কে জানে! মুরদের অসাধ্য কোনো কাজই নেই।

ডি-মেলো একবার তাকিয়ে দেখলেন সঙ্গীদের দিকে। সবাই বুঝেছে, তাঁর মতোই সকলে অনুমান করে নিয়েছে নিজেদের পরিণতি; কিন্তু কেউ কি ভয় পেয়েছে? মৃত্যুর আশঙ্কায় কি বিবর্ণ হয়ে গেছে কোনো কাপুরুষ? ডি-মেলো জ্বলন্ত চোখে যেন সকলকে পরীক্ষা করে দেখলেন একবার। না—কারো মুখেই আতঙ্কের ছায়া নেই কোনোখানে। বীরের মতো মরবার জন্যেই সকলে প্রস্তুত।

কিন্তু মুরদের এ আনন্দও বেশি দিন থাকবে না; আছে দুর্জয় পর্তুগীজের দল—আছে দুরন্ত নৌবহর—আছে ভয়ংকর কামনা—আছে দুর্ধর্ষ নুনো-ডি-কুন্‌হা। এরও বিচার হবে।

কিন্তু গঞ্জালো? কোথায় সে? মুরদের হাতে পড়লে তিনি জানতে পারতেন। যেখানেই হোক—সে অন্তত নিরাপদে থাকুক। হয়তো কোয়েল্‌হো আর ভ্যাস্‌কন্‌সেলস্‌ তাকে জাহাজে করে তুলে নিয়ে গেছে। সেইটেই সম্ভব। নিজেকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করলেন ডি-মেলো।

শিকলে বাঁধা বন্দীরা সার দিয়ে দাঁড়ালেন নবাবের দরবারে। সেই হিংস্র গম্ভীর পরিবেশ। সেই চারিদিকে বিদ্বিষ্ট ক্রুদ্ধ দৃষ্টির আঘাত।

খোদাবক্স খাঁ কী যেন বললেন। উঠে দাঁড়াল দো-ভাষী। কী বলবে আগেই অনুমান করে ক্ষিপ্তভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন ডি-মেলো।

—এর জবাবদিহি নবাবকে করতে হবে একদিন।

সেই আকস্মিক চিৎকারে সমস্ত দরবারটা যেন গম্‌ গম্‌ করে উঠল। নিজের আসনে পরম অস্বস্তিতে নড়ে উঠলেন খোদাবক্স খাঁ। মুর সেনাপতি টেনে বের করলে তার তলোয়ার। মুর সৈনিকেরা তুলে ধরল বল্লম। উগ্র-চঞ্চলতার বিদ্যুৎ বয়ে গেল সমস্ত দরবারের ওপর দিয়ে।

এক মুহূর্ত থমকে গিয়ে, তারপর হেসে উঠল দো-ভাষী।

—নবাবের আদেশে ক্রীশ্চান ক্যাপিতান সসৈন্য মুক্তিলাভ করলেন। তাঁর যে জাহাজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে—তাও সরকার থেকে ফেরত দেওয়া হবে।

কথাটা বজ্রপাতের মতো শোনাল। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন

না ডি-মেলো। পর্তুগীজেরা বিহ্বল বিভ্রান্ত ভাবে তাকাল এ-ওর মুখের দিকে।

বিস্ময়ের চমকটা সামলে নিয়ে ডি-মেলো বললেন, এ কি ব্যঙ্গ?

—না, ব্যঙ্গ নয়। নবাব সসৈন্যে ক্যাপিতানকে মুক্তি দিচ্ছেন।

সেই মুর সেনাপতির উদ্দেশ্যে দো-ভাষী আদেশ উচ্চারণ করলে একটা। কিছুক্ষণ সেনাপতিও হতবাক হয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বন্দীদের হাতের শিকল খুলে দিতে লাগল সৈনিকরা।

তবুও যেন বিশ্বাস হতে চায় না। এ কেমন করে সম্ভব? এ কি মা মেরীর অনুগ্রহ? না—মুরদের আবার কোনো চক্রান্ত? মুক্তি দেবার ভাণ করে একটা বর্বর কৌতুক?

দো-ভাষী আবার বললে, যা হয়ে গেছে, তার জন্যে নবাব অত্যন্ত দুঃখিত। যাদের প্রাণ গেছে, তাদের জন্যেও তিনি বেদনা বোধ করছেন; কিন্তু তাদের মৃত্যুর জন্যে নবাবের কোনো দায়িত্ব ছিল না। তারা অধৈর্য হয়ে কারাগার ভেঙে পালাতে চেয়েছিল বলেই তাদের এ শাস্তি পেতে হয়েছে। তা ছাড়া নবাবের দুজন সিপাহীকেও তারা হত্যা করেছে। যাই হোক—অতীতের কথা এখন ভুলে যাওয়াই ভালো। পর্তুগীজ ক্যাপিতান এখন নবাবের বন্ধু।

বন্ধু! একটা চাপা শপথ থমকে গেল ঠোঁটের প্রান্তে। এই বিশ্বাস-ঘাতকের সঙ্গে বন্ধুত্ব; কিন্তু কোনো জবাব দিলেন না ডি-মেলো—দাঁড়িয়ে রইলেন নিঃশব্দে।

দরবারের মধ্য থেকে একটি নতুন মানুষ এগিয়ে এল ডি-মেলোর দিকে।

মধ্যবয়েসী একজন পারসী বণিক। গায়ে মূল্যবান পোশাক—মাথায় জরির কাজ-করা টুপি। গায়ে আতরের তীব্র সুগন্ধ। মুখে প্রসন্ন হাসি।

—আদাব ক্যাপিতান।

—কে আপনি?

—আমি খাজা সাহেব-উদ্দিন।

—কী বলতে চান?

ভাঙা পর্তুগীজ ভাষায় সাহেব-উদ্দিন বললেন, এই বন্দরে আমার জাহাজ আছে। সেখানে আপনাদের সকলকে আমি নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কয়েক মুহূর্ত খাজা সাহেব-উদ্দিনকে বিশ্লেষণী চোখে লক্ষ্য করলেন ডি-মেলো। তারপরেই বন্ধুত্বের দক্ষিণ হাত বাড়িয়ে দিলেন সাহেব-উদ্দিনের দিকে।

দামী কার্পেট, দ্রাক্ষারস, প্রচুর ফলমূল, রাশি রাশি মাংসের খাবার। জাহাজ নয়—যেন নবাবী মহল। সাহেব-উদ্দিন আর এক পাত্র মদ তুলে দিলেন ডি-মেলোর হাতে।

বললেন, মাননীয় নুনো-ডি-কুনহা আমার হাতেই ক্যাপিতানের তিন হাজার ক্রুজাডো, মুক্তিপণ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমি তাঁরই প্রতিনিধি।

ডি-মেলো শুনে যেতে লাগলেন।

—পর্তুগীজ ক্যাপিতান ভ্যাজ-পেরিরা আমার দুখানি জাহাজ আটক করেন। তার কারণ, আমার জাহাজ দুখানা দেখতে অনেকটা পর্তুগীজ জাহাজের মতো ছিল। ভ্যাজ-পেরিরার সন্দেহ হল, ওই জাহাজ নিয়ে আমি সমুদ্রে ডাকাতি করি আর অপবাদ যায় পর্তুগীজদের ওপর। আল্লার দোহাই, ওসব কোনো মলতবই আমার ছিল না। পর্তুগীজ জাহাজের ধরন ভাল দেখে আমি ইচ্ছে করেই ও-ভাবে আমার জাহাজও তৈরি করিয়েছিলাম।

ডি-মেলো এবং সাহেব-উদ্দিন একসঙ্গেই চুমুক দিলেন ইরাণী মদের পাত্রে।

সাহেব-উদ্দিন বলে চললেন, পেরিরা মালপত্রসুদ্ধ আমার জাহাজ আটক করলেন—তারপর পাঠিয়ে দিলেন গোয়াতে। নিরুপায় হয়ে আমিও গোয়াতে গেলাম। সেখানে পরিচয় হল মহামান্য নুনো-ডি-কুনহার সঙ্গে। দোস্তী হতেও দেরি হল না। ডি-কুনহা চাকারিয়া আক্রমণের জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। আমি বুঝিয়ে বললাম, যে বাংলা দেশে বাণিজ্য করবার জন্যে তিনি এত ব্যস্ত—সেখানে যুদ্ধ করে লাভ হবে না, বন্ধুত্ব করেই কাজ আদায় করতে হবে।

ডি-মেলো উৎকর্ণ হয়ে রইলেন।

—অনেক আলোচনা হল এ নিয়ে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, ডি-কুনহা যদি আমার জাহাজ দুখানা ছেড়ে দেন, আমি ক্যাপিতান ডি-মেলোর মুক্তির ব্যবস্থা করব। তিন হাজার ক্রুজাডোর বিনিময়ে তা সম্ভব হয়েছে। টাকাটা আমিই দিয়েছি—

মদের পাত্র নামিয়ে ডি-মেলো সাহেব-উদ্দিনের হাত চেপে ধরলেন।

—এখানে এসে শুধু পেয়েছি শত্রুতা। বন্ধু বলতে কেউ ছিল না। জননী মেরীই আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আজ।

—সে তো বটেই—সে তো বটেই!—বিচক্ষণ খাজা সাহেব-উদ্দিন আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন: আল্লার দোয়া না থাকলে কিছুই হয় না। আমি আপনাকে বলছি ক্যাপিতান—যদি আমাকেও আপনারা সাহায্য করেন, তা হলে চট্টগ্রামে পর্তুগীজ কুঠি বসাবার ফরমান আমি যোগাড় করে দেবই।

ডি-মেলো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন: নিশ্চয়—নিশ্চয়। আমাদের দিক থেকে সাহায্যের কোনো ত্রুটিই হবে না। বলুন—কী করতে হবে।

—গৌড়ের সুলতান নসরৎ শাহের সঙ্গে আমার বিরোধ চলছে। তার একটা মীমাংসা না হলে আমার পক্ষে এ দেশে বাস করাই অসম্ভব। আমাকে রক্ষা করতে হবে।

—আমরা যথাসম্ভব করব।

সাহেব-উদ্দিন হাসলেন: পর্তুগীজদের কাছে যে উপকার পাব—তার ঋণ শোধ করতে আমারও চেষ্টার ত্রুটি হবে না। আসুন—আল্লার নামে আর একবার আমাদের চুক্তি পাকা করে নেওয়া যাক।

আবার দু পাত্র ইরাণী মদ ঢাললেন সাহেব-উদ্দিন, রুপোর পাত্র দুটি

ঠেকিয়ে বন্ধুত্বের স্বীকৃতি রচনা করলেন, তারপর চুমুক দিলেন দুজনে। সেইখানেই তা থামল না। বোতলের পর বোতল শূন্য হয়ে চলল।

নেশায় রক্তিম চোখ মেলে সাহেব-উদ্দিন বললেন, ক্যাপিতান—নাচ চলবে ?

—নাচ !

—হাঁ, খাঁটি ইরাণী নর্তকীর নাচ। এমন নাচ কখনো দেখনি তুমি।

—তোমাদের জাহাজে এ-সবও থাকে নাকি ?

নেশার উচ্ছলতায় সাহেব-উদ্দিন হেসে উঠলেন ঃ থাকে বইকি। আমাদের ব্যাপার তোমাদের মতো শুকনো নয়। তোমরা শুধু যুদ্ধ আর ব্যবসাই কর—একটু রঙ নইলে আমাদের চলে না। দাঁড়াও—আনাচ্ছি নর্তকীদের—

সাহেব-উদ্দিন হাততালি দিয়ে অনুচরদের ডাকলেন।

এল বাজনা—এল নর্তকী। শুরু হল উন্মত্ত উৎসব। নেশার জড়তার মধ্যেও তবু একটা ভাবনায় বার বার ডি-মেলোর মনের সুর কেটে যেতে লাগল ঃ গঞ্জালো ? গঞ্জালো কোথায় এখন ?

* * * *

রাজশেখর থর থর করে কেঁপে উঠলেন একবার।

—গুরুদেব, আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

—না বোঝবার মতো কোনো কথাই তোমাকে বলা হয়নি।—সোমদেব জবাব দিলেন।

—কিন্তু প্রভু, এ আমি হতে দেব না। না—কিছুতেই না।—রাজশেখরের মুখ শুকনো পাতার মতো বিবর্ণ।

—তুমি হতে দেবার কে ?—তীব্রভাবে সোমদেব বললেন, দেবী চামুণ্ডা যা চান তাই হবে।

—কিন্তু আমি শৈব।

—না, শাক্ত।—সোমদেবের মাথার জটা সাপের ফণার মতো দুলতে লাগল ঃ শিব আজ শব—তাঁকে দিয়ে আজ আর কোনো প্রয়োজনই নেই।

—আমি পারব না প্রভু। একে ছেলেমানুষ, তার ওপরে আমার আশ্রিত। তাকে—

—রাজশেখর !

সোমদেবের ধমকে মাঝপথে থেমে গেলেন রাজশেখর।

—প্রভু—

—প্রভু-ট্রভু নয়। দেবীর আদেশ পালন করবে কিনা জানতে চাই।

—পারব না।—মৃত গলায় রাজশেখর বললেন, ক্ষমা করুন।

—ক্ষমার প্রশ্ন নেই। আজ ধর্মের জন্যেই এর প্রয়োজন। ও সব দুর্বলতা দূর করতে হবে তোমাকে।

—গুরুদেব !

—তোমার সঙ্গে আর তর্ক করার প্রবৃত্তি আমার নেই রাজশেখর। তুমি জান, আমি যে সংকল্প করি, তার কখনো অন্যথা হয় না। এবারেও তা হবে

না। যা বলেছি, তাই কর! পরশু অমাবস্যা—পরশু মধ্যরাত্রেই মায়ের পুজো। সব আয়োজন করে রাখ।

রাজশেখর একবার শেষ চেষ্টা করলেন। যেন ডুবতে ডুবতে আঁকড়ে ধরলেন একটি তৃণখণ্ডকে।—প্রভু, এ কি না হলেই নয়?

—না—না—না!—চিৎকার করে উঠলেন সোমদেবঃ বলেছি তো, এ তোমার-আমার ইচ্ছার ব্যাপার নয়। এ দেবীর আদেশ।

রাজশেখর মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর একটি কথাও আর বলবার নেই।

বারো

"Posso, sim senhor"—

উদ্ধব পাণ্ডা কিছু একটা সন্দেহ করেছিল নিশ্চয়।

—শ্রেষ্ঠীর দক্ষিণ পাটন কি এবার নীলাচল পর্যন্তই?

শঙ্খদত্ত চমকে উঠল। এই আকস্মিক প্রশ্নে বিবর্ণ হয়ে উঠল তার মুখ।

—না, সিংহল অবধিই আমি যাব।

—এবার কিন্তু জগন্নাথধামে অনেক দিন আপনি রইলেন।

শঙ্খদত্ত চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। তারপর শীর্ণ গলায় বললে, এই পুণ্যভূমিতে পা দিলে এখান থেকে আর যেতে ইচ্ছে করে না।

উদ্ধব মাথা নাড়ল। পুণ্যভূমি—নিঃসন্দেহে। 'রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে'। সেই পুনর্জন্মের দুঃখকে এড়াবার জন্যে আসে লক্ষ লক্ষ নরনারী—রথের চাকার তলায় প্রাণ দেয় কতজন। ভক্তের রক্তে আর চোখের জলে এই নীলাচলের মাটি স্বর্গের চন্দন। সত্যিই তো—এখানে এলে কার মন আর সহজে বিদায় নিতে চায়!

কিন্তু গৌড়ের শেঠকে এতখানি ধর্মপ্রাণ বলে তো কোনোদিন মনে হয়নি। তা ছাড়া এই বণিকেরা যে দেবতার সঙ্গেও বাণিজ্যই করতে আসে, সে অভিজ্ঞতা উদ্ধবের নিশ্চিত এবং প্রত্যক্ষ। যাত্রা নির্বিঘ্ন হোক, প্রসন্ন থাকুন মহাসাগর, পথের দস্যুভীতি দূর হোক—বাণিজ্যতরী ভরে উঠুক সোনায় সোনায়। দেবতার সঙ্গে যেখানে এই সহজ দেনা-পাওনার সম্বন্ধ—সেখানে ভক্তির এই বাড়াবাড়িটা খুব স্বাভাবিক মনে হল না উদ্ধব পাণ্ডার।

কী বুঝল সে-ই জানে। সংক্ষেপে হেসে বললে, তা বটে।

পাণ্ডা চলে গেলে কিছুক্ষণ উদ্ভ্রান্তভাবে চেয়ে রইল শঙ্খদত্ত। সন্দেহ হয়েছে পাণ্ডার মনে? অসম্ভব কী? সেদিন দেবদাসীর প্রাকারের তলায় অমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকা—তাও কি কারো আর চোখে পড়েনি?

হঠাৎ একটা তীব্র ভয় আর লজ্জা এসে শঙ্খদত্তকে আচ্ছন্ন করে ধরল। উদ্ধবের মুখেই যেন সে আবিষ্কার করল—তার গোপন কথা এখানে আর গোপন নেই; হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়েছে—ছড়িয়েছে মুখে মুখে। দেবদাসী

—একমাত্র দেবভোগ্য যে, তার ওপরে গিয়ে পড়েছে তার লুব্ধ দৃষ্টি। নগরের প্রত্যেকটি মানুষ, প্রতিটি তীর্থযাত্রী—দুই চোখে ঘৃণা আর পুঞ্জিত বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে তারই দিকে। এ সংবাদ শুনেছেন রাজা—শুনেছেন রাজ-পুরোহিত, আর—আর হয়তো তারই মাথা লক্ষ্য করে এতক্ষণ শান পড়ছে রক্তচক্ষু জল্লাদের খড়্গে! শম্পার পুরীর চারপাশে নিশিরাত্রের স্তব্ধতায় যে সমস্ত অপমৃত প্রেতাত্মা দগ্ধ-কামনার দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে দেয় বাতাসে—দুদিন পরে হয়তো তারও ঠাঁই হবে তাদেরই দলে।

না—এ নয়, এ নয়। এই বিষকন্যার জাল থেকে তার মুক্তি চাই। যেমন করে হোক, আজ সে পালাবে এখান থেকে।

ধনদত্ত বণিকের ছেলে শঙ্খদত্ত জোর করে উঠে দাঁড়াল। চরিত্রবান্ শঙ্খদত্ত—কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে সে কখনো পাশা খেলেনি—মধুকের সুরায় মাতাল হয়ে সে কখনো উন্দাম রাত্রি কাটাতে যায়নি রূপজীবীদের ঘরে। এই মতিভ্রম তার চলবে না। অনেক কাজ তার বাকি। তা ছাড়া গুরু সোমদেব—বিবেকের প্রচণ্ড অঙ্কুশ-তাড়না খেয়ে শঙ্খদত্ত উঠে দাঁড়াল। আজই—আজই সে পালাবে এখান থেকে।

শঙ্খদত্ত বেরিয়ে পড়ল। ভয় আর আত্মবিশ্বাসের চাপ দিয়ে এতক্ষণে সে অনেকটা আয়ত্তে এনে ফেলেছে তার দুর্বিনীত মনকে। এমন কি, এইবারে একটা প্রশান্তিও যেন অনুভব করছে সে।

সকালের আলোয় চারদিক প্রাণ-চঞ্চল। দলে দলে মানুষ চলেছে মন্দিরের দিকে, চোখে-মুখে তাদের ভক্তির পবিত্রতা। দারুব্রহ্মের জয়ধ্বনি উঠছে থেকে থেকে; বিক্রি হচ্ছে অন্নকূটের মুঠো মুঠো প্রসাদ। একজন সন্ন্যাসী এসে ভিক্ষে চাইল, তার হাতে একটা টাকা তুলে দিলে শঙ্খদত্ত।

এই তো জীবন—এই তো স্বাভাবিক। এরই মাঝখানে থেকেও কেন সে এমন ভাবে ভূতগ্রস্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে!

আজ ইচ্ছার ওপরে সচেতন শাসন বসিয়েছে শঙ্খদত্ত। যে পথে দেবদাসী শম্পা বাস করে সে-পথে নয়। এমন কি, যেদিকে সে থাকে, সেদিকেও নয়। সম্পূর্ণ উলটো মুখে সে হাঁটতে আরম্ভ করল।

নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে সে কত দূরে চলে এসেছে খেয়াল ছিল না। হঠাৎ কাদের প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ চিৎকারে তার মগ্নতা ভগ্ন হল। শঙ্খদত্ত তাকিয়ে দেখল, সে নগরের সীমা ছাড়িয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত অঞ্চলে এসে পা দিয়েছে। বহু পেছনে, গাছপালার আড়ালে দেখা যাচ্ছে মন্দিরের উঁচু চূড়োটা।

ফিরে যাবার কথা মনে হলেও সে ফিরতে পারল না। ওই চিৎকারটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে যে দৃশ্য তার চোখে পড়ল, তার ওপর কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে।

খোলা মাঠের মতো জায়গা একটুখানি। প্রায় পনেরো-ষোলোজন লোক জড়ো হয়েছে সেখানে। চিৎকার আর গোলমালটা উঠছে তাদের মধ্য থেকেই।

ঝগড়া চলছে।

জাতে সকলকেই ব্যাধ বলে মনে হল। পরিস্ফীত পেশী দিয়ে গড়া কালো শরীর। মাথায় জটা-বাঁধা চুল, হাতে লোহার বালা। তাদের মাঝখানে পড়ে আছে প্রকাণ্ড একটা সম্বর হরিণ। মাত্র কিছুক্ষণ আগেই শিকার করা হয়েছে হরিণটাকে—তার সোনালি দীর্ঘ লোমগুলোর ভেতর দিয়ে তখনো রক্ত গড়িয়ে নামছে।

কলহ শুরু হয়েছে হরিণের ভাগ নিয়ে।

পনেরোজনের বিরুদ্ধে একটিমাত্র প্রতিপক্ষ। কিন্তু সেই একজনের দিকে তাকিয়েই শঙ্খদত্তের চোখে আর পলক পড়তে চাইল না। মাথায় সে সকলের ওপরে আধ হাত উঁচু; পাহাড়ের মতো চওড়া কালো বুকে কয়েকটা রক্তের ছিটে—বোধ হয় হরিণটারই—কিন্তু তাতে করে তাকে দেখাচ্ছে একটা গুলবাঘের মতো। অত বড় শরীরের তুলনায় চোখ দুটো ছোট—কিন্তু তাতে একটা দানবীয় হিংস্রতা।

চারদিকের কলহ-কলরবের মধ্যে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত লোকটি। অদ্ভুত রকমের স্থির। যেন একটা সুদীর্ঘ শালগাছ অবজ্ঞার চোখে তাকিয়ে আছে নিচের একরাশ ঝোপ-ঝাড়ের দিকে।

শঙ্খদত্ত কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারছিল না, কিন্তু এটা অনুমান করছিল যে অবস্থা চরমের দিকে এগোচ্ছে। হলও তাই। মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই জন-দুই ক্ষিপ্তের মতো ঝাঁপ দিয়ে পড়ল দৈত্যটার ওপরে।

লোকটার বুকের দিকে চেয়ে শঙ্খদত্ত ভাবছিল পাথরের প্রাচীর। কথাটা সত্যিই মিথ্যে নয়! লোকটা তেমনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আক্রমণকারী দুজনকে দু হাতে মাথার ওপর তুলে নিয়ে আট দশ হাত দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। একজন একটা চাপা আর্তনাদ তুলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে পালাল, আর একজন বালির মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে রইল মড়ার মতো। অজ্ঞান হয়ে গেছে নিশ্চয়।

দৈত্যটা দু হাতে বুক চাপড়াল একবার। ঢাকের বাজনার মতো গুম্ গুম্ আওয়াজ উঠল তার থেকে। তারপরে হা-হা করে একটা বিপুল অট্টহাসিতে চারদিক কাঁপিয়ে তুলল সে। সে হাসির শব্দ শুনে শঙ্খদত্তের বুকের ভেতরটা অবধি ভয়ে হিম হয়ে উঠল।

—আর কেউ আসবে ?—হাসি থামলে জিজ্ঞাসা শোনা গেল দৈত্যটার।

কিন্তু আর কারো আসবার প্রশ্ন ছিল না। ভয়ে-আতঙ্কে বাকি লোকগুলো পিছু হটতে লাগল—কিছুক্ষণের মধ্যেই দুপাশে অদৃশ্য হল তারা। মুখ থুবড়ে যে পড়ে গিয়েছিল, সে আস্তে আস্তে উঠে বসল, তারপর চোখের বালি রগড়াতে লাগল দু হাতে ; গালের দু কষেই তার রক্তের রেখা।

দৈত্য আর দেরি করল না। হরিণটাকে একটা হ্যাঁচকা টানে তুলে নিল কাঁধের ওপর, তারপরে যেন নিতান্তই বেড়াতে বেরিয়েছে, এমনি মন্থর অলস-ভঙ্গিতে চলতে শুরু করল উল্টো দিকে।

প্রথম কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়ে দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে ছিল শঙ্খদত্ত, তারপরেই চেতনার মধ্যে খরধার বিদ্যুতের মতো কী একটা চমকে গেল তার। আর তারই আলোয় শঙ্খদত্ত নিজের মনের হিংস্র রূপটাকেও দেখতে পেল প্রত্যক্ষ।

জীবনে এই রকমই ঘটে। দিনের পর দিন নিজেকে নিয়ে রোমন্থন করেও যে প্রশ্নের সমাধান মেলে না—এমনি আকস্মিক ভাবেই তাদের চকিত মীমাংসা এসে দাঁড়ায় সম্মুখে। সে মীমাংসা চরম—সে নিরঙ্কুশ। হত্যা করা উচিত কি না এ নিয়ে নিজের ভেতরে আলোড়ন করা যায় মাসের পর মাস; কিন্তু হাতে যদি অস্ত্র পাওয়া যায় আর প্রতিপক্ষকে পাওয়া যায় নির্জনতায়, তা হলে আর চিন্তা করার প্রয়োজনই থাকে না।

সেই মীমাংসা—সেই উন্মত্ত সমাধান শঙ্খদত্তের রক্তের ভেতর ফুঁসে উঠল। বুকের মধ্যে ঝন্ ঝন্ করে কী একটা বেজে উঠল তার।

শঙ্খদত্ত লোকটার পিছু নিলে।

মন্থর গতিতে সেই ভাবেই হেঁটে চলেছে। প্রকাণ্ড কাঁধের নিচে দুলতে দুলতে চলেছে হরিণের ঝুলে-পড়া মাথাটা; বিশাল পা দুটোর হাঁটুর নিচে ঢেউয়ের মতো ওঠা-পড়া করছে শিরা-চিহ্নিত মাংসপিণ্ড। বালির ওপরে তার পায়ের পাতার অতিকায় ছাপ পড়া দেখতে দেখতে সঙ্গে চলল শঙ্খদত্ত।

দুধারের ফণী-মনসার গাছে যখন পথটা সংকীর্ণ হয়ে গেছে এবং আশে-পাশে আর একটি মানুষকেও দেখা যাচ্ছে না, তখন শঙ্খদত্ত ডাকল: শোন?

অত বড় শরীর নিয়ে যে অমন তীব্র গতিতে কেউ পেছন ফিরতে পারে শঙ্খদত্ত সেটা এই প্রথম দেখল। ক্রোধ আর সন্দেহে বীভৎস ভয়ঙ্কর লোকটার মুখ—হয়তো ভেবেছে তার পেছনে আসছে সেই মাংস-লোভীর দল—নির্জন জায়গার সুযোগ নিয়ে তাকে আক্রমণ করে বসবে!

আবার আতঙ্কে দু পা পিছিয়ে গেল শঙ্খদত্ত। কাঁধের ওপর থেকে সে ধপ করে হরিণটাকে ছেড়ে দিয়েছে মাটিতে। কী ধারালো লোকটার হাতের নখগুলো!

কিন্তু শঙ্খদত্তকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই মুখের কঠোর রেখাগুলো মিলিয়ে গেল। সহজেই বুঝতে পেরেছে, এ আর যেই-ই হোক, তার কোনো সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। অভিজাত চেহারা—সম্ভ্রান্ত বেশ-বাস। নিশ্চয় বণিক।

গলার স্বর সাধ্যমতো কোমল করে লোকটা বললে, বণিক কি আমাকেই ডাকছিলেন?

আর তৎক্ষণাৎ শঙ্খদত্তের মনের মধ্যে গুর্ গুর্ করে উঠল। খুব সু-বিবেচনার হয়নি কাজটা। এই মানুষজন-বর্জিত প্রায় জঙ্গলের মধ্যে লোকটা যদি তার গলা টিপে ধরে সর্বস্ব কেড়ে নেয়, তা হলে চিৎকার করবারও সুযোগ পাবে না সে; কিন্তু যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। এখন আর ফেরবারও পথ নেই তার।

শঙ্খদত্ত বললে, একটা কথা ছিল।

লোকটা এবারেও হাসল ঃ বুঝেছি। বণিক এই হরিণটাকে কিনতে চান ; কিন্তু এ আমি বেচব না। নিজে খাব বলেই নিয়ে চলেছি। চামড়াটাও আমার দরকার।

—না, হরিণ আমি কিনব না। আমার অন্য কথা আছে তোমার সঙ্গে।

—অন্য কথা? জিজ্ঞাসুভাবে তাকাল দৈত্যটা। শুধু সন্দেহে একবার কপালের রেখাগুলো কুঁচকে উঠলো তার।

—তোমার গায়ে খুব জোর আছে দেখছি।—শংখদত্ত খুব সহজ হতে চেষ্টা করল ঃ নাম কী তোমার?

—রাঘব।

—তা রাঘব নামটা বেমানান হয়নি।—শংখদত্ত আরো অন্তরঙ্গ হতে চাইল ঃ কিন্তু কাজটা ভাল করলে না তুমি।

দৈত্য আর একবার জিজ্ঞাসু চোখে দেখে নিলে শংখদত্তকে। মেঘাচ্ছন্ন সন্দিগ্ধ গলায় বললে, কেন?

—অতগুলো লোকের মুখের গ্রাস তুমি একলা কেড়ে নিলে?

রাঘব এবারে হাসল ঃ হরিণটাকে ওরা তাড়া করেছিল বটে, কিন্তু ঝাপটে ধরেছি আমিই। তারপরে মেরেছি আমি আমার ছোরা দিয়েই। চাইলেই কিছু ভাগ ওদেরও আমি দিতাম ; কিন্তু আমাকে বিদেশী দেখে ওরা চোখ রাঙিয়ে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে এল। তাই বিবাদ মেটাবার জন্যে সবটাই নিয়ে নিতে হল নিজেকে।

শংখদত্তও হাসল ঃ নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থাটা মন্দ নয় ; কিন্তু তুমি বিদেশী?

—হুঁ—।

—কোথায় তোমার ঘর?

—অনেক দূরে। গ্রামে মড়ক লাগল—আমার যারা ছিল, তারা মরে ফুরিয়ে গেল। যারা বেঁচে ছিল, তারা কে যে কোথায় পালাল তার হদিস রইল না। আমিও চলে এসেছি। নতুন ঘর বাঁধতে পারিনি—একটা জঙ্গলের মধ্যে থাকি এখনো।

শংখদত্ত চারদিকে তাকিয়ে দেখল একবার। কোথাও কেউ নেই। শুধু যতদূরে দেখা যায় ফণী-মনসার উদ্যত ফণা।

একবার গলাটা সে পরিষ্কার করে নিলে। তারপর বললে, কয়েকটা সোনার মোহর যদি পাও, তুমি কি তা দিয়ে ঘর বাঁধতে পার না?

—সোনার মোহর?—রাঘব চমকে উঠল, সবিস্ময়ে খাবি খেল কয়েকবার ঃ কে দেবে?

শংখদত্ত বললে, আমি।

রাঘব তবু বুঝতে পারল না। বললে, কেন?

—আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।

—কী কাজ?

—একটু শক্ত। সংসারে কেউ যদি পারে, তা হলে তুমিই পারবে।

রাঘব হেসে উঠল: তা পারব। যা কেউ পারে না—তা আমিই করতে পারি।—স্বর নামিয়ে বললে, আপনার মতলব খুলে বলুন, শেঠ। কাউকে খুন করতে হবে?

—তার কাছাকাছি।—নিজের কানে শয়তানের মন্ত্রণা শুনতে শুনতে ক্ষিপ্তপ্রায় শঙ্খদত্ত আরক্ত মুখে বললে, একটা মেয়েকে চুরি করে আনতে হবে।

—এই?—রাঘবের মুখে বৈরাগ্য প্রকাশ পেল: বড় নোংরা কাজ—বড় ছোট কাজ। ওসব করতে ইচ্ছে হয় না।

—যত সহজ ভাবছ তা নয়। এ সাপের মাথার মণি ছিনিয়ে আনার মতোই শক্ত।

রাঘব তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল: তাই নাকি? বেশ, সব কথা বলুন।

—তবে একটু এস ওদিকে, এ-কথা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলবার মতো নয়। অত্যন্ত গুরুতর।

মাটি থেকে হরিণটাকে তুলে নিয়ে আবার কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে দিলে রাঘব। তারপর বললে, চলুন।

সমুদ্রের ধারে পূর্বনির্দিষ্ট জায়গাটিতে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল শঙ্খদত্ত।

সামনে কালো সমুদ্রের অশ্রান্ত রাক্ষস-গর্জন। মৃত্যুর অসংখ্য ধারালো দাঁতের মতো চিকচিক করছে ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ফেনার চঞ্চলতা; আকাশ বাতাস পৃথিবী—সকলের বিরুদ্ধেই যেন একটা প্রবল অভিযোগে মাতাল হয়ে উঠেছে সমুদ্র—একটা ভয়ঙ্কর কিছু করতে চায়, তারই প্রলয়ঙ্কর সম্ভাবনা যেন তার বুক থেকে ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। ওপরে নক্ষত্রভরা আকাশ থেকে কারা বুঝি লক্ষ লক্ষ রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে দেখছে দুর্বিনীত সমুদ্রের এই মাতলামি। হয়তো একটু পরেই বজ্রের হুঙ্কারে নেমে আসবে তাদের তর্জিত শাসন।

উত্তরের তীক্ষ্ন হাওয়া দমকে দমকে এসে কালো উদ্দাম জলের ওপরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে। এতক্ষণ পরে থর-থর করে কাঁপছে শঙ্খদত্ত। ভয়ে, অনুতাপে, উত্তেজনায় আর শীতে। সারাদিন ধরে মস্তিষ্কের মধ্যে যে অগ্নিকুণ্ডটা জ্বলছিল, এতক্ষণে নিভে শীতল হয়ে গেছে তার উত্তাপ। তারই প্রতিক্রিয়া সারা শরীরে। যদি ধরা পড়ে রাঘব? যদি প্রাচীর পার হয়ে পেরিয়ে আসবার সময় ধরা পড়ে যায় খড়গধারী প্রহরীদের হাতে? তারপর—

শঙ্খদত্ত একবার রোমাঞ্চিত কলেবরে পেছনে ফিরে তাকাল। অন্ধকার। রাশি রাশি গাছপালা মৃত্যু-মূর্ছিত। জগন্নাথের মন্দিরের চূড়ো রাত্রির কালো আকাশেও আবছা রেখায় তাকিয়ে আছে প্রেত-প্রহরীর মতো। যদি ওই অন্ধকারে এখনু দপ্ দপ্ করে জ্বলে ওঠে মশালের আলো? যদি শোনা যায় দ্রুতগ্রামী অশ্বের পায়ের শব্দ?

না—কোথাও কেউ নেই। শুধু রাত্রি—শুধু স্তব্ধতা। ওখানে—

অতদূরে কী ঘটে চলেছে এখান থেকে অনুমান করবারও উপায় নেই। শুধু অপেক্ষা করে থাকা—শুধু রোমাঞ্চিত দেহে অনিশ্চিত আশঙ্কায় প্রহর-যাপন।

সামনেই ঢেউয়ের ওপর নৌকোটা অন্ধকারে নেচে উঠছে। দূরসমুদ্রে মিটমিট করে আলো জ্বলছে শঙ্খদত্তের বহরে। ওদের আদেশ দেওয়া আছে —তৈরি হয়েই আছে ওরা। শঙ্খদত্তের নৌকো পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গেই বহর খুলে দেবে। খরধার হাওয়া বইছে দক্ষিণ মুখে। এক রাত্রের মধ্যেই বহু পথ পার হয়ে যাবে—রাজার সৈন্যদল অত দূরে আর পৌঁছুতে পারবে না।

কিন্তু কী হল রাঘবের ?

সারা শরীরে সেই ভয়ের শীতলতা। দাঁতে দাঁতে ঠক-ঠক করে বাজছে শঙ্খদত্তের। বুকের মধ্যে দুলছে আর একটা আ-দিগন্ত তুহিন সমুদ্র, চিকচিকে ঢেউগুলোর মতো একটা অসহ্য চঞ্চলতা তরঙ্গিত হয়ে যাচ্ছে রক্তে।

ও কিসের—কিসের শব্দ ?

অত্যন্ত ক্ষিপ্র পায়ে যেন বালি-ডাঙার ওপর দিয়ে ছুটে আসছে কেউ। যেন হরিণের পদধ্বনি। না—একাধিক নয়, একজনই। অশ্বারোহী নয়, তলোয়ারের ঝঙ্কার নেই, জ্বলন্ত মশালও নেই। তা হলে—তা হলে ?

শীতল রোমকূপগুলোতে উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠা তীক্ষ্ন অগ্নিকণার মতো জ্বলতে লাগল। যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল চোখের দৃষ্টি। পায়ের তলার মাটিটাও দুলতে লাগল সমুদ্র হয়ে।

দূরাগত ওই শব্দে যেন অন্ধকারটাও ছুটে চলেছে। মনে হল, আকাশের তারাগুলো পর্যন্ত স্থানচ্যুত হয়ে নড়ে উঠল একবার। তারপর দেখা দিল সেই দৈত্যের মূর্তি। কী একটা ভার বয়ে আনছে সে। রক্ত ফুটে পড়তে চাইল শঙ্খদত্তের চোখের তারা থেকে—মাথার শিরাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে যেতে চাইল, চোখের ওপরে অসহ্য পীড়ন।

সামনে এসে দাঁড়াল রাঘব। যেন আবির্ভাব ঘটল কালপুরুষের। পাহাড়ের মতো চওড়া বুকের আড়াল থেকে তার হৃৎপিণ্ডের উদ্দামতাও দেখা যায় বুঝি! ঝোড়ো হাওয়ার মতো দীর্ঘশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন।

যেমন করে রক্তাক্ত সম্বর হরিণটাকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তেমনি ভাবেই কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে এনেছে তার শিকার। তারও মুখ বাঁধা, অচেতন মাথাটা রাঘবের কাঁধের ওপরে অসহায় করুণ ভঙ্গিতে দুলছে। সোনালি রোম নয়—নীল বিস্রস্ত শাড়ির আড়ালে সুকুমার শুভ্র শরীরের ঝলক!

আর সঙ্গে সঙ্গেই নিজের নিষ্ঠুরতাটা একটা তীরের মতো এসে বিঁধল শঙ্খদত্তকে। এই মুহূর্তে নিজেকে সে ক্ষমা করতে পারল না ; এই মুহূর্তে তার ইচ্ছে করল, রাঘবকে একটা কঠিন আঘাত করে বসে সে।

কিন্তু সময় ছিল না।

শ্বাস টানতে টানতে প্রায় অবরুদ্ধ গলায় রাঘব বললে, চন্দন বণিক, আর এক তিলও দেরি করবেন না।—তারপর অসাড় শুভ্র শরীরটাকে তেমনি এক হাতে চেপে ধরে সে লাফিয়ে উঠে পড়ল নৌকোয়। তৎক্ষণাৎ শঙ্খদত্তও তাকে

অনুসরণ করল।

নৌকোর খোলের মধ্যে অচেতন দেহটাকে শুইয়ে দিয়ে রাঘব পাল তুলে দিলে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে। হাল ধরল পর-মুহূর্তে। উত্তরের তীক্ষ্ন প্রবল হাওয়ায় ঢেউয়ের মাথায় ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে নৌকো এগিয়ে চলল দূরের বহরের দিকে। শঙ্খদত্ত অনিমেষ স্তব্ধ চোখে তাকিয়ে রইল অন্ধকারে অস্বচ্ছ একটা মৃত্যুম্লান তনুশ্রীর ওপরে। কোথায় রাজপ্রতাপ— কোথায় জগন্নাথ! কোথায় রায় রামানন্দ—আর কোথায় বা পড়ে রইল চৈতন্য! সকলের কাছ থেকে ছিনিয়েই সে নিয়ে চলেছে শম্পাকে। বৈষ্ণবের চোখের জল তার জন্যে নয়। সে জানে সে শাক্ত, আর শাক্তের কাছে নারী চিরদিনই বীরভোগ্যা। জীবনতন্ত্রের উত্তরসাধিকা।

তেরো

"Tenho minha pequena"

সুপর্ণার ভাষা অপরিচিত, কিন্তু তার চোখ বুঝতে পারল গঞ্জালো। সে চোখে বিশ্বাস, কৌতূহল আর হৃদ্যতা। সকালের আলোর মতোই উজ্জ্বল হাসি হাসল সে। শাদা ধবধবে দাঁতে, নরম নরম সোনালি চুলে, শান্ত কালো সামুদ্রিক চোখে হাসির মীড় ছড়িয়ে গেল।

দীর্ঘ-শুভ্র শিল্পীর আঙুলে বুকে টোকা দিলে গঞ্জালো: **Tenho minha pequena** (তুমি আমার বান্ধবী)—

সুপর্ণাও হাসল। মুগ্ধ চোখে দেখতে লাগল এই বিদেশী কিশোরটিকে। পর্তুগীজ! কত গল্প ওদের সম্পর্কে শুনেছে সুপর্ণা। ওরা শুধু একদল ডাকাত —এদেশে খালি লুঠ করতেই এসেছে। ওদের সম্পর্কে একটা ভয়াবহ ছবিই সুপর্ণা গড়ে নিয়েছিল কল্পনায়। সে ছবির মধ্যে একটা স্বাভাবিক মানুষ কোথাও ছিল না; কিন্তু ভারী আশ্চর্য হয়ে গেছে গঞ্জালোকে দেখে। এ তো তাদের কেউ নয়! নতুন পল্লবের রঙ্-মাখা এই মানুষটা যেন সোজা নেমে এসেছে আকাশ থেকে।

—**Pequena, minha pequena**—আবার বললে গঞ্জালো।

সুপর্ণাও একটা কিছু বলতে চাইল, কিন্তু কী বলবার আছে? একটি বর্ণও তো বুঝতে পারবে না! তবে একটা সহজ উপায় আছে—আতিথেয়তার সৌজন্য দেখিয়ে।

মুখে হাত তুলে ইঙ্গিত করে সুপর্ণা বললে, কিছু খাবে?

গঞ্জালো বুঝল। নম্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। ক্ষিদে তার পায়নি। তবু বন্ধুত্বের এই আহ্বান সে উপেক্ষা করতে পারল না। মাথা নেড়ে জানাল: সে খাবে।

কিছু করতে পারার উৎসাহে ভারি খুশি হয়ে উঠল সুপর্ণা। পাখির মতো চঞ্চল পায়ে তর্ তর্ করে নেমে গেল ভাঙা সিঁড়িটা দিয়ে। শীতের

রোদে তার চাঁপা রঙের শাড়ির প্রলেপ মাখিয়ে সে অদৃশ্য হল নতুন মহলের দিকে।

গঞ্জালো চেয়ে রইল। সামনে প্রকাণ্ড চত্বরটায় বড় বড় ঘাস উঠেছিল—শীতের ছোঁয়ায় একদল মরে-যাওয়া হলদে রঙের সাপের ছানার মতো এলিয়ে আছে তারা। মাথার ওপরে শাদা কালো শরীরে রোদের চমক নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দুটো শঙ্খচিল। শঙ্খচিলের পাখার সঙ্গে গঞ্জালোর চোখ মাটি ছাড়িয়ে আকাশের দিকে ছড়িয়ে গেল। নতুন মহলের ওপর দিয়ে বহু দূরান্তে নম্র-নীল ঝলমল করছে—এক ঝাঁক উড়ন্ত পায়রা সেখানে ; বসবার জায়গা খুঁজছে কোথাও। কখনো কখনো পায়রাগুলোকে মনে হচ্ছে একদল কালো পাখি, তার পরেই যখন এদিকে ঘুরে আসছে তখন তাদের শাদা বুকগুলো একরাশ শাদা তাসের মতো ঝকঝক করে উঠছে। যেন কতগুলো মাছ খুশিতে উলটে যাচ্ছে আকাশের নীল সমুদ্রে।

ওই আকাশ, আর ওই পাখিগুলোকে দেখতে দেখতে নিজের অস্তিত্ব ভুলে যাচ্ছিল কবি গঞ্জালো। কী নীল—কী নিবিড় এই আকাশ! তাদের দেশের আকাশও উজ্জ্বল—কিন্তু এত স্নিগ্ধ নয়। নিজের দেশ! খুব ছেলেবেলায় একবার সে বেড়াতে গিয়েছিল আলেমতেজোর জঙ্গলে। জলপাই, শোলার বন আর গোলাপ ফুলে ছাওয়া সে জঙ্গল তার মন ভুলিয়েছিল, তবু এদেশের সঙ্গে তার কত তফাত! শাদা মার্বেলের পাহাড়ের চাইতে কত আশ্চর্য অফুরন্ত ঘাসে-ছাওয়া এ দেশের মাটি!

আর এই মেয়েটি! **Minha pequena**! গঞ্জালোর মন একটা নরম খুশিতে ভরে উঠল।

কিন্তু মনের গতি থেমে গেল হঠাৎ। শিউরে উঠল গঞ্জালো।

চত্বরের একান্তে একটি মানুষ কখন এসে দাঁড়িয়েছে। এই লোকটিকে সে প্রথমে দেখেছিল সেই কাল-রাত্রে—নবাবের কয়েদখানা থেকে রুদ্ধশ্বাসে পালিয়ে আসবার পরে। জেণ্টুদের সেই পাহাড়ের মতো প্রকাণ্ড মন্দিরটার বাইরে পাথরের মতোই বসেছিল এই লোকটা। একটা বিশাল থাবায় তার হাতটা ধরে টেনে নিয়ে এসেছিল এইখানে।

তখন লোকটাকে মনে হয়েছিল বুঝি আফ্রিকার কাফ্রী—এর পরে তাকে আগুনে পুড়িয়ে খাবে। প্রথম তো ভয়ের সীমাই ছিল না। তারপর এখানে আশ্রয় পাওয়ার পরে তাকে আর দেখেনি—প্রায় ভুলেই গিয়েছিল তার কথা ; কিন্তু এখন—

আবার কোথা থেকে এসে হাজির হয়েছে সে। খানিকটা দূরে চত্বরের ভেতরে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে গঞ্জালোকে—যেমনভাবে শিকারীর লক্ষ্য থাকে পাখির দিকে। কী অদ্ভুত প্রকাণ্ড—কী অস্বাভাবিক মানুষ! এখানকার কারুর সঙ্গেই তার কোনো মিল নেই। পরনে লাল রঙের কাপড়, গলায় কাঠের মালা, কপালে যেন জমাট রক্ত দিয়ে কী সব আঁকা, মাথায় দুপাশে ডাইনীর মতো চুল।

গঙ্গালো শিউরে চোখ নামাল। শির্ শির্ করে ভয় নেমে গেল মেরুদণ্ডের হাড় বেয়ে।

প্রকাণ্ড লোকটা বেশিক্ষণ দাঁড়াল না। একটু পরেই আস্তে আস্তে হাঁটতে আরম্ভ করল, তারপর কখন কোন্‌দিকে যেন মিলিয়ে গেল সে।

আর তখনি গঙ্গালোর মন থেকে সুর কেটে গেল এই নীল আকাশের—এই পাখির। তখনি মনে হল এরা তার কেউ নয়—এখানে তার কোনো বন্ধু নেই। এর চেয়ে ঢের ভাল দোলাখাওয়া সমুদ্র, ঢের ভাল সেই দুধের মতো ধবধবে বিরাট মার্বেলের পাহাড়, সেই জলপাই পাতার লাল-সবুজ রঙ—সেই শোলা গাছের ছায়া। না—এ তার জায়গা নয়। এ তার শত্রুপুরী। পালানো যায় না এখান থেকে?

সকালের রোদে আবার চাঁপাফুলী শাড়ির ঝলক। ফিরে আসছে তার 'পেকেনা'। গঙ্গালো বিভ্রান্ত হয়ে চেয়ে রইল। কোন্‌টা সত্যি? ওই লোকটা, না, এই মেয়েটি?

প্রসন্ন মুখে ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল সুপর্ণা। থালায় কয়েকটা ফল, কিছু মিষ্টি। তবু গঙ্গালো যথেষ্ট খুশি হতে পারল না। একটা সুরযন্ত্রের তার কেটে গেছে। আর জোড় মিলছে না।

নিঃশব্দে কয়েকটা ফল দাঁতে কাটল গঙ্গালো। তারপর ইঙ্গিতে জানতে চাইল: কে ওই লোকটা?

—কে?—সুপর্ণা বুঝতে পারল না।

আকার-ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইল গঙ্গালো। হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলে চেহারার বিশালতা, মাথার জটার কথা, কপালের আঁকিবুকি।

সুপর্ণা তবু বুঝতে পারল না। শুধু হাসল।

গঙ্গালোও হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু হাসিটা তেমন স্বচ্ছ হয়ে ফুটল না এবার। কোথায় একটা কাঁটার মতো বিঁধতে লাগল খচ্ খচ্ করে।

তারপর গঙ্গালোর কাছে মাঝে মাঝে আসতে লাগল সুপর্ণা।

প্রথম প্রথম শুধুই কৌতূহল—যেন নতুন একটা খেলার জিনিস। রাজশেখরও আপত্তি করেননি। একটি মাত্র মেয়ে। বয়েস কিছু বেড়েছে, কিন্তু মন এখনো থমকে আছে ছেলেবেলায়। আজও খেলবার নেশা কাটেনি, এখনো পোষা পাখি মরে গেলে দু'দিন তার খাওয়া বন্ধ। এই নতুন খেলনা নিয়ে যে কয়দিন খেলতে চায়, খেলুক।

কিন্তু এই খেলনা যেদিন হঠাৎ কেড়ে নেওয়া হবে তার কাছ থেকে? ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে আচমকা? ভাবতেও গায়ের রক্ত একেবারে হিম হয়ে আসতে থাকে তাঁর। প্রাণপণে আত্মস্থ হতে চেষ্টা করেন রাজশেখর। বার বার ভাবতে চান: গুরু যা করবেন তা-ই ঠিক। তাঁর কিসের ভাবনা? শাস্ত্রে বলে, যে মুহূর্তেই গুরু শিষ্যকে দীক্ষা দেন, সেই মুহূর্ত থেকে নিজের কাঁধে তুলে নেন শিষ্যের সুকৃতি-দুষ্কৃতির ভার। তিনিই পারের কাণ্ডারী। রাজশেখর আউড়ে চলেন: অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া—

আর সুপর্ণা আর গঞ্জালো একটু একটু করে মনে মনে মিতালি পাতায়। ভূগোলের ব্যবধান, জাতির ব্যবধান, ভাষার ব্যবধান, সংস্কৃতির ব্যবধান। অথচ সব ছাড়িয়ে কোথাও একটা অদৃশ্য মিল খুঁজে পায় দুজন। সে মিল কৈশোরের—সে মিল জীবনকে প্রথম অনুভব করার চকিত আনন্দের।

আভাসে ইঙ্গিতে কথা চলে। সামান্যই বুঝতে পারে দুজনে। মুগ্ধ কৌতূহলে এ ওকে দেখে—বুঝতে চেষ্টা করে। দেখে দু'জনের বিচিত্র বেশ-বাস। গঞ্জালোর কচি জলপাই পাতার মতো গায়ের রঙ দেখে সুপর্ণা আশ্চর্য হয়ে যায়—গঞ্জালো দেখে সুপর্ণার শাড়ি, তার কালো চুল। মনে পড়ে যায় নিজের দেশকে। যব, ভুট্টা আর গমের ক্ষেতে চাষার মেয়েরা রঙীন পোশাক পরে কাজ করে—অজস্র সূর্যের আলোয় অপরিমিত হাসিতে উজ্জ্বল তাদের মুখ। তাদের সঙ্গে কোথায় যেন সাদৃশ্য আছে সুপর্ণার।

মিনহা পেকেনা! বার বার ডাকতে ইচ্ছে করে। মনে পড়ে তাদের দেশেও একটা নদী আছে—তার নাম 'মিনহো'। পাহাড়ের বুকের ভেতর দিয়ে তার ফেনিল জল বয়ে যায়। না—মিনহো নয়—টেগাস্। তার নিজের দেশের নদী টেগাস্। কোথা থেকে এসেছে কে জানে! আকাশের দিগন্তে যেখানে 'সেরা ডা এস্ট্রেলা'র চূড়ো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে—সেখান থেকেই কি নেমেছে টেগাসের নীল জল? গঞ্জালো জানে না; কিন্তু গঞ্জালোর ভাবতে ইচ্ছে করে, সেই টেগাসের ধার দিয়ে সে হাঁটছে সুপর্ণার পাশে পাশে; বারো মাস নানা রঙের গোলাপ ফোটে তাদের দেশে, তুষার-ঝরার মতো তাদের পাপড়ি উড়ে উড়ে এসে পড়ছে গায়ে, হাওয়া গন্ধে আকুল হয়ে গেছে। সিস্টাসের শাদা ফুলে চামর দুলছে, নদীর জলে কখনো কখনো এক একটা সার্ডিন মাছ লাফিয়ে উঠছে—সূর্যের আলোয় ঝিলিক দিচ্ছে তাদের রুপালি শরীর। পাশ দিয়ে উঁচু উঁচু চাকার ষাঁড়ের গাড়ি চলে গেল একখানা—তাতে বোঝাই করা পাকা মিষ্টি ডুমুর, সুস্বাদু লেবু। একটি চাষার মেয়ে মুখ-ভরা হাসি নিয়ে দু-মুঠো লেবু আর ডুমুর বাড়িয়ে দিলে তাদের দিকে।

ভাবতে ভাবতে চোখে জল আসে গঞ্জালোর। স্বর করুণ হয়ে আসে তার। গানের সুর গুনগুনিয়ে ওঠে গলায়। যখের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দেখা যায় মাতামুহুরী নদীর জল—হঠাৎ তাকে মনে হয় টেগাস—এই স্তব্ধ-গম্ভীর শিমুল-জারুল-গামার গাছগুলো আলেমতেজোর ঘন জলপাই বনে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

হঠাৎ গান ধরে গঞ্জালো।

প্রথমটা অদ্ভুত সুর শুনে সুপর্ণার হাসি পায়, তারপর আস্তে আস্তে অভিভূত হয়ে যায় মন। আশ্চর্য বিষাদ ভরা সুর। অর্থ বোঝা যায় না, তবু কেমন একটা বিষণ্ণতা লতিয়ে উঠতে থাকে বুকের ভেতরে।

অনেকক্ষণ ধরে গান করে গঞ্জালো। যখন থামে, সত্যিই তখন চোখে জল টলটল করছে তার।

সুপর্ণা ইঙ্গিতে জানতে চায় : কী এ গান ? কেন তুমি কাঁদছ ?

গঞ্জালো বলে যেতে থাকে নিজের ভাষায়। একটি বর্ণও সুপর্ণা বুঝবে না জেনেও বলার লোভ সামলাতে পারে না। যেন স্বগতোক্তির মতো বলে চলে, এ আমার দেশের গান, তার মাটির গান। এর নাম 'ফ্যাডোস্'।

সুপর্ণা তাকিয়ে থাকে। নিজের মনের সঙ্গে কথা কয় গঞ্জালো : ও-লা পেকেনা, তোমার দেশ খুব সুন্দর ; কিন্তু আমার দেশ তো তুমি দেখনি। তার পাহাড়ের কোলে কোলে কেমন করে সমুদ্রের ঢেউ মাতামাতি করে সে তো দেখনি তুমি। ভুট্টা আর যবের ক্ষেতের মাঝখানে আমাদের সেই সব গ্রাম, চারদিকে তার গোলাপের বাগান ; কাঠ আর পাথরের দেওয়াল বেয়ে কত ফুলের লতা উঠেছে, কত আঙুর পেকে থোকায় থোকায় দুলছে এখানে-ওখানে। কেমন উজ্জ্বল সূর্য আমাদের দেশে—আর কী মন-ভোলানো জ্যোৎস্না! সেই জ্যোৎস্না রাতে সমুদ্রের ধারে বসে মানুষ গায় এই 'ফ্যাডোস্'—কখনো বা এর সুর গোলাপ বনকে দোলা দিয়ে ভুট্টার শিষে কাঁপতে থাকে. কখনো বা জ্যোৎস্নার মায়া মাখানো জলপাই বনে আর কখনো পাইনের চূড়োয় এই ফ্যাডোস্ পরীর গানের মতো ছড়িয়ে যায়।

আবেগে চঞ্চল হয়ে ওঠে গঞ্জালো। আচমকা চেপে ধরে সুপর্ণার হাত।

—মিন্‌হা পেকেনা, চল আমার দেশে নিয়ে যাই তোমাকে। দেখবে সমুদ্রে কেমন করে মাছ ধরে আমার দেশের মানুষ—কত রং-বেরঙের কাপড় পরে আমাদের মেয়েরা সমুদ্রের ধারে মাছ শুকোয় আর গুচ্ছে গুচ্ছে পাকা আঙুর তোলে, কেমন করে বড় বড় গাছ থেকে খসিয়ে নেয় শোলার খোলস, কেমন করে লম্বা লম্বা ঘাসের জামা গায়ে দিয়ে হাঁটে বৃষ্টির দিনে। তোমাকে দেখাব আমাদের দেশে ষাঁড়ের লড়াই, তুমি আশ্চর্য হয়ে যাবে ; কিন্তু পেকেনা, সব চেয়ে খুশি হবে তুমি যখন শুনবে গীটারের বাজনা। ফ্যাডোসের সঙ্গে সঙ্গে তার বিষণ্ণ আর্তি তোমার মনকেও আকুল করে দেবে।

তারপর চুপ করে যায় গঞ্জালো। কত দূরে তার দেশ এখান থেকে! কত সমুদ্র, কত ঝড়, কত মৃত্যু, কত 'কাবে টরমেণ্টোসো'। জুসার্তে মার্টিম অ্যাফন্‌সো ডি-মেলো এখন কোথায় কে জানে! সেই দুঃস্বপ্নের রাত! পেড্রোর সেই বুকফাটা আর্ত চিৎকার! সব ভুলে যায় গঞ্জালো। এখন আলেমতেজোর বনের মধ্য দিয়ে সে চলেছে শোলাগাছ আর জলপাইয়ের ছায়ায় পাশে পাশে চলেছে তার বিদেশিনী পেকেনা। নিচু হয়ে গঞ্জালো তুলে নিলে একগুচ্ছ গোলাপ, সঙ্গিনীর হাতে দিয়ে বললে—

স্বপ্ন ভেঙে যায়। বিশ্রী শব্দ করে হয়তো বা একটা তক্ষক ডেকে ওঠে। যখের জঙ্গলে ঝাঁপিয়ে পড়ে রুক্ষ উত্তরের হাওয়া—ঝরঝরিয়ে মুঠো মুঠো শুকনো পাতা ঝরে পড়ে।

গঞ্জালোর ইচ্ছে হয় যে-কোনো একটা ফুল সে তুলে দেয় তার 'পেকেনা'র হাতে ; কিন্তু কোথায় ফুল ? এ তাদের দেশ নয়, এখানে বারোমাস গোলাপ ফোটে না, টেগাসের হাওয়ায় পাপড়ি উড়ে যায় না তার।

এখানে শীতের হাওয়া এখন। মৃত্যুর মতো শীতল অমাবস্যা ঘনিয়ে আসছে সম্মুখে। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় সুপর্ণা, তারপর যেখান থেকে এসেছিল অদৃশ্য হয়ে যায় সেদিকেই। গঙ্গালো তাকিয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে। ফ্যাডোসের সুর আবার নতুন করে মনে আনতে চায়, কিন্তু সে আর ফিরে আসে না।

অজস্র তারায় আকাশ ছেয়ে নামল অমাবস্যার রাত।

সেই বড় অসুখটা থেকে সেরে ওঠবার পর মা-মরা এই মেয়েটির প্রতি আরো বেশি দুর্বলতা এসেছে রাজশেখরের। বাঁচবার আশাই ছিল না, শুধু চন্দ্রনাথের দয়াতেই সেরে উঠেছে সে। সেই কৃতজ্ঞতার তাগিদেই রাজশেখর নতুন করে মন্দির তৈরী করিয়েছিলেন—তার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সাদর আহ্বান করে এনেছিলেন গুরু সোমদেবকে ; কিন্তু তার পরিণাম যে এমন দাঁড়াবে—এ তিনি ভাবতেও পারেননি। এখন মনে হচ্ছে, সম্ভব হলে নিজের হাতেই তিনি তাঁর ওই মন্দিরকে ভেঙে চুরমার করে ফেলতেন।

ক্ষোভ, অস্বস্তি আর ভয়ে বুকের ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে রাজশেখরের। যেন একটা প্রকাণ্ড সর্বনাশকে উদ্যত দেখছেন চোখের সামনে। এই ঘটনার পরিণাম যে তাঁকে কোথায় ঠেলে নিয়ে যাবে, সে তাঁর কল্পনারও বাইরে। নবাব জানতে পারলে তাঁর ক্রোধ কী মূর্তি নেবে কে বলতে পারে! কিন্তু সেও বড় কথা নয়। দেবতা—দেবতার কোপ। যিনি সুপর্ণাকে দয়া করে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি যদি—

আর ভাবতে পারেন না রাজশেখর। ইচ্ছে হয়, সোমদেবের কাছে গিয়ে স্পষ্ট সহজ ভাষায় জানিয়ে দেন ঃ এ হবে না গুরুদেব—এ আমি কিছুতেই হতে দেব না ; কিন্তু সে-কথা বলবার শক্তি নেই তাঁর। তাঁর এতটুকু সাহস নেই যে সহজ দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে দেখবেন সোমদেবের মুখের দিকে।

শোবার ঘরে এসে ঢুকলেন রাজশেখর।

এক কোণায় প্রদীপটা জ্বলছে ক্ষীণভাবে ; চারিদিকে ছায়া-ছায়া আলো। কিন্তু সুপর্ণা শোয়নি—চুপ করে বসে আছে খাটের একপাশে।

—এখনো ঘুমুসনি মা ?

—তুমি না এলে কী করে ঘুমুব বাবা ?

কথাটা ঠিক। অসুখ থেকে ওঠার পরে মেয়েটা তাঁকেই আঁকড়ে ধরেছে দু হাতে। ঘুমুবার আগে কিছুক্ষণ তার পাশে বসতেই হবে তাঁকে—হাত বুলিয়ে দিতে হবে চুলে-কপালে। আজও সে তাঁরই জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে।

—তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে বাবা ?

রাজশেখর বললেন, কাজ ছিল মা। তুই শুয়ে পড়্।

গায়ের আবরণটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল সুপর্ণা।

—তুমি শোবে না বাবা ?

—একটু দেরি হবে।—কথা বলতে স্পষ্ট অস্বস্তি বোধ করলেন রাজশেখর : গুরুদেব ডেকে পাঠিয়েছেন—যেতে হবে তাঁর কাছে।

—গুরুদেবকে আমার একেবারে ভাল লাগে না।—অস্ফুট মৃদু গলায় সুপর্ণা বললে।

—ছিঃ মা, ও-কথা বলতে নেই।

সুপর্ণা তবু থামল না : কী ভীষণ চেহারা! দেখলেই ভয় করে।

—উনি মহাপুরুষ মা! সাধারণ মানুষের মতো তো নন; কিন্তু ও-সব বলতে নেই ওঁর সম্পর্কে—পাপ হবে।

পাপ? শুধু সেই ভয়ই নয়। শুধু পারলৌকিক নয়—ইহলোকেও অনিষ্ট করবার একটা ভয়ংকর শক্তি আছে ওঁর—এটা মনে মনে অনুভব করেন রাজশেখর। তা ছাড়া এই মুহূর্তে গুরুদেব সম্বন্ধে কোনো কথাই ভাবতে চান না—তাঁর সম্পর্কে ভুলে থাকতে পারলেই একান্ত খুশি হন তিনি।

—আমাদের মন্দির প্রতিষ্ঠা কবে হবে বাবা?

—শীগগিরই।

সুপর্ণা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বললে, আমি নিজে রোজ পুজোর ফুল তুলে দেব।

—তাই হবে।

—তোমার আজ কী হয়েছে বাবা?—একটা আকস্মিক প্রশ্ন এল সুপর্ণার।

—কী হবে আবার?—রাজশেখর চমকে উঠলেন। এই প্রদীপের ক্ষীণ আলোতেও কি তাঁর মুখের রেখাগুলোকে বুঝতে পেরেছে সুপর্ণা—পেয়েছে তাঁর মনের আভাস? রাজশেখর একটা ঢোঁক গিললেন।

—কই, কিছু তো হয়নি। কী আর হবে?

—তবে তুমি ভাল করে কথা বলছ না কেন?—সুপর্ণার স্বরে অনুযোগ শোনা গেল।

—এই তো বলছি।—রাজশেখর শুকনো হাসি হাসলেন।

—না, বলছ না।—প্রায় স্বগতোক্তির মতো বললে সুপর্ণা।

রাজশেখর জোর করে সহজ হতে চাইলেন—হাতটা সস্নেহে নামিয়ে আনলেন সুপর্ণার কপালে।

—কী পাগলী মেয়ে! রাত হয়েছে—এখন ঘুমো।

—কোথায় বেশি রাত হয়েছে? যখের জঙ্গলে এখনো তো শেয়াল ডাকেনি!

—ডেকেছে—ডেকেছে।—অসহায় ভাবে রাজশেখর বললেন, তুই শুনতে পাসনি!

—শেয়াল ডেকেছিল—আমি শুনতে পাইনি! নিজের মনেই গুঞ্জন করতে লাগল সুপর্ণা। রাজশেখর তাকিয়ে রইলেন প্রদীপটার দিকে। মিটমিট করছে—একটু পরেই নিভে যাবে। তারপরেই একটা নিতল-নিচ্ছেদ অন্ধকার। ঘরে। বাইরে। তাঁর মনের মধ্যে। আগামী ভবিষ্যতে।

সুপর্ণা আবার ডাকল : বাবা!

—কী ?

—ওই খ্রীষ্টান ছেলেটার নাম কী ?

রাজশেখর থরথর করে কেঁপে উঠলেন।

—কী হল বাবা ?

—কিছু হয়নি—শীত করছে।—প্রায় রুদ্ধ গলায় জবাব দিলেন রাজশেখর।

—ওই ছেলেটার নাম কী বাবা ?

—জানি না তো।

সুপর্ণা আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, কী একটা বুঝতে চাইল রাজশেখরের মুখের দিকে তাকিয়ে। কোথায় যেন ঠেকছে। বাবার গলার স্বরে স্বাভাবিক সুর লাগছে না।

সুপর্ণা আবার বললে, ও এখন তো আমাদের এখানেই থাকবে ?

নিজের মনের মধ্যে যুদ্ধ করতে করতে রাজশেখর প্রাণপণে বললেন, থাকবে বইকি। কোথায় যাবে আর ?

—ওর দেশে যাবে না ?

—যাবে। সময় হলে।

—ওঃ।—সুপর্ণা চুপ করে কী ভাবতে লাগল। রাজশেখর তেমনি তাকিয়ে রইলেন ক্ষীণ-দীপ্তি প্রদীপটার দিকে।

—কী রকম নীল্‌চে ওর চোখ—কী অদ্ভুত সোনালি চুল! আর কী যে কথা বলে—একটাও বুঝতে পারা যায় না!—সুপর্ণা নিজের সঙ্গে কথা কইতে লাগল: জান বাবা, আর কী ছেলেমানুষ! ভাল করে খেতেও জানে না এখনো। মিষ্টি খেতে দিয়েছিলাম, হাত থেকে অর্ধেক তার গড়িয়ে পড়ে গেল।

অসহ্য! শরীরের শিরাগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে—মাথার মধ্যে রক্ত ভেঙে পড়ছে ঢেউয়ের মতো। রাজশেখর উঠে দাঁড়ালেন।

—তুই ঘুমো মা—আমি আসছি।

প্রদীপটাকে উজ্‌লে দিয়ে পলাতকের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন রাজশেখর। ওই নিভে-আসা আলোটা যেন একটা অশুভ সম্ভাবনার প্রতীক! একটা সমুদ্র-সীমার ফেনরেখা!

সুপর্ণা কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়ে রইল। আজ বাবার যেন কী হয়েছে। কী একটা বিরক্তিকর ভাবনায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আছেন তিনি। সুপর্ণা খানিকটা ভাববার চেষ্টা করল—তারপর তার চিন্তার মোড় ঘুরে গেল সোনালি চুল আর কচি পাতার রঙের আশ্চর্য কিশোরটির দিকে। কেমন ভরাট গম্ভীর গলা—কেমন দীর্ঘ সুঠাম শরীর, আর কী ছেলেমানুষ! ভাল করে খেতেও পারে না এখনো।

পেকেনা! একটা শব্দ কানে লেগে আছে সুপর্ণার। কী ওর অর্থ? কী বলতে চায় ?

অর্থটা ভাবতে ভাবতে একটা কোমল অনুভূতি সুপর্ণার বুকের মধ্যে

ছড়িয়ে যেতে লাগল, একটা শান্ত স্নেহে আচ্ছন্ন হয়ে উঠল মন। কাল সকালে আবার দেখা হবে—তাকে দেখে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে—বেশ বোঝা যাবে, তারই জন্যে সে অপেক্ষা করে আছে। আচ্ছা, ও কেন ফিরে যেতে চায় নিজের দেশে? তাদের এখানে থাকলেই বা ওর ক্ষতি কী? আর বাবারও এ ভারী অন্যায়! অমন করে ওই পুরনো ভাঙা মহলে কেন জায়গা দেওয়া ওকে? ওর পেছনেই তো যখের জঙ্গল—একটা সাপ-টাপ উঠে আসতে পারে যে-কোনো সময়ে। না, কালই কথাটা বলতে হবে বাবাকে।

কিশোর কাব্যের প্রথম শ্লোকে সুপর্ণার চোখে আস্তে আস্তে নেশার মতো ঘুম নেমে এল। আর ঘুমের মধ্যে সে টুপ্ টুপ্ করে শিশির পড়ার আওয়াজের সঙ্গে শুনতে লাগল: পেকেনা—মিন্‌হা পেকেনা!

তারাগুলো আরো উজ্জ্বল হল—আরো নিবিড় হল অমাবস্যার রাত। যখের জঙ্গলে ডেকে উঠতে গিয়েই থমকে গেল শিয়ালরা। সুপর্ণার ঘুমের সঙ্গে সঙ্গে সোমদেবের নেশা-জড়ানো মন্ত্রপাঠ আরো গভীর—আরো অলৌকিক হয়ে উঠতে লাগল। চারদিকে ঝম ঝম করতে লাগল স্তম্ভিত অরণ্য—ভাঙা বেদীটার ফাঁক দিয়ে শীতের ঘুম ভাঙা একটা সাপ একবার মুখ বের করেই মশালের লাল আলোয় ভয় পেয়ে আবার লুকিয়ে গেল ফাটলের আড়ালে।

স্তব্ধ রাত্রির ওপর দিয়ে সোমদেবের মন্ত্রোচ্চার ভেসে চলল—পার হল পুরনো মহল—এসে পৌঁছুল সুপর্ণার ঘরে। তখন সে ঘরে পুঞ্জিত অন্ধকার—প্রদীপটা নিবে গেছে অনেকক্ষণ আগেই।

জেগে উঠল সুপর্ণা।

কী যেন একটা ঘটেছে—কোথায় কী যেন হয়ে চলেছে রাত্রির আড়ালে। সুপর্ণা অর্থহীন ভয়ে উঠে বসল বিছানার ওপরে। ডাকল: বাবা!

কোনো সাড়া নেই।

আবার ডাকল: বাবা!

এবারেও সাড়া পাওয়া গেল না।

অন্ধকারে চকমকি হাতড়ে নিয়ে ঠুকল সুপর্ণা। চকিতের আলোতেই দেখা গেল—বাবার বিছানা খালি—কেউ নেই সেখানে।

শুধু দূর থেকে—দিগন্ত পার হয়ে যেন একটা মন্ত্রের ধ্বনি আসছে। কোথায় পুজো হচ্ছে—কে পুজো করে? সুপর্ণা সম্মোহিতের মতো উঠে পড়ল—বেরিয়ে এল বারান্দায়। ঝাড়গুলো নিবু নিবু—মশালগুলোও আর জ্বলছে না এখন। একটা তরল অন্ধকার। আর—আর যখের জঙ্গলে কী যেন একটা হচ্ছে—গাছপালার মাথায় আলোর আভা—একটানা মন্ত্রধ্বনির অস্বাভাবিক গুঞ্জন।

স্বপ্নাহতের মতো বারান্দা দিয়ে চলল সুপর্ণা—নেমে এল চত্বরে, পার হল অন্ধকার খিড়কির দরজা—। ওই তো শোনা যাচ্ছে সেই মন্ত্রের নিরবচ্ছিন্ন আহ্বান।

সুপর্ণা এগিয়ে চলল।

কিন্তু যে-মুহূর্তে সে সেই আলো আর ভাঙা বেদীর সামনে পৌঁছুল, সেই মুহূর্তেই আকাশ-ফাটানো আর্তনাদ তুলে পড়ে গেল মাটিতে। পড়ে গেল জমে-আসা একরাশ রক্তের ওপর।

বেদীর ওপরে যেখানে একটা কালী-মূর্তির দুদিকে মশাল জ্বলছে রক্ত-আলো ছড়িয়ে—সেখানে, মূর্তির পায়ের কাছে মাটির পাত্রে একটা ছিন্নমুণ্ডু। তার নিবিড় চোখ আর কোনো দিন খুলবে না—তার সোনালি চুল এখন রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে! আর সে দেখবে না টেগাসের স্বপ্ন—'সেরা ডা-এস্ট্রেলা'র চূড়ো আর তার মন কাড়বে না—জ্যোৎস্নায় কাঁপা জলপাই পাতার মর্মরে আর সে কোনোদিন শুনবে না বিষণ্ণ করুণ ফ্যাডোসের ঐকতান।

—গুরুদেব, গুরুদেব, এ কী করলেন!—চিৎকার করে ছুটে এলেন নিথর হয়ে থাকা রাজশেখর—আছড়ে পড়লেন সুপর্ণার অচেতন দেহের ওপরে।

চোদ্দ

—"Al diablo que te-doy"—

সমস্ত জিনিসটাই এমন আকস্মিকভাবে ঘটে গেল যে শঙ্খদত্ত নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। আজ পুরো তিনটি দিনের পরেও তার মনে হচ্ছিল যেন মধুকের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে একটা স্বপ্নের মধ্যে ডুবে আছে সে; সে স্বপ্ন তার উত্তপ্ত কামনা দিয়ে গড়া—অসম্ভব কল্পনার কারুকার্য দিয়ে খচিত। হঠাৎ এক সময় স্বপ্ন ভেঙে যাবে—কল্পনার বুদ্বুদগুলো মিলিয়ে যাবে হাওয়ায়। বিভ্রান্ত চোখ মেলে সে দেখবে উদ্ধব পাণ্ডার ঘরের জানালা দিয়ে সকালের আবছা আলো এসে পড়েছে—ঘরের কোণে সদ্য-নিবে-যাওয়া প্রদীপটার একটা উগ্র গন্ধ, তার শিথিল স্নায়ুগুলোতে একটা বিরক্তিকর অবসাদ; আর হয়তো তখনি বাইরে শোনা যাবে কয়েকটা স্পর্ধিত পায়ের শব্দ, কয়েকটা তলোয়ারের চাপা ঝঙ্কার, কাঁপতে কাঁপতে ছুটে আসবে পাণ্ডা, বলবে—

ডিঙার ছাদের ওপরে যেখানে বসেছিল, সেইখানেই থরথরিয়ে উঠল শঙ্খদত্ত। উত্তরের হাওয়া বইছে সমুদ্রে—ঢেউয়ের নাগরদোলায় দুলতে দুলতে চলেছে বহর। বাতাসে শীতের আমেজ নেই; আছে রোমাঞ্চ। তবুও একটা তীক্ষ্ণ শীতলতার স্রোত বইছে শরীরের ভেতরে।

শঙ্খদত্ত পেছন ফিরে তাকাল। এতদূরে কোথায় জগন্নাথের মন্দির—কোথায় তার উদ্ধত চূড়ো? কোথায় তার নিশীথ পলায়নের ওপরে দারুব্রহ্মের কঠিন চোখের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি? চৈতন্যের কীর্তনের সুর তো এখানে শোনা যায় না।

প্রাণহীন জলের মরুভূমিতে শুধু মৃদু গর্জন করে চলেছে একটা জান্তব প্রাণ : তার নেপথ্যে হাঙরের বুভুক্ষা—তার গভীর অতলে একটু একটু করে দল মেলেছে চিত্র-প্রবাল—অন্ধকার আকাশে সারি সারি নক্ষত্রের মতো তার নীল-কাজল নির্জনতায় অগণিত শুক্তার বুকে জ্বলছে মুক্তোর প্রদীপ। ওপরে শুধু শূন্যতা—শুধুই শূন্যতা। অসহ্য লবণাক্ত এক জলাভূমি। পৃথিবীর হৃদয়।

ঠিক কথা। পৃথিবীর হৃদয় এই সমুদ্র—তার হৃৎপিণ্ড। নিরবচ্ছিন্ন স্পন্দনের মতো নিরন্তর ঢেউ। কটুস্বাদ লবণ-জর্জর তার অতৃপ্তি ; ওই হাঙরের ক্ষুধায় তার অসহ্য কামনার পীড়ন। তার নিঃসঙ্গ সত্তার আকাশে মুক্তোর দীপান্বিতা।

শুধু পৃথিবীর হৃদয় নয়, তারও হৃদয় ; কিন্তু সে হৃদয়ের সন্ধান কি এখনো সম্পূর্ণ পেয়েছে শম্পা ? যেটুকু দেখেছে তা শুধু ঝড়ের ঢেউ। যে-ঢেউ অকস্মাৎ প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে জলস্তম্ভে ; হঠাৎ দানবের মতো বাহু বাড়িয়ে কেড়ে নেয় নিশ্চিন্ত আশ্রয় থেকে, তারপরে ভাসিয়ে দেয় সর্বনাশা বিপর্যয়ের উদ্দামতায়। শঙ্খদত্তের মধ্যে শম্পা প্রত্যক্ষ করেছে সেই লুব্ধ বর্বর জন্তুটাকে : দেখেনি প্রবাল দ্বীপ, দেখতে পায়নি অসংখ্য মুক্তোর আশ্চর্য ইন্দ্রধনু।

কোথা থেকে যে ওই লোকটা এল—ওই রাঘব ! শঙ্খদত্তের সন্দেহ হয় : ও কখনো ছিল না—শম্পাকে নৌকোয় তুলে দেওয়ার পরে একরাশ ধোঁয়ার মতো নিরস্তিত্ব শূন্যতায় মিলিয়ে গেল বুঝি ! শঙ্খদত্ত শুনেছিল, এক রকমের তান্ত্রিক-প্রক্রিয়া আছে—সেই অভিচারের নির্ভুল আচরণ করতে পারলে মানুষের মনের ভেতর থেকেই সৃষ্টি হতে পারে এক কল্প-পুরুষ। একটা কবন্ধ-দৈত্যের মতো মস্তিষ্কহীন হৃদয়হীন নিষ্ঠুর পশুত্ব সে—তার সাহায্যে যে-কোনো কূট ক্রূর কামনার নিরাকৃতি চলে। ওই রাঘবকেও তেমনিভাবে সৃষ্টি করেছিল সে। ও আর কেউ নয়—তারই বীভৎস বাসনার রূপমূর্তি !

নিজের সৃষ্টির কাছে নিজেই হার মেনেছিল শঙ্খদত্ত। তখন আর ফেরবার পথ ছিল না। ওই অন্ধ শক্তিটা যেন তাকে জোর করে টেনে নিয়ে চলেছিল একটা দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে ; কিন্তু এখন—

এখন আর শম্পার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস নেই তার।

শুধু শম্পা নয়—নিজের মনের মুখোমুখিই কি দাঁড়াতে পারে সে ? এই জন্যেই কি সে বেরিয়েছিল দক্ষিণ পাটনে—এই কি তার প্রতিশ্রুতি ছিল গুরু সোমদেবের কাছে ? দেবতাদের কাছ থেকে যাত্রার আগে সে যে আশীর্বাদী নিয়েছিল সে কি দেবতার সেবিকাকে হরণ করবার জন্যেই ?

একবার মনে হয়েছিল—দেবদাসীকে আবার যথাস্থানেই ফিরিয়ে দিয়ে আসে সে ; কিন্তু তারপর ? দেবদাসীকে হয়তো ফিরিয়ে দেওয়া যায়—কিন্তু নিজের আর ফিরে আসা চলে না। রাজার জল্লাদ শুধু খড়্গ দিয়ে তার মুণ্ড-চ্ছেদ করবে তা-ই নয়—তার দেহ হয়তো টুকরো টুকরো করে খেতে দেওয়া হবে কুকুরকে। অথবা, আরো ভয়ঙ্কর—আরো নিষ্ঠুর কোনো শাস্তি—যা তার কল্পনা থেকেও বহুদূরে !

দুদিন শম্পার কাছ থেকে দূরেই পালিয়ে ছিল সে। কথা বলতে পারেনি, তাকাতে পারেনি মুখের দিকে। প্রথম উত্তেজনার অবসাদ কেটে যেতেই মনে হয়েছে, সে অশুচি। দেবতার নৈবেদ্যের কাছে এগিয়ে যাওয়ার সাহস কোথায় তার—স্পর্ধা কই ?

তারপর ঃ

তারপর আজ নিজেই কথা বলেছে শম্পা।

—এ তুমি কি করলে শ্রেষ্ঠী ?

চারদিকে সমুদ্র না হয়ে সমতল হলে ছুটে পালিয়ে যেত শঙ্খদত্ত; কিন্তু পালাবার যখন উপায় নেই, তখন মরীয়া হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

—দেবতার কাছে অনর্থক ফুরিয়ে যেতে দিইনি তোমাকে। জীবনের প্রয়োজনে উদ্ধার করে এনেছি।

শম্পার গভীর সুন্দর চোখ ঝকঝক করতে লাগল ঃ আমি উদ্ধার হতে চাই কে বলেছিল তোমাকে ?

—কেউ বলেনি, আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

আহত নারীত্ব শম্পার চোখের দৃষ্টিতে উগ্র হয়ে উঠল ঃ তোমার দুঃসাহসের সীমা নেই শ্রেষ্ঠী। আমাকে নিয়ে আসনি—নিজের মৃত্যুকে এনেছ সঙ্গে। যে রাক্ষসটাকে তুমি পাঠিয়েছিলে—সে রাজার প্রহরীকে গলা টিপে খুন করেছে, তারপর আমার মুখে কাপড় বেঁধে ছিনিয়ে এনেছে আমাকে। তুমি কি ভেবেছ এতবড় ধৃষ্টতা রাজা সহ্য করে যাবেন ? তাঁর নাবিকের দল এতক্ষণে বেরিয়ে পড়েছে সমুদ্রে—তাদের হাত থেকে তোমার কিছুতেই নিস্তার নেই।

—কিন্তু সমুদ্র বিরাট। বিরাট তার আশ্রয়।

অহমিকায় এবং ক্রোধে ঝল্‌মল্‌ করে উঠল শম্পার কণ্ঠ ঃ রাজার প্রতাপও সমুদ্রের মতোই বিশাল; কিন্তু তাঁর চাইতেও শক্তিমান মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। কালপুরুষের মতো তাঁর দৃষ্টি—পৃথিবীর যে-প্রান্তেই তুমি পালাও সে দৃষ্টি তোমাকে অনুসরণ করবে।

—তা হোক। তোমাকে পেয়েছি সেই অহঙ্কারেই যে-কোনো পরিণামকে আমি স্বীকার করে নিতে পারব।

—কিন্তু আমাকে পেয়েছ, এ অহঙ্কারই বা তোমার এল কোথা থেকে ? গায়ের জোরে ছিনিয়ে এনেছ বলেই আমি তোমার কাছে ধরা দেব, এ ধারণা তোমার কী করে জন্মাল ? আমার গুরু রায় রামানন্দ শুধু নৃত্যশিক্ষাই আমাকে দেননি, আরো বড় ঐশ্বর্য দিয়েছেন তার চেয়ে।

শম্পার দিকে এবার পূর্ণদৃষ্টি ফেলল শঙ্খদত্ত। শ্বেতপদ্ম নয়—ক্রোধে আর উত্তেজনার উত্তাপে কনকচাঁপার মতো মনে হচ্ছে শম্পার মুখ। আজ আর নীল পাহাড়ের ওপরে রক্তমেঘের ছায়া পড়েনি; আজ পাহাড়ের চূড়োয় ফুলের কঞ্চুক—একটু বিস্রস্ত—তার ওপরে বাসন্তী রঙের রোদ ঢেউ খেলে চলেছে। শঙ্খগ্রীবা থেকে গলিত সূর্যের দুটি ধারা নেমে এসে মিশে গেছে সেই রৌদ্রের ভেতরে।

নিজের মোহের জালটাকে জড়িয়ে আনতে একটু সময় লাগল শঙ্খদত্তের। তারপর কোমল গলায় বললে, সে অপরাধ ক্ষমা কর শম্পা।

—আমি ক্ষমা করবার কে?—শম্পা চোখ ফিরিয়ে নিলেঃ অপরাধ তোমার দেবতার কাছে। দেবতার দণ্ডই তোমার ওপরে নেমে আসবে।

—আর তুমি?—এতক্ষণে প্রশ্রয়ের আশায় একটু একটু করে লুব্ধ হয়ে উঠতে লাগল শঙ্খদত্তঃ তুমি কি আমার দিকে মুখ তুলে চাইবে না?

—দুরাশার মাত্রা বাড়িয়ো না বণিক—শম্পার স্বর চাবুকের মতো লিক্ লিক্ করে উঠলঃ আমি দেবতার। যেদিন থেকে মন্দিরে সেবিকার কাজ নিয়েছি, সেদিনই দেবতার সঙ্গে আমার সপ্তপদী হয়ে গেছে। আমি দেববধূ।

—কিন্তু শম্পা—

—না, আর কোনো কথা নয়। ভুল মানুষে করে। সর্বনাশা মূঢ়তা জেনেও কেউ কেউ জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। সে দুর্বলতা আমি বুঝতে পারি; কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের সময় তোমার আছে শ্রেষ্ঠী! এর পরে যে-বন্দরে তোমার বহর ভিড়বে, তুমি সেখানেই নামিয়ে দেবে আমাকে।

শঙ্খদত্ত আবার তাকিয়ে দেখল কনকচাঁপা মুখের দিকে—আবার তার চোখের দৃষ্টি এসে আটকে গেল পাহাড়ের চূড়োর ওপর—বিচিত্র কণ্ডুক ফুলের সমারোহ যেখানে। হঠাৎ যেন নিজের সম্পর্কে চকিত হয়ে উঠল শম্পা—শঙ্খ-গ্রীবা পর্যন্ত দুলে উঠে এল বাসন্তী রৌদ্রের তরঙ্গ।

—বণিক!—শম্পার স্বরে ভৎ‍র্সনা।

লজ্জিত শঙ্খদত্ত সরিয়ে নিলে চোখ। তারপর কয়েকটা নিঃশব্দ মুহূর্ত ভরে দুজনের ভেতরে সমুদ্রের কলধ্বনি বাজতে লাগল। হঠাৎ শঙ্খদত্তের মনে হলঃ ওই বিরাট—ওই বিশাল সমুদ্রটাকে এতক্ষণ তারা ভুলে ছিল কী করে?

সমুদ্রের ধ্বনিকে থামিয়ে দিয়ে আবার বেজে উঠল শম্পার কণ্ঠ।

—যে-কোনো বন্দরে, যে-কোনো ঘাটে তুমি আমায় নামিয়ে দাও। আমি আমার দেবতার কাছে ফিরে যাব।

—কিন্তু একটা জিনিস তুমি ভুল করছ শম্পা। পুরীধাম থেকে অনেকখানি পথ আমরা পার হয়ে এসেছি। এখন তোমাকে নামিয়ে দিলেও ফিরে যাওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব।

—কেন অসম্ভব?

—তোমার রূপ দেখে লুব্ধ হওয়ার মতো মানুষ পৃথিবীতে আমি কেবল একাই নই।

—আমি দেববধূ। গর্বিত ক্রোধে শম্পার সমস্ত শরীর দীপিত হয়ে উঠলঃ দেবতাই আমাকে রক্ষা করবেন। আর রক্ষা করবেন চৈতন্য।

—দেবতা? চৈতন্য?—মৃদু হাসির রেখা ফুটতে চাইল শঙ্খদত্তের ঠোঁটের কোণায়। নাস্তিক সে নয়—তবু নাস্তিকের মতোই তার মনে হলঃ দেবতা আজ রূপান্তরিত হয়েছেন দারুব্রহ্মে। মন্দিরের আসনে স্থির-স্থাবির তিনি—

আশ্রিতকে রক্ষা করার শক্তি নেই তাঁর বজ্র-বাহুতে। যদি থাকত, শম্পাকেও রক্ষা করতেন তিনি। আর চৈতন্য? সে শুধু ভাবের উচ্ছ্বাসে লুটিয়ে পড়তে পারে, গাইতে পারে উদ্দাম সংকীর্তন। চৈতন্যেরও যদি কোনো অলৌকিক শক্তি থাকত, তা হলে ওই রাক্ষস রাঘব এমন ভাবে দেবতার কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারত না তাকে। সেই মুহূর্তেই তার ক্রোধবজ্র আকাশ থেকে নেমে এসে পুড়িয়ে ছাই কার দিত তাকে।

শঙ্খদত্তের মনের কথা কি বুঝতে পারল শম্পা? হয়তো খানিকটা বুঝল—হয়তো অনুমান করে নিল খানিকটা।

—হাঁ, দেবতা।—তেমনি গর্বিতভাবেই শম্পা বললে, তিনি আমার সঙ্গেই আছেন। তোমাকেও সে-কথা আমি মনে করিয়ে দিতে চাই বণিক। যদি আমাকে স্পর্শ করার বিন্দুমাত্র দুঃসাহসও তোমার মনে জাগে, তাহলে চারদিকে সমুদ্রে রয়েছে দেবতার কোল—সেইখানেই তিনি আমায় আশ্রয় দেবেন।

সমুদ্র? তাই বটে। ইচ্ছে করলেই তার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারত শম্পা—শরণ নিতে পারত দেবতার কোলে; কিন্তু সে তো নেয়নি। কেন নেয়নি? যে মুহূর্তেই চূড়ান্ত অপমানের মধ্য দিয়ে শঙ্খদত্ত এইভাবে তাকে হরণ করে এনেছে—সেই মুহূর্তেই তো সে স্বচ্ছন্দে আত্মবিসর্জন করতে পারত, কিন্তু সে করেনি।

কেন করেনি? কেন করেনি সে?

শম্পা বললে, তুমি এখন আমার সামনে থেকে সরে যাও শেঠ। তোমাকে আর আমি সহ্য করতে পারছি না।

শঙ্খদত্ত উঠে পড়ল; কিন্তু হতাশা নিয়ে নয়—ব্যর্থতা নিয়েও নয়। শম্পা তো এখনো আত্মহত্যা করেনি। কেন করেনি?

শঙ্খদত্ত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল সমুদ্রের অশ্রান্ত বিক্ষোভকে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে মল্লিকার পাপড়ি ঝরে যাচ্ছে অবিরাম। অসহ্য তৃষ্ণার লবণাক্ত এক জলাভূমি। ল্যাজের ঝাপ্টা দিয়ে মাথা তুলল একটা হাঙর—প্রাণভয়ে ঝটপট করে আকাশে ছিটকে পড়ল এক ঝাঁক উড়ুক্কু মাছ, কিন্তু ওই হাঙর ছাড়াও আরো কিছু বেশি আছে সমুদ্রে—আছে তার অন্ধকার অতলে চিত্র-প্রবাল, আছে শুক্তির হৃদয়-পুটে মুক্তার দীপাবলী।

কিন্তু সে সন্ধান কি শম্পা পাবে কোনোদিন? কবেই বা পাবে?

হয়তো পাবে না। আর এক সমুদ্রের ডাক বুঝি সে শুনতে পেয়েছে।

তাই ঢেউয়ের কলরোল ছাপিয়েও কিছুক্ষণ পরে তার কানে এল শম্পার স্বর। যেন কান্না—যেন কোন আকুল আর পীড়িত হৃদয়ের প্রার্থনা ঃ

"পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং
মূকমাবর্তয়েৎ শ্রুতিম্‌
যৎকৃপা তমহং বন্দে
কৃষ্ণ-চৈতন্যমীশ্বরম্‌।"

কৃষ্ণ! চৈতন্য! একবারের জন্যে নিজের দু কান দু হাতে চেপে ধরতে

ইচ্ছে হল শঙ্খর। তারপরই একটা ক্রুদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বিতার মতোই মনে হল, আচ্ছা দেখা যাক—চৈতন্যই তবে রক্ষা করুক শম্পাকে।

শঙ্খদত্তের বড় ডিঙার দুটো ভাগ। একটা মুখের দিকে—আর একটা অংশ পেছনে দাঁড়ের দিকে। ঠিক যেন দুখানা বড় বড় ঘরে ভাগ করা। মাঝখানে বিচিত্র চন্দনকাঠের একটি দরজা।

শম্পা ওই পেছনের অংশটায় থাকে—সম্মুখের দিকে আশ্রয় নিয়েছে শঙ্খদত্ত। নিশীথ রাতে যখন কালো সমুদ্রের সমস্ত কলধ্বনি একটা গভীর অর্থে মুখর হয়ে ওঠে, শুধু আকাশের তারার দিকে পলকহীন চোখ মেলে হাল ধরে বসে থাকে 'কাঁড়ার', ডিঙার নিচে সঞ্চিত মোম আর লাক্ষার গন্ধের সঙ্গে চন্দনকাঠের গন্ধ ঘন হতে থাকে, তখন শঙ্খদত্তের ঘুম ভাঙে।

মাঝখানে একটি মাত্র দরজা। তার ওপারেই ঘুমিয়ে আছে শম্পা। ঘুমিয়ে আছে? না, তার স্বামী জগন্নাথের ধ্যান করছে? কিংবা অভয় প্রার্থনা করছে তার নতুন গুরুর কাছে: 'কৃষ্ণ-চৈতন্যমীশ্বরম্?'

ভাবতেই সমস্ত মন দপ্ দপ্ করে জ্বলে ওঠে। কানে বাজে পিশাচের মন্ত্রণা। কিসের ভয়—কিসের সংকোচ? ইচ্ছে করলেই তো তাকে তুমি গ্রাস করতে পারো। এখুনি—এই মুহূর্তেই। শিকার তো একেবারে তোমার মুঠোর মধ্যেই।

কিন্তু সম্পূর্ণ মুঠোর মধ্যে বলেই তো কুণ্ঠা আরো বেশি। বীভৎস কাপুরুষ মনে হয় নিজেকে। যদিও জোর করেই সে শম্পাকে ধরে এনেছে, তবু এখন যেন নিজেকে দেখতে পায় একটা কদাকার লম্পটের ভূমিকায়। মনে হয়, শম্পা যেন একটা বহুমূল্য রত্নের মতো তার দেহকে গচ্ছিত রেখেছে তার কাছে। অসহ্য লোভে সেদিকে হাত বাড়িয়ে বিশ্বাসের মর্যাদা নষ্ট করতে পারবে না সে—এমন বর্বর সে নয়।

এরই ফাঁকে ফাঁকে আছে আত্মগ্লানির দহন। অবদমনের দুঃসহ চেষ্টায় সে হাতে মুখ গুঁজে বসে থাকে, লেহন করে নিজেরই রক্তঝরা ক্ষতকে। কখনো কখনো একটা ভয়াবহ আকাঙ্ক্ষার জ্বর তার মস্তিষ্কের কোষগুলোকে আক্রমণ করতে চায়। তার ডিঙার ঠিক নিচেই মোম আর লাক্ষার একটা বিরাট ভাণ্ডার। যদি একবার চকমকি ঠুকে সে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়? আর দেখতে হবে না, কয়েক লহমার মধ্যেই কর্পূরের মতো জ্বলে উঠবে সব। সে মুছে যাবে, পুড়ে ছাই হয়ে যাবে তার এই বিকৃত কামনা—

কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারে, আত্মনিগ্রহটা তার মনোবিলাস, তপ্ত ইক্ষুরস পান করার মতো দুঃসহ আনন্দ। ওই আনন্দটুকু পাওয়ার জন্যেই তো এই যন্ত্রণার সার্থকতা। পাপবোধটা তার একটা নেশা মাত্র—মদের মতোই কণ্ঠ-জ্বালানো নেশা। এই জ্বালা বয়েই শম্পাকে সে কেড়ে এনেছে—এই জ্বালার লোভেই আগুনের পুতুলের মতো শম্পাকে নিজের বুকে সে জড়িয়ে ধরবে। মরতে সে পারবে না, আর পারবে না বলেই মৃত্যু-জল্পনা এত সহজ হয়ে দেখা দিয়েছে তার কাছে।

একদিন। দুইদিন।

এক রাত। দুই রাত।

একটি রাত্রি জাগর-তন্দ্রার কণ্টকিত অস্বস্তি দিয়ে ছাওয়া ; আর একটি রাত্রি শুধু বিনিদ্র আরক্ত চোখ মেলে বসে থাকা—যেন মৃগহীন অরণ্যে ক্ষুধিত বাঘের নিশিপালন।

তবুও জোর করতে চায়নি শঙ্খদত্ত। মনের দরজা না খুলে তবুও সে ছুঁতে চায়নি দেহকে। ফুলকে ফোটাতে চেয়েছে, তার কুঁড়িকে ছিঁড়তে চায়নি টুকরো টুকরো করে ; কিন্তু এবার ধৈর্যের বাঁধ টলে উঠছে তার। চন্দনকাঠের দরজার সামান্য খিলটুকু ভেঙে ফেলতে কতক্ষণ লাগে! তারপর তাকে বাধা দেবার কেউ-ই নেই। পুরীধাম অনেক দূরে পিছিয়ে পড়েছে—ঠুঁটো জগন্নাথের বাহু এগিয়ে আসতে পারবে না এতদূরে। চৈতন্যের ভক্তেরা তাদের প্রভুকে ঘিরে ঘিরে পরম উৎসাহে খোল-করতাল বাজাচ্ছে—সেই কোলাহল ছাপিয়ে শম্পার আর্তস্বর কিছুতেই সেখানে গিয়ে পৌঁছুবে না।

তৃতীয় রাত্রিতে শয্যা ছেড়ে উঠেই বসল শঙ্খদত্ত। আজ শুয়ে থাকার চেষ্টাও বিড়ম্বনা বলে মনে হচ্ছে।

আজ সকালেই তাকে আবার প্রত্যাখ্যান করেছে শম্পা।

—দোষ তোমার নয় শেঠ। অপরাধ আমারই।

লুব্ধ আর মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিল শঙ্খদত্ত। শুনছিল উদগ্র আগ্রহে।

—দুর্বলতা এসেছিল আমারও। প্রাকারের পাশে ওইভাবে তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে করুণা এসেছিল আমার মনে। হয়তো একটুখানি মোহও মিশে গিয়েছিল তার সঙ্গে। তাই তোমাকে আমি ডেকে এনেছিলাম। অস্বীকার করেছিলাম বিধিবিধান, ভুলে গিয়েছিলাম আমি দেবতার বধূ। সীতার মতো সেইখানেই আমি গণ্ডি পার হয়েছি আর সেই দুর্বলতার সুযোগে তুমি আমাকে এনেছ রাক্ষসের মতো।

যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করে উঠল শঙ্খদত্ত ঃ আমি রাক্ষস!

—শুধু তুমি রাক্ষস নও, পাপ আমারও। আমিও তো পবিত্র নই—আমারও মোহ ছিল নিশ্চয়।

শঙ্খদত্তের চোখ জ্বলে উঠল।

—তবে আর দ্বিধা কেন শম্পা? দুজনেই যখন পাপের মধ্যে পা দিয়েছি, তখন ফেরবার চেষ্টা কেন আর? এস, দুজনেই এবার এক পথে এগিয়ে চলি। দেবতার ভালমন্দ নিয়ে দেবতা থাকুন, মানুষের মতো বাঁচি আমরা। মরবার পরে একসঙ্গেই নরকে চলে যাব।

শম্পা চুপ করে রইল। যেন কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

—শম্পা!—শঙ্খদত্ত ডাকল ঃ সাড়া দাও, কথা বল।

শম্পার দু-চোখ কেমন ছায়া-ছায়া হয়ে এল। পাপ—নরক! নেশা! সেই নেশার ঘোর তারও লেগেছে। যেন দু-ধারে দোল খাচ্ছে সে, কোন্‌টাকে যে আঁকড়ে ধরবে ঠিক করতে পারছে না!

—শম্পা, তুমি হৃতা !—জ্বরতপ্ত গলায় শঙ্খ বলে চলল, ইচ্ছায় তুমি দেবতার কাছে আসনি, দেবতা তোমায় জোর করে লুটে এনেছিল। বীরকেই তুমি মালা দেবে শম্পা, সে দেবতাই হোক আর মানুষই হোক।

—দেবতার চেয়ে মানুষের ওপর আমার লোভ বেশি, তা তুমি জান বণিক। তাই এমনি ভাবে আমাকে তুমি চঞ্চল করে তুলতে চাইছ। যে মোহে একদিন তোমাকে ভেতরে ডেকে এনেছিলাম, তার রন্ধ্রপথেই তুমি আনতে চাইছ বন্যাকে ; কিন্তু সে আর হতে পারে না। জগন্নাথ আমার প্রভু, চৈতন্য আমার মন্ত্রদাতা, গুরু রামানন্দ আমার রক্ষাকবচ। বণিক, দোহাই তোমার, আমাকে দুর্বল করতে চেয়ো না। আমি মানুষ—আমার রক্তমাংস আছে—একথা তুমিও ভোল, আমাকেও ভুলতে দাও।— শম্পার চোখে জল এল।

প্রথম দিনে এ-কথা বলেছিল শম্পা, আজও তার পুনরুক্তি করল ; কিন্তু সেদিন বলেছিল গর্ব আর ক্রোধের সঙ্গে—শঙ্খকে আরো উত্তেজিত, আরো মাতাল করে দিয়ে। সেদিন শঙ্খ বুঝলেন, ক্রোধের তারটা যত বেশি টানা, ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও ততই বেশি। কিন্তু এই অশ্রুর সামনে সে দাঁড়াবে কেমন করে ? জলসিক্ত কন্থার ছোঁয়ায় অঙ্গার যেমন করে নিবে যায়, তেমনি করেই হিমাক্ত অবসাদে যেন নিশ্চেষ্ট হয়ে গেল শঙ্খদত্ত। লুব্ধ-ক্ষুব্ধ ইন্দ্রিয়গুলো অসাড় হয়ে গেল তার—পরাভূত ভাবে মাথা নিচু করে শম্পার কাছ থেকে সরে এল সে।

কিন্তু তারপরে আবার রাত এসেছে ; আবার একটু একটু করে দৃপ্ত হয়েছে মন, আবার একটা যন্ত্রণা দপ্ দপ্ করছে মাথার মধ্যে। তার পরে মধ্যরাত তার সমস্ত হিংস্রতা নিয়ে বলয়ের মতো ঘিরে ধরেছে শঙ্খদত্তকে। বাইরে শীতের পাণ্ডুর জ্যোৎস্না। সমুদ্রের কলশব্দ। আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে স্থির নিশ্চল কাঁড়ার। কী গভীর—কী সীমাহীন নির্জনতা চারিদিকে ! দিগন্ত-বিস্তার এই জলের অরণ্যে কোথাও কোনো বাধা নেই শঙ্খদত্তের—কোথাও কোনো প্রহরী নেই যে শম্পাকে রক্ষা করতে পারে !

লাক্ষা আর শুকনো মৌচাকের অবরুদ্ধ গন্ধ। অতি সহজেই ওরা জ্বলে উঠতে পারে। শুধু জ্বলে না—জ্বালাতেও পারে, ঘটাতে পারে কল্পনাতীত অগ্নিকাণ্ড। নিচের ঠোঁটে দাঁত চেপে নিথর হয়ে বসে রইল শঙ্খদত্ত। শেষ চেষ্টা—শেষ বার ঠোঁট কেটে রক্ত পড়তে লাগল, নোনা স্বাদে ভরে উঠল মুখ, তবু নিজেকে সে সংযত করতে পারল না।

শঙ্খদত্ত উঠে দাঁড়াল। মৃদু ঢেউয়ের ওপর ডিঙা দুলতে দুলতে চলেছে। একবার দুবার টাল খেয়ে নিজেকে সে সহজ করে নিলে, তারপর এগিয়ে গেল চন্দনকাঠের খোদাই করা দরজাটার দিকে।

একটু ছোঁয়া লাগতেই দরজা খুলে গেল—সঙ্গে সঙ্গে দু পা পিছিয়ে গেল শঙ্খদত্ত। যেন একটা অদম্য শত্রু মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে তার। একবারের জন্য যেন সে অনুভব করল ওই দরজার পাশে খড়্গ হাতে করে বসে আছে রাজার জল্লাদ ! ঠিক সামনেই পেতলের একটা জলপাত্র চকচক করে উঠল, সে যেন

দারুব্রহ্মের রুদ্ধ চোখ।

বিভ্রান্তিটা কেটে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। কানে পিশাচের তীব্র ভর্ৎসনা। মূর্খ—নির্বোধ! কাকে ভয় পাও তুমি? কিসের আশঙ্কা তোমার? ছিনিয়ে আনবার সাহস যদি তোমার থাকে, তবে এত কুণ্ঠা কেন আত্মসাৎ করতে?

অদ্ভুত দুঃসাহস শম্পার—শংখদত্ত ভাবল। পাশের ঘরে একটা ক্ষুধিত রাক্ষসের নগ্ন লোলুপতার কথা ভেবেও কোন্ ভরসায় সে খুলে রেখেছে দরজাটা? তার ওপর বিশ্বাস? না, শম্পা আশা করে দেবতা তাকে পাহারা দেবেন, তার রক্ষাকবচ হয়ে থাকবে চৈতন্যের আশীর্বাদ—তার চারদিকে নিরাপদ গণ্ডি টেনে রেখেছেন রামানন্দ?

অসহ্য!

গুঁড়ি মেরে শঙ্খদত্ত ভেতরে ঢুকল।

কাঁচের আধারের মধ্যে একটা মোমবাতি জ্বলছে তখনো। প্রায় পুড়ে এসেছে, তার অন্তিম দীপ্তিটা এখন প্রকাণ্ড একটা হীরের মতো ধক্ ধক্ করছে। আর সেই আলোয় শিথিল ক্লান্ত ভঙ্গিতে ঘুমিয়ে আছে শম্পা।

কিন্তু কি ভেবেছিল সে ঘুমের মধ্যে? সে কি মনে করেছিল আবার সে এসে দাঁড়িয়েছে তার প্রভু জগন্নাথের মন্দিরে—আবার নাচের তালে তালে, দেহছন্দে, মুদ্রায় মুদ্রায় আত্ম-নিবেদনের পালা? তাই প্রায় নিজেকে সে এমন করে এলিয়ে দিয়েছে?

সেই পুড়ে আসা মোমবাতির হীরের মতো আলোয় কী দেখল শংখদত্ত? শম্পার শুভ্র করুণ দেহের সমস্ত রেখাগুলো অবারিত হয়ে আছে তার সামনে। অথচ এ কি হল তার? সাপের মাথার উপর কোথা থেকে নেমে এল একটা মন্ত্রপড়া শিকড়?

শম্পার এই নগ্নতা তো লালসা জাগাল না বুকের মধ্যে! কোথা থেকে একটা শীতল ভয় যেন থাবা দিয়ে তার হৃৎপিণ্ডকে চেপে ধরল! মনে পড়ে গেল সেই মন্দির—সেই মৃদঙ্গ আর বাঁশির আওয়াজ—সুরের স্রোতে ভেসে যাওয়া শ্বেতপদ্মের মতো সেই অপূর্ব নৃত্য-নিবেদন। সেই মন্দিরের কত দূরে দাঁড়িয়েছিল শংখদত্ত! মাটি থেকে মুখ তুলে দেখছিল তারাকে!

ভয়! একটা শীতল ভয়ে হৃৎপিণ্ড অসাড় হয়ে গেল তার। শম্পার নগ্নতা যে এত ভয়ংকর—এত সুন্দর, কে জানত সে কথা! যেমন গিয়েছিল তেমনি নিঃশব্দেই পালিয়ে এল শংখদত্ত। সমস্ত শরীর তার হাওয়া-লাগা পাতার মতো কাঁপছে। না—শম্পাকে সে আর কোনদিনই ছুঁতে পারবে না।

*   *   *   *

সজোরে মুখের তামাটে দাড়িগুলো মুঠো করে ধরলে কোয়েলহো। বললে, এ সহ্য করা যায় না—কিছুতেই নয়।

ভ্যাসকনসেলস্, একটা চামড়ার মশক থেকে খানিকটা মদ ঢালল গেলাসে।

—কিন্তু কী করতে চাও?

—একটা শিক্ষা দেওয়া দরকার ওই মুরগুলোকে। যেমনভাবে আলমীডা

একদিন কামনের মুখে ওদের উড়িয়ে দিয়েছিলেন—ঠিক সেই রকম। রক্ত আর আগুন ছাড়া এদের বুঝিয়ে দেবার উপায় নেই যে বাঘের হাঁয়ের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলে তার পরিণাম কী দাঁড়াতে পারে।

মদের গেলাসে চুমুক দিয়ে ভ্যাস্‌কন্‌সেলস্‌ বললে, কিন্তু আলবুকার্ক বলেছিলেন ওই রক্ত আর আগুনের নীতি এদেশে চলবে না। এখানকার মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে, তাদের বিশ্বাসভাজন হতে হবে, তারপর আস্তে আস্তে বাণিজ্য বিস্তার করতে হবে—

অধৈর্যভাবে টেবিলে একটা চাপড় বসাল কোয়েল্‌হো। ঝন্‌ ঝন্‌ করে উঠল ভুক্তাবশেষ ভোজনপাত্রগুলো।

—ভুল—ভুল করেছেন আলবুকার্ক। সেই ভুলের দাম দিতে হচ্ছে আজ। একটি ক্রীশ্চানের রক্ত ঝরলে তার বিনিময়ে একশো মুরের গর্দান নেওয়া উচিত। বন্ধুত্ব—বিশ্বাস! সেটা মানুষের সঙ্গে চলতে পারে, কিন্তু এ সমস্ত বিশ্বাসঘাতক বুনো জানোয়ারদের সঙ্গে কখনো নয়।

গেলাসের জন্যেও আর অপেক্ষা করলে না কোয়েল্‌হো। চামড়ার মশকটা তুলে নিয়ে ঢক ঢক করে খানিকটা উগ্র পানীয় ঢেলে দিলে গলায়।

—এই মুরেরা চোট-খাওয়া বাঘ। কিউটার যুদ্ধের অপমান ওরা ভোলেনি, ভোলেনি আল্‌হামরার কথা। সুযোগ পেলেই ওরা আমাদের ওপর লাফিয়ে পড়বে। বন্ধুত্ব পাতিয়ে নয়— তলোয়ার দিয়েই ফয়সালা করতে হবে ওদের সঙ্গে।

—নুনো ডি কুন্‌হা বলেন—এত বড় দেশে ওদের সঙ্গে বিরোধ রেখে আমরা টিকতে পারব না। তা ছাড়া রাজ্যজয় আমরা তো করতেও আসিনি। আমরা চাই বাণিজ্য। বিরোধ করে সে বাণিজ্য—

—চুলোয় যাক্‌ ডি-কুন্‌হা!—কোয়েল্‌হো গর্জন করে উঠল: মরে গেছে হিসপানিয়া, পর্তুগীজ ভুলে গেছে তার শক্তির কথা, ভুলে গেছে আজ লিস্‌বোয়াই পৃথিবী শাসন করে। তা নইলে এ দীনতা কেন? শুধু বাণিজ্য চাই না আমরা, শুধু মশলা চাই না—চাই ক্রীশ্চান। সেই ক্রীশ্চান কি হাত বাড়িয়ে ডাকলেই চলে আসবে দলে দলে? নবাবেরা অনুমতি দেবে মস্‌জেদের পাশে পাশে ইগ্রেঝা তুলবার? যা করতে হবে গায়ের জোরেই। গড়তে হবে সাম্রাজ্য। মাটির ওপরে দখল না থাকলে মানুষের মনের ওপরেও দখল আসবে না।

ভ্যাস্‌কন্‌সেলস্‌ চিন্তা করতে লাগল।

কোয়েল্‌হো মত্ত গলায় বললে, আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকত, তা হলে ওই চাকারিয়াকে আমি শ্মশান করে দিয়ে আসতাম। নবাবের মাথাটাকে বল্লমে বিঁধে উপহার নিয়ে যেতাম ডি-কুন্‌হার কাছে। ডি-মেলোর এতক্ষণ যে কী হয়েছে—কে জানে!

—নবাব কখনো ডি-মেলোকে হত্যা করার সাহস পাবে না।

—এই নির্বোধদের কিছুই বিশ্বাস নেই; কিন্তু আমি তোমাকে বলে

রাখছি ভ্যাস্‌কন্‌সেলস্‌, যদি সত্যই ডি-মেলোর তেমন কিছু ঘটে, আমি ডি-কুন্‌হার হুকুমের অপেক্ষা রাখব না। দেখব, আমাদের কামান নবাবের তলোয়ার-বন্দুকের চাইতে জোরে কথা বলে কিনা।

সমুদ্রে শীতের জ্যোৎস্না উঠেছে। ম্লান—মৃদু জ্যোৎস্না। পাশের গোল জানালাটা দিয়ে সমুদ্রের দিকে একবার তাকালো ভ্যাস্‌কন্‌সেলস্‌। বললে, ওসব কথা ভাবা যাবে পরে। এস, খেলা যাক খানিকটা।

এক প্যাকেট তাস টেনে বের করলে সে। তারপর গুছিয়ে নিয়ে বাঁটতে আরম্ভ করল।

মাঝখানে মস্ত বড় একটা জোরালো আলো জ্বলছে। দুজনে হাতে তাস তুলে নিতেই সেই আলো প্রতিফলিত হল তাসের মধ্যে। তখনি দেখা গেল, সাধারণ তাসের চাইতে এরা স্বতন্ত্র, একটু বিশিষ্ট। তাসের বড় বড় বিন্দুর আড়াল থেকে এক একটি করে জলরঙা ছবি ফুটে উঠতে লাগল আলোতে।

সে ছবি আর কিছুই নয়। কতগুলো অশ্লীল রেখাচিত্র—নানা ভঙ্গিতে দেহ-মিলনের কতগুলো বীভৎস রূপায়ণ। নির্জন সমুদ্রে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে ভাসতে ভাসতে নারী-সঙ্গহীন ক্লান্ত দিনযাত্রায়, যৎসামান্য সান্ত্বনার উপকরণ।

দুজনের মনেই তীব্র খানিকটা তাপ ছিল আগে থেকেই। মদের তীক্ষ্ণ নেশায় তা তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। তাই খেলার চাইতে ওই জলরঙা ছবিগুলোই যেন বেশি করে আচ্ছন্ন করে ধরতে লাগল দুজনকে। কোয়েল্‌হোর তো কথাই নেই—এমন কি অপেক্ষাকৃত শান্ত ভ্যাস্‌কন্‌সেলসেরও যেন মনে হতে লাগল ঃ এই মুহূর্তে কিছু একটা করা চাই। কিছু ভয়ঙ্কর—কিছু একটা পৈশাচিক!

নাঃ, অসম্ভব!

ক্রুদ্ধ কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠে কোয়েল্‌হো আবার তুলে নিলে মদের মশকটা। ঢক ঢক করে ঢালতে লাগল গলায়। আরো নেশা চাই—আরো!

জানালার ফাঁক দিয়ে ভ্যাস্‌কন্‌সেলসের দৃষ্টি এবারে চঞ্চল হয়ে উঠল।

—দূরে একটা বহর যাচ্ছে না?

—বহর? কিসের বহর?—রক্ত-চোখে জানতে চাইল কোয়েল্‌হো।

অভিজ্ঞ চোখের দৃষ্টিকে আরো তীক্ষ্ণ প্রসারিত করে—কুঞ্চিত কপালে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ভ্যাস্‌কন্‌সেলস্‌। তারপর বললে, মনে হচ্ছে জেণ্টুরদের।

—জেণ্টুরদের!—টেবিল ছেড়ে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল কোয়েল্‌হো ঃ এখুনি—আর দেরি নয়।

—কী করতে হবে এখুনি? কিসের দেরি নয়?—দ্বিধাজড়িত গলায় প্রশ্ন করল ভ্যাস্‌কন্‌সেলস্‌।

—লুঠ করতে হবে ওই বহর, পুড়িয়ে দিতে হবে, জ্বালিয়ে দিতে হবে—পৌরাণিক কাহিনীর নরমাংসভোজী কোনো দৈত্যের মতোই উঠে দাঁড়িয়ে

পা বাড়াল কোয়েল্‌হো।

—কিন্তু নুনো ডি-কুন্‌হা—

—চুলোয় যাক্‌ ডি-কুন্‌হা!—কোয়েল্‌হো বেরিয়ে গেল বেগে। একটা কাঠের সঙ্গে লেগে ঝন্‌ ঝন্‌ করে বেজে উঠল তার কোমরের দীর্ঘ বিশাল তলোয়ার।

—ক্যাপিতান!

ভ্যাস্‌কন্‌সেলস্‌ বেরিয়ে এল পিছে পিছে; কিন্তু তখন আর কোয়েল্‌-হোকে নিবৃত্ত করার সময় ছিল না তার। হয়তো মনের জোরও নয়।

—'Al diablo que te-doy—' (শয়তান নিক তোদের) দাঁতে দাঁত চেপে বললে কোয়েল্‌হো।

কামানের ডাকে রাত্রির সমুদ্র কেঁপে উঠল হঠাৎ। নিরবচ্ছিন্ন অশান্ত ঢেউয়ের দল যেন দাঁড়িয়ে গেল স্তব্ধ হয়ে। দূরের বহর থেকে একটা বুকফাটা আর্তনাদ ছড়িয়ে গেল চারদিকে।

ভীত-বিহ্বল শঙ্খদত্ত উঠে দাঁড়াল নিজের জাহাজের ওপর। একটা শাদা পতাকা দোলাতে দোলাতে চিৎকার করে উঠল: কেন—কেন তোমরা আমাদের আক্রমণ করছ? আমরা নিরস্ত্র—আমরা গৌড়ের বণিক—

সে চিৎকার শুনল না কোয়েল্‌হো—শুনতে পেল না তার কামান। পরক্ষণেই আর একটা গোলা এসে জাহাজের অর্ধেক মাথাসুদ্ধ শঙ্খদত্তকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে রাত্রির কালো শীতল সমুদ্রে। ডিঙা এক দিকে কাত হয়ে পড়ল—ধূ ধূ করে জ্বলে উঠল তার লাক্ষার স্তূপ।

সন্ত্রস্ত পশুর মতো কাঁড়ার আর মাল্লারা ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল জলে। নিক্ষিপ্ত একটা তীরের মতোই দ্রুতগতিতে সমুদ্রের নোনা জলে হারিয়ে যেতে যেতে শঙ্খদত্তের শুধু একটা কথাই মনে হল: শম্পা? শম্পার কী হবে? তাকে কি এইবার রক্ষা করতে পারবেন জগন্নাথ, পারবেন "কৃষ্ণ-চৈতন্যমীশ্বরম্‌?"

পনেরো

"Estou Cansado!—Estou Cansado!"

চার বছর পরে।

আবার একটি প্রসন্ন সকালে যখন কর্ণফুলীর জল সূর্যের আলোয় রাঙা হয়ে উঠছে, তখন পাঁচখানা পর্তুগীজ জাহাজ এসে ভিড়ল চট্টগ্রামের বন্দরে।

সকলের মাঝখানে সমুন্নতশির রাফাএল্‌। বিশাল গম্ভীর মূর্তিতে যেন ঘোষণা করছে লিস্‌বোয়ার গৌরব—নুনো ডি-কুন্‌হার রাজপ্রতাপ। আর তারই ওপরে দাঁড়িয়ে আছেন অ্যাফন্‌সো ডি-মেলো—ক্যাপিতান। এই বহরের তিনি নেতা।

এবার সত্যিই চট্টগ্রামের বন্দর। স্বপ্নে নয়—কল্পনায় নয়। সেই দুর্বুদ্ধি আরাকানীটার মতো পথ ভুলিয়ে কেউ তাঁকে পৌঁছে দেয়নি চাকারিয়ার ঘাটে। নবাব খোদাবক্স খাঁ নেই—সেই বিভীষিকার পুনরাবৃত্তিও আর ঘটবে না। এ যাত্রায় তিনি চট্টগ্রামের প্রত্যাশিত আর সম্মানিত অতিথি।

খাজা সাহেবউদ্দিন ধুরন্ধর লোক। শুধু তিন হাজার ক্রুজাডোর বিনিময়ে তিনি যে ডি-মেলোকে উদ্ধার করেছেন তাই নয়; তাঁর চেষ্টাতেই এতদিনে স্বপ্ন সফল হতে চলেছে নুনো ডি-কুনহার।

তার জন্যে সাহেবউদ্দিন প্রতিদান নেননি তা নয়। যথেষ্টই নিয়েছেন। তবু—তবু সাহেবউদ্দিনের কাছে কৃতজ্ঞতার সীমা নেই ডি-কুনহার। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে পর্তুগীজেরা আজকের এই শুভ-মুহূর্তটির জন্যেই তো অপেক্ষা করেছে; ঘুমের মধ্যে তারা শুনেছে সারা ভারতবর্ষের রত্নখনি বেঙ্গালার আহ্বান। আজ সাহেবউদ্দিন সেই স্বপ্নলোকে তাঁদের বাস্তবে পৌঁছে দিয়েছেন।

বাণিজ্যের সুব্যবস্থা হয়ে যাবে। কুঠি তৈরি করার অনুমতি পাওয়া যাবে। চট্টগ্রামের শাসনকর্তার অনুমোদন পেলে গৌড়ের সুলতানও আপত্তি করবেন না। সোনা আর মসলিনের দেশ পোর্টো গ্র্যাণ্ডি থেকে পোর্টো পেকেনো পর্যন্ত ময়ূরের পেখমের মতো পাল তুলে দেবে পর্তুগীজ বাণিজ্য-বহর।

সেই সৌভাগ্য-সূচনায় আজও নেতৃত্ব করতে এসেছেন অ্যাফনসো ডি-মেলো। এত বড় সম্মান যেচে তাঁকে দিয়েছেন ডি-কুনহা—দিয়েছেন ঐতিহাসিক গৌরব।

তবু খুশি হতে পারছেন না ডি-মেলো। তাঁর দেহ-মন আর্ত হয়ে বলতে চাইছে: **Estou Cansado**! ক্লান্ত—আমি ক্লান্ত।

মা মেরী জানেন, ঈশ্বর জানেন, মনেপ্রাণে কখনোই এ গৌরব ডি-মেলো চাননি। যে যাই বলুক: এই স্বপ্নের বেঙ্গালা তাঁর কাছে অভিশপ্ত, একটা দুঃস্বপ্নের প্রেতপুরী। এর সমস্ত শ্যাম-সৌন্দর্যের নেপথ্যে যেন তিনি একটা রাক্ষসের কালো মুখ দেখতে পান; এখানকার সবুজ ঘাসের আঙিনা তাঁর কাছে বিশ্বাসঘাতকের চোরাবালি।

গঞ্জালো! সেই আশ্চর্য সুন্দর কিশোর—দু'চোখভরা আকাশের স্বপ্ন! কোথায় সে?

পরে জেনেছিলেন সবই; কিন্তু কিছুই করবার উপায় ছিল না। শুধু রাতের পর রাত অসহায় জ্বালায় কাল কাটিয়েছেন—শুধু ঘরময় পায়চারি করেছেন তীর-বেঁধা বাঘের মতো; প্রতিশোধের উপায় ছিল না তা নয়—এই বেঙ্গালাকে সমুদ্রের জলে একমুঠো ধুলোর মতো উড়িয়ে দেওয়াই তার চরম জবাব।

কিন্তু সে জবাব দেওয়া যায়নি। বিরোধ চান না নুনো ডি-কুনহা। বাণিজ্য বিস্তার করতে হবে এই দেশে, বন্ধুত্ব করতে হবে মুরদের সঙ্গে।

রাজভক্তি! রাজার আদেশ! বেশ, তাই হোক। ডি-মেলো নিজের

ঠোঁটটাকে শক্ত করে কামড়ে ধরলেন।

পাশে এসে দাঁড়ালেন খাজা সাহেবউদ্দিন। ক্লান্ত চোখ তুলে তাকালেন ডি-মেলো। Estou Cansado!

সাহেবউদ্দিন ডাকলেন ঃ ক্যাপিতান!

—বলুন?

—এইবারে নামতে হবে।

—বেশ, চলুন।

আবার দরবার। চট্টগ্রামের শাসনকর্তার দরবার। সেই বাঁধা সৌজন্যের পুনরাবৃত্তি—সেই উপহারের পালা।

প্রসন্ন মুখে নবাব হাসলেন।

—আমাদের এই দেশ হচ্ছে এতিমখানা। যেখান থেকে, যতদূর থেকেই যে আসুক, সকলের জন্যেই খোলা আছে এ দরজা। যার খুশি দু হাত ভরে নিয়ে যাক; কিন্তু আঁজলা আঁজলা জল নিয়ে যেমন কেউ সমুদ্র শুকিয়ে ফেলতে পারে না—তেমনি এই দেশকেও শূন্য করবার ক্ষমতা নেই কারো।

ডি-মেলো একবার চোখ তুলে তাকালেন—কোনো জবাব দিলেন না। ঐশ্বর্য আছে, তার সন্দেহ নেই তাতে। সমুদ্রের মতোই অসীম এ দেশের রত্নভাণ্ডার—সে-কথাও তিনি মানেন; কিন্তু সে-ঐশ্বর্যের দ্বার খুলে দেওয়ার মতো মানসিক দাক্ষিণ্য এতদিন তিনি তো দেখতে পাননি! বরং এর উল্টোটাই চোখে পড়েছে তাঁর—মনে হয়েছে এ বুঝি নিষিদ্ধ পুরী।

নবাব বললেন, অনুমতি আমি দেব—আনন্দের সঙ্গেই দেব; কিন্তু মহামান্য ক্যাপিতান এবং সেই সঙ্গে প্রবল প্রতাপশালী রাজ-প্রতিনিধি নুনো ডি-কুন্হাকে আমি জানাতে চাই যে বাঙলা দেশে বাণিজ্যের পূর্ণ অধিকার তাঁদের দেওয়া আমার ক্ষমতার মধ্যে নেই। একমাত্র সর্বশক্তিমান গৌড়ের সুলতানই সে হুকুম দিতে পারেন। আমি তাঁরই আজ্ঞাবহ।

ভ্রূ কুঁচকে এল ডি-মেলোর।

—তা হলে কি আমাদের এখন গৌড়ে যেতে হবে দরবার করতে?

নবাব বললেন, না, তার দরকার নেই। একজন দূত গেলেই যথেষ্ট।

—কিন্তু—

—চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই।—নবাব বললেন, এ নিয়মরক্ষা মাত্র। গৌড়ের সুলতান নিশ্চয়ই অনুমতি দেবেন; কিন্তু যতক্ষণ তাঁর ফরমান না এসে পৌঁছয়, ততক্ষণ ক্যাপিতান এই বন্দরে আতিথ্য গ্রহণ করুন। গুয়াজিল আলী হোসেন খাঁ তাঁদের দেখাশোনা করবেন।

—তবে তাই হোক!—ডি-মেলো জবাব দিলেন। তাঁর চোখমুখে অবসাদের কালো ছায়া ঘনিয়ে এল।

—আপনারা গৌড়ে ভেট পাঠাবার ব্যবস্থা করুন—নবাব বললেন, কখনো কোনো কথা জানাবার থাকলে খাজা সাহেবউদ্দিন কিংবা আলী হোসেনকে দিয়েই জানাবেন।

নবাব উঠলেন। সভা ভঙ্গ হল।

*   *   *   *

সপ্তগ্রাম থেকে গৌড়।

বাঙলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত। কর্ণফুলী-ব্রহ্মপুত্র-পদ্মা-গঙ্গার মায়া দিয়ে মাখানো। তাল-নারকেল-সুপুরির জয়ধ্বজা উড়ছে হাওয়ায় হাওয়ায়। মেঘের ছায়ায় ছায়ায় স্বপ্ন দেখে নীল পাহাড়। রৌদ্রের ঝিলিক ঝলে নীলকণ্ঠ পাখির পাখায়। জ্যোৎস্নার দুধ-সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে যায় হংস-বলাকা। পলিমাটির চন্দন-ডাঙায় শ্বেতপদ্মের পাপড়ির মতো ছড়িয়ে থাকে বকের দল।

আটচালা শিবমন্দির থেকে গম্ভীর শঙ্খধ্বনি ওঠে; সকাল-সন্ধ্যায় ভক্তের আহ্বান ওঠে শাহী মস্‌জিদ থেকে। বৌদ্ধ পূর্ণিমার দিনে দীপে-ধূপে আরতি চলে 'গোতম-চন্দিমার'। গ্রামের বিষহরি তলা থেকে নূপুর আর খঞ্জনীর তালে তালে ছড়িয়ে পড়ে মনসার গান—তার রেশ এসে মিলে যায় দূরের নদীতে মাঝির ভাটিয়ালী গানের সঙ্গে। দীপকে-মল্লারে-বসন্তে পঞ্চমে সুর বাজে আকাশে-বাতাসে, পাহাড়-নদী-অরণ্য-পাখি-মেঘ এক একটি বাদ্যযন্ত্রের মতো ঐকতান তোলে তার সঙ্গে সঙ্গে।

স্বপ্নের বাঙলা—গানের বাঙলা—আড়-বাঁশির বাঙলা—রূপকথার বাঙলা। পর্তুগীজ দূত দুরাতে আজেভেদো যেন নেশার ঘোরে পথ চলেছেন। কত দূর সমুদ্র পার হয়ে আসতে হয়েছে এদেশে! চঞ্চল আটলান্টিকের কোলের মধ্যে সেই 'আজোর' দ্বীপ—পর্তুগীজেরা নাম দিয়েছিল বাজপাখির দ্বীপ; যেখানে কালো আগ্নেয় পাহাড়ের মাথায় ঝাঁক ঝাঁক বাজপাখি উড়ে বেড়ায়; যেখানে হঠাৎ দেখা দেয় 'হোল'—ঝড় নেই বৃষ্টি নেই, শান্ত নির্মল আকাশের তলায় হঠাৎ বিরাট তরঙ্গোচ্ছ্বাস হয় সমুদ্রে—পাড়ের কাছে জাহাজ থাকলে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। কোথায় সেই 'মেদিরা'—যেখানে একদিকে গুচ্ছ আঙুরের কোমলতা, অন্যদিকে বিরাট রুক্ষ পাহাড়ের বুক চিরে রাক্ষস-গর্জনে ঝর্না নেমে আসে! তার কাছেই ক্যানারী দ্বীপ—'ইনসুলা ক্যানারিয়া'। কুকুরের দ্বীপ। আর হলুদ ফুলের অসংখ্য উড়ন্ত পাপড়ির মতো ক্যানারির ঝাঁক। তারপরে সেই 'ফোগো' বা আগুনের দ্বীপ—যেখানে মাথা তুলে আছে পিকো ডো ক্যানোর চূড়ো—যা থেকে আগুনের লাল শিখা আকাশকে লেহন করতে থাকে—মনে হয় পৌরাণিক ভালক্যানের বিশ্বকর্মা-শালায় কাজ চলছে রাত দিন।

আসেনসন, কাবে টরমেণ্টোসো, মাদাগাস্কার, আফ্রিকার হিংস্র উপকূল। লোহিত সাগর আরব সাগর। গোয়া, দিউ, কালিকট, সিংহল—বেঙ্গালা! এ যেন জন্ম-জন্মান্তর পাড়ি দিয়ে আসা। কত মানুষের কত চেষ্টা মুছে গেছে মাঝপথে; আজোরের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে কতজন নিশ্চিহ্ন হয়েছে, পথ ভুল করে পশ্চিমে সরে গিয়ে কত ডুবেছে বাহামা-বার্মুডার বিশ্বাসঘাতক ঝড়ে—কাবে টরমেণ্টোসো কতজনের জীবনে রচনা করেছে সমাধি! রাত্রির আকাশে 'ফোগোর' আগুনের জিভ শুধু শয়তানের ভ্রূকুটির মতো নিষেধ করেছে তাদের!

এত দুঃখের পর এইবার পাওয়া গেছে বেঙ্গালাকে।

তার নিজের দেশ নয়, মেদিরা-ক্যানারী-মাদাগাস্কার নয়—এমন কি কালিকট সিংহলও নয়। এ সবচেয়ে আলাদা! তার নিজের দেশের গোলাপ-বাগানের চাইতেও এ যেন সুন্দর করে সাজানো, লাল আঙুর আর মিষ্টি ডুমুরের চাইতেও সরস, এখানকার আকাশ তার নিজের 'সূর্যালোকের দেশে'র চাইতেও বুঝি স্বর্ণোজ্জ্বল!

এই দেশ—এর মাটিতে এবার পর্তুগীজের আসন পড়বে। ইগ্রেঝার উঁচু চূড়োর ওপর ঝরবে প্রসন্ন সূর্য-চন্দ্রের আলো; এমন সুন্দর দেশের ধর্মহীন মানুষগুলো উদ্ধার হবে জননী মেরীর আশীর্বাদে—প্রার্থনা মন্ত্রোচ্চার উঠবে—ঘন্টার ধ্বনিতে ধ্বনিতে ঘোষিত হবে সদা প্রভুর উদার মহিমা!

দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে, স্বপ্নের জাল বুনতে বুনতে গৌড়ের তোরণে এসে দাঁড়ালেন আজেভেদো। সঙ্গে বারোজন সেনানী, নুনো ডি-কুন্হা আর নবাবের চিঠি, আর প্রচুর উপঢৌকন। সে উপঢৌকনে আছে সিংহলের মুক্তো, পেগুর মূল্যবান মণিরত্ন, আর ইরানী গোলাপজল।

পথের দুধারে জনতা সার দিয়ে দাঁড়াল এই আশ্চর্য মানুষগুলোকে দেখবার জন্যে। এমন বিচিত্র মানুষ এর আগে কেউ কখনো দেখেনি। তামাটে বড় বড় চুল আর দাড়ি, তীক্ষ্ণধার পিঙ্গল চোখ—শেষ রাতের জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া গায়ের রঙ।

দূত আগেই খবর দিয়েছিল। গৌড়াধিপ মামুদ শা দরবারে বসে অভিবাদন গ্রহণ করলেন আজেভেদোর।

—মহামান্য গৌড়েশ্বরের জন্যে সামান্য কিছু পাঠিয়েছেন পর্তুগীজ রাজ-প্রতিনিধি মাননীয় নুনো ডি-কুন্হা। সুলতান অনুগ্রহ করে তা গ্রহণ করলে অত্যন্ত বাধিত হবেন।

—তার বিনিময়ে?—সুলতান জানতে চাইলেন।

—গৌড় বাঙলার সঙ্গে বন্ধুত্ব। এবং—

—এবং?—মাঝখান থেকেই মামুদ শা তুলে নিলেন প্রশ্নটা।

—বাঙলার সঙ্গে বাণিজ্যের অধিকার। কুঠি বসানোর অনুমতি। পণ্যের আদান-প্রদান।

—বাণিজ্য? কুঠি?—হঠাৎ সশব্দে হেসে উঠলেন মামুদ শা। হাসিটা অত্যন্ত আকস্মিক বলে মনে হল—চমকে উঠলেন আজেভেদো, দরবারের সমস্ত লোক ফিরে তাকাল একসঙ্গে।

—বাণিজ্য? পর্তুগীজদের সঙ্গে? অতি চমৎকার প্রস্তাব।—হাসি থামিয়ে মামুদ শা বললেন। কিন্তু চমৎকার প্রস্তাব? ঠিক তাই কি মনে করেন সুলতান? কথার সঙ্গে গলার সুর যেন ঠিক মিলছে না—হাসিটাকে অত্যন্ত অশুভ বলে সন্দেহ হচ্ছে। আজেভেদো উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

—তা হলে কি ধরে নিতে পারি গৌড়ের সুলতান আমাদের অনুমতি দিয়েছেন?

—এত ব্যস্ত কেন?—মামুদ শা এবারে আর হাসলেন না। শুধু ভ্রূরেখা দুটো সংকীর্ণ হয়ে অনেকটা কাছাকাছি এগিয়ে এল ঃ প্রস্তাব অত্যন্ত সাধু, তাতে সন্দেহ নেই। তবু একবার ভেবে দেখতে হবে, চিন্তা করতে হবে শর্তগুলো সম্পর্কে। এতবড় একটা গুরুতর কাজ, মাত্র দু-কথায় নিষ্পত্তি করা যায় না।

—মহামান্য সুলতান যদি অপরাধ না নেন—অস্বস্তিতে চঞ্চল হয়ে আজেভেদো বললেন, তা হলে সবিনয়ে জানাচ্ছি আমাদের নেতা অ্যাফনসো ডি-মেলো অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে চট্টগ্রামে অপেক্ষা করছেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খবরটা সেখানে পাঠাতে পারলে তিনি নিশ্চিন্ত হবেন—আমরাও দায়মুক্ত হতে পারব।

মামুদ শা এবার নিজে জবাব দিলেন না। তাঁর হয়ে উঠে দাঁড়ালেন উজীর।

—সুলতানের সিদ্ধান্ত কালকের দরবারে পেশ করা হবে। আজ পর্তুগীজ দূত সদলবলে বিশ্রাম করুন। তাঁদের যথাযোগ্য পরিচর্যা করা হবে।

—আদেশ শিরোধার্য।—সবিনয়ে মাথা নত করলেন আজেভেদো।

কিন্তু মামুদ শার সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই।

এক ঘণ্টা পরে নিজের খাস কামরায় সুলতান ডেকে পাঠালেন উজীরকে, সেই সঙ্গে বাগদাদের বিচক্ষণ আল্‌ফা হাসানীকে।

কুর্নিশ করে দাঁড়ালেন দুজনে। মামুদ শা গম্ভীর গলায় বললেন, বসুন আপনারা। অত্যন্ত জরুরী পরামর্শ আছে আপনাদের সঙ্গে।

দু'জনে নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলেন; কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে একটা কথাও বলতে পারলেন না মামুদ শা। যেন একটা তীব্র অশান্তিতে তিনি ছটফট করতে লাগলেন।

নীরবতা ভাঙলেন উজীর।

—কী আদেশ আমাদের প্রতি?

—আদেশ?—হঠাৎ পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলেন মামুদ শা—যেন প্রতিরুদ্ধ বন্যার জল বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে পড়ল।

—আদেশ?—মামুদ শা গর্জন করে উঠলেন ঃ এখনি কোতল করা হোক ওই ক্রীশ্চানগুলোকে। আর চট্টগ্রামে খবর পাঠানো হোক বাকি সবগুলোর যাতে গর্দান নেওয়া হয় অথবা মাটিতে পুঁতে খাইয়ে দেওয়া হয় ডালকুত্তার মুখে!

—খোদাবন্দ্!—তীরের মতো একসঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠলেন উজীর আর আল্‌ফা হাসানী।

—এই হচ্ছে আমার হুকুম।—বিকৃত গলায় সুলতান জবাব দিলেন।

—হুকুম নিশ্চয় তামিল করা হবে—উজীর ঢোঁক গিললেন, তারপর বিবর্ণ মুখে বললেন, কিন্তু কারণটা যদি জানা যেত—

—কারণ?—তেমনি বিকৃত গলায় সুলতান বললেন, কারণ এখুনি বুঝিয়ে ! এই—

প্রহরী ছুটে এল।

—আজকে যে গোলাপজলের ভেট এসেছে, নিয়ে আয়—

প্রহরী চলে গেল সন্ত্রস্ত হয়ে। চঞ্চলভাবে ঘরের মধ্যে ঘুরতে লাগলেন মামুদ শা। উজীর আর আলফা হাসানী কয়েকবার মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলেন নির্বাক জিজ্ঞাসায়।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই গোলাপজলের পাত্রগুলো এসে হাজির হল। ছোঁ মেরে তাদের একটা তুলে সুলতান এগিয়ে দিলেন উজীরের দিকে।

—চিনতে পারেন ?

উজীর যেন অন্ধকারে আলো দেখলেন।

—ইরানী গোলাপজল। তা হলে—

—হাঁ, বুঝেছেন এতক্ষণে!—বিজয়ীর মতো সুলতান বললেন, এ সেই গোলাপজল যা মক্কা থেকে নিয়ে আসছিল আরবী বণিকেরা আর জাহাজ লুট করে যা কেড়ে নিয়েছিল ওই ক্রীশ্চান শয়তানের দল!—হিংস্র ক্রোধে ঠোঁটের ওপর দাঁত চাপলেন মামুদ শা ঃ স্পর্ধার আর শেষ নেই! সেই লুটের মাল আমাকে ভেট দিতে এসেছে! অপমান করতে চায়! কাফের—কুত্তার দল! ওদের আম-কতল্ করাই হচ্ছে এর একমাত্র জবাব।

—কিন্তু এ ঠিক হবে না।—শান্ত গলায় বললেন আল্ফা হাসানী।

—কেন ঠিক হবে না?—মামুদ শা দু চোখে আগুন বৃষ্টি করলেন ঃ আমি কি ওই ক্রীশ্চান লুটেরাদের ভয় করি? আমি কি ডরপোক?

তেমনি প্রশান্ত ভাবেই হাসানী বললেন, ভয়ের কথা নয়। ওরা দূত; ওদের গায়ে হাত দিলে গুণাহ্ হবে জনাব!

—গুণাহ্?—সুলতান নিষ্ঠুর গলায় বললেন, কিসের দূত? কার দূত? ওরা ডাকাত আর লুটেরার চর। ওদের ঔদ্ধত্যের শাস্তি এই ভাবেই দেওয়া উচিত।

—কিন্তু খোদাবন্দ্—এতে আপনারই ক্ষতি হবে। আপনি ওদের শক্তিটা ঠিক বুঝতে পারেননি। ওরা সাধারণ লোক নয়। আগুন নিয়ে খেলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

—তোমার ওপরে আমার শ্রদ্ধা ছিল হাসানী, কিন্তু সে বিশ্বাস তুমি নষ্ট করলে!—সুলতানের মুখ বিরক্তিতে কুঞ্চিত হয়ে উঠল ঃ এরা যদি গৌড়কে কালিকট ভেবে থাকে, তা হলে ভুল করেছে। গৌড়ের শক্তি যে কতখানি, তা ওরাও বুঝতে পারেনি। উজীর সাহেব, এখুনি হুকুম তামিল করুন। আমি ওদের শির দেখতে চাই।

—না মামুদ, না।

একটা গম্ভীর অশরীরী কণ্ঠ যেন বজ্রের আওয়াজের মতো ঘরময় ভেঙে পড়ল। তিনজন একসঙ্গে ফিরে তাকালেন, তারপরে তিনজনেই একসঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন।

একটি আশ্চর্য মানুষ ঢুকেছেন ঘরের মধ্যে। বিশাল দীর্ঘ তাঁর দেহ।

তুষারশুভ্র চুলগুলো কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলে পড়েছে—শাদা দাড়ির গোছা নেমে এসেছে বুক ছাপিয়ে। একটি কালো আলখাল্লায় তাঁর পা পর্যন্ত ঢাকা, গলায় দু-তিন ছড়া বিচিত্র বর্ণের মালা—আর একটি জপমালা তাঁর ডান হাতে দুলছে।

—না মামুদ, না।—সেই মূর্তি আবার বললেন, ফিরোজের রক্তমাখা সিংহাসনে বসে প্রতি মুহূর্তে তুমি ছটফট করে জ্বলে মরছ। মূর্খ, আরো রক্ত ঝরাতে চাও?

ষোলো

"Esta faca nao Corta—"

ভুল—ভুল করেছিলেন সোমদেব। মহাকালীর নামে যে নির্ভয় দীক্ষা নিতে পারে—রাজশেখর শ্রেষ্ঠী সে-দলের লোক নয়। ভীরু, দুর্বল, মেরুদণ্ডহীন। বিধর্মী নবাবের পরম অনুগত হয়ে শুধু তার সেবা করতে পারে, ক্রীতদাসের মতো বসে থাকতে পারে করজোড়ে। সোমদেব ভুল করেছিলেন।

কিন্তু আশা ছাড়লে তো চলবে না। দেশের শক্তিহীন ক্ষত্রিয়দের আবার জাগাতে হবে—যুদ্ধের জন্যে সশস্ত্র করে তুলতে হবে তাদের। সেজন্যে চাই বণিকের কোষাগার। ক্ষত্রিয়ের কর্মশক্তির পেছনে চাই বৈশ্যের অর্থ—আর সকলের ওপরে চাই ব্রাহ্মণের বুদ্ধি।

রাজশেখর শেঠকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবেন না সোমদেব। তাঁর মেয়ে সুপর্ণা পাগল হয়ে গেছে। কী হয়েছে তাতে? কয়েক ফোঁটা রক্ত দেখেই একটা মেয়ের যদি মস্তিষ্কবিকার ঘটে, তার জন্যে বিন্দুমাত্র বিচলিত হওয়াও অবান্তর মনে করেন সোমদেব। রক্তের বন্যা যদি কোনোদিন দেশময় বয়ে যায় —তা হলে সে-স্রোতে অনেক সুপর্ণাকেই ভেসে যেতে হবে।

তবু বিশ্বাসঘাতক রাজশেখর পরের দিনই নবাবের দরবারে উপস্থিত হয়ে স্বীকার করেছে নিজের অপরাধ। আর সঙ্গে সঙ্গেই নবাব খোদাবক্স খাঁ বন্দী করেছে তাকে। সময়মতো পালাতে পেরেছেন বলে রক্ষা পেয়েছেন সোমদেব, নইলে কী যে তাঁর ঘটত সেটা অনুমান করা অসম্ভব নয়।

চুলোয় যাক রাজশেখর। তার সংবাদ জানবার জন্যে আজ কোনো কৌতূহল নেই সোমদেবের। আজও সে বন্দী, অথবা নবাবের জল্লাদের হাতে তার মুণ্ডচ্ছেদ হয়েছে কিনা সে খবরও তিনি পাননি। রাজশেখরের পরিণতি যাই-ই ঘটুক, সেজন্যে অপেক্ষা করলে চলবে না সোমদেবের।

কিন্তু শুধু রাজশেখর শ্রেষ্ঠীই বা কেন? আজ প্রায় চার বছর ধরে সোমদেব এই যে বাঙলা দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছেন—কতটুকু সাড়া তিনি পেয়েছেন? দেশের যারা ভূস্বামী, তাদের অধিকাংশই বিধর্মী শাসকের পায়ে মাথা বিকিয়ে বসে আছে। তাদের কাছ

থেকে সহযোগিতার আশা নেই—আছে শত্রুতারই সম্ভাবনা। যে-দুচারজনকে তিনি নির্জের কথা বোঝাতে পেরেছেন, তাদেরও কেউ আগ্ বাড়িয়ে এসে কোনো কিছু করতে প্রস্তুত নয়। সবাই বলেছে, আমরা কী করতে পারি—আরো দশজনকে যোগাড় করে আনুন।

তবু হাল ছাড়েননি সোমদেব—ছাড়তে পারেন না। সময় এগিয়ে আসছে—অনুকূল হয়ে আসছে হাওয়া। সাসারামের পাঠান শের খাঁর সঙ্গে গৌড়ের লড়াই চলছে। ষাঁড়ের শত্রু এবার বাঘে মারবে—মাঝখান দিয়ে হিন্দু ফিরে আসবে নিজের অধিকারে। এ অবধারিত—চোখের সামনেই সেই ভবিষ্যৎকে দেখতে পাচ্ছেন সোমদেব। শুধু সুযোগটা গ্রহণ করবার মতো প্রস্তুতি থাকা চাই।

আর না হলে? না হলে চতুর্থ পক্ষের ছায়া স্পষ্টই সঞ্চারিত হচ্ছে আকাশে। বিদেশী ক্রীশ্চানের দল। দূর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এমন করে যারা এ-দেশে এসে পৌঁছেছে আরো অনেক দূর পর্যন্তই তারা পা বাড়াবে।

এত জেনে, এত বুঝেও এখনো কতখানি এগোতে পেরেছেন সোমদেব? ক্রুদ্ধ একটা কাঁকড়া-বিছের মতো নিজের বিষের জ্বালায় জ্বলছেন সর্বক্ষণ—নিজেকেই জর্জরিত করছেন দংশনে দংশনে। কখনো কখনো মনে হয় আরো কয়েকটা নরবলি চাই—নইলে দেবী সাড়া দেবেন না!

তাঁর উত্তেজনা সম্প্রতি বেড়ে উঠেছে আর একটা কারণে। তা হল খোল-করতাল নিয়ে কীর্তন গেয়ে বেড়ানো বৈষ্ণবের দল।

নবদ্বীপের এক চৈতন্যের কথা শুনেছিলেন তিনি; কিন্তু ওই শোনা পর্যন্তই। চৈতন্যের প্রভাব দেশে কতখানি ছড়িয়ে পড়েছে, সে-সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণাই তাঁর ছিল না। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের মন্দিরে অথবা তাঁর নিজের সেই অর্জুন-নাগেশ্বরে ছাওয়া অরণ্য-আশ্রয়ে সংকীর্তনের কোনো সুরই কোনোদিন পৌঁছুতে পারেনি। মাঝে মাঝে যেটুকু কানে আসত, তাতে মনে হয়েছিল ও একটা পাগলের খেয়ালের ব্যাপার—সাধারণ মানুষ দু-চারদিন নাচানাচি করেই ও-সমস্ত ভুলে যাবে; কিন্তু—

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আর চুপ করে থাকা চলে না। এ আর এক শত্রু। দেশের মানুষকে নির্বীর্য করে ফেলার আর একটা চক্রান্ত। এদের বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে হবে তাঁকে।

সংশয় এনে দিয়েছে মালিনী। আপাতত যে কেশব শর্মার বাড়িতে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁরই স্ত্রী।

প্রতিদিনের মতো সকালে এসে মালিনী তাঁকে প্রণাম করল; কিন্তু তখনই চলে গেল না—কেমন দ্বিধাভরে দাঁড়িয়ে রইল দরজার পাশে।

সোমদেব প্রসন্ন মুখে বললেন, কিছু বলবার আছে মা?

মালিনী বললে, দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছে ছিল আপনাকে। যদি অভয় দেন।

—ভয়ের কী আছে মা? যখন যা মনে আসবে অসংকোচে জিজ্ঞাসা

কোরো। দ্বিধার কোনো কারণ নেই। বস—কী বলবে বল।

সোমদেবের আসন থেকে কিছু দূরে মাটিতে বসে পড়ল মালিনী। তারপর আস্তে আস্তে বললে, মহাপ্রভু সম্বন্ধে গুরুদেব কিছু ভেবেছেন?

—মহাপ্রভু? এমন একটা মহাপ্রভু আবার কে এল?—সোমদেব ভ্রূকুঞ্চিত করলেন।

—মহাপ্রভু চৈতন্যদেব।

—চৈতন্য? সেই পাগলটা?—সোমদেবের চোখে বিরক্তির জ্বালা ঝিলিক দিয়ে উঠল ঃ সে আবার মহাপ্রভু হল কেমন করে?

সংকুচিত হয়ে মালিনী বললে, লোকে তাই বলে।

—অনেক ভণ্ড সন্ন্যাসীই নিজেদের মহাত্মা বলে পরিচয় দেয়, তাই বলে বুদ্ধিমান লোকে কখনো তাদের মহাপুরুষ ভেবে পুজো দেয় না।

মালিনী আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

—গৌড়ে কী হয়ে গেছে তা শুনেছেন তো? নবাবের দুজন প্রধান উজীর কেমন করে সর্বস্ব ছেড়ে—

সোমদেব বাধা দিলেন ঃ এ ঘটনা এমন নতুন কিছু নয়, যার জন্যে এতখানি বিস্মিত হতে হবে। এর আগেও অনেক মূর্খ এই সব সাধু-সন্ন্যাসীর ভাঁওতায় ভুলে সর্বস্ব ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।

—কিন্তু গুরুদেব—মালিনী দ্বিধাজড়িত গলায় বললে—যাঁরা চৈতন্যকে দেখেছেন তাঁরাই বলেন তিনি সহজ মানুষ নন। তাঁর কাছে যে যায়, সে-ই তাঁর কাছে মাথা নত করে। আশ্চর্য শক্তি আছে তাঁর।

সোমদেবের রক্তচোখে এবার ক্রোধ ঝলসে উঠল ঃ ও শক্তির নাম সম্মোহন-বিদ্যা। ওটা অনার্য প্রক্রিয়া—ওকে অভিচার বলে।

—তাঁর কণ্ঠের গান নাকি অপূর্ব।

—অনেক নর্তকীর কণ্ঠই অপূর্ব। তুমি কি বলতে চাও তারাও মহাপুরুষ?

বিষণ্ণ মুখে মালিনী বললে, কিন্তু তা হলে লোকে এমন করে তাঁর দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে কেন? কেন বৈষ্ণবের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে দিনের পর দিন?

—তার কারণ, লোকের দুর্বুদ্ধি হয়েছে বলে। তার কারণ, দেশে নিদান অবস্থা দেখা দিয়েছে বলে। কাপুরুষেরাই শক্তির সাধনা করতে ভয় পায়। তারাই বলে, অহিংসার মতো ধর্ম নেই। ওটা দুর্বলের আত্মতৃপ্তি।

—গুরুদেব!

সোমদেব বললেন, একটা কথা তোমায় স্পষ্ট করেই বোঝাতে চাই মা। যখনি এই দুর্বলের অহিংসা-ধর্ম দেশকে ছেয়ে ফেলেছে, তখনি তার পরিণামে এসেছে সর্বনাশ। একদিন বুদ্ধ এনেছিল এই ক্লীবতার বন্যা—মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরিয়েছিল জাতির—সেই পথ দিয়ে দেশে পাঠান এল। আজ আবার যখন উপযুক্ত সময় এসেছে,—তখন দুষ্টগ্রহের মতো দেখা দিয়েছে এই বৈষ্ণবের দল। যাদের হাতে তলোয়ার দেওয়া উচিত ছিল, তাদের হাতে দিয়েছে

খোল-করতাল। দেশসুদ্ধ এই বীর্যহীনদের দল যখন গলা ফাটিয়ে অহিংসার জয়গান গাইবে, তখন সেই অবসরে ক্রীশ্চান এসে রাজা হয়ে বসবে। তাই দেশের মঙ্গলের জন্যেই এই ফোঁটা-তিলকওয়ালাদের ধরে প্রহার করা উচিত—নিপাত করলেও পাপ নেই।

গুরুদেবের দিকে তাকিয়ে আর কথা বাড়াবার সাহস পেল না মালিনী। সামনে থেকে উঠে চলে গেল। সেই চলে যাওয়াটা সোমদেবের ভাল লাগল না।

তিক্ততাকে চরম করে তুলল কেশব এসে।

—গুরুদেব, আপনি কি মনে করেন না—দেশে আজ বৈষ্ণব ধর্মের প্রয়োজন আছে?

—প্রয়োজন!—সোমদেব সরোষে বললেন, আজ ওদেরই সকলের আগে দেশ থেকে দূর করে দেওয়া উঠিত।

—কেন?—শিষ্য হয়েও নৈয়ায়িক কেশব তর্ক করতে ভয় পেল না : আমার তো মনে হয়, ঠিক এই মুহূর্তে সমন্বয়ের যে-পথ চৈতন্য নিয়েছেন, তার চাইতে মহৎ কাজ আর কিছুই হতে পারত না।

—যথা?

—আজ দেশের এত লোক কেন ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে এবং নিচ্ছে, এ-সম্বন্ধে গুরুদেব কিছু ভেবেছেন কি?

—ভাববার মতো কিছুই নেই। বিধর্মীরা তলোয়ার দেখিয়ে, মুখে গো-মাংস গুঁজে দিয়ে জোর করে মুসলমান করেছে তাদের।

—এটা আংশিক সত্য—পূর্ণ সত্য নয়।

—অর্থাৎ? কী বলতে চাও, স্পষ্ট বলো।

কেশব ইতস্তত করতে লাগল : গুরুদেব যদি ঔদ্ধত্য ক্ষমা করেন, তবেই দু-চারটে কথা বলতে পারি; কিন্তু উত্তেজিত হলে এ নিয়ে কোনো আলোচনাই চলে না।

সোমদেব একবার ওষ্ঠ-দংশন করলেন—যেন প্রাণপণে আত্মসংযম করতে চাইলেন। এ-রকম প্রশ্ন নির্বোধ রাজশেখরও তুলেছিল। দেখাই যাক, কেশবের দৌড় কতখানি। দেখাই যাক, তার মূর্খতা এবং অন্ধতা কতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে।

—আমি উত্তেজিত হব না। তুমি বলে যেতে পার।

কেশব বললে, দেশের বৌদ্ধদের প্রতি আমরা সুবিচার করিনি।

—যারা বেদ-বিদ্বেষী, তাদের সম্বন্ধে সুবিচারের প্রশ্নই ওঠে না।

—কিন্তু অত্যাচারের প্রশ্নটা ওঠে বৈকি। দিনের পর দিন তাদের যে-ভাবে দলন করা হয়েছে, যে-ভাবে তাদের ওপর নির্বিচারে উৎপীড়ন চালানো হয়েছে, তারই ফল আমরা পাচ্ছি গুরুদেব। আজ ইসলাম তাদের আশ্রয় দিচ্ছে—সে আশ্রয় তারা কেন গ্রহণ করবে না? আত্মরক্ষার জন্যেই এ পথ তাদের নিতে হয়েছে।

—তুমি কি বলতে চাও বৌদ্ধদের মাথায় তুলে পুজো করতে হবে?

—আমি কিছুই বলতে চাই নে গুরুদেব। আমি শুধু আজ যা ঘটেছে তার কারণটাই বিশ্লেষণ করতে চাইছি।

আবার নিচের ঠোঁটে দাঁতগুলো চেপে ধরলেন সোমদেব, আবার আত্মসংযম করতে চাইলেন। অবরুদ্ধ গলায় বললেন, বলে যাও।

—তারপরে যারা নীচ জাতি, তারাও আমাদের কাছে লাঞ্ছনা আর অপমানই পেয়ে এসেছে এতকাল। অস্পৃশ্য বলে যাদের ছায়া আমরা মাড়াইনি—ইসলাম তাদের ধর্ম-মন্দিরে ওঠবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। প্রভু—এই কারণেই আজ দেশে মুসলমান বাড়ছে। শুধু তলোয়ারের ভয়ে নয়, শুধু গো-মাংসের জন্যেও নয়।

—বুঝলাম। অর্থাৎ চণ্ডাল এবং রাঢ়দেরও আজ কোলে টেনে নিতে হবে। গীতার বর্ণভেদের পিণ্ডদান করতে হবে।

—ওই রকমই একটা কোনো উপায় ভেবে দেখতে হবে গুরুদেব। নইলে হিন্দুই কোথাও থাকবে না—তার নতুন সাম্রাজ্য তো দূরের কথা।

তিক্ত হাসি সোমদেবের মুখে ফুটে উঠল ঃ তোমার ন্যায়শাস্ত্র পড়াটা দেখছি মিথ্যে হয়নি কেশব। তার অর্থ, তুমি বলতে চাও—আজ একটি সর্বজনীন ধর্ম দরকার? যেমন বুদ্ধ দাঁড়িয়েছিল জাতির বিরুদ্ধে, ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে—ধর্মের এক শ্রীক্ষেত্র বানিয়ে বসেছিল, সেই রকম? আর্য-ধর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে?

—কারো বিরুদ্ধেই নয় গুরুদেব, কারো সঙ্গে শত্রুতা করেই নয়। আজ ইসলাম যেমন সমস্ত মানুষকে স্বীকার করে নিয়ে একটা উদার ধর্ম ছড়িয়ে দিয়েছে, তেমনি ঔদার্যও আমাদের দরকার।

—তোমাদের চৈতন্যও বুঝি তাই করছে?

—আমার সেই কথাই মনে হয় গুরুদেব।

—চণ্ডাল, অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ—সকলকে আলিঙ্গন করতে হবে?

কেশব থতমত খেয়ে গেল ঃ আলিঙ্গন না হোক, অন্তত কিছুটা উদারতার প্রয়োজন কি দেখা দেয়নি?

—কিন্তু এতদিনের ধর্ম? পিতৃ-পিতামহের সংস্কার?

—কিছু যাবে, কিছু থাকবে। সেই তো ভাল গুরুদেব। সম্পূর্ণ সর্বনাশ হওয়ার আগে অর্ধেক ত্যাগটাই কি বিধেয় নয়? সব রাখতে গিয়ে সব হারানোর চাইতে কিছু দিয়ে বাকিটা বাঁচানোর চেষ্টাই তো প্রাজ্ঞের লক্ষণ। দেশ-কালের সঙ্গে ধর্মের সঙ্গে যাতে সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায়, সেইরকম কোনো বিধান দিন।

কেশবের দিকে এবার কিছুক্ষণ দৃষ্টি মেলে রাখলেন সোমদেব। কয়েকটি নিঃশব্দ মুহূর্ত। দুটি আরক্তিম চোখ জেগে রইল দুটো পঞ্চমুখী জবার মতো—তাতে ক্রোধের উত্তাপ নেই, আছে ঘৃণার প্রদাহ।

তারপর তিক্ত গম্ভীর গলায় সোমদেব বললেন, ধর্ম, আচার, সংস্কারকে বিসর্জন দিয়ে বাঁচার চাইতে মৃত্যুটাও গৌরবের কেশব। বৈষ্ণবের ধর্মহীন

ভণ্ডামির আড়ালে আত্মরক্ষা না করে দেশসুদ্ধ লোক মুসলমান হয়ে যাক কেশব, তাই আমি চাই।

—কিন্তু গুরুদেব, চৈতন্যদেবকে আপনি দেখেননি।—অত্যন্ত সংযত মনে হল কেশবকে।

—আমার দেখবার প্রয়োজন নেই।

—আমি তাঁকে দেখেছি।—তেমনি স্থির শান্ত ভঙ্গি কেশবের।

—তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তুমিও না দেখলেই ভাল কাজ করতে।

কেশব দু হাত জোড় করলে ঃ আমাকে ক্ষমা করবেন। চৈতন্যদেবকে আমার মহাপ্রভু বলেই মনে হয়েছে—তাঁকে ধর্মহীন ভণ্ড বলে ভাবতে পারিনি।

দুর্নিবার ক্রোধে সোমদেব স্তব্ধ হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর অনেক-গুলো কথা একসঙ্গে বলতে গিয়েও মাত্র কয়েকটি শব্দ ছাড়া কিছুই আর খুঁজে পেলেন না।

—তোমাকে আমি শক্তির মন্ত্রই দিয়েছিলাম কেশব। আমার প্রতিজ্ঞার কথা তুমি জানো।

—জানি!—কেশবের স্বর ক্ষীণ হয়ে এল।

—কীর্তন গাইবার বাসনা যদি প্রবল হয়ে থাকে, দু-চারদিন পরে সে সখ মেটালেও কোনো ক্ষতি নেই। তুমি নৈয়ায়িক—তর্ক করবার রীতিও তোমার জানা আছে, এ কথা মানি; কিন্তু সে তর্কের চাইতে কাজের প্রয়োজনটাই এখন সব চেয়ে বেশি।

—আপনি আশীর্বাদ করুন—হঠাৎ সোমদেবের পায়ের কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে উঠে গেল কেশব—ঠিক যেমন ভাবে গিয়েছিল মালিনী।

কিন্তু সেই থেকে একটা গভীর সন্দেহে সংকীর্ণ হয়ে আছেন সোমদেব। কোথাও যেন একটা দাঁড়াবার মতো নির্ভরযোগ্য ভিত্তি খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। হাল তিনি ছাড়তে চান না—কিন্তু হালই ছেড়ে যেতে চাইছে হাত থেকে। একটার পর একটা। ঢেউয়ের পরে ঢেউ। আবর্তের পরে আবর্ত। সংশয়ের পরে সংশয়।

কাদের জাগাতে চাইছেন সোমদেব? কে জাগবে? অসহ্য অন্তর্জ্বালায় তিনি ভাবতে লাগলেন—নিজেদের পরিণামকে এরা নিজেরা ডেকে আনতে চাইছে—এদের পথ দেখাচ্ছে অন্ধদৃষ্টি নিয়তি। হয় ভীরু, নয় স্বার্থপর। হয় দুর্বল, নয় দাসানুদাস। হয় পলাতক, নইলে তার্কিক।

বাধা যত ভেবেছিলেন, তা তার চাইতে ঢের বেশী। কেশব সেখানে আর একটা নতুন প্রশ্ন তুলে দিয়েছে; কিন্তু একা কত দিক সামলাবেন তিনি? শুধু হাল ধরাই তো নয়! পাল তুলতে হবে—নৌকোর তলায় ছিদ্র দিয়ে যে জল উঠছে, রুখতে হবে তারও সম্ভাবনা। মুসলমান—ক্রীশ্চান—তারও পরে বৈষ্ণব!

উঠে জানালার কাছে দাঁড়ালেন সোমদেব। বাইরে একটা বিরাট পিপুল গাছের বিশাল ছায়া—তার মাথার ওপর দিয়ে আকাশে বৃশ্চিক রাশির আগ্নেয়-

পুড়ছে। এই অন্ধকার—ওই অগ্নি-সংকেত। এই দুইয়ে মিলে কোনো কথা কি বলতে চায় তাঁর কাছে? দিতে চায় কোনো নতুন ইঙ্গিত?

অকস্মাৎ খরবেগে উল্কা ঝরল একটা। অতিরিক্ত উজ্জ্বল—অস্বাভাবিক বড়। আকাশের অনেকখানি আলো হয়ে গেল—যেন বিদ্যুতের চমকে পিপুল গাছের ছায়ামূর্তিটা পর্যন্ত একবার চকিত হয়ে উঠল।

ওই উল্কার সঙ্গে তাঁর জীবনের কি কোনো মিল আছে? অমনি উজ্জ্বল আত্মদাহী তাঁর বিকাশ, আর অন্ধকারের শূন্যতায় ওই ভাবেই তাঁর পরিনির্বাণ?

উত্তর পেলেন না। শুধু পিপুল গাছের পাতায় পাতায় বাতাস মর্মরিত হল।

* * * *

ভোরবেলায় একটা উৎকট অস্বাভাবিক কোলাহলে উঠে বসলেন সোমদেব। তখনো ব্রাহ্মমুহূর্ত আসেনি—জানালার বাইরে আকাশে ভোরের রঙ ধরেনি। শুকতারা তখনো ঘুমন্ত—তখনো পাখিদের চোখ থেকে পাকা ফল আর নতুন শাবকের স্বপ্ন মুছে যায়নি।

উঠে বসলেন সোমদেব। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

কীর্তন হচ্ছে—বৈষ্ণবের কীতর্ন! এই কেশব পণ্ডিতের বাড়িতে!

কিন্তু শুধু তো কীর্তন নয়। সে যেন বহু কণ্ঠের উতরোল কান্না! যেন বুকফাটা আর্তনাদ।

"কী কহসি, কী পুছসি শুন পিয় সজনী,
কৈসনে বঞ্চব ইহ দিন-রজনী!
নয়নক নিঁদ গেও, বয়নক হাস—
সুখ গেও পিয় সনে দুখ মঝু পাস—"

ক্ষিপ্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন সোমদেব। এসে দাঁড়ালেন কেশবের প্রাঙ্গণে। না—এ স্বপ্ন নয়। নিজের চোখকে অবিশ্বাস করবার কোনো হেতু নেই কোথাও।

উন্মত্তের মতো একদল মানুষ খোল-করতাল বাজিয়ে তাণ্ডব নাচছে প্রাঙ্গনের মধ্যে। দু চোখ দিয়ে দর দর করে জল পড়ছে তাদের। আট-দশজন অচেতন হয়ে পড়ে আছে—মালিনী তাদের একজন।

বিমূঢ় ভাবটা কাটাতে সময় লাগল না সোমদেবের। তার পরেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন বৈষ্ণবদের মধ্যে। ঠিক মাঝখানেই ছিল কেশব—এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধ চেপে ধরলেন।

—কী হচ্ছে কেশব? কী এ?

কেশব তাকাল। তাকাল যেন ঘষা কাচের মধ্যে দিয়ে। জলে তার দু চোখ আবছা হয়ে গেছে।

—এর অর্থ কী, কেশব?

—পরম দুঃসংবাদ আছে প্রভু!—কান্নায় অবরুদ্ধ গলায় কেশব বললে, নীলাচলে চৈতন্য মহাপ্রভু লীলা সংবরণ করেছেন।

—তাতে তোমার কী?—নির্মমভাবে দাঁতে দাঁত ঘষলেন সোমদেব ঃ তাতে তোমার কী কেশব? নির্বোধ, তুমি মহাশক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত—

—না—না।—কেশব আর্তনাদ করে উঠল ঃ আমি বৈষ্ণব।

—তবে চেপে রেখেছিলে কেন একথা? আগে বললে তোমার ঘরে আমি জলগ্রহণ করতাম না!

সোমদেব হাঁপাতে লাগলেন ঃ আর আমার দীক্ষা? তোমার গুরুমন্ত্র? তার কী হয়েছে?

—কৃষ্ণের নামে আমি গঙ্গাজলে ভাসিয়ে দিয়েছি।—কেশবের মৃদুকণ্ঠ শোনা গেল।

—কৃষ্ণ! গঙ্গাজল!

বিশাল শরীরের আসুরিক শক্তি দিয়ে সোমদেব দূরে ছুঁড়ে দিলেন কেশবকে। কেশব মাটিতে লুটিয়ে পড়ল—আর উঠল না। অথচ—এর বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়াও হল না বৈষ্ণবদের ভেতরে। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে নির্বিকার চিত্তে তারা গেয়ে চলল ঃ

'সুখ গেও পিয় সনে দুখ মঝু পাস—'

শুধু সেই ছুটন্ত উল্কাটার মতোই বাইরের প্রায়ান্ধকারে ছিটকে পড়লেন সোমদেব। চলতে লাগলেন দিক্‌-বিদিকের জ্ঞান হারিয়ে। কিছু হবে না—!

কিছুই না। শুধু নিজেকে তিলে তিলে দাহন করবেন—আগুন জ্বালাতে পারবেন না—বুকের ভেতরে শুধু পুঞ্জ পুঞ্জ ছাই জমে উঠবে।

কতদিন পরে—কত বৎসর পরে, কেউ জানে না—সোমদেবের রক্তাক্ত চোখ বেয়ে আজ ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়তে লাগল।

সতেরো

"Os senhores estao em sua Casa"

র, আল্‌ফা হাসানী আর সুলতান গিয়াসুদ্দীন মামুদ তিনজনেই স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। সেই আশ্চর্য অদ্ভুত মূর্তি আবার বললে, আলাউদ্দীন ফিরোজের রক্ত এখনো তোমার দু হাতে—এখনো দু চোখে রক্তের বৃষ্টি দেখতে পাচ্ছ তুমি। আরো রক্ত ঝরাতে চাও কেন?

সুলতান নিজেকে খানিকটা সংযত করলেন এবার। স্থির গলায় বললেন, ফিরোজের হত্যার জন্যে সব সময়ে আপনি আমায় দায়ী করেন দরবেশ; কিন্তু আমিও হোসেন শাহের সন্তান। আপনিই বলুন, গৌড়ের তখ্‌তে আমার কি ন্যায়সঙ্গত অধিকার ছিল না?

—তা হয়তো ছিল; কিন্তু আল্লার দেওয়া প্রাণ নেবার অধিকার তো ছিল না। কবি-শিল্পী ফিরোজকে যে-ভাবে তুমি হত্যা করিয়েছ—

—কবি-শিল্পী!—মামুদ মুখ বিকৃত করলেন ঃ পৌত্তলিক কাফেরের বিদ্যাসুন্দরের কেচ্ছা নিয়ে যার সময় কাটত, গৌড়ের সিংহাসনে বসবার যোগ্য সে নয় দরবেশ। তাই তাকে সরাতে হয়েছে।

—কিন্তু দেশ জুড়ে তুমি শত্রু সৃষ্টি করছ মামুদ। এর ফলাফল ভেবে দেখো।

সুলতান হেসে উঠলেনঃ যারা আমার ন্যায্য অধিকার কেড়ে নিয়ে ফিরোজকে সিংহাসন দিয়েছিল, তাদের চক্রান্ত রোধ করার শক্তি আমার আছে। ওই মখদুম আর তার দলবলকে আমি দেখে নেব।।

—তোমার দাদা?—নসরৎ শা?—দরবেশ বললেন, যার রক্তে হোসেন শার কবর রাঙা হয়ে গিয়েছিল, তার কথা মনে আছে আবদুল বদর?

—আমি আর আবদুল বদর নই দরবেশ, আমি এখন মামুদ শা।—মামুদের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠলঃ তা ছাড়া নসরৎ শাও আমি নই।

দরবেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তারপরে।

—ভুল তুমি অনেক করেছ মামুদ; কিন্তু যা হয়ে গেছে সে-কথা থাক। নতুন ভুলের পাপ আর তুমি বাড়িয়ো না। দূতের প্রাণ নেওয়া ধর্মের বিরোধী। তা ছাড়া ক্রীশ্চানদের ক্ষেপিয়ে দিলেও তার পরিণাম শুভ হবে না তোমার পক্ষে। ভবিষ্যৎ ওদেরই সম্মুখে। ওদের সঙ্গে তুমি বন্ধুত্ব কর মামুদ।

—আপনার প্রথম উপদেশ আমি রাখলাম দরবেশ। ক্রীশ্চান দূতদের গায়ে হাত আমি দেব না; কিন্তু—মামুদ শা বিকৃত মুখে বললেনঃ বন্ধুত্ব করব কতগুলো ডাকাতের সঙ্গে! সমুদ্রে যারা লুঠতরাজ করে বেড়ায়, তাদের দেব দেশকে লুটপাট করার সুযোগ! অসম্ভব দরবেশ—ও আদেশ আমি মানতে পারব না।

—ইলিয়াস-শাহী বংশে আল্লার ক্রোধ নেমেছে—আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন দরবেশ—পরক্ষণেই বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। যেমন আকস্মিক ভাবে এসেছিলেন, তেমনি ভাবেই মিলিয়ে গেলেন যেন।

আবার কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বললেন না। সুলতানই স্তব্ধতা ভাঙলেন।

—উজীর সাহেব!

—হুকুম করুন।

—ওই ক্রীশ্চান দূতদের এখনি বন্দী করুন—তারপরে ঠাণ্ডী-গারদে পাঠিয়ে দিন। আর চট্টগ্রামে এখনি খবর পাঠান ওদের দলবলসুদ্ধ সকলকেই যেন আটক করা হয়। দরবেশ বারণ করেছেন, আলফু খাঁও বারণ করছেন। তাঁদের কথা আমি রাখব—বিনা বিচারে আমি রক্তপাত ঘটাব না; কিন্তু আমার দেশের সমুদ্রে যারা হামলা করে বেড়ায়, গৌড়-বাঙলার প্রজাদের সম্পত্তি আর জীবন যাদের হাতে বিপন্ন, শাস্তি তাদের আমি দেবই।

—কিন্তু সুলতান—আলফা হাসানী একবার গলাটা পরিষ্কার করে নিলেনঃ ওরা অত্যন্ত সুদক্ষ সৈনিক। কালিকটে, গোয়ায়—

মামুদ শা বাধা দিলেন। ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, একটা জিনিস ক্রীশ্চানদের এখনো বুঝতে বাকি আছে আলফু খাঁ। আমিও আবার—আবার বলছি, গৌড় কালিকট এক নয়। গৌড়ের সঙ্গে যদি ওরা শক্তি পরীক্ষা করতে চায়

তো করুক ; কিন্তু সে পরীক্ষা খুব সুখের হবে না ওদের কাছে।

আলফা হাসানীর হয়তো আরো কিছু বলবার ছিল ; কিন্তু এবার অধৈর্যভাবে হাত নাড়লেন সুলতান।

—এইবার আপনারা আসুন তা হলে। আর উজীর সাহেব, পর্তুগীজ দূতদের এখুনি আপনি বন্দী করবেন—যান, দেরি না হয়—

দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মামুদ শা ক্লান্ত দৃষ্টি ফেলে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। শান্তি নেই কোথাও। যেদিন আমীর-ওমরাহদের চক্রান্তের ফলে নসরৎ শার সিংহাসনের ন্যায্য দাবি থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন—সেদিনও শান্তি ছিল না, আজও নেই। গলার জোরে তিনি অস্বীকার করেন, কিন্তু মনের কাছে আত্ম-বঞ্চনার উপায় কোথায়! চোখ বুজলেই দেখতে পান—আলাউদ্দীন ফিরোজের রক্তমাখা দেহ দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সামনে—দু চোখে ক্রোধ আর ঘৃণার আগুন জেলে যেন তাঁকে দগ্ধ করে ফেলতে চাইছে!

কিন্তু না—এ সময়ে তাঁর হাল ছাড়লে চলবে না, বিন্দুমাত্র দুর্বল হতে দেওয়া যাবে না মনকে। বড় দুর্দিনে তিনি গৌড়ের সিংহাসনে এসে বসেছেন। আকাশে সত্যিই মেঘ ঘনিয়েছে—একটা প্রকাণ্ড কালো ঈগলের মতো ছোঁ দিয়ে পড়তে চাইছে ইলিয়াস-শাহী বংশের ওপর। এদিকে ক্রীশ্চান—ওদিকে হুমায়ুন। মাঝখানে পাঠান শের খাঁ, বিহারের কোন্ জঙ্গল থেকে সামান্য একটা শেয়াল এবার দাঁড়িয়েছে বাঘের বিক্রমে, লোকটা তুচ্ছ হলেও ধূর্ত কম নয়। তার মাঝখানে গৌড়ের ইতিহাস কোন্ পথ ধরে যে এগিয়ে যাবে—কোন্ ঝড়ের মধ্য দিয়ে কোন্ ঘাটে সে পৌঁছুবে, কে বলতে পারে সে-কথা!

কিন্তু স্থির অটল হয়ে থাকতে হবে মামুদ শাকে। তাঁর দুর্বল হলে চলবে না। সিংহাসনের পথ চিরদিনই রক্ত দিয়ে আঁকা—নসরৎ শাহ, আলাউদ্দীন ফিরোজ—একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে গেছে।

চিন্তায় পীড়িত ক্লান্ত পায়ে গৌড়ের সুলতান ঘরময় পায়চারি করে বেড়াতে লাগলেন।

ঠিক সেই সময় আজেভেদো তাকিয়ে ছিলেন তাঁর বিশ্রামাগারের জানালা দিয়ে। দূরের গঙ্গায় নৌকোর পাল। আম-জামের ইতস্তত শ্যামলতার ঊর্ধ্বে মাথা তুলে রয়েছে কতগুলো মস্‌জিদের চূড়ো—আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে বারদুয়ারীর পাষাণ মূর্তি—আর সকলের ওপরে মেটে রঙের ফিরোজ মিনার। এ-ই 'বেঙ্গালা'র রাজধানী। আকাশে নীলা, রৌদ্রে সোনা, ঘাসে পাতায় পান্না—দিকে দিকে অফুরন্ত ঐশ্বর্য।

দরজায় ঘা পড়ল।

চিন্তায় সুর কেটে গেল। চমকে উঠে আজোভেদো বললেন, কে?

—মহামান্য গৌড়ের সুলতান আমাদের পাঠিয়েছেন—বিশেষ প্রয়োজন—

বাইরে থেকে সাড়া পাওয়া গেল।

আজেভেদো এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিলেন। তখনো তাঁর চোখে মোহ— 'বেঙ্গালার' নিবিড় মায়া।

—কী চাই ?

—সুলতানের হুকুমে আমরা পর্তুগীজ দূতকে বন্দী করতে এসেছি।

একটি আঘাতে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল মায়া—যেন প্রকাণ্ড একটা ধাতুপাত্র ঝন্‌ঝন্‌ করে ভেঙে পড়ল কোথাও।

রুদ্ধশ্বাসে আজেভেদো বললেন, কেন ?

—সুলতান বলেছেন, পর্তুগীজ লুটেরাদের যোগ্য জায়গা হচ্ছে কারাগার।—সম্মুখের মুর সেনাধ্যক্ষ জবাব দিলেন কঠিন শান্ত গলায়।

আজেভেদো দেখলেন আট-দশটা বল্লমের ফলা উদ্যত হয়েছে তাঁর দিকে। হিংস্র চোখ থেকে একবার বিষ-বর্ষণ করে মাথার ওপরে হাত দুটো তুলে ধরলেন আজেভেদো। তেমনি রুদ্ধ গলায় বললেন, বেশ, আমি আত্মসমর্পণ করলাম।

গৌড়ের নীল আকাশের স্বপ্ন একরাশ পোড়া ছাইয়ের মতোই কালো হয়ে গেল।

* * * *

কিন্তু কতদিন আর এমন করে বসে থাকা যায় অনিশ্চিত আশঙ্কায় ? ডি-মেলো চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। পোর্টো গ্র্যাণ্ড থেকে দীর্ঘ পথ পোর্টো পেকেনো—মাঝখানে কত নদী, কত অরণ্য পার হয়ে যেতে হবে কে জানে ! অনুমতি নিশ্চয় পাওয়া যাবে—চট্টগ্রামের নবাব সে ভরসা দিয়েছেন ; কিন্তু কবে আসবে গৌড়ের অনুমতি—কবে ফিরে আসবে আজেভেদো কিছুই বোঝবার উপায় নেই। তা ছাড়া এই মুরদের মতিগতিও আন্দাজ করা শক্ত। শেষ পর্যন্ত—

চাকারিয়ার সে অভিজ্ঞতা ডি-মেলো ভুলতে পারেননি। ভুলতে পারেননি নবাব খোদাবক্স খাঁকে। সেই বীভৎস অধ্যায়টা বুকের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে তীরের ফলার মতো। জেন্টুররা গঞ্জালোকে বলি দিয়েছে। গঞ্জালো ! সেই কিশোর সুন্দর মুখখানা যেন আজও প্রতিহিংসার হাতছানি দেয় ডি-মেলোকে ; সন্ধি নয়—চুক্তি নয়, ইচ্ছে করে বিরাট নৌবহর নিয়ে তিনি আক্রমণ করেন চাকারিয়া—মাতামুহুরী নদীর জল কেঁপে ওঠে মুরদের মৃত্যু-যন্ত্রণায় আর হাহাকারে, তারপর—

নুনো ডি-কুন্‌হার আদেশ—তাই আসতে হয়েছে। নইলে তাঁর কোনো আকর্ষণ নেই 'বেঙ্গালার' ওপর। এর আকাশ-বাতাস বিষাক্ত। এর চারদিকে বিশ্বাসঘাতকতা।

মনের ঠিক এই অবস্থাতে এল ক্রিস্টোভাম।

—একটা কথা ছিল ক্যাপিতান।

—বল।

—গৌড়ের সুলতানের অনুমতি পেয়েও এখানে ব্যবসা করা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে।

—কেন ?

কুণ্ঠিত ললাটে ক্রিস্টোভাম বললে, এদের শুল্কের পরিমাণ শুনেছেন ?

শুকনো গলায় ডি-মেলো বললেন, শুনেছি।

—বন্দরের শুল্ক মিটিয়ে কী লাভ থাকবে আমাদের ? কিছুই না।

—আমরা নবাবের কাছে অনুমতি চাইব—বিরসভাবে ডি-মেলো বললেন, যাতে শুল্কের হার কিছু কমিয়ে দেওয়া হয়।

—সে ভরসা নেই। বরং আরো কিছু বাড়িয়েই বসবে কিনা কেউ বলতে পারে না। মুর বণিকেরা যা শুল্ক দেয় আমাদের দিতে হবে তার দ্বিগুণ। তাই যদি হয়—এত দূর থেকে, এত কষ্ট করে এসেও কিছু লাভ করতে পারব না আমরা। সোনা নিতে এসেছিলাম এখানে, মুঠো মুঠো ধুলোই নিয়ে যেতে হবে তার বদলে।

—হুঁ।—ডি-মেলো চুপ করে রইলেন।

—একটা উপায় আছে—বিশ্বস্ত ভঙ্গিতে কাছে এগিয়ে এল ক্রিস্টোভাম। চুপি চুপি বললে, একটা উপায় আছে ক্যাপিতান।

—কী উপায় ?

ক্রিস্টোভাম তেমনি নিচু গলায় বলে চলল, ক্যাপিতানের অনুমতি পাওয়ার আগেই আমি একটা ব্যবস্থা করেছি। আশা করি, তাঁরও আপত্তি হবে না। যেমন ধড়িবাজ এই মুরেরা—তেমনি ব্যবহারই করা উচিত এদের সঙ্গে।

—খুলে বলো কথাটা—ডি-মেলো অধৈর্য হয়ে উঠলেন।

—বন্দরের 'গুয়াজিলের' কিছু লোকের সঙ্গে আমি কথাবার্তা বলেছি। ওদের ঘুষ দিলেই চুপি চুপি কিছু জিনিসপত্র নামিয়ে দেওয়া যাবে। গোপনে কেনা-কাটাও করা যাবে।

মুহূর্তের জন্যে থমকে গেলেন ডি-মেলো।

—কিন্তু কাজটা খুব অন্যায় হবে ক্রিস্টোভাম।

—মুরেরাই বা কোন্ ন্যায়-ব্যবহারটা করছে আমাদের সঙ্গে ?

—তা বটে! মেঘমেদুর মুখে চুপ করে রইলেন ডি-মেলো। ঠিক কথা। কাদের সঙ্গে বিশ্বাসের চুক্তি বজায় রাখবেন তিনি ? চাকারিয়ার অভিজ্ঞতা কি এত সহজেই ভুলে যাবার ?

—তা ছাড়া এও ভেবে দেখুন—ক্রিস্টোভাম আবার আরম্ভ করল : গৌড়ের সুলতানের কাছ থেকে কবে অনুমতি আসবে ঠিক নেই। ততদিন কি এভাবেই আমরা বসে থাকব ? বিশেষ করে 'বেঙ্গালা'র মসলিন, পাটের শাড়ি আর সোনারুপো দেখে তো মাথা ঠিক রাখাই শক্ত। তারপর যদি অনুমতি নাই-ই আসে ? এত কষ্ট, এত পরিশ্রম সব বৃথা হয়ে যাবে ? ক্যাপিতান আর দ্বিধা করবেন না। অনুমতি দিন—আমরাই সব ব্যবস্থা করছি।

এক মুহূর্ত ভেবে নিলেন ডি-মেলো। তারপরে বললেন, অনুমতি দিতে আমার আপত্তি নেই ; কিন্তু যদি ওরা টের পায়—

—কেউ টের পাবে না। এই মুর-কর্মচারীরা ঘুষ পেলেই খুশি।

—বেশ, তবে তাই কর।

হাঁ, যা পারা যায়, কুড়িয়ে নেওয়া যাক। এদের সঙ্গে বিশ্বাসের চুক্তি নয়—এ সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি। নিজের বিবেককে নিরঙ্কুশ করে ফেললেন ডি-মেলো।

তারপর যখন রাত নামল, নিকষ-কালো হয়ে গেল কর্ণফুলীর জল, এক-একটি করে নিভে যেতে লাগল বন্দরের আলো—আর প্রহরীদের চোখ ক্লান্ত ঘুমে জড়িয়ে এল, তখন দুটি-একটি করে নৌকো এসে লাগল পর্তুগীজ বহরের গায়ে। প্রেতমূর্তির মতো কতগুলো মানুষের ছায়া ওঠা-নামা করতে লাগল জাহাজ থেকে। ভারে ভারে জিনিস উঠল, নেমে গেল ভারে ভারে।

আর ডি-মেলো মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলেন 'বেঙ্গালার' মসলিন—সূক্ষ্ম, উজ্জ্বল—যেন চাঁদের আলো দিয়ে গড়া। তার পঞ্চাশ গজ হাতের মুঠোয় চেপে ধরা যায়। আশ্চর্য রঙের খেলা তার ওপরে, অপরূপ তার কারুকার্য। রোমের সুন্দরীরা এই মসলিনের জন্যেই অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করতেন—এ স্বপ্নও নয়, কল্পনাও নয়।

আরো দেখলেন ডি-মেলো। যেন সোনার সুতো দিয়ে তৈরি পাটের কাপড়। তাকিয়ে দেখতে দেখতে চোখ ঝলসে ওঠে। দেখলেন অপূর্ব হাতীর দাঁতের কাজ—সূক্ষ্মতম শিল্প-নিপুণতার এমন তুলনা বুঝি কোথাও নেই। দেখলেন শঙ্খ-শিল্প, সে যেন দেবতার তৈরি। সকলের ওপরে রয়েছে মণিমুক্ত-বসানো সোনার অলঙ্কার—এ ঐশ্বর্য শুধু লিসবোয়ার অন্তঃপুরেই বুঝি মানায়!

রাতের পর রাত চলতে লাগল এই ভাবে। কর্ণফুলীর জলে অমাবস্যার পালা শেষ হয়ে গিয়ে যখন চাঁদের আলো ফুটল তখনো। সেই আলো-আঁধারিতেও নিয়মিত চলতে লাগল ছায়া-ছায়া নৌকো, আর দলে দলে ছায়া-মূর্তির আনাগোনা। আজেভেদো আর তাঁর দলবল যখন আলো-বাতাস-বর্জিত ঠাণ্ডা গারদে বন্দী হয়ে তিক্ত ক্ষোভে অভিসম্পাত দিচ্ছেন—আর ঝড়ের বেগে লাল ঘোড়ার পিঠে যখন সুলতানের ফরমান নিয়ে গৌড়ের দূত ছুটে আসছে চট্টগ্রামের পথে, তখনো হাতীর দাঁতের কাজ করা মসলিনের মোহে মগ্ন হয়ে আছেন অ্যাফোনসো ডি-মেলো।

তারপর একদিন দলবল নিয়ে বন্দরের গুয়াজিল এসে উঠলেন সান রাফাএল্ জাহাজে।

ডি-মেলো আর তাঁর সঙ্গীরা চকিত হয়ে উঠলেন। নিশীথরাত্রের গোপন ব্যাপারটা কি জানাজানি হয়ে গেছে? তাই তাঁদের বন্দী করার জন্যেই কি গুয়াজিলের এই আবির্ভাব?

কিন্তু ডি-মেলোকে বিস্মিত করে গুয়াজিল তাঁকে অভিবাদন জানালেন।

—সুখবর আছে ক্যাপিতান। গৌড়ের অনুমতি এসেছে।

—অনুমতি এসেছে?—উল্লাসে উত্তেজনায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন ডি-মেলো ঃ সুলতান মামুদ শা আমাদের অনুমতি দিয়েছেন!

—দিয়েছেন।—হাসিমুখে গুয়াজিল মাথা নাড়লেন।

—কিন্তু আমার দূত দুরাতে আজেভেদো তো এখনো ফেরেননি!

—তাঁর খবরও এসেছে। তিনি আপাতত সুলতানের অতিথি। পরম আনন্দে তাঁর দিন কাটছে।—গুয়াজিলের হাসিটা আরো বিকীর্ণ হয়ে পড়ল ঃ সুলতান ক্রীশ্চানদের সঙ্গে বন্ধুত্বটা আরো নিবিড় করার জন্যে ক্যাপিতানকেও গৌড়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

আনন্দে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলেন ডি-মেলো।

—কিন্তু যে অতিরিক্ত শুল্কের বোঝা আমাদের ওপরে চাপানো হয়েছে—তার—মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গুয়াজিল বললেন, সে-ব্যবস্থাও হয়েছে। সুলতান অবিবেচক নন। তিনি একথাও বলে দিয়েছেন তাঁর রাজ্যে কোনো পক্ষপাতিত্ব থাকবে না। আরব বণিকদের যে-সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে, পর্তুগীজ ক্যাপিতানও তা পাবেন।

মুহূর্তের জন্যে একবার ক্রিস্টোভামের দিকে তাকালেন ডি-মেলো। ক্রিস্টোভাম মাথা নিচু করল। একটা গোপন অপরাধের অনুতাপ একসঙ্গেই অনুভব করলেন দুজনে।

গুয়াজিল বলে চললেন, কাল দরবারে নবাব সুলতানের ফরমান তুলে দেবেন ক্যাপিতানের হাতে। তার আগে আজ সন্ধ্যায় একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়েছে। ক্রীশ্চানদের অভ্যর্থনা করবার সৌভাগ্য আমিই লাভ করেছি। সুতরাং আমি ক্যাপিতান এবং তাঁর সমস্ত সেনানী আর নাবিকদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। আশা করি, সে নিমন্ত্রণ ক্যাপিতান গ্রহণ করবেন।

—সানন্দে।

আর একবার অভিবাদন জানিয়ে গুয়াজিল নেমে গেলেন।

আনন্দে আবেগে বিমূঢ় হয়ে বসে রইলেন ডি-মেলো। অভিশপ্ত 'বেঙ্গালা'কে এই মুহূর্তে আর তাঁর খারাপ লাগছে না—এমন কি গঞ্জালোকে হত্যার অপরাধও বুঝি তিনি ক্ষমা করতে পারেন এখন।

সন্ধ্যায় বিরাট ভোজসভা বসল গুয়াজিলের বাড়ির প্রাঙ্গণে।

চারদিকে অসংখ্য আলোর সমারোহ—মাঝখানে বিশাল আয়োজন। এত বিচিত্র, এত সুস্বাদু খাদ্য পর্তুগীজেরা কোনোদিন চোখেও দেখেনি। সুরার দাক্ষিণ্যে ক্রমেই তারা মাতাল হয়ে উঠতে লাগল। আনন্দে আর কোলাহলে ভরে উঠল প্রাঙ্গণ।

ডি-মেলোর পাশেই খেতে বসেছিলেন গুয়াজিল আলী হোসেন। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন।

—মাপ করবেন ক্যাপিতান। আমি একটু অসুস্থ বোধ করছি।

—কী হল আপনার?

—পেটে কেমন একটা যন্ত্রণা হচ্ছে। আমাকে ক্ষমা করবেন।

ডি-মেলো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন গুয়াজিল।

সঙ্গে সঙ্গে অভাবিত ঘটনা ঘটল একটা।

প্রাঙ্গণের চারদিকে উঁচু বারান্দা। তারই ওপর থেকে কার মেঘমন্দ্র ধ্বনি শোনা গেল ঃ লুটের মাল গৌড়ের সুলতানকে ভেট পাঠাবার দুঃসাহসের জন্যে বন্দরের শুল্ক ফাঁকি দিয়ে অবৈধ বাণিজ্য করার জন্যে গৌড়ের সুলতানের আদেশে সমস্ত ক্রীশ্চানদের বন্দী করা হল।

তীর বেগে খাদ্য আর মদ ফেলে উঠে দাঁড়াল পর্তুগীজেরা। মদের নেশা আগুন হয়ে জ্বলে উঠল মাথার মধ্যে। আর নিজের কানকে ভুল শুনেছেন ভেবে, যেখানে ছিলেন সেইখানেই অসাড় বসে রইলেন অ্যাফন্সো ডি-মেলো।

আবার সেই মেঘমন্দ্র স্বর শোনা গেল ঃ ক্রীশ্চানেরা বন্দী। যদি নিজেদের ভালো চান, তাঁরা অস্ত্র ত্যাগ করুন।

কিন্তু অস্ত্র ত্যাগ কেউ করল না। সবেগে তলোয়ার খুলে উঠে দাঁড়ালেন ডি-মেলো, সেই সঙ্গে আরো চল্লিশখানা তলোয়ার ঝকঝক করে উঠল চারদিকের প্রখর আলোতে।

আর তৎক্ষণাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল শত শত মুর সৈন্য—চারদিকের উঁচু বারান্দা থেকে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল পর্তুগীজদের ওপর।

আনন্দ-কোলাহলের পালা শেষ হল আর্তনাদে, হিংস্র গর্জনে, তলোয়ারের ঝলকে। রক্তে আর মৃত্যুতে একাকার হয়ে গেল ভোজসভা। দশজন পর্তুগীজ প্রাণ দিল দেখতে দেখতে। ক্রিস্টোভামের একখানা হাত অন্তিম আক্ষেপে ডি-মেলোর পায়ের কাছে মাটি আঁকড়ে ধরল।

রক্তাক্ত দেহে, বড় বড় নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে চিৎকার করে উঠলেন ডি-মেলো ঃ আর নয়—আমরা আত্মসমর্পণ করছি।

তার পরের দিন ত্রিশজন আহত সৈন্যের সঙ্গে শৃঙ্খলিত হয়ে ডি-মেলো যাত্রা করলেন গৌড়ে। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে নয়—আরো একবার অন্ধকার কারাগারে আজেভেদোর সঙ্গে সুলতানের বিচার গ্রহণ করবার জন্যে।

চাকারিয়া শুধু 'বেঙ্গালা'তেই নেই—সারা বাঙলা দেশই তবে চাকারিয়া!

আঠারো

"Vou falar com ela"

গঙ্গাসাগরে তীর্থস্নানে চলেছেন রাজশেখর শ্রেষ্ঠী।

এই তিন বছর ধরে বহু তীর্থই পরিক্রমা করেছেন তিনি। বহু দেবতার মন্দিরে হত্যা দিয়েছেন—ফেলেছেন বহু চোখের জল। হাজার হাজার মোহর ব্যয় করেছেন পুজো আর প্রণামীর পেছনে; কিন্তু অনুগ্রহ হয়নি দেবতার।

সুপর্ণা আজও স্বাভাবিক হয়নি।

সেই কাল-রাত্রি। মহাকালীর পায়ের কাছে একটি রক্তজবার মতো পর্তুগীজ কিশোরের ছিন্নমুণ্ড। নিবিড় চোখ দুটি শাদা হয়ে গেছে মৃত্যুর ছোঁয়ায়—সোনালী চুলগুলো জটা বেঁধে গেছে কালো রক্তে। একটা চিৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল সুপর্ণা।

জ্ঞান ফিরে এসেছিল—কিন্তু স্বাভাবিক সহজ বুদ্ধি আর ফিরে আসেনি তার। সেই থেকে আর একটি কথাও বলেনি সুপর্ণা—এই তিন বছরের মধ্যেও না। যেন জন্ম থেকেই সে বোবা। দুটি আশ্চর্য উদাস ভাষাহীন চোখ মেলে সে বসে থাকে, একভাবেই বসে থাকে। সে চোখের ওপর দিয়ে একরাশ ছায়ার মতো ভেসে যায় চেনা-অচেনা মানুষের মুখ, আকাশের মেঘ-বৃষ্টি, চন্দ্র-সূর্য-তারা—দিনের আলো, রাত্রির অন্ধকার ; কিন্তু চোখের সীমা ছাড়িয়ে তারা কোনো অনুভূতির মর্মকোষে গিয়ে দোলা লাগায় না। সুপর্ণা সব দেখে—অথচ কিছুই দেখে না। যেখানে নানা রঙের একটি মন ঝলমল করত, এখন সেখানে বর্ণহীন একটা শাদা পর্দা ছাড়া আর কিছুই নেই।

এত শব্দ ওঠে পৃথিবীতে। এত মানুষ কথা বলে—হাসে, কাঁদে, গান গায়। পাখির গান বাজে, নদীর জল কল্লোল তোলে, পাতায় পাতায় বাতাস মর্মরিত হয়ে যায়, ঝর্ ঝর্ করে বৃষ্টি পড়ে—ক্ষুব্ধ আক্রোশে মেঘ গর্জায়। কিছুই শুনতে পায় না সে। বর্ণ-গন্ধ-শব্দ—সব তার কাছ থেকে হারিয়ে গেছে।

এক ভাবে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বসে থাকে। সারাক্ষণ কী একটা দেখতে থাকে—নইলে কিছুই দেখে না। খাইয়ে দিলে খায়—নইলে উপোসেই হয়তো দিন কাটায়। বিস্ফারিত চোখে ঘুমের আভাস মাত্র নেই। ঘুমুতেও সে ভুলে গেছে।

পাণ্ডুর মুখখানা আরও পাণ্ডুর হয়ে গেছে। চোখের কোণায় নিবিড় কালির রেখা। সুপর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে চাপা আগুনে রাতদিন পুড়ে খাক হয়ে যান রাজশেখর। সব অপরাধ তাঁরই। গুরুর আদেশ পালন করতে গিয়ে দেবতার অপমান করেছিলেন তিনি। শিবের বিগ্রহকে তিনি কলঙ্কিত করেছিলেন মানুষের রক্তে। তাই আজকে এই কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে তাঁকে। সুপর্ণার রোগমুক্তির জন্যেই মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তিনি—ভুলের ফলে পেলেন এই অভিশাপ।

তাই ক্রমাগত তীর্থে তীর্থে ঘুরেছেন। দেবতার কাছে ক্ষমা চাইছেন বার বার ; কিন্তু আজও অনুগ্রহ হয়নি দেবতার। হয়তো হবেও না কোনোদিন।

দুপুরের রোদ চড়ছে নোনা নদীর ওপর। ধু-ধু করছে ও-পারটা—এ-পারে গাছপালার শ্যামল ছায়া। বিশাল নদীর ঘোলা জলের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সুপর্ণা।

রাজশেখর বললেন, বেলা বাড়ছে—বজরা বাঁধ এখানেই। খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতে হবে।

মাঝিরা রাজী হল। ভাঁটার মুখে আরো খানিক এগিয়ে গেলেই নদী ক্রমশঃ সমুদ্রের রূপ ধরবে—বিস্বাদ নোনা হয়ে যাবে জল—কাদামাখা তীর পড়বে নদীর ধারে। খাওয়ার পর্ব এইখানেই সেরে নেওয়া ভাল। নৌকো চলল কূলের দিকে।

একটা জরাজীর্ণ বিষ্ণুমন্দির—ভাঙন-লাগা কূলে তার অর্ধেকটা নেমে গেছে নদীর ভেতরে। পাশে দাঁড়িয়ে আছে পুরনো বটগাছের ঘন-গম্ভীর ছায়া। কয়েকটা মোটা মোটা শাদা শিকড় এঁকেবেঁকে সাপের মতো চলে গেছে জলের মধ্যে। সেই বটগাছের শিকড়ে বজরা বাঁধলেন রাজশেখর।

ঠিক এই সময় ভাঙা মন্দিরটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা লোক।

পাগল নিঃসন্দেহ। মাথায় জটার মতো লম্বা লম্বা চুল—মুখে বিশৃঙ্খল গোঁফ-দাড়ি। কিছুক্ষণ উদ্‌ভ্রান্ত চোখে তাকিয়ে রইল সে। তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ঃ শেঠ রাজশেখর!

চমকে লোকটার দিকে তাকালেন রাজশেখর। এখানে—এই দূর গঙ্গা-সাগর অঞ্চলে কে তাঁকে চিনল এমন করে? তীক্ষ্ন চকিত গলায় তিনি বললেন, কে—কে তুমি?

আমাকে চিনতে পারছেন না?—যন্ত্রণা-বিকৃত গলায় লোকটা বললে, আমি শঙ্খ—শঙ্খদত্ত।

শঙ্খদত্ত! কয়েক মুহূর্ত মুখ দিয়ে একটি শব্দ বেরুল না রাজশেখরের। তাঁর বাল্যবন্ধু—সপ্তগ্রামের বিখ্যাত বণিত ধনদত্তের ছেলে। তীব্র বিস্ময়ে তিনি বললেন, শঙ্খদত্ত! তুমি?

দু হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল শঙ্খদত্ত। তারপর হু হু করে কেঁদে ফেলে বললে, কারো দোষ নেই কাকা—নিজের পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করছি।

* * * *

ভাঙা জাহাজের একটা মাস্তুলে চড়ে তিনদিন সমুদ্রে ভেসে ছিল শঙ্খদত্ত। তারপর আশ্রয় মিলল একটা দ্বীপে। সেখানে কতকগুলো অর্ধ-উলঙ্গ মানুষের সঙ্গে দু বছর অদ্ভুত জীবন কাটল তার। যখন মনে হচ্ছিল সে এবার পাগল হয়ে যাবে, সেই সময়ে কোথা থেকে মগেদের জাহাজ এল একটা। তারা শঙ্খ-দত্তকে উদ্ধার করল। শেষ পর্যন্ত গঙ্গাসাগরের কাছে তাকে নামিয়ে দিয়ে ভেসে চলে গেল পূর্ব সমুদ্রে।

এই প্রায় চারটি বছর ধরে একটিমাত্র কথাই ভেবেছে শঙ্খদত্ত। জগন্নাথের দাসীকে চুরি করে এনেছিল সে—তাই এমনি করে দেবতার অভিসম্পাত নেমে এসেছে তার ওপর। কারো দোষ নেই—কেউ-ই দায়ী নয়। এ-দণ্ড তার প্রাপ্য ছিল—নিজের বিকৃত কামনার মাশুলই তাকে মিটিয়ে দিতে হয়েছে কড়ায় গণ্ডায়; নীলমাধব তাঁর দিগন্ত-নীল বুক পেতে দিয়ে গ্রহণ করেছেন বধূকে—মর্ত্যের কোনো আবিল দৃষ্টি সেখানে গিয়ে কখনো পৌঁছুবে না।

দু ধারে দিগন্ত-প্রসারী নদী। হাওয়া দিয়েছে—ঘোলা জলে ঢেউ খেলছে—ভারী বজরাটা দুলছে ঢেউয়ের তালে তালে। নিঃশব্দে শুনে গেলেন রাজ-

শেখর। একটি কথাও বললেন না।

দেবতার ক্রোধ! তাই বটে। তার হাত থেকে কারো নিস্তার নেই— শঙ্খদত্তেরও নয়।

নিজের কপালে দু হাত দিয়ে চুপ করে বসে রইল শঙ্খদত্ত। অন্যমনস্ক ভাবে তার দিকে তাকিয়ে তেমনি নিঃশব্দে বসে রইলেন রাজশেখর। আর বজরার জানালা দিয়ে ঢেউ-জাগানো জলে নির্বাক সুপর্ণা কী যে দেখতে লাগল সে-ই জানে।

কিছুক্ষণ পরে শঙ্খদত্তই স্তব্ধতা ভাঙল।

—গুরুদেবই ঠিক বলেছিলেন।

হঠাৎ যেন তপ্ত অঙ্গারের ছোঁয়ায় চমকে উঠলেন রাজশেখর। অস্বাভাবিক গলায় বললেন, কে?

শঙ্খদত্ত আশ্চর্য হল।

—আমাদের গুরু। গুরু সোমদেব। তিনি বলেছিলেন, আজ শুধু আমাদের চুপ করে বসে থাকলেই চলবে না। অনেক বড় কাজ করবার আছে—রয়েছে অনেক দায়িত্ব। দেশে মোগল-পাঠানের বিরোধ বাধছে—বিদেশী ক্রীশ্চানেরা বাড়িয়েছে লোভের হাত—চারদিকে দুর্যোগ ঘন হয়ে আসছে। এই-ই সুযোগ। এমন সুযোগ হেলায় হারালে চলবে না। আমাদের তৈরি হয়ে নিতে হবে—যাতে এর ভেতর দিয়ে আবার আমরা হিন্দুর রাজত্ব ফিরিয়ে আনতে পারি—যাতে—

—শঙ্খ!

আরো অস্বাভাবিক গলায়, অপ্রত্যাশিত উত্তেজনার সঙ্গে শান্ত-স্তিমিত মানুষ রাজশেখর চিৎকার করে উঠলেন। হিংস্র একটা দ্যুতিতে জ্বলে উঠল তাঁর স্তিমিত চোখ ঃ ও-কথা থাক শঙ্খ, ও-কথা থাক। গুরু সোমদেবের নাম আমার সামনে তুমি উচ্চারণ কোরো না।

শঙ্খদত্তের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়ে উঠল ঃ এ আপনি কী বলছেন কাকা! আমাদের গুরুদেব—

—বলেছি তো, তাঁর নাম আমি আর শুনতে চাই না।

—একি মহাপাপের কথা বলছেন কাকা! তিনি যে স্বয়ং মহাপুরুষ!

ক্ষিপ্ত হয়ে রাজশেখর বললেন, তা জানি না ; কিন্তু তিনি আমার সর্বনাশ করেছেন।

—কাকা!

অদম্য উত্তেজনায় রাজশেখর হাঁপাতে লাগলেন ঃ তাঁর হিন্দুরাজ্য শুধু একটা উন্মাদের কল্পনা। অস্ত্র নেই—প্রস্তুতি নেই—শুধু অর্থহীন ক্ষ্যাপামি দিয়েই কেউ রাজ্য গড়তে পারে না। মহাশক্তিকে জাগানো শুধু কথার কথাই নয়—তার আগে দেশের মানুষকে জাগাতে হয়। সে শক্তি সোমদেবের নেই—কোনোদিন ছিলও না।

—কাকা!—শঙ্খদত্ত এবার আর সম্পূর্ণ শব্দটা উচ্চারণ করতে পারল না।

একটা অস্পষ্ট ধ্বনিই বেরিয়ে এল শুধু। এতদিন ধরে এ-কথাগুলো কি কখনো ভেবেছিলেন রাজশেখর? কখনো কি এত কথা একসঙ্গে চিন্তা করেছিলেন তিনি? নিজেই বুঝতে পারলেন না। অথবা একটা প্রচণ্ড উত্তেজনার বৈদ্যুতিক ছোঁয়ায় তাঁর সমস্ত বিচ্ছিন্ন শৃঙ্খলাহীন ভাবনাগুলো এই মুহূর্তেই স্পষ্ট একটা ঘনীভূত রূপ ধরল। নিজেরই অপরিচিত তীব্র ভয়ংকর ভাষায় তিনি বলে চললেন, হিন্দু রাজ্য! কোন্ হিন্দু রাজ্য? কোন্ হিন্দুর মাথাব্যথা পড়েছে তার জন্যে? রাজা হিন্দুও যা, মুসলমানও তাই। কোন্ হিন্দু শাসনকর্তা মুসলমানের চেয়ে কম অত্যাচার করে? হিন্দুর রাজত্ব হলে হয়তো সোমদেবের সুবিধে হবে—যার খুশি তারই মাথা হাতে কাটতে পারবেন; কিন্তু সাধারণ মানুষের তাতে কী লাভ? এখন বরং কিছু বাঁচোয়া আছে, কিন্তু তখন মনুর বিধানে পান থেকে চুন খসলে শূলে চড়তে হবে লোককে।

এবারে আর কথা বলবার শক্তি ছিল না শঙ্খদত্তের। বিস্মিত আতঙ্কে দুঃস্বপ্নের মতোই সে রাজশেখরের কথাগুলো শুনে যেতে লাগল।

—কাকে জাগাবেন গুরুদেব? দেশের অর্ধেক লোক আপ্ত বৌদ্ধ। চারদিকে চলেছে তন্ত্র আর ব্যভিচার—মনুর বিধানের জন্যে কারো এতটুকুও মাথাব্যথা নেই। একটা গ্রামে এসে মৌলবী বদ্‌না টাঙিয়ে দিয়ে যায়—গোটা গ্রামের সব মানুষ মুসলমান হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। মন্দির ভেঙে মস্‌জিদ তৈরি হয় তৎক্ষণাৎ—কালীর থান হয় পীরের দর্গা। শাস্ত্র মেনে চলা কটি হিন্দুর সন্ধান পাবেন গুরুদেব—যাঁদের নিয়ে তিনি লড়াই করবেন মুসলমানের সঙ্গে? দেশের মানুষকে দিনের পর দিন বৌদ্ধ আর মুসলমানদের কাছে ঠেলে দিয়ে আজ মিথ্যেই তিনি আকাশ-কুসুম তৈরি করছেন। মানুষ বলে যাদের কোনোদিন স্বীকার করা হয়নি—আজ কিসের জন্যে তারা ব্রাহ্মণের ডাকে সাড়া দিতে যাবে?

—আপনি সব জিনিসের খালি অন্ধকার দিকটাই দেখছেন কাকা।—ক্ষীণভাবে বললে শঙ্খদত্ত।

—অন্ধকার দিক?—কখনো নয়—উত্তেজনার উচ্ছ্বাসটাকে অনেকখানি পরিমাণে সংযত করলেন রাজশেখর: তোমার চাইতে আমি অনেক বেশি ভেবেছি শঙ্খ, অনেক বেশি দেখেছি। আর এটা বেশ বুঝতে পেরেছি হিন্দুর হাতে এ দেশ আর কখনো ফিরবে না—কোনোদিনই না। এখন বল্লালী আমলের স্বপ্ন দেখাও পাগলামি।

—কিন্তু কিছু কিছু খাঁটি হিন্দু এখনো তো রয়েছেন। যাঁরা বঙ্গ-বরেন্দ্রভূমির রাজা জমিদার, তাঁরা অনেকেই তো নিষ্ঠাবান হিন্দু। তাঁরা যদি একসঙ্গে দাঁড়ান—

—পাগল হয়েছ তুমি?—রাজশেখর অনুকম্পার হাসি হাসলেন: কেন দাঁড়াবে তারা—কী তাদের স্বার্থ? গৌড়ের মুসলমান সুলতান মাথার ওপর আছে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কতটুকু? খাজনা পাঠিয়েই

খালাস। তারা স্বাধীন, নিশ্চিন্ত—যা খুশি করে বেড়ায়। আর তারা একসঙ্গে দাঁড়াবে বলছ? পাশাপাশি দুটো চাকলাদারের মধ্যেই জমি জায়গা নিয়ে খুনোখুনির অন্ত নেই—দুটো রাজাকে তুমি একসঙ্গে মেলাতে চাও? এ সব ভাবনা ছেড়ে দাও শঙ্খ। বণিকের ছেলে—ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়েই থাক। রাজনীতির মিথ্যে ভাবনায় সময় নষ্ট করে কোনো লাভ নেই।

—আর এই বিদেশী পর্তুগীজেরা?

—ওরা আসবে—সবাই আসবে। কাউকে ঠেকাতে পারবে না। দেশ বলে কিছু নেই—দেশের মানুষ বলেও কেউ নেই। জনকয়েক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কয়েকটা ছোট ছোট সমাজ আর চতুষ্পাঠী আগলে বসে আছে মাত্র। চারদিকে যখন সমুদ্র, তখন মাঝখানের কয়েকটা ছোট ছোট দ্বীপকে নিয়ে দেশ গড়া যায় না শঙ্খ।

আবার চুপ করে রইল শঙ্খদত্ত। কিছু বলতে পারল না—ভাষা খুঁজে পেল না প্রতিবাদ করবার। একটা অবরুদ্ধ ক্রোধ বুকের মধ্যে বন্দী বুনো বেড়ালের মতো আঁচড়ে চলল। ঠিক এই মুহূর্তে রাজশেখরকে কোনো কঠিন কথা বলতে পারলে তৃপ্তি পেত সে—একটা মুখের মত জবাব দিতে পারলে অনেকখানি কমতে পারত অন্তর্জ্বালা, কিন্তু—

আর—আর শম্পা? বুনো বেড়ালের আঁচড়গুলো আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল—যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে লাগল তার হৃৎপিণ্ড। নিচের ফাটা ঠোঁটের ওপর সামনের দুটো দাঁত সজোরে বসিয়ে দিলে শঙ্খদত্ত। একটা মৃদু যন্ত্রণা জাগল।

নীরবতা। হাওয়ায় পাল তুলে বজরা চলেছে মন্থর মন্দাক্রান্তায়। নোনা নদীর খেয়ালী কলধ্বনি। পাশের জানালা দিয়ে দেখা গেল বজরার সঙ্গে সঙ্গে টিকটিকির মতো জলের ওপর গলা তুলে একটা প্রকাণ্ড কুমীর ভেসে চলেছে—হয়তো মানুষ-টানুষ কিছু জলে পড়বে এই আশায়। কুৎসিত কালো পিঠের উঁচু উঁচু চাকাগুলোর ওপরে শ্যাওলার হালকা আস্তরটা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার।

শিউরে উঠে দৃষ্টি সরিয়ে নিল শঙ্খদত্ত; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখ গিয়ে পড়ল সুপর্ণার ওপর। বজরার একান্তে বাইরের দিকে তাকিয়ে একভাবেই বসে আছে। প্রাণহীন মুখ। রুক্ষ চুলগুলো বাতাসে উড়ছে। এতক্ষণে শঙ্খদত্তের খেয়াল হল—একবারও তার দিকে ফিরে তাকায়নি সুপর্ণা—একবার হাসেনি—একটি কথাও বলেনি। সে আছে—তবু সে কোথাও নেই। নিঃশব্দ নির্বিকার একটি ছায়ার মতো নিজের মধ্যেই সে লীন হয়ে রয়েছে।

রাজশেখর লক্ষ্য করলেন। বললেন, সুপর্ণাকে তুমি কি চিনতে পারছ না?

—অনেক ছোট দেখেছিলাম, তবুও না চেনার কোনো কারণ নেই; কিন্তু ও কি অসুস্থ?

গম্ভীর মৃদু গলায় রাজশেখর বললেন, ও পাগল হয়ে গেছে।

—পাগল!—শঙ্খদত্ত বেদনায় বিস্ময়ে বিহ্বলভাবে তাকিয়ে রইল: কী

বলছেন আপনি ?

—সে অনেক ইতিহাস, অন্য সময় বলব। রাজশেখরের চোখ দুটো আবার চকচক করে উঠল ঃ শুধু এইটুকুই বলতে পারি, তার জন্যে গুরুদেবই দায়ী।

—গুরুদেব!

—হাঁ, গুরুদেব। তাঁরই খেয়ালের দাম আমাকে এইভাবে দিতে হচ্ছে। —এবার চোখের কোণটা ভিজে আসতে লাগল রাজশেখরের ঃ আজ চার বছর ধরে একটি কথাও ও বলেনি। হয়তো কোনোদিনই আর বলবে না। গুরুর পাপে দেবতার অভিশাপ ওকে চিরদিনের মতো বোবা করে দিয়েছে।

—চিকিৎসা—

—কোনো বৈদ্যের সে সাধ্য নেই। তাই তো তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছি। যদি দেবতার দয়া হয় হবে—নইলে আমার ওই একমাত্র সন্তানকে বুকের কাঁটা করে নিয়েই শেষ দিন পর্যন্ত বাঁচতে হবে, মরেও আমি শান্তি পাব না।

জল পড়তে লাগল রাজশেখরের চোখ দিয়ে।

একবার সেই চোখের জলের দিকে তাকাল শঙ্খদত্ত—আর একবার তাকাল ছায়ার মতো প্রাণহীন—স্পন্দনহীন একটি আশ্চর্য ছবির দিকে। তারপর হঠাৎ বলে ফেলল ঃ আমি ওকে কথা বলাব কাকা—আমি ওকে ফিরিয়ে আনব।

—পারবে ?—আবেগে রাজশেখর শঙ্খদত্তের হাত চেপে ধরলেন ঃ পারবে তুমি ?

কোথা থেকে শক্তি আর আত্মবিশ্বাস এল কে জানে। বিষণ্ণ বিবর্ণ ছায়াময়ীর দিকে দৃষ্টি একান্ত রেখেই শঙ্খদত্ত বললে, পারব।

উনিশ

"O ar esta Pezado"

শান্তি নেই—কোথাও শান্তি নেই।

সিংহাসন এখনো ফিরোজের রক্ত-মাখা—আবদুল বদর মামুদ শার চোখের সামনে এখনো তার প্রেতচ্ছায়া ভেসে বেড়ায়। নিথর রাত্রে কখনো কখনো ঘুম ভেঙে যায় মামুদ শার—খোলা জানালা দিয়ে পড়া এক ঝলক চাঁদের আলো যেন ফিরোজের মূর্তিতে পরিণত হয়। একটা তীক্ষ্নধার ছোরা হাতে নিয়ে সে যেন এগোতে থাকে মামুদ-শার দিকে—তার দুটো চোখ নিষ্ঠুর হিংসায় দুখানা হীরের মতো ঝকঝক করে ওঠে।

একটা আর্ত চিৎকার বেরিয়ে আসে মামুদ শার গলা থেকে ঃ আল্লা—রহমান!—মূর্তিটা যেন জ্যোৎস্নায় ধোঁয়ার মত মিলিয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। দরজার বাইরে ঘুম-জড়ানো চোখ দুটো মেলে মাত্র মুহূর্তের জন্যে চমকে ওঠে প্রহরী—একবার ঝনঝনিয়ে ওঠে কোমরের তলোয়ার—তার পরেই আবার

এলিয়ে পড়ে নিশ্চিন্ত ঘুমে। ওরা জানে, রাত্রে মাঝে মাঝে অমনি চেঁচিয়ে ওঠার অভ্যাস আছে সুলতানের।

মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে একা প্রার্থনা করেন মামুদ শা। কয়েক মুহূর্তের দুর্বলতায় আল্লার কাছে মিনতি জানান তিনিঃ ফিরিয়ে দাও—ফিরিয়ে দাও আবদুল বদরকে। আমি মামুদ শা হতে চাই না।

কিন্তু রাত্রের বিভীষিকা দিনে থাকে না। তার জায়গায় থাকে আর এক জ্বালা। হাজিপুরের মখদুম-ই-আলম—আর—আর সাসারামের শের খাঁ!

পূর্বভারত থেকে মোগলকে দূর করতে চেয়েছিলেন নসরৎ শা—প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন পাঠানের এক সম্মিলিত বিশাল রাজ্য। ভালই করেছিলেন; কিন্তু একটা ভুল হয়েছিল তাঁর—দক্ষিণ বিহারের ওই সামান্য জায়গীরদার শের খাঁকে তিনি চিনতে পারেননি। নসরৎ জানতেন না—আফগানের গৌরব ফিরিয়ে আনবার জন্যে এক বিন্দু মাথাব্যথা নেই শের খাঁর। শের লোভী—শের স্বার্থপর। নিজের একার জন্যে সব গুছিয়ে নিতে চায় শের খাঁ—বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসতে চায় সে।

তুচ্ছ—নগণ্য ভৃত্য শের খাঁ। নসরৎ শা নিজের অজ্ঞাতে তার হাতে তুলে দিয়েছেন মৃত্যুবাণ,—দিয়েছেন তারই হাতে হোসেন শাহী বংশের সমাধি-রচনার ভার।

বাবরের বিরুদ্ধে যে লক্ষ তলোয়ার একসঙ্গে জড়ো হয়েছিল নসরৎ আর লোহানীদের নেতৃত্বে—আজ সেই সব তলোয়ারই রুখে দাঁড়িয়েছে গৌড়ের সর্বনাশ করতে। ওই শয়তান শেরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে মখদুম-ই আলম। সেই মখদুম—যার চক্রান্তে নসরৎ শাহের ছেলে ফিরোজকে বসানো হয়েছিল গৌড়ের সিংহাসনে; সেই মখদুম—যার জন্যে মামুদের হাত আজ রক্ত-কলঙ্কিত। গৌড়ের বুকে বিহারের ওই কাঁটাগুলো খচ্ খচ্ করে বিঁধছে সব সময়ে। যেমন করে হোক—উপড়ে ফেলতেই হবে ওদের।

তাই মুঙ্গেরের শাসনকর্তা বিশ্বস্ত কুতুব খাঁকে বিরাট সৈন্যবাহিনী দিয়ে পাঠিয়েছিলেন মখদুমকে দমন করতে—আগে আত্মীয়-শত্রু নিপাত করা দরকার। তারপর আসবে শের খাঁর পালা; কিন্তু শয়তানের আশীর্বাদ পেয়েছে শের। যুদ্ধে লোহানী আর গৌড়ের সৈন্যেরা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে—শেরের হাতে প্রাণ দিয়েছে কুতুব খাঁ।

লজ্জা—অপমান! বাংলার প্রবল-পরাক্রান্ত সুলতান—হোসেন শা নসরতের উত্তরাধিকারী এমনি ভাবে হার মানবে বিহারের তুচ্ছ একটা জায়গীর-দারের কাছে! আর—আর—আত্মীয়-শত্রু মখদুম ওই রকম ভাবে গর্বে বুক ফুলিয়ে বেড়াবে! আবার নতুন উদ্যমে সৈন্য পাঠিয়েছেন মামুদ শা। এবার আর শের খাঁ সময়মতো এসে মখদুমের সঙ্গে মিলতে পারেনি—মখদুমকে বুকের রক্ত দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে।

কিন্তু শুধু মখদুমের রক্তস্নানেই তো গৌড়ের গৌরব উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না। এত সহজেই তো কুতুবের পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে পারা যায় না। যতদিন

শের খাঁকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করা না যায়, যতদিন ভেঙে না দেওয়া যায় বিদ্রোহী বিহারের বিষদাঁত—ততদিন গৌড়-বঙ্গের শান্তি নেই কিছুতেই। ততদিন একটা হিংস্র জন্তুর মতো সারাদিন পায়চারি করবেন মামুদ শা—অসহ্য ক্রোধে নিজের হাত কামড়ে রক্তারক্তি করতে ইচ্ছে হবে—আর—আর—নিথর রাত্রে যখন আচমকা ঘুম ভেঙে যাবে, তখন—

দু হাতে মাথা টিপে ধরলেন সুলতান। শান্তি নেই—শান্তি নেই কোথাও। সুন্দরী বাইজীদের পেশোয়াজের ঘূর্ণি মাথা থেকে দুশ্চিন্তার পাহাড় উড়িয়ে নিতে পারে না—তাদের নেশাভরা চোখের তীক্ষ্ন কটাক্ষ এতটুকু আলো ফেলতে পারে না সুলতানের অন্ধকার নিঃসঙ্গতায়। এর চেয়ে অনেক বেশি—অনেক সুখে ছিল সামান্য আবদুল বদর। খোদা—রহমান!

ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন সুলতান। মাথার ওপর হাজার ডালের বাতি জ্বলছে, আর তার আলোয় নিজের একটা দীর্ঘ ছায়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে তাঁর। ও যেন তাঁর দেহের প্রতিবিম্ব নয়—ও তাঁর অন্ধকার আত্মার প্রতিফলন। সুলতান একবার তাকিয়ে দেখলেন। একটা বিকৃত বিকলাঙ্গ ছায়া—অদ্ভুত স্থূলকায়—অস্বাভাবিক তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। নিজের ভেতরে অমনি একটা বিকারকে বয়ে নিয়ে চলেছেন তিনি ঃ পেছনে পেছনে নিয়ে চলেছেন এক দুঃসহ ছায়া-সহচরকে।

শান্তি ? শান্তি কোথাও নেই।

আজ কিছুদিন ধরেই উৎকণ্ঠায় ভরে আছে মন। লোহানী জালাল খাঁ আর সেনাধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁর সঙ্গে আর একটি বিপুল বাহিনী মুঙ্গের থেকে তিনি পাঠিয়েছেন শেরের বিরুদ্ধে। দুর্ধর্ষ এই সৈন্যবাহিনী—এমন প্রচণ্ড আয়োজন বাবরের বিরুদ্ধে নসরৎ শাও করতে পারেননি সেদিন। কামান আছে—ঘোড়সোয়ার আছে, আর—আর আছে বাঙালী পাইকের দল। রায়বাঁশ আর বল্লম নিয়ে এই বাঙালী পাইকেরা যখন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে—তখন এমন কোনো শক্তি নেই—যা তাদের মুখোমুখি দাঁড়ায়। যুদ্ধে তারা পেছন ফিরতে জানে না—শরীরে যতক্ষণ একবিন্দু রক্ত আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সংগ্রাম। এই হিন্দু পাইকদের ওপরেই মামুদ শার ভরসা সব চাইতে বেশি।

কিন্তু কী আশ্চর্য—প্রায় এক মাস ধরে এই শক্তিধর বাহিনী শেরকে যুদ্ধে হারাতে পারেনি। বিচক্ষণ শের খাঁ যুদ্ধের সুযোগ দেয়নি বললেই হয়।—সে জানে—ইব্রাহিম খাঁর সামনে একবার পড়লে হাওয়ার মুখে রাশি রাশি কার্পাস তুলোর মতো উড়ে যাবে তার সৈন্য।

অদ্ভুত কৌশলে শের ইব্রাহিম খাঁকে আটকে রেখেছে সুরযগড়ের সংকীর্ণ প্রান্তরে। একদিকে খরবাহিনী গঙ্গা, অন্য দুধারে কিউল আর খড়্গপুরের পাহাড়। মাঝখানের ছোট পথটুকু আগলে আছে শের। ওখান দিয়ে অতবড় বাহিনীকে চালিয়ে বের করে নেওয়ার আগেই দু দিক থেকে আক্রমণ করে বসবে শের খাঁ। তার ফল কী হবে বলা যায় না। অতএব—

কিন্তু আর সহ্য হয় না। যেন আগুনের প্রকাণ্ড একটা চক্র ঘুরে চলেছে মাথার ভেতরে। মামুদ শা চিৎকার করে ডাকলেন, কে আছে বাইরে?

প্রহরী এসে অভিবাদন করে দাঁড়াল।

—উজীর সাহেব!—প্রয়োজন ছিল না, তবু চিৎকার করে উঠলেন মামুদ শা।

প্রতিহারী চলে গেল। আবার সুলতান একা পায়চারি করতে লাগলেন ঘরের মধ্যে। আর ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয় তাঁর নিজেরই ছায়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগল। দেহের নয়—একটা অন্ধকার আত্মার প্রতিবিম্ব।

সিংহাসন! প্রতাপ! সুখ!

প্রতাপ থাকলে সিংহাসন পাওয়া যায় বইকি—তখ্‌তে বসে নির্ধারণ করা যায় কোটি কোটি মানুষের জীবন মৃত্যু। বিলাস? তারও ত্রুটি থাকে না। আসে রাশি রাশি আশ্চর্য সূক্ষ্ম মস্‌লিন—যেন চাঁদের আলোয় সূতো দিয়ে গড়া; হীরা-মাণিক-মোতি সবই আসে, ইরাণের সেরা সুন্দরীরা এসে জড়ো হয় রংমহলে—কত উন্মত্ত রাত কাটে উদ্দাম সম্ভোগের বন্যতায়; কিন্তু তার পর? কোনো নিঃসঙ্গতায়—নিজের কোনো একান্ত অবসরে—বুকের ভেতরে তাকিয়ে দেখো একবার। কেউ নেই—কিছুই নেই!

কখনো কখনো মামুদ শার মনে হয়—হঠাৎ এই গৌড় যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে; মসজেদের মিনার, মন্দিরের ত্রিশূল, আকাশ-ছোঁয়া বুরুজ, লাল ইট আর শাদা-কালো পাথরে গড়া চারদিকের বড় বড় বাড়ি, গঙ্গায় পাল-তোলা অসংখ্য নৌকো—এরা সব মুছে গেছে চক্ষের পলকে। জলের বুকে কয়েকটা বুদ্‌বুদের মতো ফুটে উঠেছিল এরা—এখন আর কোথাও নেই। কোন্ যাদুকরের ভেল্‌কি লেগে এই হাওয়াই শহর উড়ে গেছে আকাশে; আর মামুদ শা দাঁড়িয়ে আছেন একটা ফাঁকা মাঠের ভেতরে! মাঠ? তাও ঠিক বলা যায় না। পায়ের নিচে মাটি—ওপরে আশমান—সব কিছুই ধোঁয়া দিয়ে গড়া। তার মধ্যে একা দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। আর সেই ছায়া-ছায়া কুয়াশার ভেতরে—সেই শূন্যতার জগতে একে একে এগিয়ে আসছে নসরৎ শা—আসছে ফিরোজ, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন রক্তাক্ত তাদের শরীর, তাদের চোখে বীভৎস ঘৃণা। নিঃশব্দ সমস্বরে তারা যেন প্রশ্ন করতে চাইছে—তারপর মামুদ, তারপর?

তারপর?

—কে?—মামুদ শা প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন।

উজীর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

—সুলতান আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

মামুদ শা চকিত হয়ে উঠলেন। যেন ঘুম ভাঙল তাঁর।

—ইব্রাহিম খাঁর কোনো খবর আছে?

—না।

—এখনো শের খাঁ চুরমার হয়ে যায়নি?

—সুলতানকে সুখবর দিতে পারলে আমিই সবচেয়ে খুশি হতাম। মাথা

নিচু করে উজীর জবাব দিলেন। মামুদ শা আবার পায়চারি করতে লাগলেন খাঁচায় বন্দী অসহায় একটা বাঘের মতো। বিকৃত পিণ্ডাকার ছায়াটা ঘুরতে লাগল সঙ্গে সঙ্গে।

—কী করছে ইব্রাহিম খাঁ? মখদুমের মতো শত্রু নিপাত হয়েছে আর শেরের মতো একটা সামান্য জায়গীরদার এখনো দাঁড়িয়ে আছে মাথা তুলে?

—শের অত্যন্ত ধূর্ত খোদাবন্দ্। বেয়াদবি মাপ করবেন—তাকে ঠিক সামান্য বলা যায় না!

—ধূর্ত!—হিংস্র গলায় সুলতান বললেন, এত সৈন্য, এত কামান, ইব্রাহিম খাঁ আর জালাল খাঁ লোহানীর মতো সেনানায়ক, তবু শেরকে পিষে মারা যায় না?

—হয়তো যায়; কিন্তু সুলতান তো জানেন সুরযগড়ের ওই সংকীর্ণ মুখটুকু শের খাঁ এমন কৌশলে আটকে রেখেছে যে তার সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ অসম্ভব। অথচ হঠাৎ একটা কিছু করতে গেলে তার ফলও হয়তো ভাল হবে না।

—উঃ—অসহ্য!—মামুদ শা সরে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়ালেন। কেল্লার বাইরে গৌড়ের বুরুজ-মিনার আর বড় বড় বাড়ির চূড়াগুলো অন্ধকার আকাশে আরো কালো কালি দিয়ে আঁকা; দু-একটা আলো বিদ্রূপ-ভরা চোখের মতো মিটমিট করছে।

কিছুক্ষণ পরে উজীরই আবার স্তব্ধতা ভাঙলেন।

—তাছাড়া একথাও সুলতান জানেন যে মখদুম-ই আলম মরবার সময়েও আমাদের শত্রুতা করে গেছেন।

তীরবেগে ঘুরে দাঁড়ালেন মামুদ শা। জ্বলন্ত গলায় বললেন, মখদুম্!

উজীর বলে চললেন, শেষবার যুদ্ধে যাওয়ার আগে মখদুম শের খাঁর হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর লক্ষ লক্ষ মোহর—বহুমূল্য হীরা-মাণিকের ভাণ্ডার। বলে গিয়েছিলেন, যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তিনি এগুলো নেবেন—তাঁর কাছে থাকলে হয়তো গৌড়ের সৈন্য সব লুটে নেবে। যুদ্ধ থেকে মখদুম ফেরেননি—বিনিময়ে কিন্তু শেরের লাভই হয়েছে তাতে। মখদুমকে সে হারিয়েছে—পেয়েছে কোটি টাকার ঐশ্বর্য। এই টাকার জোরেই শের এমন করে লড়তে পারছে আমাদের সঙ্গে। সৈন্য সংগ্রহ করছে, কিনছে অস্ত্র-শস্ত্র। নইলে কোন্ কালে একটা তুচ্ছ পোকার মতো সে মাটিতে দলে যেত।

কোনো কথা আমি শুনতে চাই না—আবার একটা অধৈর্য আর্তনাদ এল মামুদের কাছ থেকে ঃ আপনি দূত পাঠান সুরযগড়ে। ইব্রাহিম খাঁকে জানিয়ে দিন, সাত দিনের মধ্যে শের খাঁর মাথা পৌঁছনো চাই আমার কাছে—আর চাই বিহারের নিষ্কণ্টক অধিকার। যদি না পারে, ইব্রাহিম খাঁকে আমি বরখাস্ত করব।

—সুলতানের যা হুকুম, তাই হবে; কিন্তু ঃ সংশয়ের মেঘ ঘনিয়ে এল উজীরের মুখে ঃ শের খাঁ অত্যন্ত শয়তান। তাকে জব্দ করতে হলে কিছু ধৈর্য—

—ধৈর্য ! ধৈর্যেরও সীমা আছে একটা। আর একটা কথাও আমি শুনতে চাই না।

উজীর বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘরে ঢুকলেন আল্‌ফা হাসানী। চোখে-মুখে উৎকণ্ঠার ছায়া।

—সুলতানের কাছে একটা জরুরী সংবাদ পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিয়ে এসেছি আমি।

—জরুরী সংবাদ ?—সুলতান উচ্চকিত হয়ে উঠলেন ঃ সুরযগড়ে শের খাঁ হেরে গেছে ? বিহার বশ্যতা স্বীকার করেছে গৌড়ের কাছে ?

—সে আমি জানি নে খোদাবন্দ্‌। আমি এসেছি পর্তুগীজদের খবর নিয়ে।

—পর্তুগীজ !—ঘৃণায় মুখ বিকৃত করলেন মামুদ ঃ সেই চোর, সেই লুটেরার দল ? কী করেছে তারা ? ঠাণ্ডী-গারদ থেকে পালাতে চেষ্টা করেছে ? তা হলে এখনি তাদের সব কটার গর্দান নেওয়া হোক।

ধীর-বিচক্ষণ আল্‌ফা হাসানী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, অত অস্থির হলে চলবে না সুলতানের। কথাগুলো অত্যন্ত জরুরী—তাঁকে মন দিয়ে শুনতে হবে।

যেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে থেমে দাঁড়ালেন সুলতান, একটা লাগাম-ছেঁড়া বুনো ঘোড়ার মতো তাঁর সমস্ত মন দাপাদাপি করতে চাইছে, অতি কষ্টে তিনি যেন তার রাশ টেনে ধরলেন।

—বেশ, বলুন, কী বলতে এসেছেন।

—গোয়ার পর্তুগীজ শাসনকর্তার দূত জর্জ আলেকোকোরাদো এইমাত্র গৌড়ে এসে পৌঁছেছে।

—সে বদমাশ কী বলতে চায় ?

—কামান আর ক্রীশ্চান সৈন্য নিয়ে ন'খানা পর্তুগীজ জাহাজ এসেছে চট্টগ্রামের বন্দরে।

—হুঁ, তারপর ?

—তাদের সেনাপতি সিল্‌ভা মেনেজেস্‌ গৌড়ের সুলতানকে জানিয়েছে যে বাংলার সঙ্গে কোনো বিরোধ ঘটে এ তারা চায় না। ব্যবসা-বাণিজ্য আর বন্ধুত্বের সম্পর্কই তারা এ-দেশে আশা করে।

—বন্ধুত্বের সম্পর্ক !—মামুদ শার মুখ আবার ঘৃণায় বিকৃত হয়ে উঠল ঃ ডাকাত শায়েস্তা করার উপযুক্ত কোতোয়াল আছে গৌড়ে।

—তা হলে কি গৌড়ের সুলতান ক্রীশ্চানদের শত্রু করতে চান ?

—শত্রু ! শত্রুতা করতে হয় উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে। কয়েকটা সামান্য জলদস্যুকে অতখানি ইজ্জত দিতে আমি রাজী নই।

—সে ক্ষেত্রে—আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন আল্‌ফা হাসানী ঃ সে ক্ষেত্রে মেনেজেস্‌ সুলতানকে জানাতে চায় যে যদি অবিলম্বে পর্তুগীজ ক্যাপিতান অ্যাফন্‌সো ডি-মেলো আর তাঁর দলবলকে মুক্ত করা না হয়, তা

হলে তিনি চট্টগ্রামে রক্ত আর আগুনের স্রোত বইয়ে দেবেন।

—কী—এত বড় কথা! এত বড় সাহস!—মামুদ শার স্বর গোঙানির মতো মনে হল: উজীর সাহেব, এখুনি আমকতল্! এই দূত—ঠাণ্ডী গারদে যারা আছে, তাদের সবসুদ্ধ এখনি কতল্ করা হোক। আর চট্টগ্রামে খবর দেওয়া হোক—ওদের একটি প্রাণীও যেন আর গোয়ায় ফিরে যেতে না পারে!

আল্ফা হাসানী বললেন, সুলতানকে আরো একটু ধৈর্য রাখতে অনুরোধ করব আমি। এর ফল যুদ্ধ।

—যুদ্ধ! এক ফুঁয়ে উড়ে যাবে। একবার ওদের মা মেরীর নাম করবার পর্যন্ত সময় পাবে না।

উজীর এতক্ষণ পরে মুখ খুললেন।

—সুলতান যা বলছেন সবই সত্যি; কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের যুদ্ধ করতে হচ্ছে বিহারে। হয়তো দুদিন পরে দিল্লীর মোগলদের সঙ্গেও বোঝাপড়া করতে হবে। এই সময়ে আরো শত্রু বাড়লে আমাদের দুশ্চিন্তাও বেড়ে যাবে খোদাবন্দ্। শত্রু হয়তো তুচ্ছ—কিন্তু অনেকগুলো ক্ষুদ্র শত্রু একসঙ্গে মিললে তার শক্তিকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

—ঠিক কথা।—আল্ফা হাসানী মাথা নাড়লেন।

সুলতান চুপ করে রইলেন। একবার উজীরের মুখের দিকে তাকালেন—একবার আল্ফা হাসানীর দিকে। তারপর আবার ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ কাটল স্তব্ধতার মধ্যে। শেষে থেমে দাঁড়ালেন সুলতান। একটা বিচিত্র হাসি ফুটে উঠেছে তাঁর মুখে।

বললেন, বেশ, তাই হবে। ক্রীশ্চান দূতকে আপাতত বন্দী করে রাখা হোক। আমি ভেবেচিন্তে এর জবাব দেব।

আল্ফা হাসানী আর উজীর বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ পেছন থেকে ডাকলেন মামুদ শা।

—উজীর সাহেব!

—হুকুম করুন।

—কী বলেছি, মনে আছে আপনার?

উজীর দ্বিধা করতে লাগলেন। তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন না। ঠিক কোন্ জিনিসটি মামুদ শা তাঁকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন—সেইটেই ভেবে নিতে চাইলেন।

মামুদ শা বললেন, ইব্রাহিম খাঁকে খবর পাঠাতে হবে। সাতদিনের মধ্যে শেরের মাথা আমার চাই। বিহারের বিদ্রোহকেও চিরদিনের মতো মুছে দেওয়া চাই, যদি তা না হয়, বন্দী করা হবে ইব্রাহিম খাঁকে। তাকে গৌড়ে এনে বেইমানীর বিচার করা হবে।

একটা কঠিন উত্তর আসতে চাইল উজীরের মুখে। বেইমান! বলতে ইচ্ছে করল, ভাইপোর রক্ত হাতে মেখে যে গৌড়ের তখ্তে বসেছে—বেইমান

সেই-ই। যারা তার জন্যে দিনের পর দিন প্রাণপাত করছে, তার খাম-খেয়ালের তাগিদে যাদের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছে, তারা কখনো বেইমান নয়।

কিন্তু একটা অর্ধ-উন্মাদ অস্থির মানুষকে সে-কথা বলা বৃথা। একবারের জন্যে দাঁতে দাঁত চাপলেন উজীর, তারপর অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, তাই হবে।

আবার শূন্য ঘর। আবার একা মামুদ শা। একটা ঝাপসা ধোঁয়াটে ছায়ার জগতে নিঃসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সুলতান। কেউ নেই কোথাও—কিছুই নেই। এই প্রাসাদ—ওই মিনারঃ গৌড়ের এই বিশাল নগর—সব যেন বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে গেছে। যেন কোন্ যাদুকরের ভেল্‌কি!

শের খাঁ! হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ করে মামুদ শা ভাবতে লাগলেন, এমনি করে শেরের গলাটাও যদি তিনি দুহাতে টিপে ধরতে পারতেন!

কুড়ি

"Tenho mina, tenho mina !"

জোয়ার-ভাঁটায় রাজহাঁসের মতো ভাসতে ভাসতে রাজশেখর শেঠের বজরা এগিয়ে চলল। তীরের রেখা ক্রমেই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে দুধারে। একদিক শুধুই ধু-ধু করছে—অন্যদিকে কালো কালো বিন্দুর মতো গাছপালার অস্পষ্ট স্বাক্ষর। মাঝখানে অতল জ্বলন্ত জল। তার গেরুয়া রঙ ক্রমশ নীলিম হয়ে আসছে—তার স্বাদ এখন তীব্র লবণাক্ত।

শঙ্খদত্তের মনে পড়ল, সমুদ্র আর দূরে নয়। আবার সে সাগরের কাছাকাছি এসে পড়েছে। একদিন সমুদ্রের কালো অন্ধকারেই সে তার ভুলের মাশুল চুকিয়ে দিয়ে এসেছে। অসহ্য গ্লানি আর লজ্জা নিয়ে এখন সে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজ তার সপ্তগ্রামে ফিরে যাবার মুখ নেই, তার সাহস নেই যে শেঠ ধনদত্তের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াবে।

পর্তুগীজ দস্যুরা তার বহর ডুবিয়ে দিয়েছে। তাতে লজ্জার কোনো কারণ নেই। কিছুদিন থেকেই এই শয়তান ক্রীশ্চানের দল সমুদ্রের বিভীষিকা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাদের কামানের মুখে শঙ্খদত্তের বহর ডুবে গেছে—সেজন্য তার অপরাধ নেই, কেউ তাকে দোষও দেবে না; কিন্তু—

কিন্তু নিজের মনের কাছে কী বলে কৈফিয়ৎ দেবে শঙ্খদত্ত? সে জানে—সে বিশ্বাস করে, তার বহরডুবির জন্যে দায়ী ক্রীশ্চানেরা নয়; সে অপরাধ করেছিল জগন্নাথের কাছে—দেববধূকে হরণ করে পালিয়ে যাচ্ছিল চোরের মতো।

সেই পাপ। সেই পাপে ভরাডুবি হয়েছে তার। জগন্নাথ তার বধূকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন, তার মাথার ওপর অভিশাপের বোঝা বয়ে প্রেতের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে শঙ্খদত্ত।

কী বলবে সে ধনদত্তকে? কী জবাব দেবে গুরু সোমদেবের কাছে?

নদীর জ্বলন্ত জলে যেন নীল-সমুদ্রের সংকেত। গঙ্গা-সাগর তীর্থ আর বেশী দূরে নেই। আর একটা বাঁক ঘুরলেই সাগরদ্বীপের রেখা চোখে পড়বে—একটু আগেই মাল্লা-মাঝিদের সঙ্গে কথা কইছিলেন রাজশেখর। শঙ্খদত্তের ইচ্ছা হল, একবার চিৎকার করে বলে, কাকা, আমি পালিয়ে এসেছি—আর একবার মুঠোর মধ্যে পেলে সাগর আমাকে আর ছাড়বে না। হয়তো আমার পাপে এই বজরাও—

শঙ্খদত্তের হৃৎপিণ্ড হঠাৎ যেন থমকে গেল। কী হবে তা হলে? যেমন করে শম্পাকে সমুদ্র গ্রাস করেছে, তেমনি ভাবে গ্রাস করবে সুপর্ণাকেও—

আবার তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সুপর্ণার দিকে। তেমনি উদাস লক্ষ্যহীন চোখে সে চেয়ে আছে জলের দিকে। মানুষ নয়—মোমের মূর্তি। নিশ্বাস পড়ছে কিনা ভাল করে বোঝাও যায় না। রাজশেখরকে কথা দিয়েছে এই মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে।

কেন করবে?

শুধুই সহানুভূতি? এমন একটি স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের তিলে তিলে এই অপমৃত্যুকে সে সইতে পারছে না? অথবা রাজশেখর শেঠ তার দূর সম্পর্কের আত্মীয় বলে এটুকু নিছক কর্তব্যবোধ?

অথবা!

কিছুদিন থেকেই তীব্র যন্ত্রণার একটা আত্মনিগ্রহ তার ভাল লাগে; সূচিকাভরণের জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে যেমন সৃষ্টি হয় বিষক্রিয়ার নেশা—ঠিক তেমনই অবস্থা হয়েছে তার।

বড় বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে শঙ্খদত্ত মনে মনে বললে, না—না, দেবতার কাছে কোনোমতেই আমি হার স্বীকার করব না।

শম্পার মতো সুপর্ণাও তো দেবতার শিকার। শৈব রাজশেখর শক্তির কাছে হার মেনেছিলেন, তাঁর দেবতাকে মানুষের রক্ত দিয়ে শোধন করে নিতে চেয়েছিলেন তিনি। তাই রুদ্রের দণ্ড নেমেছে তাঁরও ওপরে। তাঁর একমাত্র সন্তান চিরদিনের মতো নীরব হয়ে গেছে। ডাকলে শুনতে পায় না, শুনলেও সাড়া দেয় না। মানুষের ভাষা সে ভুলে গেছে—সেই সঙ্গে ভুলে গেছে মানুষের পৃথিবীকেও।

কিন্তু বারে বারেই কি দেবতার চক্রান্তের কাছে শঙ্খদত্ত হার মানবে? না, শম্পাকে বাঁচাতে পারেনি, তাই বলে সুপর্ণাকেও দেবতার হাতেই সঁপে দেবে?

—না। ওর মুখে আমি কথা আনব। ওর অন্ধকার মনের মধ্যে জ্বালিয়ে তুলব চৈতন্যের মশাল। পৃথিবীর আলোয় বাতাসে আবার আমি ফিরিয়ে আনব ওকে।

বজরার ছাদে বসে মাঝিদের সঙ্গে কথা বলছেন রাজশেখর। একটা দূরবীন হাতে লক্ষ্য করছেন দূর-দূরান্তের তটরেখা। শঙ্খদত্তের স্বগতোক্তি তাঁর কানে গেল না।

শঙ্খদত্ত ডাকল, সুপর্ণা!

সুপর্ণা ফিরেও তাকাল না। বিরাট, বিশাল নদীর ওপর সে তার চোখ দুটি ছড়িয়ে রেখে দিয়েছে। কী যেন অনবরত দেখে চলেছে, সেখান থেকে আর তার দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে পারছে না কিছুতেই।

শঙ্খদত্ত আবার ডাকল ঃ সুপর্ণা—সুপর্ণা!

ও নামে কেউ কোথাও ছিল না—চিরদিনের মতোই ও নামের অস্তিত্ব মুছে গেছে পৃথিবী থেকে। যেমন করে রোদ ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে মুছে যায় শিশির-বিন্দু; যেমন করে ঝড়ের হাওয়ায় মিলিয়ে যায় ফুলের গন্ধ, যেমন করে একটু পরেই রামধনুর চিহ্ন-মাত্র কোথাও থাকে না; আর যেমন করে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে দেবদাসী শম্পাকে গ্রাস করে রাক্ষস সমুদ্রের জল।

—তাকাও এদিকে সুপর্ণা। সুপর্ণা, কথা বল—

কে কথা বলবে? ফুলের গন্ধ যখন হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে যায়, তখন কে তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে ফুলের বুকে? ইন্দ্রধনুর রঙকে আবার কে আলাদা করে বেছে নিতে পারে খরধার সূর্যের আলো থেকে? সুপর্ণার যে মন—যে বুদ্ধি তাকে ছাড়িয়ে আজ ছড়িয়ে পড়েছে অন্তহীন আকাশে, নদীর এই বিশাল বিস্তারের ভেতরে—সেখান থেকে মনের সেই কোটি-কোটি বিন্দুকে কুড়িয়ে আনা যাবে কোন্ মন্ত্রে।

তবু সুপর্ণা ফিরে তাকাল এবার। কেন তাকাল সে-ই জানে। হয়তো একভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শারীরিক যন্ত্রণা, হয়তো শুধুই তার অর্থহীন খেয়াল, নয়তো নিছক একটা মস্তিষ্কহীন দৈহিক ক্রিয়া।

তবু সে ফিরে তাকাল। আশ্চর্য অতল তার বিষণ্ণ চোখ! শঙ্খদত্তের শম্পার চোখকে মনে পড়ল। সে চোখ কেমন তরল, যেন নদীর স্রোতের মতো বয়ে চলেছে, তার ওপরে ঝলমল করছে সূর্যের আলো। আর এ চোখ যেন গভীর, গম্ভীর—একটা দীঘির জলের মতো স্থির হয়ে আছে, এর নিবিড় পক্ষ্ম যেন আমের জামের উদাস ছায়ার মতো তার ওপর বিকীর্ণ।

—কথা বল সুপর্ণা, কথা বল—

সুপর্ণা তবু কথা বললে না, শুধু একটুখানি শীর্ণ হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটের কোণায়। সে-হাসি ভোরের নক্ষত্রের মতো। পৃথিবীর দিকে সে তাকিয়ে আছে—অথচ কোনোদিকেই তাকিয়ে নেই। তার দৃষ্টি ভেসে আসছে একটা শূন্য আকাশের পথ বেয়ে—তা দিয়ে সকলকে দেখা যায়, অথচ কাউকেই দেখা যায় না।

—তোমাকে আমি কথা বলাব সুপর্ণা, তোমাকে আমি বাঁচিয়ে তুলব দেবতার গ্রাস থেকে।—উন্মত্তভাবে ভাবল শঙ্খদত্ত। আকাশের তারা মাটির ফুল হয়ে ফুটে উঠবে।

শুধু শম্পা নয়—সুপর্ণাও সুন্দর। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে বলেই সে আরো বেশি অপরূপ। দুর্লভের জন্যেই তো শঙ্খদত্তের চিরদিনের আকর্ষণ। তাই সপ্তগ্রামে যখন সঙ্গী আর বন্ধুর দল কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে মোহর নিয়ে জুয়া খেলে—তখন শঙ্খদত্ত বেরিয়ে পড়ে দক্ষিণ পাটনের সুদূর সমুদ্রের

আকর্ষণে। সরস্বতীর কূলে কোনো অশোককুঞ্জে তারা যখন বসন্ত-সঙ্গিনীর ঠোঁটে তপ্ত-কামনার মুখবন্ধ রচনা করে—তখন পূর্বঘাট পাহাড়ের তলায় ফেনিল তরঙ্গ-মন্ত্রের সঙ্গে সিন্ধু-শকুনের কান্না শোনে শঙ্খদত্ত। বাতায়ন থেকে যৌবন-মত্তা বণিক-কন্যার কালো চোখের বাণ তার নিরুত্তাপ মনের বর্মে প্রতিহত হয়ে যায়, তাকে মৃত্যুর মোহে অবশ করে সাপের মাথার মণি দেবনর্তকী শম্পা।

শুধুই সুপর্ণা—শুধুই রাজশেখর শেঠের মেয়েকে সে কি কোনোদিন তাকিয়েও দেখত? এই মুহূর্তে তার কাছ থেকে মাত্র তিন হাত দূরে যে আত্মমগ্ন হয়ে বসে আছে—সে সেই সুন্দরতমা। তাকে তার পেতে হবে! কিন্তু কোন্ পথে? মনের ভেতরে একটা হিংস্র বর্বর রাঘবকে খুঁজে ফিরছে—খুঁজছে একটা প্রচণ্ড শক্তিকে—যা ভয়ংকর আঘাত দিয়ে সুপর্ণাকে ফিরিয়ে আনতে পারে। কোথায় সে শক্তি? কোথায় আছে তা?

এইখানে মহর্ষি কপিল ধ্যান করছিলেন—কত হাজার হাজার বছর ধরে, কে জানে। পঞ্চ প্রাণবায়ুকে রুদ্ধ করে নিজের মধ্যে নিষ্কম্প দীপশিখার মতো মগ্ন হয়ে ছিলেন তিনি। তাঁর আশ্রমপ্রান্ত থেকে সগরের অশ্বমেধের ঘোড়া হরণ করলেন স্বর্গপতি ইন্দ্র।

সগরের ষাট হাজার হতভাগ্য পুত্র অকালে মুনির ধ্যান ভাঙিয়ে ভস্মস্তূপে পরিণত হল। আরো বহু দিন, বহু বছর কেটে গেল তারপরে। ভগীরথের শঙ্খরবে মর্তে নামলেন জাহ্নবী। কিন্তু সে ভস্মস্তূপ? কত বৈশাখী ঝড়, কত বর্ষা তাদের নিশ্চিহ্ন করে মুছে দিয়েছে পৃথিবী থেকে।

গঙ্গা বললেন, কোথায় গেল ভস্ম? কেমন করে তোমার পিতৃকুলকে আমি ত্রাণ করব?

মহাবিপদে পড়লেন ভগীরথ। অনেক চিন্তা করে বললেন, মা, যখন এত অনুগ্রহ করেছেন তখন আরো একটু করুন। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়েই আমার ষাট হাজার পিতৃপুরুষের দেহভস্ম ছড়িয়ে রয়েছে। আপনি এর সমস্তটাই একবার পরিক্রমা করুন।

গঙ্গা অনুরোধ রক্ষা করলেন। লক্ষ লক্ষ যোজন ধরে পরিক্রমা করলেন তিনি। সৃষ্টি হল সাগর। সগরের ষাট হাজার পুত্র—যারা আকাশে নিরালম্বরূপে, বায়ুভূতে নিরাশ্রয় হয়ে প্রেতের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তারা মুক্তি লাভ করে স্বর্গে চলে গেল।

সৃষ্টি হল মহাতীর্থ গঙ্গা-সাগর।

সেই গঙ্গা-সাগরে কপিল মুনির আশ্রমে বাৎসরিক মহামেলা। দূর-দূরান্ত দেশ-বিদেশ থেকে এসেছে তীর্থযাত্রীর দল। সাগর দ্বীপের অরণ্যময় পঙ্কিল তীরে শত শত নৌকোর ভিড়। গঙ্গার মন্দির আর মহর্ষি কপিলের আশ্রম লোকে লোকারণ্য। ফুল, মিষ্টি, দুধ অবারিত ধারায় ঝরে পড়ছে। দলে দলে ভিক্ষুক এসেছে, এসেছে সন্ন্যাসী। এখানে ওখানে ধুনি জ্বলছে, শোনা যাচ্ছে মন্ত্রপাঠ। চারদিকের নলবন আর এলোমেলো জঙ্গল পরিষ্কার করে সারি সারি কুঁড়েঘর উঠেছে।

রাজশেখর বজরাতেই থাকবেন স্থির করেছিলেন। ডাঙার মাটি জলে কাদায় একাকার—যেন বিরাট একটা পঙ্ককুণ্ডের ভেতরে একদল বুনো মোষের মতো চলাফেরা করছে তীর্থযাত্রীর দল। তার ভেতরে বাস করার প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না। সুপর্ণা, শঙ্খদত্ত আর জনকয়েক চাকর-মাল্লা নিয়ে তিনি কপিলের আশ্রমের দিকে পা বাড়াবেন—এমন সময়ে একটা বিচিত্র দৃশ্যে তাঁরা থমকে দাঁড়ালেন।

গঙ্গার ঘোলা জল যেখানে নীল-সমুদ্রের বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, ফেনায় ফেনায় যেখানে প্রকৃতির একটা হিংস্র উদ্দাম উল্লাস আর আধ-ডোবা একটা বালির ডাঙার ওপর যেখানে মানুষের এত কোলাহল সত্ত্বেও একদল অচঞ্চল পাখি নিজেদের মনেই কী যেন ঠুকরে বেড়াচ্ছে, তিনখানা বড় বড় নৌকো সেই সাগর-সঙ্গমের দিকে এগিয়ে চলেছে। ডিঙ্গি ধরনের খোলা নৌকো—সবই দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। প্রথম নৌকোতে একদল মেয়ে-পুরুষ—এতদূর থেকেও দেখা যায়, একটি অল্পবয়েসী বৌ দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে তাতে। মাঝখানের নৌকোটি সবচেয়ে বড়—তাতে ঢাক-ঢোল বাজছে, কয়েক-জন মানুষ ধুনুচি হাতে ঘুরে ঘুরে নাচছে তার ওপর। যে দাঁড় ধরে দাঁড়িয়ে আছে, সেও মাথার ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে দুলিয়ে তালে তালে পা ঠুকছে গলুইয়ের ওপর। সবচেয়ে পেছনের নৌকোয় প্রায় পঁচিশ-ত্রিশজন মানুষ—ঢাক-ঢোলের আওয়াজ ছাপিয়েও তাদের চিৎকার শোনা যাচ্ছে ঃ জয়—মা-গঙ্গার জয়!

মেলার অর্ধেক লোক জড়ো হয়েছে জলের ধারে এসে। সকলের দৃষ্টি ওই নৌকোর দিকেই। একটা চাপা উত্তেজনার গুঞ্জন উঠছে চারদিকে—আগ্রহে জ্বলজ্বল করছে সকলের চোখ।

জিজ্ঞাসা করার দরকার ছিল না, তবু প্রশ্ন করলেন রাজশেখর ঃ কী ব্যাপার ?

একসঙ্গে অনেকেই জবাব দিলে। তাদের কথা থেকে জানতে পারা গেল, শ্রীপুরের ছোট রাণী গঙ্গাসাগরে সন্তান দিতে এসেছেন।

গঙ্গাসাগরে সন্তান! সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল শঙ্খদত্তের। রাক্ষস—সমুদ্র রাক্ষস! দিনের পর দিন কত বলি সে নেয়, তবু তার পেট ভরে না! তাই শম্পাকেও সে গ্রাস করেছে!

একজন বললে, ছেলেটাকে আমি দেখেছি। কী সুন্দর—যেন মোমের পুতুল! মায়ের বুকের মধ্যে কেমন হাসছিল, যেন পদ্মফুল ফুটে রয়েছে একটা!

কচি বয়েসের একজন বিধবা আঁচলে চোখ মুছল। ধরা গলায় বললে, আহা—কোন্ প্রাণে অমন ছেলেকে মা হয়ে জলে ফেলে দিচ্ছে!

পাশের বুড়ো মতন মানুষটি—বাপ কিংবা শ্বশুর হবে, চাপা গলায় ধমক দিলে একটা। বললে, ছিঃ—ছিঃ, ও কথা বলতে নেই মা। দেবতার কাছে মানত রয়েছে, তাঁর জিনিস তাঁকে তো দিতেই হবে।

—ছাইয়ের দেবতা!—বিধবাটি হঠাৎ ডুকরে উঠল ঃ আমিও তো আমার

প্রথম সন্তানকে এমনি করে গঙ্গায় দিয়েছিলাম। কী লাভ হল তাতে ? আমার কোল তো আর ভরল না। বরং বছর ঘুরতে না ঘুরতেই কপালের সিঁদুর আমার মুছে গেল।

সঙ্গের বুড়ো লোকটি ভারি বিব্রত হয়ে উঠল। বিপন্নভাবে চারদিকে তাকিয়ে দেখল, কেউ তাদের লক্ষ্য করছে কিনা। এমন অধর্মের আর অশাস্ত্রের কথা শুনলে লোকে ভাববে কী!

বুড়ো বললে, থাক—থাক, ওসব কথা থাক। চল এখান থেকে আমরা যাই। এইবেলা পুজো দিয়ে আসি, মন্দিরের কাছে ভিড়টা নিশ্চয় অনেকখানি কমেছে এতক্ষণে।

অল্প-বয়সী বিধাবটি তবু নড়ল না। সইতে পারছে না, চলেও যেতে পারছে না। সমস্ত দৃশ্যটার একটা বিষাক্ত আকর্ষণে সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তবুও। হয়তো আর একজনের সন্তান ভাসিয়ে দিতে দেখে নিজের মনে মনেও জোর পাবে খানিকটা ; হয়তো ভাবতে পারবে—অতল সমুদ্রের অসংখ্য ঢেউয়ে ঢেউয়ে তার খোকা এতদিন মাকে কেঁদে কেঁদে খুঁজে ফিরছে, এবার হয়তো একটি সঙ্গী জুটবে তার।

নদী আর সমুদ্রের নীল-গৈরিক রেখার ওপর গিয়ে পেঁাছেছে নৌকো তিনটি। একরাশ পুঞ্জিত ফেনার ওপর দোলনার মতো দুলছে তারা। সমুদ্রের অশান্ত ফোঁসানির সঙ্গে ঢাক-ঢোলের শব্দ চারদিকে একটা অমানুষিক ধ্বনি-তরঙ্গ সৃষ্টি করেছে।

তীর থেকে সমস্ত মানুষগুলি আকুল আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে। প্রতীক্ষায় যেন ঠিকরে বেরিয়ে যাচ্ছে তাদের চোখের তারা। মাঝের নৌকোর মানুষগুলি পাগলের মতো নাচতে শুরু করেছে এখন।

হঠাৎ প্রথম নৌকোটি সকলের চাইতে আলাদা হয়ে খানিকটা পাশে সরে গেল। দু হাতে যে-মেয়েটি মুখ ঢেকে বসে ছিল, নৌকোর একটা পাশের দিকে ঝুঁকে পড়ল সে। এত দূর থেকেও দেখা গেল, তার হাতে একটি শিশু।

আস্তে শিশুটিকে নীল-গৈরিক জলের পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনার ওপরে ছেড়ে দিলে সে। পরক্ষণেই দেখা গেল, সেও পাগলের মতো জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে চাইছে যেন।—মাথার একরাশ রুক্ষ চুল তার উড়ছে সমুদ্রের হাওয়ায়—গায়ের থেকে খসে পড়ছে কাপড়।

তিন-চারজন তাকে সঙ্গে সঙ্গে টেনে ধরল পেছন থেকে। নৌকোর ভেতরে যেন উপুড় হয়ে পড়ে গেল মেয়েটি—তাকে আর দেখা গেল না। ওদিকে তখন আকাশ-ফাটানো চিৎকার উঠেছে ঃ জয়—মা-গঙ্গার জয়!—ঢাক-ঢোলের শব্দ এমনি উদ্দাম হয়ে উঠেছে, যে এতক্ষণের নিশ্চিন্ত পাখিগুলো পর্যন্ত এইবার আতঙ্কে ডানা মেলেছে আকাশে। ধূপ-ধুনোর ধোঁয়া এত পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে উড়ছে যে মনে হচ্ছে একটা চিতা জ্বলছে সাগর-সঙ্গমের অতল জলের ওপর।

ডাঙা থেকেও তখন তারস্বরে চিৎকার উঠছে ঃ জয়—মা-গঙ্গার জয়—

তার মাঝখানেই দেখা গেল, বোবা গলায় একটা আর্তনাদ তুলে মাটির ভেতরে মুখ গুঁজড়ে পড়েছে সেই বিধবা মেয়েটি। অজ্ঞান হয়ে গেছে।

—ও বৌমা—ও বৌমা! এ কী হল! এখন আমি কী করি?—সেই বুড়ো সঙ্গীটির ভয়ার্ত আকৃতি।

সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে শংখদত্ত দেখল, সাগর-সঙ্গমের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন রাজশেখর। তাঁর সমস্ত মুখ বেদনায় বিকৃত। সুপর্ণাও তাঁরই মতো তাকিয়ে আছে সেদিকে—কিন্তু কোথাও কোনো অভিব্যক্তি নেই। সেও সব দেখেছে, সব শুনেছে—কিন্তু বাইরের জগতের যা কিছু ঘটনা, সবই কতগুলো উড়ন্ত ছায়ার মতো ভেসে গেছে তার মনের আকাশ দিয়ে—কোথাও এতটুকু ছায়া ফেলেনি।

রাজশেখরই কথা বললেন সকলের আগ।

—চলো, পুজো দিয়ে আসি। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে আর?

অন্ধকার থাকতেই শংখদত্তের ঘুম ভাঙল।

ভোরের হাওয়ায় শীত করতে শুরু হয়েছিল, গায়ের ওপরে একটা আবরণ টেনে দিয়েও ভাঙা ঘুমটা আর তার জোড়া লাগল না। কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করতে লাগল সে। বজরার ভেতরে ঝাপসা অন্ধকার—তবুও আবছা আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে সব। রাজশেখর অঘোরে ঘুমুচ্ছেন—সুপর্ণা যথানিয়মে কখন উঠে বসেছে জানালার কাছে। রাত্রে কখন ঘুমিয়েছিল কে জানে! অথবা আদৌ সে ঘুমোয় কিনা সে-কথাই বা কে বলবে!

বাইরে সাগর-দ্বীপ এখনো ভাল করে জাগেনি, তবুও মানুষের চলা-ফেরা শুরু হয়েছে—শোনা যাচ্ছে কথার আওয়াজ। সমুদ্রের শোঁ শোঁ আর গঙ্গার কলতানের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের প্রথম শংখ-ঘণ্টার গম্ভীর শব্দ উঠছে। কোথায় যেন চিৎকার করে ভজন গান গাইছে একজন সন্ন্যাসী—কেন কে জানে, কেমন অলৌকিক মনে হচ্ছে তার গলার স্বর।

আরো কিছুক্ষণ চুপ করে রইল শংখদত্ত। আর একটি সকাল; কিন্তু কোনো আশা নিয়ে আসছে না, নিয়ে আসছে না কোনো নতুন আলো, কোনো নতুন সম্ভাবনার সংবাদ। আবার একটি দিন—দীর্ঘ—ক্লান্তিকর। নিজের হতাশাক্ষুব্ধ মনের ভেতরে আবার শূন্যতার মন্থন। শম্পা হারিয়ে গেছে, সুপর্ণাও আর কথা কইবে না। দেবতা তাকে গ্রাস করেছে, চিরদিনের মতোই ছিনিয়ে নিয়েছে মানুষের কাছ থেকে। বৃথা চেষ্টা। অভিশপ্ত প্রেতগ্রস্ত শংখদত্তের কোথাও না আছে আশ্রয়, না আছে সান্ত্বনা।

কোথায় যাবে শংখদত্ত?

সপ্তগ্রামে? না গুরু সোমদেবের কাছে? না।

জীবন। একটা কলঙ্কিত নাটকের ওপরে আশ্চর্য আর অসমাপ্ত পূর্ণচ্ছেদ।

শংখদত্তের চোখ দুটো আবার জড়িয়ে আসতে লাগল। ঘুমে নয়—অবসাদে। শ্মশানে কোনো পরম প্রিয়জনের চিতাভস্ম ধুয়ে দেবার পরে যে

অবসাদ সারা শরীরকে ভারাক্রান্ত করে, সেই ক্লান্তি—সেই মন্থরতা ; অথবা—অথবা কোনো মৃত আত্মার মতো দাঁড়িয়ে থাকা নিজের নিঃসঙ্গ চিতার পাশে। পৃথিবীর অবলম্বন নেই—শূন্যময় আকাশে পথ-রেখা নেই কোথাও। নিজের ভস্মশেষ দেহের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলা—তারপর হা হা রবে আর্তস্বর তুলে মিলিয়ে যাওয়া কোনো রন্ধ্রহীন অন্ধকারে।

হঠাৎ শঙ্খদত্তের চমক ভাঙল। ভাঙল একটা ধারালো চিৎকারে।

রাজশেখর উঠে বসবার আগে, মাঝিদের বিহ্বল সুপ্তি সম্পূর্ণ কেটে যাওয়ার আগে—শঙ্খদত্ত এক লাফে বজরার বাইরে চলে এল। পালের খুঁটিটা ধরে মাতালের মতো টলছে সুপর্ণা। কিসের খেয়ালে যে বাইরের খোলা হাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল, সে কথা একমাত্র সে-ই জানে।

আবার একটা তীক্ষ্ন গগনভেদী চিৎকার করল সুপর্ণা। চার বছর পরে এই প্রথম মানুষের স্বর বেরিয়ে এল তার গলা দিয়ে।

—কী ও? কী ওখানে?

ভোরের আলো স্পষ্টতর হয়ে উঠছে তখন। একটু একটু অরুণ-দীপ্ত হয়ে উঠছে নদীর জল। সেই রক্তাভায় চোখে পড়ল এক বীভৎস করুণ দৃশ্য। জোয়ারের জল নেমে গেছে—বজরার আশে-পাশে ভেসে উঠেছে অনেকখানি পঙ্কতট। তারই ওপরে পড়ে আছে একটি শিশুর ছিন্নমুণ্ড। সুন্দর শুভ্র মুখখানি একটুও মলিন হয়নি, শরীরের বাকি অংশ তার হাঙরে খেয়ে ফেলেছে, তবু মনে হচ্ছে বিশৃঙ্খল রেশম-চুলে ছাওয়া মাথাটি দুলিয়ে এখনি সে খিল খিল করে হেসে উঠবে।

দু হাতে চোখ ঢাকতে যাচ্ছিল শঙ্খদত্ত, তার আগেই দেখল, বজরা থেকে টলে জলের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে সুপর্ণা। শঙ্খদত্ত তাকে জড়িয়ে ধরল।

সুপর্ণার স্বর আবার যেন শতখান হয়ে ফেটে পড়ল: কী ও? কী ওখানে?

সঙ্গে সঙ্গেই একটা উন্মত্ত আনন্দধ্বনি শোনা গেল রাজশেখরের: কথা বলেছে—চার বছর পরে ও কথা বলেছে!

একুশ

"Rue outro valor mais alto se alevanta"

ঝড় উঠেছে দূরের সমুদ্রে। ইতিহাসের ঢেউ আছড়ে আছড়ে ভেঙে পড়েছে পশ্চিম-সাগরের কূলে কূলে, সিংহলের শৈলতটে, মালদ্বীপের নারিকেল-বনে। তারই একটুখানি দোলা এসে লেগেছিল চট্টগ্রামে। কোয়েলহো, সিলভিরা, অ্যাফনসো ডি-মেলো ; কিন্তু গৌড়বঙ্গ তখনো বহুদূরে—তখনো নিশ্চিন্ত সুপ্তিতে ঘুমিয়ে আছে বাংলার সপ্তগ্রাম—তার পুণ্যভূমিকে প্রদক্ষিণ করে "তিনদিকে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল"। বৈষ্ণবের আনাগোনা শুরু হয়েছে

সেখানে, কিন্তু আজও দেশের মানুষ ভক্তিভরে জড়ো হয় বিশালাক্ষীর মন্দিরে —কান পেতে শোনে "যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপালের গীত"। গুরু গোরক্ষনাথের মহিমা-কাহিনীতে তারা এখনো তন্ময়। ত্রিবেণীর জাফর খাঁর দরগায় একসঙ্গে জড়ো হয় হিন্দু মুসলমান—হাত পেতে নেয় পীরের শির্নি। তার শঙ্খবণিক-গন্ধবণিকের ঘরে এখনো লক্ষ্মীর সোনার পদ্মের পাপড়ি ছড়ানো—আজও কোজাগরী রাতে হাতীর দাঁতের পাশা নিয়ে তারা দ্যূতক্রীড়া করে।

কিন্তু সমুদ্রের ঝড় এগিয়ে এল গৌড় বাংলার বুকের ভেতরে। সপ্তগ্রামে এসে ঘাঁটি আগলালেন ডিয়েগো রেবেলো। বাঙলার মাটিতে ক্রীশ্চান-শক্তির প্রথম অনুপ্রবেশ। সমুদ্র থেকে কাল-বৈশাখী মেঘ বাংলার আকাশে ঘনিয়ে এল এই প্রথম। বিশালাক্ষীর মন্দিরে যারা গান শুনছিল, তারা একবারও জানল না—যুগান্তরের এক সন্ধিলগ্নে পদক্ষেপ করল তারা; যে বণিকের দল গৌড়ী আর পৈষ্ঠীর নেশায় বিভোর হয়ে নটীর গৃহে সান্ধ্য-অভিসারে চলেছিল, তারা জানল না—শুধু বাঙলা দেশ নয়—শুধু ভারতবর্ষ নয়—সমস্ত পূর্ব-পৃথিবীর বাণিজ্যে প্রবেশ করল প্রথম মৃত্যুবীজ!

ক্যাম্বে থেকে আসা দুখানা আরব জাহাজ তখন প্রবেশ করতে যাচ্ছিল সপ্তগ্রামের বন্দরে। রেবেলো প্রথমেই কামানের ভয় দেখিয়ে বন্দর ছাড়তে বাধ্য করলেন তাদের। পূর্ব-পৃথিবী থেকে আরব বাণিজ্য একেবারে মুছে যাওয়ার সেই বুঝি ইতিহাসের ইঙ্গিত।

জাহাজের মাথায় দাঁড়িয়ে রেবেলো দেখতে লাগলেন—ত্রস্ত গতিতে সরস্বতীর জল কেটে আরব জাহাজ দুটো পালিয়ে যাচ্ছে সম্মুখ থেকে। মাথার ওপর তাকিয়ে দেখলেন নদীর স্নিগ্ধ সজল হাওয়ায় ক্রুশ-চিহ্নিত পতাকা বিজয়গর্বে ফর্ ফর্ করে উড়ছে। দেউল-মন্দির-প্রাসাদে ছাওয়া সপ্তগ্রামের ঘাটে ঘাটে কতকগুলো খর্বাকার মানুষের বিহ্বল দৃষ্টি। মুহূর্তে রেবেলোর মনে হল যেন এই পতাকাকে অভিনন্দন জানানোর জন্যেই তারা ভক্তিভরে সমবেত হয়েছেন এখানে।

সৈনিক কবি ক্যামোয়েনস্-এর 'লুসিয়াদাস' তাঁর মনে পড়ল ঃ—

> "Cesse tude o que Musa antigue Canta,
> Rue outro valor mais alto se alevanta !"

'হে স্বর্গের গীতকণ্ঠ, থামাও তোমার অতীতের গান; সৃষ্টি-সাগরের তীরে এবার উজ্জ্বলতর এক নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটেছে।' আর সেই নক্ষত্র?

মাতা মেরীর জয় হোক!

লিস্‌বোয়ার জয় হোক!

সেই মুহূর্তেই রেবেলোর কাছে সংবাদ এল—গৌড়ের সুলতান মামুদ-শা তাঁকে সসম্মানে আহ্বান জানিয়েছেন।

* * * *

জর্জ আল্‌কোকোরাদোকে গৌড়ে পাঠিয়ে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করছিলেন

মেনেজেস্; কিন্তু ধৈর্য তাঁর শেষ সীমায় পৌঁছেছে। আল্‌কোকোরাদোর কী হয়েছে কে জানে! বিশ্বাস নেই এই মুরদের—এই জেণ্টুরদের মতলব বোঝবার উপায় নেই। কে জানে গৌড়ের সুলতান তাকেও বন্দী করে রেখেছে কিনা!

কর্ণফুলীর জলে অবিশ্রাম জোয়ার ভাঁটার তরঙ্গলীলা। যেন কোথাও কিছু হয়নি—এমনি স্বাভাবিক নিয়মেই বয়ে যায় দিনের পর দিন—রাতের পর রাত। নিস্পৃহ নির্বিকার ভাবেই বন্দরের মানুষগুলো সুখ-দুঃখ-জন্ম-মৃত্যুর প্রহর গোনে। নবাবের কর্মচারীরা—বন্দরের গুয়াজিল চোখের সামনেই ঘুরে বেড়ায়—ঠোঁটে তাদের চাপা ব্যঙ্গের হাসিই যেন দেখতে পান মেনেজেস্।

আর সহ্য হয় না। মাথার মধ্যে রক্তের হিংস্র তরঙ্গ দুলে ওঠে মেনেজেসের। গৌড়ে চরমপত্র পাঠিয়েছেন তিনি। কতদিন দেরি লাগে তার জবাব আসতে? কী করতে চায় সুলতান,—কী তার উদ্দেশ্য?

রাত অনেক হয়েছে। সামনে মদের পাত্র নিয়ে একা বসে ছিলেন মেনেজেস্। নদীর অবিশ্রান্ত কলধ্বনি কানে আসছে। বন্দরে আলোগুলো প্রায় সব নিভে গেছে—শুধু একটি বাতি এখনো মিট্ মিট্ করছে গুয়াজিলের কাছারিতে। আশেপাশে মুর আর বাঙালী বণিকদের বহরগুলো একরাশ জমাট ছায়ার মতো কর্ণফুলীর জলের ওপরে দুলছে।

মদের পাত্র শূন্য করতে করতে একটা তিক্ত বিদ্বেষে জর্জরিত হচ্ছিলেন মেনেজেস্। বন্দরের ঘরে ঘরে এখন মানুষের নিশীথ-বিশ্রাম—সঙ্গিনীদের দেহের উত্তাপ তাদের শরীরে মাদকতা ঘনিয়ে আনছে। আর সেই সময় শুধু মদের পাত্রেই খুশি থাকতে হচ্ছে মেনেজেস্‌কে। উঃ—অসহ্য!

আজ সকাল থেকেই মেনেজেসের মন উত্তেজিত হয়ে আছে। জাহাজের একটা কাফ্রী ক্রীতদাস খানিকটা মদ চুরি করে খেয়েছিল। চাবুকে জর্জরিত করে যখন ক্রীতদাসকে তাঁর কাছে আনা হল, তখন মেনেজেসের আর ধৈর্য থাকেনি। নিজের হাতে টেনে ছিঁড়েছেন তার জিভ, তারপর একটা একটা করে কেটেছেন তার দু হাতের আঙুলগুলো। লোকটা যখন যন্ত্রণায় আর্তনাদ করেছে তখন সেই কাটা জায়গাগুলোতে লবণ আর লঙ্কার গুঁড়ো ছড়িয়ে দেবার আদেশ দিয়েছেন মেনেজেস্।

এ-ই উচিত। যারা কালো—যারা বিধর্মী, তাদের সঙ্গে এই ব্যবহারই সঙ্গত। নিগ্রো, মুর, জেণ্টুর—ওরা কেউ মানুষের মধ্যেই গণ্য নয়; কিন্তু অ্যাফন্‌সো ডি-মেলোর মতো যারা নির্বোধ আর কোমলচিত্ত, তাদেরই এই সমস্ত অকারণ বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়।

কিছুদিন আগেই মোম্বাসার কূল থেকে কিছু কালো কাফ্রী জাহাজে করে চালান দেওয়া হচ্ছিল তার দেশে—ওপোর্টোতে। হাতের তালু ফুটো করে বেত দিয়ে গেঁথে তাদের ফেলে রাখা হয়েছিল জাহাজের খোলে। তারপর রাত্রে তাদের সে কী চিৎকার! কিছুতেই দু'চোখের পাতা আর এক করা যায় না।

মেনেজেস্ তখন একটা প্রকাণ্ড পাত্রে জল গরম করালেন। তাঁর হুকুমে সেই ফুটন্ত জল কাফ্রীগুলোর গায়ে ঢেলে দেওয়া হল—চিৎকার থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। কয়েকটা অবশ্য সেদ্ধ হয়ে মরে গিয়েছিল, সেগুলোকে পেট ভরে খেতে পেল সমুদ্রের হাঙরেরা।

ভাবতে রোমাঞ্চ হয় মেনেজেসের। কাফ্রীগুলোর কালো গা ফেটে যখন দরদরিয়ে রক্ত পড়ে, তখন কী চমৎকার হয় সে দেখতে! মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়েও ভাবেন, এ কি অন্যায়! কালো লোকগুলোর গায়ের রঙও কেন আলকাতরার মতো কালো হয় না? কেন তা ক্রীশ্চানদের মতো টকটকে লাল হয়? ভারী অন্যায়!

জাহাজে একটা কলরব শোনা গেল।

তৎক্ষণাৎ কাচপাত্রটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মেনেজেস্। তীরবেগে টেনে নিলেন তলোয়ার। সুলতানের লোকেরা রাত্রির অন্ধকারে জাহাজ আক্রমণ করেনি তো? বিশ্বাস নেই—কিছুই জোর করে বলা যায় না।

খোলা তলোয়ার হাতে বেরিয়ে এলেন মেনেজেস্। জাহাজের নাবিকেরা একটি লোককে ঘিরে কলরব করছে। সে মুরদের কেউ নয়। সবিস্ময়ে মেনেজেস্ দেখলেন—সে আল্‌কোকোরাদো।

—জর্জ?

আল্‌কোকোরাদো সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানাল।

—এ সময় তুমি কোথা থেকে এলে জর্জ?

—পালিয়ে এসেছি ক্যাপিতান।—আল্‌কোকোরাদো তখনো যেন একটু একটু করে হাঁপাচ্ছে—যেন দাঁড়াতে পারছে না ভাল করে। কয়েকটা মশালের উজ্জ্বল আলোয় মেনেজেস্ দেখতে পেলেন শীর্ণ পীড়িত তার চেহারা। কত-দিন যেন সে খেতে পায়নি—যেন অসংখ্য দুর্ভোগ পার হয়ে আসতে হয়েছে তাকে।

—পালিয়ে? কেন?

—গিয়ে পৌঁছনোর পরেই গৌড়ের সুলতান বিশ্বাসঘাতকের মতো আমাকে বন্দী করে। আমার অবস্থাও হয় ক্যাপিতান ডি-মেলো আর তাঁর দলবলের মতো। প্রহরীদের মুখে শুনেছিলাম, সুলতানের হুকুমে শীগগিরই আমাদের হত্যা করা হবে। ঠিক এই সময় একদিন সুযোগ পেয়ে আমি কারাগার থেকে পালাই। সুলতানের সৈন্যেরা অনেকদূর পর্যন্ত আমাকে তাড়া করে এসেছিল—মাতা মেরীর দয়ায় আমি রক্ষা পেয়েছি। বন-জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে—রাত্রির অন্ধকারে নদী-নালা পার হয়ে আমাকে আসতে হয়েছে। একবার একটু হলেই কুমীরে ধরত, আর একবার বাঘের মুখে পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি।

আল্‌কোকোরাদো থামল। মশালের আলোয় আলোয় আদিম জিঘাংসা জ্বলতে লাগল মেনেজেসের চোখে।

মেনেজেস্ বললেন, আর আমাদের কিছু করবার নেই। মূর্খ মামুদ শা নিজেই রক্ত আর আগুনকে ডেকে আনল।

চট্টগ্রাম বন্দর থেকে প্রায় এক যোজন দূরে আশ্রয় নিয়েছিলেন সোমদেব।

প্রায় দু'বছর পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। ঘুরেছেন পাগলের মতো। কোথাও একটা লোক সাড়া দেয়নি তাঁর ডাকে।

—দেশ থেকে দূর করে দাও পাঠানকে। আবার ফিরিয়ে আন ব্রাহ্মণের যুগ।

দেশের মানুষ বিহ্বল হয়ে তাকিয়েছে তাঁর দিকে। যেন একটা কথাও তারা বুঝতে পারেনি।

সোমদেবের উদ্‌ভ্রান্ত চোখ থেকে যেন রক্ত ছিটকে পড়েছে।

—শুনছ তোমরা সবাই? কান পেতে শোন। এমন সুযোগ আর আসবে না। বাংলা আর বিহারে পাঠানের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি শুরু হয়েছে। মোগল এখনো অনেক দূরে। গৌড়ের সুলতান একটা বদ্ধ উন্মাদ—তার হয়ে এসেছে। এই সময়েই যে যা পার অস্ত্রশস্ত্র তুলে নিয়ে বিদ্রোহ কর।

—বিদ্রোহ?

আশ্চর্য হয়ে শুনেছে মানুষগুলো। বিদ্রোহ? কিসের জন্যে? কার বিরুদ্ধে? গৌড়ের সিংহাসনে হিন্দু কিংবা পাঠান যে-ই থাক, কী আসে যায় তাদের? ডিহিদারের লোকের কাছে খাজনা দিয়েই তারা নিশ্চিন্ত। সুলতানের সঙ্গে তাদের চোখের দেখারও সম্বন্ধ নেই। বিদ্রোহ?

—হাঁ—হাঁ—বিদ্রোহ।—প্রায় গর্জন করে উঠেছেন সোমদেব—মাথার জটা-বাঁধা চুলগুলো একদল ক্রুদ্ধ সাপের মতো ফণা তুলে উঠেছেঃ দেখতে পাচ্ছ না, আজ মহাশক্তির জাগবার পালা? দেখছ না শিব আজ শব হয়েছেন? দেখছ না চণ্ডীর জিহ্বা রক্তের তৃষ্ণায় লক লক করছে? আগুন জ্বালাও, বিদ্রোহ কর—পাঠানের গ্রামগুলোকে মুছে দাও দেশের ওপর থেকে।

—পাঠান আমাদের শত্রু নয়।—একজন বুড়ো মতন মানুষ এগিয়ে এল সামনে।

—শত্রু নয়?—বিকৃত কণ্ঠে সোমদেব বললেন, শত্রু নয়?

—না।—শান্ত স্থির গলায় বুড়ো বললে, আমাদের দেশে ঘর বেঁধেছে তারা, আমাদের প্রতিবেশী। তারা আমাদের ভাষা শিখছে—আমাদের ভাষায় কথা বলছে। আমাদের রামায়ণ আর মহাভারতের গান শুনতে তারা আসে। মিথ্যে কেন তাদের সঙ্গে শত্রুতা করব আমরা? তা ছাড়া তারা বীর। গায়ে যেমন শক্তি মনেরও তেমনি জোর। তাদের হাতে লাঠি আর তরোয়াল দুই-ই সমান চলে। আগে আমাদের গ্রামে প্রায়ই ডাকাত পড়ত—সর্বস্ব লুটপাট করে নিয়ে যেত—আমরা রুখতে পারতাম না; কিন্তু যে-সব জায়গায় পাঠানের দল এসে ঘর বেঁধেছে, সে-সব জায়গায় আর দস্যুর ভয় নেই—ঠ্যাঙাড়ের উৎপাত থেমে গেছে—

—চুপ ! চুপ কর !

বুড়ো বললে, কেন পাগলামি করছ ঠাকুর ? কে হিন্দু, কে পাঠান কিংবা কে বৌদ্ধ—তা নিয়ে কী আসে যায় ! একসঙ্গে আমরা থাকি, একসঙ্গেই আমাদের মরা-বাঁচা। যদি লড়তে হয় সবাই মিলে লড়ব খুনে আর ডাকাতের সঙ্গে। গ্রামে বাঘ এলে জঙ্গল ঘেরাও করব সবাই মিলে, নদীতে কুমীর এলে ফুঁড়ে তুলব বল্লম দিয়ে। নতুন ধান উঠলে একসঙ্গেই গানের আসর বসবে আমাদের। ওরা ওদের গান গাইবে—আমরা গাইব আমাদের গান—

এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অসহ্য ক্রোধে কাঁপছিলেন সোমদেব। এইবার দাঁতে দাঁতে ঘষে বললেন, নিপাত যাও।

বুড়ো হাসল ঃ কেন শাপমন্যি দিচ্ছ ঠাকুর ? বামুন মানুষ, পুজো-অর্চনা করতে চাও, কর। আমাদের গাঁয়ে পায়ের ধুলো দিয়েছ—দুটো দিন থাক, আমাদের সেবা নাও—

—তোদের দিয়ে মহাকালীর সেবার ব্যবস্থা করতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার ! সেবা ! মূর্খ—বর্বরের দল !

একজন আর একজনকে বললে, বোধ হয় পাগল।

দ্বিতীয় লোকটি শঙ্কিত মুখে বললে, না, পাগল নয়। মনে হচ্ছে তান্ত্রিক।

—অ্যাঁ—তান্ত্রিক !

—দেখছ না, সেই লাল লাল চোখ—সেই জটা-বাঁধা চুল—সব সেই রকম ? মানুষটার রকম সকম দেখে আমার ভাল লাগছে না। হয়তো রাত-বিরেতে আমাদের ছেলেপুলে চুরি করে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে বলি দেবে।

শেষ কথাটা সোমদেবের কানে গিয়েছিল। বীভৎসভাবে চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

—হ্যাঁ—দিয়েছিই তো নরবলি। নিজের হাতেই দিয়েছি—ফিনকি দিয়ে বেরিয়েছে রক্ত—ধড়টা একটুখানি দাপাদাপি করেছে, তারপরেই সব স্থির। হা—হা—হা !—সোমদেব হেসে উঠলেন ঃ এবার তোমাদের সব কটাকেও নির্বংশ করব—কারুর একটা ছেলেও আমি ঘরে রাখব না—

এক মুহূর্তে চারদিকের মানুষগুলোর মুখ জমে যেন পাথর হয়ে গেল। একজন চিৎকার করে উঠল—মার্ ! আর একজনের হাতের প্রকাণ্ড একটা মোটা লাঠি সবেগে নেমে আসবার উপক্রম করল সোমদেবের মাথার ওপর।

সেই বুড়োই বাঁচাল। নইলে গ্রামের লোক গুঁড়িয়ে ফেলত সোমদেবকে।

সোমদেবকে আড়াল করে বুড়ো বললে—ছিঃ—ছিঃ—কী হচ্ছে ! ব্রাহ্মণ—অতিথি !

—অতিথি নয়—তান্ত্রিক ! আমাদের ছেলেপুলে চুরি করে নিয়ে বলি দেবে।

ভিড়ের মধ্যে থেকে উতরোল কান্না শোনা গেল একটা। বুক চাপড়ে কাঁদছে একটি মেয়ে।

—আমার ছেলেকে চুরি করে নিয়ে কেটে ফেলেছে তান্ত্রিকেরা—আমার ছেলেকে ওরা কেটে ফেলেছে !

—মার্—মার্—

অনেক কষ্টে সে-যাত্রা বুড়ো সোমদেবের প্রাণ বাঁচাল। সোমদেব তখন একটা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছেন নিথরভাবে। করুক—করুক, ওরা তাঁকে হত্যাই করুক। এই ক্লীব-কাপুরুষদের দেশে বেঁচে থেকে তাঁর কোনো লাভ নেই—এর চেয়ে মৃত্যুই তাঁর ভাল! নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইলেন সোমদেব। দুঃখ, ভয়, ক্ষোভ—তাঁর মুখে কোনো কিছুর চিহ্নই নেই! শুধু ঘৃণা—পুঞ্জ পুঞ্জ স্তব্ধ ঘৃণা সেখানে!

বুড়োই অবশ্য তাঁকে গ্রামের চৌহদ্দির বাইরে রেখে এল। বললে, ঠাকুর, বুঝে-সুঝে চোলো। দিনকাল বড় খারাপ। তান্ত্রিকদের অত্যাচারে কোথাও শান্তি নেই। আজকাল ঘরে ঘরে অল্প-বয়েসী ছেলে চুরি যাচ্ছে, দিন-দুপুরে ঘাট থেকে বৌ-ঝিদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এ সময় সাবধানে কথাবার্তা না বললে বেঘোরে প্রাণ হারাবে!

সোমদেব অনেকবার ভেবেছেন আত্মহত্যা করবেন। ভেবেছেন এই বিড়ম্বিত লজ্জিত জীবনের বোঝা আর তিনি বয়ে বেড়াবেন না; কিন্তু তারপরেই তাঁর মনে হয়েছে—কেন মরবেন তিনি এত সহজেই, কিসের জন্যে হাল ছেড়ে দেবেন? যদি কেউ না থাকে—তবে তিনি একা। একাই তিনি যুদ্ধ করবেন সমুদ্রের সঙ্গে।

একা ছাড়া কীই বা বলা যায় আর?

কোথাও দেখেছেন বৌদ্ধদের গ্রাম—আকাশের অনেকখানি পর্যন্ত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ওদের বিহার। দেখে ঘৃণায় মাটিতে থুথু ফেলেছেন তিনি। এই আর একদল! নাস্তিক—বেদের শত্রু!

দূর থেকে দেখছেন খড়ের চালার মধ্যে বুদ্ধের মাটিতে মূর্তি। সার দিয়ে প্রদীপ জ্বলছে সেখানে। মাথা নিচু করে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। কখনো সে প্রণাম করছে 'গোতম-চন্দিমা'কে—কখনো বা প্রার্থনা করে বলছে—দাও আমাকে 'সম্মা বাচা', 'সম্মা সংকপ্পো'—'সম্মা আজীবো'।

'সম্মা আজীবো!' সত্য জীবন! বিধর্মী—নাস্তিকদের দল! পাঠানদের আগে ওদের মুণ্ডপাত করলে তবেই তাঁর ক্ষোভ মেটে। এরাই তো সর্বনাশের ফাটল ধরিয়েছে সকলের আগে। দু হাতে নিজের কান চেপে ধরে—অন্ধের মতো প্রায় চোখ বুজেই বৌদ্ধদের গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছেন সোমদেব।

কিন্তু কোথায় যাবেন? চারদিকেই অগ্নিবলয় জ্বলছে তাঁর।

নবদ্বীপের ওই চৈতন্য-পণ্ডিত! কৃষ্ণনাম ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। শুধু কেশব নয়—আরো কত জন! হরে কৃষ্ণ! অহিংসা পরমো ধর্ম! দেশের সর্বনাশ কে আর ঠেকাতে পারবে!

হয়তো গ্রামের প্রান্তে কোথাও আশ্রয় নিয়েছেন। ভেবেছেন রাতটা কাটিয়ে দেবেন সেখানেই। এমন সময় দূর থেকে বুকের মধ্যে এসে বেঁধে কতগুলো বিষের তীর! যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে সোমদেব শুনতে পান:

'তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুত-মিত-রমণী সমাজে,
তোহে বিসরি' মন তাহে সমর্পিলু
অব মঝু হব কোন্ কাজে !
মাধব—মঝু পরিণাম নিরাশা—'

যেমন বৌদ্ধদের গ্রাম, তেমনি বৈষ্ণবদের গ্রাম থেকেও একটা অভিশপ্ত আত্মার মতো ছুটে পালাতে হয় সোমদেবকে। নিস্তার নেই—কোথাও নিস্তার নেই। শুধু ওই একটি পংক্তি কানের কাছে তীব্র একটা আর্তনাদের মতোই একটানা বাজতে থাকে ঃ 'মাধব,—মঝু পরিণাম নিরাশা—'

কার পরিণাম ? সোমদেবের ?

তা ছাড়া আর কার ? দেশের মানুষ আজ বিধর্মী পাঠানকে প্রতিবেশী বলে কাছে টেনে নিয়েছে। গ্রামে গ্রামে আজও মুখর হয়ে উঠছে বেদ-বিদ্বেষী —ধর্ম-বিদ্বেষী গৌতমের বন্দনা। বীর্যহীন কাপুরুষদের দল অহিংসা পরম ধর্মকেই সত্য বলে জেনেছে, খোলে-করতালে চাঁটি দিয়ে 'গৌর হে—গৌর হে—'বলে তারস্বরে আর্তনাদ করছে।

শুধু কি এই ?

তান্ত্রিক বলে যারা তাঁকে আক্রমণ করতে এসেছিল, তাদের কথা ভুলতে না হয় পারেন সোমদেব ; নির্বোধ গ্রাম্য মানুষগুলোর ওপরে তাঁর যত ক্রোধই জাগুক—তাদের তবু তিনি ক্ষমা করতে রাজী আছেন ; কিন্তু যারা শহরের —যারা নাগরিক ?

একটা প্রকাণ্ড বটগাছের ছায়ায় রাত্রির আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। দলে দলে অজগরের মতো ঝুরি নেমেছে চারপাশে—একটা বিষাক্ত অন্ধকার মন্থর হয়ে আছে ভিজে ভিজে মাটির গন্ধে। কালপ্যাঁচা থেকে থেকে কেঁদে উঠছে মাথার ওপর। দূরে থেকে একটা কুকুরের হাহাকার।

বটগাছের অন্ধকার ছায়াতল ছাড়িয়ে—সেই সারি সারি মরা অজগরের প্রলম্বিত দেহের মতো বটের ঝুরিগুলোর ভেতর দিয়ে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। অসংখ্য হাড়ের টুকরো ছড়ানো একটা ধূসর শ্মশানের মতো মনে হচ্ছে আকাশটাকে। ওই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সোমদেব আত্ম-জিজ্ঞাসার মধ্যে মগ্ন হয়ে গেলেন। নিজেকে শান্ত নিরুত্তেজ অবসাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে সব ভেবে দেখতে চাইলেন আর একবার।

গ্রামের মানুষের অজ্ঞতাকে ক্ষমা করা যায় ; কিন্তু যারা নাগরিক ?

শৌর্য খুঁজছিলেন সোমদেব—বীরের সন্ধান করেছিলেন। পেয়েছেন বইকি সেই বীরের সন্ধান ! দেশে আছে বইকি তান্ত্রিক। অনেক জমিদার—অনেক ভূস্বামীরই তন্ত্রে অনুরাগ আছে ; কিন্তু কী তাদের উদ্দেশ্য ? কৌল-মার্গীরা অন্যকে 'পশ্বাচারী' বলে ধিক্কার দেয়, তারা নিজেরাই পরিণত হয়েছে পশুতে।

একজনের কথা মনে পড়ছে।

মহানাদ অঞ্চলের এক ভূস্বামী। প্রচুর লোকবল—প্রচুর অর্থ—দুর্গের মতো তার বাড়ি। তার পূর্বগামী পুরুষ যুদ্ধ করেছে ত্রিবেণীর গাজীদের সঙ্গে। অনেক আশা নিয়েই সোমদেব গিয়েছিলেন তার কাছে।

দিনের বেলাতেই প্রচুর মদ্যপান করে বসে ছিল লোকটা। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, আসুন—আসুন—প্রভু। আপনার আগমনে আমি ধন্য হলাম।

লক্ষ্য করে দেখলেন সোমদেব। শুধু তার পা-ই টলছে তা-ই নয়; তার সর্বাঙ্গে মৃত্যু-ব্যাধির স্বাক্ষর। অত্যাচার আর অনিয়মে ত্রিশ বছর বয়েস না হতেই সর্বাঙ্গে তার ভাঙন ধরেছে। লোকটার ব্যাধিগ্রস্ত কুৎসিত মুখের দিকে চেয়ে তাঁর সর্বাঙ্গ যেন শিউরে উঠল।

পরে আরো জানলেন তিনি।

লোকটা বীরাচারী; কিন্তু তার বীরাচারের অর্থ সুরা আর নারীচর্চা। উত্তরসাধিকার লোভেই সে চক্রে বসে। তিনটি স্ত্রী ছাড়াও চারটি যুবতী দাসী আছে তার ঘরে—নামে দাসী হলেও আসলে তারা উপপত্নী। তাদের কয়েকটি সন্তান তো আছেই, এর উপর আরো কটা জারজের সে জন্মদাতা—তা হয়তো নিজেরও জানা নেই তার।

এদের নিয়ে তিনি যুদ্ধ করবেন! এদের ওপরেই তাঁর ভরসা! যে জমিদার আর ভূস্বামীদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত শুধু লাম্পট্য আর ব্যভিচার, তারা অস্ত্র নিয়ে দাঁড়াবে নতুন শক্তির সামনে! দুরাশা। উন্মাদের কল্পলোক। এরা নিঃশ্বাসেরও তো ভর সইবে না।

আর ব্রাহ্মণ! যে ব্রাহ্মণের মহিমা-প্রতিষ্ঠায় তিনি এত তন্ময়—কী করছে সে?

যে বেদজ্ঞ, সে-ই ব্রাহ্মণ। যে অগ্নিহোত্রী—সে-ই ব্রাহ্মণ। আজ কোন্ ব্রাহ্মণকে দেখছেন তিনি রাঢ়ে-বঙ্গে-গৌড়ে? আজ কামশাস্ত্র ছাড়া কোনো শাস্ত্রে তার অনুরাগ নেই—ব্রাহ্মণের ঘরে পর্যন্ত নীতির শুচিতা অপমৃত! গ্রামের সরল বিশ্বাসী মানুষকে পথ দেখাবে এই ভূস্বামী? এই ব্রাহ্মণ? চূড়ান্ত নিরাশার গ্লানিতে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে সোমদেব অনুভব করলেন—যা ঘটেছে তা কালের নিয়মেই ঘটেছে। ব্রাহ্মণ মরেছে—ক্ষত্রিয়ের নাভিশ্বাস। সেই দুর্বলতার পথ দিয়েই যাবনিক শক্তি এসেছে—ক্রীশ্চানও আসবে। তা হলে কী আর করবার আছে তাঁর?

কিছুই নয়—কিছুই নেই।

শুধু ভুলের পথেই পরিক্রমা করে এলেন। ফেলে এলেন চন্দ্রনাথ মন্দিরের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ—তাঁর সেই ধ্যানতীর্থ। আর নয়। এবার তিন আবার ফিরে যাবেন সেখানেই। সেই নির্মল ভোরের আলোয়—সেই প্রথম শঙ্খধ্বনিতে—ভক্তকণ্ঠের সেই ভজন গানে—

হঠাৎ চমক লাগল তাঁর। যেন দূর-দূরান্তের ওপার থেকে এল মেঘের ডাক।

মেঘের ডাক ? কী করে হয় ? আকাশ নির্মল ধূসর—শেষ রাতের তারাগুলো ঝকমক করছে। এক টুকরো মেঘেরও তো চিহ্ন নেই কোথাও।

তবে ? তবে এ কেমন মেঘের ডাক ?

আবার সেই শব্দটা উঠল। রাত্রির শেষে শান্ত আকাশের তলা দিয়ে আবার তার তরঙ্গিত গুরু গুরু ধ্বনি হাওয়ায় হাওয়ায় আশ্চর্য আতঙ্কের রেশ ছড়িয়ে দিলে একটা।

না—এ তো মেঘের ডাক নয় !

ত্রস্ত হয়ে সোমদেব উঠে বসলেন। লহরে লহরে সেই গর্জন আসছে—একের পর একটা। মাথার ওপর নক্ষত্র-ছাওয়া আকাশটা যেন থর থর করে দুলে উঠল। অজানা ভয়ে তড়িৎগতিতে উঠে বসলেন সোমদেব।

আর সেই মুহূর্তেই তিনি দেখতে পেলেন পূর্ব দিকে কালো আকাশটা লাল হয়ে উঠছে একটু একটু করে। ঊষার বর্ণচ্ছটা নয়—আগুনের রক্তরাগ !

ওই দিকেই তো চট্টগ্রামের বন্দর !

আগুনের আকর্ষণে অন্ধ পতঙ্গের মতো সোমদেব ছুটে চললেন সেদিকে। বুঝেছেন—নিশ্চিত করে কিছু একটা বুঝতে পেরেছেন, আকাশের নতুন নক্ষত্রের সঙ্গে ওই গুরু গুরু বজ্রনাদের সম্পর্ক আছে কোথাও। সোমদেবের অনুমান করতে বিলম্ব হয়নি—ওটা কামানের ডাক।

রক্তাভ দিগন্তের দিকে রুদ্ধশ্বাসে ছুটে চললেন সোমদেব।

* * *

মেনেজেসের প্রতিহিংসায় তখন চট্টগ্রামের বন্দরে আগুন জ্বলছে। ধ্বসে পড়ছে বাড়ি, উড়ে যাচ্ছে মসজিদের মিনার, দেউলের চূড়ো। আগুনের আভায় সূর্যোদয়ের রঙ মুছে গেছে লজ্জায় আর আতঙ্কে।

বন্দরের দিক থেকে নবাবের কামানে জবাব এসেছিল কয়েকবার; কিন্তু অনেক গুণে শক্তিশালী পর্তুগীজ কামানের মুখে কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা থেমে গেছে। চারদিকে ভয়ার্ত মানুষের আকাশ-ফাটানো কোলাহল।

এই প্রচণ্ড অগ্নিবর্ষণকে বাধা দেবার কেউ নেই। নবাবের সৈন্য ইতস্ততঃ পালিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টায় ব্যস্ত। মেনেজেসের আদেশে সেই সুযোগে তিনশো পর্তুগীজ খোলা তলোয়ার হাতে বন্দরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

নবাব-সৈন্যের কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না কোথাও, পর্তুগীজের ধারালো তলোয়ারের মুখে শিশু-বৃদ্ধ-নারীর দীর্ণ দেহ লুটিয়ে পড়তে লাগল মাটিতে। হত্যার নেশায় মাতাল পর্তুগীজেরা রক্তের বন্যা বইয়ে দিলে চারদিকে।

বন্দরে আগুন আর মৃত্যু—নদীর জলেও তাই। বাঙালী আর আরব বণিকদের বহরগুলো ধূ-ধূ করে জ্বলছে। কালিকটের সেই পুনরাবৃত্তি যেন।

ঠিক সেই সময়ে চট্টগ্রামে এসে পৌঁছুলেন সোমদেব।

চারদিকের এই নরকের মাঝখানে একবার থমকে দাঁড়ালেন তিনি। তাঁর সময় এসেছে। কেউ যদি সঙ্গী না থাকে—তিনি একাই আছেন।

মুসলমানেরা ভয় পেয়ে পালাচ্ছে—পালাক ; তাঁর তো হার স্বীকার করলে চলবে না।

কাদার মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে নবাবের একজন সৈনিক। মরে গেছে। সারা গায়ে রক্ত জমাট বাঁধছে তার। একখানা হাত ছড়িয়ে রয়েছে—মুঠো থেকে খুলে গেছে তার তরোয়াল। লোকটার সর্বাঙ্গ রক্ত-মাখা ; অথচ একবিন্দু রক্তের চিহ্ন নেই তরোয়ালের উজ্জ্বল ফলকে !

ঘৃণাভরে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন সোমদেব। হয়তো পালাতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে—একজন শত্রুকেও আঘাত করার সময় পায়নি !

পরক্ষণেই একটা মস্ত কোলাহল শুনলেন সোমদেব। সামনেই একজন মগ বণিকের দোকান লুট করছে পর্তুগীজেরা। হা-হা করে হাসছে জৈবিক আনন্দে।

চকিতে নিষ্কলঙ্ক তরোয়ালখানা তুলে নিলেন সোমদেব। তারপর বীভৎস চিৎকার করে অগ্রসর হলেন ক্রীশ্চানদের দিকে।

পর্তুগীজেরা তাকিয়ে দেখল। মানুষ নয়—যেন কালপুরুষ ছুটে আসছে তাদের দিকে। মাথায় তার অসংখ্য সাপের ফণা দুলছে—পঞ্চমুখী জবার মতো তার রক্তিম চোখ। **Diablo** ! শয়তান !—কে যেন চেঁচিয়ে উঠল। ভয়ের সুর তার গলায়।—

শয়তান নয়—জেন্টুর !—আলকোকোরাদো এল এগিয়ে। বাঘের জিভের মতো লকলক করছে তার তরোয়াল—মরিচা-ধরার মতো তা বিবর্ণ-রক্তিম, এই-মাত্র মগ বণিকের হৃৎপিণ্ড দীর্ণ করে এসেছে।

সোমদেব প্রচণ্ড আঘাত হানলেন আলকোকোরাদোর ওপর। চকিতে একপাশে সরে গিয়ে মাথা বাঁচাল আলকোকোরাদো, খানিকটা চোট লাগল বাঁ কাঁধের ওপর— ; কিন্তু শিক্ষিত অভ্যস্ত নৈপুণ্যে পরক্ষণেই তার তরোয়াল বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে গেল—অর্ধেকের বেশি প্রবেশ করল সোমদেবের নাভিমূলে।

মুসলমানের রক্তে মিশল ব্রাহ্মণের রক্ত। শেষ পর্যন্ত নিজেকেই আহুতি দিলেন সোমদেব। মহাকালী নয়—মহাকালের কাছে।

মৃত্যুর অন্ধকার সম্পূর্ণ নেমে আসবার আগে—সমস্ত যন্ত্রণার অতীত এক স্বপ্নঘন প্রশান্তির মধ্যে সোমদেব যেন শুনতে পেলেন চন্দ্রনাথ মন্দিরের চূড়োয় প্রথম সূর্যের আলোয় পাখির কাকলি বাজছে—উঠছে শান্ত গম্ভীর শঙ্খের শব্দ—শোনা যাচ্ছে কার স্তোত্রের সুর। সেই সুর—সেই পাখির গান—সেই শঙ্খের ধ্বনি যেন ক্রমশ তাঁর কাছে আসতে লাগল। আরো কাছে—আরো কাছে—

তারপর—

বাইশ

"Boz Dias"

ইরাণী সুরার পাত্র শূন্য হয়ে চলেছে একটির পর একটি। সামনে বাইজীর উন্মত্ত নাচের ঘূর্ণি চলেছে—সে নাচে মানুষের আদিম আকাঙ্ক্ষা গর্জন করে ওঠে। দিলরুবা, সারেঙ্গী, বাঁশির সুরে সুরেও যেন অ গুন ঝরছে। নেশায় জর্জরিত চোখ মেলে তাকিয়ে আছেন মামুদ শা। নিশি-রাত্রের নিঃসঙ্গ আবদুল বদর যেন মামুদ শা হয়ে ভুলতে চাইছেন নিজেকে।

কিন্তু এই-ই বা কতক্ষণ চলবে? তৃষ্ণারও একটা শেষ আছে। দেহের চূড়ান্ত উত্তেজনার পরে আছে তার ভয়াবহ অবসাদ। দুশ্চিন্তার পুঞ্জ-পুঞ্জ সঞ্চয় মাথার ভেতরে জমে আছে পাথরের পিণ্ডের মতো। সুলতান আবার মদের পাত্রে চুমুক দিলেন।

ওড়না উড়ছে—পেশোয়াজ উড়ছে নর্তকীর। দেহের প্রত্যেকটি রেখা ফুটে উঠছে ফণা-তোলা সাপের মতো; কিন্তু খানিকক্ষণ পরে ও-ও নাচতে নাচতে ক্লান্ত হয়ে থেমে যাবে, সুলতানের উচ্ছ্বলিত রক্তে শুরু হয়ে যাবে ভাঁটার টান। তখন? সেই মুহূর্তে?

পরের কথা পরে। একজন থামলে আর একজন আসবে। তারপরে আর একজন। তিনশো নর্তকী আনিয়েছেন মামুদ শা। তারা আসতে থাকবে একের পর এক—যতক্ষণ তিনি না অচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়েন।

—খোদাবন্দ, উজীর সাহেব সেলাম দিয়েছেন।

সুলতান চমকে উঠলেন। রাত দুই প্রহর। এই সময় উজীর! এমন পরিপূর্ণ নাচের আসরে এমন রসভঙ্গ! সুলতানের প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল: গর্দান নাও।—তার পরক্ষণেই মনে হল, এমন অসময়ে কেন উজীর? নিশ্চয়ই সুসংবাদ আছে কোনো। হয়তো সুরযগড়ের যুদ্ধ জয় হয়ে গেছে—হয়তো ইব্রাহিম খাঁ ভেট পাঠিয়েছে পাঠান শের খাঁ সুরীর ছিন্নমুণ্ড—

সুলতান বললেন, ডেকে আন—

নাচ চলতে লাগল। মনের তীব্র উত্তেজনা ভোলবার জন্যে আবার মদের পাত্রের দিকে হাত বাড়ালেন সুলতান, কিন্তু হাত কাঁপতে লাগল তাঁর।

একটু পরেই উজীর এসে ঢুকলেন। নিষ্ঠাবান মুসলমান, সুরা স্পর্শ করেন না, নারী-ঘটিত ব্যাপারে কোনো আসক্তি নেই। অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে প্রায় বিবর্ণ মুখে এসে দাঁড়ালেন সুলতানের পাশে। নটীর সংক্ষিপ্ত এবং উদ্দাম বেশবাসের দিকে তাকিয়েই তাঁর মাথা নিচু হয়ে গেল।

তীক্ষ্ণ উদগ্র দৃষ্টিতে তাকালেন সুলতান। উজীরের মুখে সুসংবাদের লেখা তো কোথাও দেখা যাচ্ছে না! পেছনে পেছনে তো শের খাঁর ছিন্নমুণ্ড নিয়ে আসছে না ইব্রাহিম খাঁর দূত! তা হলে—

হঠাৎ গর্জন করে উঠলেন মামুদ শা: খবর?

উজীর চমকে উঠলেন। নর্তকীর পা থমকে গেল পলকের জন্যে, একবারের

জন্যে কেটে গেল সারেঙ্গীর সুর। তেমনি মাথা নিচু করে উজীর শীর্ণ স্বরে বললেন, খবর ভাল নয় সুলতান। আমার বেয়াদপি মাপ করবেন।

—সুরযগড় যুদ্ধের খবর?—সুলতান আর্তনাদ করলেন।

—না। পর্তুগীজ ক্যাপিতান মেনেজেস্ চট্টগ্রামের বন্দরে আগুন লাগিয়েছে। আমাদের বহু সৈনিক নিহত হয়েছে। যুদ্ধ চলছে চট্টগ্রামে।

—কুত্তা—কুত্তা।—মামুদ শা চিৎকার করে উঠলেনঃ এত সাহস কতকগুলো ক্রীশ্চানের! সুলতানের গলা চিরে একটা পৈশাচিক আওয়াজ উঠলঃ নাচ বন্দ্ করো।

পরের ঘটনা ঘটল যেন যাদুমন্ত্রে। অভিশপ্ত আবদুল বদরের চোখের সামনে থেকে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল কল্পলোক। নর্তকী চকিতের মধ্যে ভয়ার্ত হরিণীর মতো পালিয়ে গেল, শুধু একটা ঘুঙুর মাটিতে পড়ে রইল স্মৃতি-চিহ্নের মতো। সারেঙ্গী আর সঙ্গতীর দল তাদের বাজনা কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল ঊর্ধ্বশ্বাসে।

সুলতান বললেন, আজই ফৌজ পাঠাও এখনি! পর্তুগীজেরা যেন কর্ণফুলীর মুখ থেকে বেরুতে না পারে, যেন একটি জাহাজও ফিরে যেতে না পারে বার-দরিয়ায়। একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া চাই ওদের। আর সেই মেনেজেস্‌কে হাতে পায়ে জিঞ্জীর পরিয়ে আনা চাই এখানে—আমি তাকে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াব।

উজীর বললেন, ফৌজ পাঠাবার ব্যবস্থা আমি করছি; কিন্তু আরো খবর আছে খোদাবন্দ্। আর একজন ক্রীশ্চান ক্যাপিতান ডিয়োগো রেবেলো সপ্তগ্রাম বন্দরের পথ আটকে বসে আছে। একটি জাহাজ আসতে পারছে না, একটি জাহাজও যেতে পারছে না।

—সপ্তগ্রাম পর্যন্ত এসেছে!—ক্রোধে মামুদ শা থমকে গেলেন।

—এর পরে হয়তো গৌড়েও আসবে।

—ইয়া আল্লা! এও আমায় সইতে হল! মশা আজ হাতীকে ঘায়েল করতে চায়? বড় বড় কামান পাঠান উজীর সাহেব, তোপের মুখে উড়িয়ে দিয়ে পথ পরিষ্কার করে ফেলুন। আর—মুহূর্তের জন্য সুলতান থামলেন—উজীর অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সুলতান বললেন, যে-সব ক্রীশ্চান গারদে আছে, এক্ষুনি তাদের সকলকে কতলের ব্যবস্থা করতে বলুন।

উজীর অস্বস্তিতে ছট্‌ফট্ করে উঠলেন।

সুলতান আবার বললেন, রাত শেষ হওয়ার আগেই তাদের মাথাগুলো যেন শহরের পথে-বাজারে টাঙিয়ে দেওয়া হয়।

উজীর একটা ঢোঁক গিললেন।

—এটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না সুলতান। এখন সময়টা ভাল নয়—

—চুপ করুন!—সুলতান চেঁচিয়ে উঠলেনঃ আপনাদের পরামর্শ শুনেই আমি ভুল করেছি। তখনি যদি এদের ঝাড়সুদ্ধ নিকাশ করতাম, তা হলে

এদের বুকের পাটা এত বাড়ত না—এরা ল্যাজ গুটিয়ে অনেক আগেই পালিয়ে যেত। তা করিনি দেখে ভেবেছে আমি ভয় পেয়েছি। যান—একটা কথাও আর আমি শুনতে চাই না।

—কিন্তু সুরযগড়ের যুদ্ধ—

—কোনো খবর আছে তার?

—এখনো কিছু পাকা খবর আসেনি, তবে যতদূর জানি, অবস্থা খুব ভাল নয়—

অসহ্য অন্তর্জ্বালায় সুলতান হঠাৎ হাতের মদের গ্লাসটা সামনে দেওয়ালের গায়ে ছুঁড়ে মারলেন। বিকট শব্দ তুলে ঝন্ ঝন্ করে ভেঙে পড়ল কাচপাত্র, যেন দেওয়ালের বুক ফেটে একরাশ টকটকে লাল রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল।

উজীর স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, আমি বলছিলাম—কিন্তু এবারেও উজীরের কথা শেষ হতে পেল না। ঘরে ঢুকলেন আল্‌ফা হাসানী। তাঁর সঙ্গে বহু-বাঞ্ছিত সুরযগড়ের দূত।

আল্‌ফা হাসানী শান্ত-গম্ভীর বিষণ্ণ গলায় বললেন, সুলতান, আমাদের দুর্ভাগ্য। সুরযগড়ের যুদ্ধে ইব্রাহিম খাঁ আর জামাল খাঁর সম্পূর্ণ পরাজয় হয়েছে। একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে বাঙলার সৈন্য। দুর্দান্ত বেগে শের খাঁ সুরী গৌড় আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছেন।

কিছুক্ষণের জন্যে মৃত্যুর মতো স্তব্ধতা। যেন অনন্ত কাল ধরে হাসানীর কণ্ঠস্বর রং-মহলের দেওয়ালে দেওয়ালে গম্ গম্ করে বেড়াতে লাগল।

তারপর, আশ্চর্য শান্ত গলায় সুলতান বললেন, তামাম শোধ!

উজীর তটস্থ হয়ে উঠলেন: এখনো হাল ছাড়বার সময় হয়নি সুলতান।

—হয়নি?—অদ্ভুত অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকালেন সুলতান। তারপর সীমাহীন অবসাদে নিজেকে তাকিয়ায় এলিয়ে দিয়ে বললেন, এখনো কোনো আশা আছে?

আল্‌ফা হাসানী বললেন, খোদাবন্দ্, এ উত্তেজনার সময় নয়। চারদিক থেকেই সংকট এসেছে এখন। এ অবস্থায় ভেবে-চিন্তে কাজ না করলে শের খাঁর হাত থেকে বাঙলা দেশ রক্ষা করা যাবে না। সুরযগড়ের যুদ্ধে যে লোকক্ষয় হয়েছে, তার চাইতেও বড় ক্ষতি সামনে এগিয়ে আসছে। শেরকে রোখা এখন অসম্ভব। সে অসাধারণ বীর, অসামান্য কৌশলী। এই যুদ্ধজয়ের ফলে আমাদের বহু অস্ত্রশস্ত্র তার হাতে গিয়ে পড়েছে। তার ওপরে তার রয়েছে মখদুম্-ই-আলমের বিরাট ধনভাণ্ডার। এখন ঘর সামলে তার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে।

সুলতান জবাব দিলেন না। ফিরোজের রক্ত-মাখা সিংহাসন। হোসেন শাহের সমাধির পাশে লুটিয়ে পড়ে আছে নসরৎ শার মৃতদেহ। রক্ত আর মৃত্যুর অভিশাপ চারদিকে। একটা বায়বীয় শূন্যতার মধ্যে তিনি দাঁড়িয়ে

আছেন—তাঁর সম্মুখে যেন প্রেতলোকের হাতছানি। আবদুল বদর—কী প্রয়োজন ছিল তোমার মামুদ শা হয়ে? আবার কি তুমি আবদুল বদর হয়ে সহজে নিঃশ্বাস ফেলতে পার না, খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে নিঃসংশয় চোখে দেখতে পার না খোদাতালার পৃথিবীকে?

উজীর আস্তে আস্তে বললেন, এখন এই ক্রীশ্চানেরাই আমাদের ভরসা।

—ক্রীশ্চানেরা?—সুলতান একবার নড়ে উঠলেন।

উজীর সন্তর্পণে বললেন, ওরা দুঃসাহসী সৈনিক। তা ছাড়া ওদের যুদ্ধ-কৌশলও সম্পূর্ণ আলাদা। ওদের কামানও আমাদের চেয়ে জোরালো। আজ যদি ওরা আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়, তা হলে হয়তো শেরের আক্রমণ থেকে গৌড়-বাংলাকে বাঁচানো সম্ভব।

মিতালী! কতগুলো লুটেরার সঙ্গে! যারা অসীম দুঃসাহসে গৌড়ের রাজমর্যাদাকে বার বার অপমান করছে, সেই কয়েকটা বিদেশীর সঙ্গে!

কিন্তু—এ হবেই। শুধু সিংহাসনে নয়—চারদিকেই ফিরোজের রক্ত। বাতাসে বাতাসে ক্রুদ্ধ অভিসম্পাত। অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মিছিল। সেই অপঘাতের শোভাযাত্রায় নিজের প্রতিচ্ছবিও কি দেখতে পাচ্ছ না মামুদ শা? ফকির সাহেব! কোথায় গেলেন তিনি? এ সময়ে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী শুনতে পেলেও যে ভরসা পাওয়া যেত।

উজীর বললেন, তা হলে ওদের সঙ্গে সন্ধির ব্যবস্থাই করি।

সুলতান বললেন, করুন।

—ডিয়োগো রেবেলোকে খবর দিই।

—দিন।

—আর—উজীর একবার গলা পরিষ্কার করলেন, ওদের নেতা ক্যাপিতান অ্যাফনসো ডি-মেলোকে এখুনি সসম্মানে সদলে মুক্তি দেওয়া দরকার। তাঁর জন্যেই যা কিছু গণ্ডগোল। ডি-মেলো যদি আমাদের সহযোগিতা করতে রাজী হন, তা হলে আর কোনো ভাবনাই থাকবে না।

পরাজয়ের পালা পড়েছে—ইলিয়াস শাহী বংশের ওপর আল্লার ক্রোধ নেমে আসছে। কিছু করা যাবে না—কিছুই করবার উপায় নেই। মামুদ শা শুধুই নিমিত্ত মাত্র।

—বেশ, তাই হোক—একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে কথাটা ছেড়ে দিলেন মামুদ শা। তারপর আবার হাত বাড়ালেন সুরাপাত্রের সন্ধানে; কিন্তু সব শূন্য হয়ে গেছে।

সুলতান টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন। চোখের সামনে একরাশ ধোঁয়া পাক খাচ্ছে যেন। উত্তেজনায় টানে টানে বাঁধা স্নায়ুগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। এবার শুধু লুটিয়ে পড়বার পালা।

সুলতান বললেন, বেশ, তাই করুন।

নিজের বিশ্রামঘরের দিকে ফিরে চললেন সুলতান; কিন্তু কোথায় ঘর? কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না। চারদিকে শুধু কবরের পর কবর দাঁড়িয়ে। আর

আমেদ শার নিঃসঙ্গ নিরাশ্রয় প্রেতাত্মা যেন তার নিজের কবরটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কোথাও তা দেখতে পাচ্ছে না।

* * * *

গৌড়ের সুলতানের দরবারে পর্তুগীজেরা আবার এসে দাঁড়ালেন সার দিয়ে। ডি-মেলো, আজেভেদো, রেবেলো, স্পিণ্ডোলা, ডায়াস। এর মধ্যে অনেক শীর্ণ হয়ে গেছে ডি-মেলোর চেহারা। মাথায় বন্য বিশৃঙ্খল চুল—তামাটে দাড়িতে অস্বাভাবিক দ্রুততায় পাক ধরেছে, চোখের কোটরে কালো অন্ধকার, তার মধ্য থেকে দুটো উজ্জ্বল অঙ্গারকে যেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কপালের ডান দিকে ক্ষতচিহ্নের একটা কলঙ্ক-রেখা—গুয়াজিলের শেষ মহ্‌ফিলের স্মারক!

সুলতান দু হাতে কপাল টিপে ধরে বসে আছেন। সভায় একটা শোকাচ্ছন্ন নীরবতা।

উজীর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। গম্ভীর গলায় বলতে শুরু করলেন তারপর।

—গৌড়ের সুলতান অনেক চিন্তা করে দেখেছেন যে বিদেশী ক্রীশ্চানদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করাই তাঁর রাজমর্যাদার উপযুক্ত। তাই এতদিন ধরে ক্রীশ্চানদের তিনি যে কারারুদ্ধ করে রেখেছিলেন, সে জন্যে তিনি আন্তরিক দুঃখিত।

ডিয়োগো রেবেলোর ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের একটা চাপা হাসি খেলে গেল। হঠাৎ একটা অসহ্য হিংস্র ক্রোধে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল ডি-মেলোর। গঞ্জালো—পেড্রো—চাকারিয়া—গুয়াজিলের নিমন্ত্রণ!

উজীর বলে চললেন, তাই সুলতান মনে করেন, তিনি গোয়ার মহামান্য ডি-কুন্‌হার সঙ্গে সন্ধি এবং শান্তি রচনা করবেন। গৌড়বাঙলার সঙ্গে তিনি বাণিজ্যের সনদ দেবেন পর্তুগীজদের। আর এই উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম এবং সপ্তগ্রামে তিনি ক্রীশ্চানদের কুঠি রচনারও অনুমতি দেবেন।

সুলতান একবার মাথা তুললেন। কিছু দেখতে পাচ্ছেন না চোখের সামনে। এই প্রাসাদ নয়—এই সভা নয়—কিছুই নয়। মাথার ওপরে একটা আশ্চর্য উদার আকাশ। তার রঙ ঘন নীল। সবুজ অরণ্য সূর্যস্নান করছে। মসজিদ থেকে শোনা যাচ্ছে আজানের গম্ভীর সুর। কী উদার! কোথাও কোনো সমস্যা নেই—কোথাও কোনো সংকট নেই—মাথার ভেতরে অশান্ত উন্মত্ততার চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। এবার নামাজের সময় হয়েছে আবদুল বদর। খোদার কাছে মোনাজাত করো: রহমান—একটি টুকরো রুটি, একখানা কোরাণ—আর কিছুই নয়।

পর্তুগীজেরা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এতদিনের এত দুঃখ—এত তিক্ততার পরে। বেঙ্গালা! মাটিতে সোনা, আকাশে সোনা। ভোরের কুয়াশায় মসলিন উড়ে বেড়ায়। ডা-গামার স্বপ্ন—আলবুকার্কের অসমাপ্ত কল্প-কামনা!

উজীর প্রশ্ন করলেন ঃ এ বিষয়ে পর্তুগীজ ক্যাপিতানের আশা করি কোনো আপত্তি নেই ?

—না।—ডি-মেলো জবাব দিলেন। যেন কয়েক শতাব্দী পরে কথা কইলেন তিনি, তাঁর নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কানেই যেন অপরিচিত ঠেকল।

—কিন্তু একটি শর্ত আছে।—উজীর বলে চললেন, বিহারের শের খাঁ গৌড় আক্রমণ করতে আসছে। এই আক্রমণ রোধ করবার জন্যে সুলতান পর্তুগীজ সৈনিকদের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেন। পর্তুগীজ ক্যাপিতান কি রাজি আছেন ?

—রাজি।—আবার সেই অপরিচিত গম্ভীর গলায় ডি-মেলো জবাব দিলেন।

—তা হলে এই শর্ত-পত্রে পর্তুগীজ ক্যাপিতান স্বাক্ষর করুন। তার পরে এ অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে মহামান্য নুনো-ডি-কুন্‌হার কাছে।

ডি-মেলো এগিয়ে গেলেন আস্তে আস্তে। বেঙ্গালা ! স্বর্গের দরজা খুলে গেল এতদিন পরে ?

লেখনী তুলে নিলেন ডি-মেলো—ধীরে ধীরে কাঁপা হাতে সই করে দিলেন কালো কালো অক্ষরে। আর সেই স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গেই মহাকাল তাঁর পাণ্ডু-লিপিতে নতুন একটি অধ্যায়ের পাতা খুলে দিলেন। পাশ্চাত্ত্য বাণিজ্যলক্ষ্মীকে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে প্রাচ্যের বাণিজ্যলক্ষ্মী ভাগীরথীর জলে হারিয়ে গেলেন।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন সুলতান।

—আপনারা ক্ষমা করবেন, আমি বড় অসুস্থ !

মামুদ শা সভা থেকে বেরিয়ে গেলেন। ভঙ্গ হল সভা। একা এগিয়ে চলতে চলতে সুলতানের মনে হল, তাঁর নিজের ছায়াটা যেন তাঁকে ছাড়িয়ে সামনের দিকে ক্রমাগতই প্রলম্বিত হয়ে চলেছে !

* * * *

তারপর ইতিহাস।

আশ্চর্য কৌশলের সঙ্গে কী করে শের খাঁ গৌড়ের দিকে এগিয়ে এলেন—যুদ্ধনীতির নিদর্শন হিসেবে তা স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। পর্তুগীজ অধ্যক্ষদের নেতৃত্বে তেলিয়াগড়ীর দুর্গে যে নৌবাহিনী গঙ্গার পথ আটক করে রেখেছিল, তার মুখোমুখি দাঁড়ালে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতেন শের খাঁ ; অথবা গৌড়েও যদি তিনি পৌঁছুতেন, তা হলে দশ বছরেও তার দুর্ভেদ্য প্রাকার তিনি ভাঙতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

কিন্তু আবদুল বদর যুদ্ধ চায় না। সে যেন দেওয়ালের গায়ে নিয়তির লেখন দেখতে পেয়েছে।

কিছু না করে শুধু বাধা দিয়ে রাখলেই হয়তো শের খাঁর পরাজয় ঘটত। ইতিহাসে যেমন আগেও ঘটেছে, এবারেও তেমনি তারই পুনরাবৃত্তি হত। বাঙলা দেশের অসংখ্য নদীনালা দুর্লংঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়াত শেরের সামনে—প্রতি পদে পদে থমকে দাঁড়াতে হত আফগান সৈন্যকে। তারপরে আসত বর্ষা

—বাঙলা দেশের মেঘপুঞ্জিত নিবিড়ঘন ধারা-বর্ষণ। সেই প্রচণ্ড জলধারায় গঙ্গা গর্জন করে উঠত—মহানন্দা ধরত মৃত্যুরাক্ষসীর রূপ। সাড়া দিয়ে উঠত জল-জঙ্গলের হিংস্র বিষধরের দল, পলি-মাটির পঙ্কবন্ধনে থমকে যেত শের খাঁর কামান। আসাম অভিযানে যে তিক্ত-অভিজ্ঞতার চরম মূল্য দিয়েছিলেন মীর-জুমলা—ঠিক তেমনি ভাবেই হতলাঞ্ছিত শের খাঁকে বাঙলা জয়ের স্বপ্ন চিরদিনের মতো ত্যাগ করতে হত।

অ্যাফন্‌সো ডি-মেলো সেই পরামর্শই দিয়েছিলেন মামুদ শাকে। অসীম বীরত্বের পরিচয় দিয়ে পর্তুগীজেরা শেরের পক্ষে দুর্জয় করে তুলেছিলেন গৌড়কে।

কিন্তু মনের মধ্যে যার পরাজয়ের তিক্ত গ্লানি, চোখের সামনে যার শূন্য-তার অন্ধকার, নিশি রাত্রে ফিরোজের রক্তাক্ত দেহ যাকে পরিক্রমা করে বেড়ায়—সেই মামুদ শার আর যুদ্ধ করবার শক্তি ছিল না।

পর্তুগীজদের পরামর্শ কানে তুললেন না মামুদ শা। ডি-মেলো যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন—কিন্তু কে যুদ্ধ করবে? নত-মস্তকে মামুদ শা সন্ধি করলেন শেরের সঙ্গে। তেরো লক্ষ টাকার সোনা উপঢৌকন নিয়ে শের খাঁ এবারের মতো ফিরে গেলেন।

অ্যাফন্‌সো ডি-মেলো বলেছিলেন, শয়তানকে লোভ দেখালেন সুলতান—নিজের দুর্বলতাকে মেলে ধরলেন তার সামনে। এবার সে ফিরে গেল, কিন্তু আবার আসবে। সেদিন তার ক্ষুধার নিবৃত্তি আপনি করতে পারবেন না—গৌড়-বাঙলাকে সে গ্রাস করে নেবেই।

সুরার পাত্র নিঃশব্দে নিঃশেষ করে মামুদ শা নর্তকীদের আহ্বান করতে বলেছিলেন। ডি-মেলোর কথার কোনো জবাব তিনি দেননি। তারপর থেকেই যেন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে গেছেন সুলতান। অভিশাপ যদি লেগেই থাকে, তা হলে কী হবে নিজেকে বাঁচাবার বৃথা চেষ্টা করে? যা হওয়ার তা হবেই—ইতিহাসের গতি কেউ থামিয়ে রাখতে পারে না। মামুদ শা নয়—আবদুল বদরও না। তার চেয়ে এই-ই ভাল। সুরা আর নর্তকী। ফিরোজই বা কী অন্যায় করেছিল? বিদ্যাসুন্দরের কেচ্ছা—বেশ, তা-ই হোক।

পরদিন পণ্ডিত ডাকলেন মামুদ শা। বললেন, রসের বয়েৎ শোনাতে হবে ঠাকুর, হাত ভরে মোহর দেব।

পণ্ডিত পড়তে লাগলেন কল্হণের 'চৌর-পঞ্চাশিকা':

'ইন্দীবরাক্ষি তব তীব্র কটাক্ষবাণপাতব্রণে
দ্বিতয়মৌষধমেব মন্যে।
একস্তবাধরসুধারসপানমন্যদুত্তুঙ্গ পীন—
কুচকুঙ্কুমপঙ্কলেপঃ—'

হে নীলপদ্মনয়না, তোমার তীব্র কটাক্ষবাণে আমার দেহে যে ক্ষতব্রণ সৃষ্টি হয়েছে তার দুটি ওষুধ আছে বলে আমি মনে করি। এক তোমার অধরের সুধারস পান, আর একটি তোমার উত্তুঙ্গ পীন-স্তনের কুঙ্কুম লেপন—

মামুদ শা চিৎকার করে উঠলেন ঃ শাবাশ !

বিকৃতচিত্ত, অপদার্থ হোসেন শা, নসরৎ শার অযোগ্য উত্তরাধিকারী মামুদ শাকে চাকার তলায় গুঁড়িয়ে দিতে অনিবার্য বেগে এগিয়ে আসতে লাগল ইতিহাসের রথ।

সে ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে হয়নি ডি-মেলোর। ঐতিহাসিকের ভাষায় "মামুদ শা নিজের সর্বনাশের জন্যে মাটিতে রোপণ করলেন ড্রাগনের দাঁত ; আর তাঁরই দেওয়া প্রত্যেকটি স্বর্ণমুদ্রা থেকে জন্ম নিল এক একটি দুর্ধর্ষ আফগান সৈনিক —যারা পরের বৎসরেই তাঁর ওপর দ্বিগুণ উৎসাহে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে।".

আর সমস্ত ইতিহাসের এই তরঙ্গ-মন্থনের পর দুটি পদ্মের মতো নতুন সূর্যের আলোয় ভেসে উঠল পর্তুগীজদের দুটি বাণিজ্য-কুঠি।

একটি চট্টগ্রামে, একটি সপ্তগ্রামে।

তেইশ

"Aguas do Gange e a terra de Bengala ;
Fertil de sorte que outra naao the iguala—"

সরস্বতীর দুধবরণ জলের ওপর মেদুর ছায়া মেলে দিয়ে পর্তুগীজ জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে তিনখানা। হাওয়ায় হাওয়ায় শব্দ করে উড়ছে ক্রশ-চিহ্নিত পতাকা—এই সপ্তগ্রামের সমস্ত মন্দির-মসজিদের চূড়ো ছাড়িয়ে যেন আকাশের মেঘের সঙ্গে গিয়ে মিলতে চাইছে। ইতিহাসের একটা অঙ্ক শেষ হয়ে এল, সূচনা হল নতুন পালার।

ঝড়ের গতিতে বয়ে গেছে সময়। নিরুদ্যম অসংযত মামুদ শা নিজের হাতেই রচনা করেছেন নিজের ভাগ্যলিপি।

—শয়তানকে পথ দেখিয়ে দিলেন সুলতান! আবার আসবে—বারে বারেই ফিরে ফিরে আসবে সে।

অ্যাফনসো ডি-মেলো ঠিকই বলেছিলেন। শের খাঁ আবার ফিরে এসেছিলেন কালবৈশাখীর বেগে। সে প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে মামুদ শা উড়ে গিয়েছিলেন কুটোর মতো—'দিল্লীশ্বরো জগদীশ্বরো বা' হুমায়ুনও তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাননি।

সে পরের কথা। কিন্তু এই দুর্যোগের দুর্লগ্নে হোসেনশাহী বংশের ওপর যখন সর্বনাশ ঘনিয়ে এল, তখন নতুন ঊষার স্বর্ণদ্বার খুলল ক্রীশ্চানদের। মহাসঙ্কটে আত্মরক্ষা করার জন্যে মামুদ শার সেদিন নুনো-ডি-কুনহার সঙ্গে চুক্তি না করে আর উপায় ছিল না। সমুদ্রের ঝড়ে ভরাডুবি হয়ে একদিন ডি-মেলো 'বেঙ্গালার' তটে এসে পৌঁছেছিলেন, সেদিন দুর্ভাগ্য ছিল তাঁর ছায়াসহচর। আর আজ অতলে ডুবে যাওয়ার আগে তাঁকেই তৃণখণ্ডের মতো আশ্রয় করেছেন মামুদ শা।

মামুদ শার নিস্তার নেই—তাঁর পরিণাম নিশ্চিত ; কিন্তু ডি-মেলো যা চেয়েছেন সবই পেয়েছেন। এতদিন পরে বাঙলা বাহু বাড়িয়ে বরণ করে নিয়েছে ক্রীশ্চান শক্তিকে। পোর্টো গ্রান্ডি আর পোর্টো পেকেনোতে কুঠি গড়বার অনুমতি মিলেছে পর্তুগীজদের।

সরস্বতীর শুভ্র জলধারার ওপর তিনখানা পর্তুগীজ জাহাজের বিশাল ছায়া। ক্রশ-চিহ্নিত পতাকা উড়ছে হাওয়ায়। কিছু দূরে নদীর ধারে গড়ে উঠেছে বিরাট বাণিজ্য-কুঠি। সেখানে খাটছে কালো কালো ক্রীতদাসের দল —তাদের পিঠে চাবুকের শুভ্র ক্ষতচিহ্ন জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। আফ্রিকার উপকূল থেকে এরা শাদা-সভ্যতার শিকার ; বন্দরের মানুষ নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে সেদিকে।

শুধুই বিস্ময়—তার বেশি আর কিছুই নয়। এমন কত আসে—কত যায়। বাঙলার ঘরে লক্ষ্মীর নিত্য কোজাগরী। বাঙালীর অন্নপূর্ণার ভান্ডার অফুরন্ত। কোনো ভিক্ষাথী এখান থেকে বিমুখ হয়ে ফেরে না। আজ এরা এসেছে—এরাও নিয়ে যাক।

সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণীর বণিকেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

—আসুক না, ভালই তো। দেব—বুঝে নেব। আমাদের কাছে সবাই সমান।

আর একজন বলে, সমান কেন হবে ? আরবী সদাগরদের চাইতে এরা অনেক ভাল। আরবরা চালাক হয়ে গেছে আজকাল—বড্ড যাচাই করে, বড় বেশী দরদাম করে। ওদের সঙ্গে ব্যবসা করে আর সুখ নেই। এরা নতুন এসেছে—এদেশের হালচাল জেনে নিতে এদের দেরি হবে।

—ঠিক কথা।—তৃতীয় জন বলে, পাটের শাড়ি দেখলে এদের ভির্মি লাগে —রেশমের সঙ্গে তার ফারাক এখনো বুঝতে পারে না। দলে দলে আসুক, যত খুশি ব্যবসা করুক, আমাদের তাতে লাভ বই ক্ষতি নেই। দেওয়া-নেওয়া ছাড়া আর কী সম্বন্ধ ওদের সঙ্গে ?

না, আর কোনো সম্বন্ধই নেই। তবু কেমন অদ্ভুত ধরন যেন লোকগুলোর। উগ্র-পিঙ্গল চোখের দৃষ্টি—শিকারী বাজের মতো তীক্ষ্ণতায় ঝকঝক করে। ভ্রূ পর্যন্ত ঢাকা টুপিতে যেন কপালের ওপর মেঘ ঘনিয়ে থাকে একরাশ। গায়ের ডোরাকাটা আঙিয়া দেখে মনে পড়ে যায় বাঘের কথা। যখন হাঁটে পায়ের তলায় মাটি কাঁপতে থাকে—ঝনঝনিয়ে বাজতে থাকে কোমরের তলোয়ার।

কোথায় একটা কী যেন আছে ওদের মধ্যে। অতিরিক্ত উগ্রতা—অতিরিক্ত লোলুপতা। মনে হয়, সব নিতে চায়—কোথাও কিছু বাকি রাখবে না। সপ্তগ্রামের বণিকেরা কী একটা বুঝতে চায়, অথচ সম্পূর্ণ করে বুঝতে পারে না এখনো।

সার-বাঁধা তিনখানা জাহাজের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলেছে রাজশেখর শেঠের বজরা। বজরার ভেতরে ক্লান্ত ঘুমে এলিয়ে আছে সুপর্ণা। চার বছর

ধরে অনেক বিনিদ্র রাত কাটাবার পরে এখন তার দু চোখ ভরে পৃথিবীর সমস্ত ঘুম নেমে এসেছে। কথা এখনো বেশি বলে না—শুধু কখনো কখনো আশ্চর্য চোখ মেলে অনেকক্ষণ ধরে শঙ্খদত্তের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সে। যেন সে-মুখে কাকে সে খুঁজছে, অথচ এখনো সম্পূর্ণ করে চিনতে পারছে না।

বজরার বাইরে রাজশেখর আর শঙ্খদত্ত দাঁড়িয়ে ছিলেন পাশাপাশি। গম্ভীর বিষণ্ণ কৌতূহলে দুজনে দেখছিলেন সমুদ্রজয়ী এই বিরাট আগন্তুকদের। একখানা জাহাজের ভেতর থেকে আট-দশটি গলায় সমবেত সঙ্গীত শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। তার ভাষা বোঝা যায় না—অর্থও না, তবু একসঙ্গেই কেমন গা-ছমছম করে উঠল দুজনের। নতুন গান—নতুন মন্ত্র—নতুন আবাহন।

রাজশেখর বললেন, ওরা তবে এল!

শঙ্খদত্ত শীর্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা ঃ হাঁ, এল।

রাজশেখর বললেন, ওরা আসবে সে আগেই জানা গিয়েছিল। এত নদী-সাগর যারা পাড়ি দিয়ে এসেছে, বাঙলা দেশের দোরগোড়া থেকেই তারা ফিরে যাবে না। নিজেদের পথ ওরা ঠিকই তৈরি করে নেবে। শুধু মাঝখান থেকে অনর্থক গুরুদেব—

বলতে বলতে হঠাৎ রাজশেখর থেমে গেলেন। গুরুদেব—গুরু সোমদেব। একটা জ্বলন্ত উল্কার মতো তিনি দিকে দিকে ছুটে চলেছেন। তাঁর শান্তি কোথাও নেই। শুধু নিজের জ্বালাতেই তিনি জ্বলে মরছেন, আর বিরাট একটা শুকনো ক্ষত-চিহ্ন রেখে গেছেন রাজশেখরের জীবনে। শুধু সুপর্ণা নয়—সেই কিশোর পর্তুগীজ ছেলেটির রক্তাক্ত ছিন্ন মুণ্ডের কথা কোনোদিনই কি ভুলতে পারবেন রাজশেখর?

গুরু সোমদেব। তাঁর কথা শঙ্খদত্তও ভাবছিল। গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে সে বাণিজ্যে গিয়েছিল, গুরুকে কথা দিয়েছিল তাঁর ব্রতে সে সাধ্যমতো সাহায্য করবে; কিন্তু কী করেছে সে? দেবদাসীর ওপর লোভের দৃষ্টি দিয়ে দারুব্রহ্মের ক্রোধে সে সব হারিয়েছে—নিঃস্ব রিক্ত অবস্থায় প্রায় পাঁচ বছর পরে ফিরে এসেছে সপ্তগ্রামে। কী বলবে সে বাপ ধনদত্তের কাছে—কেমন করে তাঁর কাছে গিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে সে?

—নৌকো কোথায় ভিড়বে?

মাঝি প্রশ্ন করছে। শঙ্খদত্ত চমকে উঠল।

—সামনে ওই বড় কদম গাছটা পার হলে যে বাঁধা ঘাট—সেখানে।

এসে পড়েছে, আর দূর নেই, আর সময় নেই। আর একটু এগিয়ে গেলেই বণিক ধনদত্তের বাড়ির উঁচু চূড়োটা চোখে পড়বে; তার পরে বাঁধানো ঘাট, সেখান থেকে পাথরে গড়া পথ ধরে দু পা হাঁটলেই বাড়ির সিংহ-দরজা; কিন্তু অত বড় সিংহ-দরজা সত্ত্বেও ঘাড়টাকে যথাসম্ভব নুইয়ে বাড়িতে পা দিতে হবে শঙ্খদত্তকে। ভাবতেই বুকের ভেতরটা শুকিয়ে আসতে লাগল।

সুপর্ণা নয়—শম্পা নয়—শঙ্খদত্তের ইচ্ছে করতে লাগল এখনি সে সর-

স্বতীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ; কিন্তু এতখানি মনের জোর কোথায় তার —কোথায় তার আত্মহত্যা করবার শক্তি ?

নিষ্ঠুর নিয়তির মতো বজরা এসে বাড়ির ঘাটে ভিড়ল।

আরো শাদা হয়েছে মাথার চুল—আরো শুভ্র হয়েছে ভ্রূজোড়া। গালে-মুখে-কপালে রেখার জটিল অরণ্য। কালো কোটরের ভেতরে প্রায় অদৃশ্য হয়ে আছে ধনদত্তের চোখ।

অন্ধকার দৃষ্টি তুলে ধনদত্ত বললেন—ও কিছু না। যিনি দিয়েছিলেন, তিনিই নিয়েছেন।

মাথা নিচু করে রইল শঙ্খদত্ত।

ধনদত্ত বললেন, তুমি এতদিন পরে এসেছ রাজশেখর, আমি বড় খুশি হয়েছি। তোমার মেয়েটিও ভারি লক্ষ্মীমতী। ও সুখী হবে।

রাজশেখর বললেন, মেয়েটির জন্যেই আরো এলাম আপনার কাছে। ওকে আমি শঙ্খের হাতেই তুলে দিতে চাই। আমার একমাত্র মেয়ে—আপনারও ওই একটিই ছেলে। যদি অনুমতি করেন—

ধনদত্ত শীর্ণ হাসি হাসলেন ঃ লক্ষ্মী নিজে এসেছেন, তাঁকে বরণ করে নেওয়াই দরকার। অনুমতির কোনো কথাই ওঠে না রাজশেখর।

শঙ্খদত্ত উঠে গেল সম্মুখ থেকে। এসে দাঁড়াল বারান্দায়। সামনে সরস্বতীর জল। নৌকোর সারি। কিছু দূরে ক্রীশ্চান জাহাজের উদ্ধত মাস্তুল। ওপারে আটটি শিবের মন্দির দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। সোনার কলস আর ত্রিশূল রোদে ঝকঝক করে জ্বলছে।

সুপর্ণা তার জীবনে আসবে। শঙ্খদত্তের খুশি হওয়া উচিত বইকি। একথাও ঠিক যে রাজশেখরের বজরায় বসে তার অপূর্ব মনে হয়েছিল সুপর্ণাকে। দুটি আশ্চর্য নিবিড় চোখ মেলে তাকিয়ে আছে—অথচ সে চোখ দিয়ে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না ; একটা গভীর সমুদ্রের অতলে তলিয়ে আছে তার মন, কিন্তু চৈতন্যের একটি ঢেউ সেখানে গিয়ে দোল দেয় না তাকে। এত কাছে সে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে, তার রুক্ষ চুল এলোমেলো হাওয়ায় শঙ্খদত্তের মুখের ওপরে এসে ছড়িয়ে পড়ছে—অথচ একটা লোহার কবাট তার মনকে আড়াল করে বসে আছে। সমস্ত স্পর্শসীমার সে বাইরে। সেদিন শঙ্খদত্তের মনে হয়েছিল এই ঘুমন্ত কন্যাকে সে জাগিয়ে তুলবে, মাটির মূর্তির মতো এই প্রতিমার মধ্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করবে সে ; পাথরের ফুলকে সে ভরে তুলবে প্রাণের গন্ধে-পরাগে।

সুপর্ণা জেগেছে—প্রাণ পেয়েছে মূর্তি ; কিন্তু এইবার ? একটা আকস্মিক প্রশ্ন জেগেছে ঃ পূজারী কি প্রতিমাকে ভালবাসতে পারে ? অথবা তা-ও নয়। যে করুণা—যে অনুকম্পার ছোঁয়া দিয়ে সুপর্ণাকে সে জাগাতে চেয়েছিল, তার পালা তো শেষ হয়ে গেছে। এর পরে আর তো কিছু নেই সুপর্ণার মধ্যে। শঙ্খদত্ত আর কোনো নতুন বিস্ময়কে খুঁজে পাবে না তার ভেতরে,

আর কোনো অসামান্যতা আকর্ষণ করবে না তাকে। সপ্তগ্রামের শ্রেষ্ঠীদের ঘরে ঘরে যে অসংখ্য সুন্দরী মেয়ে সন্ধ্যায় শঙ্খ বাজায়, লক্ষ্মীর পায়ের আলপনা আঁকে, হাসি কান্না দুঃখ বেদনা দিয়ে সংসার গড়ে—তাদের সঙ্গে কোথায় পার্থক্য সুপর্ণার? শুধু এইটুকু পাওয়ার জন্যেই এমন করে সমুদ্র-পাড়ি দিতে হয়েছিল শঙ্খদত্তকে? এ তো তার ঘরেই ছিল—এর জন্যে তো এতখানি মূল্য দেবার তার কোনো দরকার ছিল না।

আজ তার আর সুপর্ণার মধ্যে করুণা ছাড়া কোনো বন্ধনই তো সে খুঁজে পাচ্ছে না; কিন্তু এই করুণার পাথেয় নিয়েই কি চিরদিন চলবে? সাধারণ আরো দশজন বণিকের মতো তো ঘরে বসে দিন কাটাতে পারবে না শঙ্খদত্ত। একবার সমুদ্র তার সব কেড়ে নিয়েছে, তাই বলে তো সে হার মানবে না সাগরের কাছে। আবার বহর সাজাবে—আবার পাড়ি দিতে চাইবে কালফণা তোলা কালীদহ, আবার তার রক্তে রক্তে এসে দোলা দেবে দক্ষিণের ডাক। সেদিন কী হবে কে জানে! আর একবার হয়তো কোনো নতুন দেবদাসী শম্পা তাকে পথ ভোলাবে—আবার সে বাহু বাড়াবে আকাশের দিকে—কেড়ে নিতে চাইবে দেবতার নৈবেদ্য। সেই দিন?

আর—আর সুপর্ণাই কি তাকে ভালবাসতে পারবে? দু-একটা কথা আভাসে বলেছেন রাজশেখর—অস্পষ্টভাবে আরো কী যেন বলেছে সুপর্ণা। শঙ্খদত্ত কিছু একটা বুঝেছে বইকি। সুপর্ণার ঘুম ভেঙেছে, কিন্তু আজও সে সম্পূর্ণ করে জেগে ওঠেনি। তার অস্বচ্ছ মনের সামনে কী যেন—কে যেন ঘুরে বেড়ায়। সোনালী চুল, নীল তার চোখ, অপরিচিত তার ভাষা—

সে কি কখনো মুছে যাবে সুপর্ণার মন থেকে? যেমন করে শম্পাকে কোনোদিন সে ভুলতে পারবে না? সুপর্ণা চিরদিন একটি রক্তজবার স্বপ্ন দেখবে, আর শঙ্খদত্ত চোখ বুঝলেই দেখতে পাবে সুন্দর সমুদ্রে অম্লান-সুন্দর একটি শ্বেতপদ্ম ভেসে চলেছে? দুজনে পাশাপাশি বসে থাকবে—অথচ কেউ কারো সঙ্গে থাকবে না; দুজনের হাত মিলে থাকবে একসঙ্গে—অথচ এক সময়ে শিউরে উঠে দুজনেরই মনে হবে যেন অপরিচিত কাউকে স্পর্শ করে আছে তারা। সেই দিন?

শঙ্খদত্তের ভাবনায় ছেদ পড়ল।

বাইরে থেকে সংকীর্তনের সুর। খোল-করতালের আওয়াজ।

শঙ্খদত্ত উচ্চকিত হল। এখানেও কীর্তন?

বাইরে বেরিয়ে আসতেই সে চমকে উঠল।

এখানেও ভুল করেছেন গুরু সোমদেব। সব কটি স্রোতের উলটো মুখেই তিনি দাঁড়াতে চেয়েছিলেন—কিন্তু কোনোটিকেই তাঁর রুখবার ক্ষমতা ছিল না। যে বৈষ্ণবেরা তাঁর কাছে ছিল নিছক কৌতুক আর ঘৃণার উপাদান, আজ তারাই সারা দেশকে ছেয়ে ফেলেছে। মহাকালীর হাতে খড়্গ তুলে দিতে চেয়েছিলেন সোমদেব—কিন্তু বাঁশী হাতে দেখা দিয়েছেন ব্রজগোপাল। সেই চৈতন্যেরই জয় হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

তা না হলে এ কী করে সম্ভব হয় ?

তাদের বাড়ির উঠোনেই চলেছে সংকীর্তন। জরাগ্রস্ত ধনদত্ত সে কীর্তনে যোগ দিতে পারেননি—তিনি শুয়ে পড়েছেন ধুলোয়—অঝোরে ঝরছে তাঁর চোখের জল। আর কীর্তনের মাঝখানে গলায় তুলসীর মালা পরে যে মুণ্ডিতমস্তক মানুষটি ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নাচছেন—তিনি আর কেউ নন—বণিককুলের চূড়ামণি ত্রিবেণীর উদ্ধারণ দত্ত।

সুবর্ণ-বণিক উদ্ধারণ দত্ত—ঐশ্বর্যের অন্ত নেই তাঁর, ঘর তাঁর সুবর্ণের অক্ষয় ভাণ্ডার। দেশ-জোড়া তাঁর খ্যাতি। সেই উদ্ধারণ দত্ত ভাবের আবেগে নাচছেন উন্মত্ত হয়ে !

"এসো হে গৌরাঙ্গ এসো
এসো এসো শচীর দুলাল—
এসো নদীয়ার চাঁদ
এসো এসো দীন-দয়াল—"

এসেছেন বইকি নদীয়ার দুলাল। ভক্তদের ওপরে আবির্ভূত হয়েছেন তিনি। নাচতে নাচতে প্রায়ই দু-একজন মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন দশাগ্রস্ত হয়ে। শঙ্খদত্তের সেই ব্যঙ্গাত্মক সংস্কৃত শ্লোকটা মনে পড়ল : 'কীর্তনে পতনে মল্লশরীর।' কিন্তু এই মুহূর্তে—ভাবের এই বন্যার সামনে সে তো পরিহাস করবার শক্তি খুঁজে পাচ্ছে না। বরং তার নিজের বুকই ছলছলিয়ে উঠছে এখন।

দাঁড়িয়ে রইল শঙ্খদত্ত। নিথর।

ঘরে-বাইরে দু দিক থেকেই পরিবর্তনের পালা। সরস্বতীর জলে ক্রীশ্চান বণিকদের জাহাজগুলোর বিশাল গম্ভীর ছায়া। সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণীতে ভক্তের কণ্ঠে চৈতন্যদেবের বন্দনা। সোমদেব একটা অতীত ইতিহাস।

কতক্ষণ একভাবে শঙ্খদত্ত দাঁড়িয়ে ছিল জানে না। ধনদত্তের ডাকে তার ধ্যান ভাঙল।

ভাঙা কাঁপা কাঁপা গলায় ধনদত্ত ডাকলেন, শঙ্খ, এস এখানে।

এগিয়ে এল সে। তখন কীর্তন থেমে গেছে। সমাধিস্থের মতো প্রাঙ্গণে বসে আছেন উদ্ধারণ দত্ত। দু চোখ দিয়ে প্রেমবিন্দু গড়িয়ে পড়ছে তাঁর। পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে সপ্তগ্রামের বণিকের দল—এতদিন যাদের কেউ কেউ একশো ছাগ-মেষ-মহিষ বলিদান দিয়ে শক্তিপুজো করত, বলির রক্তের মধ্যে যারা মাতামাতি করত অমানুষিক উল্লাসে।

তেমনি কাঁপা কাঁপা ভিজে গলায় ধনদত্ত বললেন, আমাদের পরম সৌভাগ্য যে ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধারণ দত্ত আজ আমার এখানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন। নিতাইয়ের তিনি দাস—তিনি গৌরাঙ্গের পদাশ্রিত। নীলাচলে মহাপ্রভুর সেবা করে তিনি ধন্য হয়েছেন। শঙ্খ, প্রণাম কর—

একবার সোমদেবের মুখ মনে পড়ল, মনে পড়ল তাঁর রক্ত-রাঙানো দুটো জ্বলন্ত চোখ, মনে পড়ল তাঁর মাথায় ফণা-তোলে কেউটের মতো পিঙ্গল জটার

রাশি—বাঘের গর্জনের মতো তাঁর উগ্র কণ্ঠস্বর ; কিন্তু কোথায় এখন সোমদেব —কত দূরে ! কী পরিণাম তাঁর হয়েছে কে জানে ! মহাকালী আর জাগবেন না—তাঁর হাতের খড়্গ আজ ব্রজগোপালের বাঁশীতে পরিণত হয়ে গেছে। এখন শুধু অসহ্য অন্তর্জ্বালায় জ্বলে মরতে হবে তাঁকে—যেমন করে কক্ষচ্যুত একটা উল্কা জ্বলে যায়।

সব অন্যরকম হয়ে গেছে। সোমদেব যা চেয়েছিলেন—তার একটিও তিনি পেলেন না। কী পেল শঙ্খদত্ত ?

ধনদত্ত আবার বললেন, শঙ্খ, কী দেখছ দাঁড়িয়ে ? তোমার সামনে মহাপুরুষ। রাজার মতো ঐশ্বর্য ছেড়ে দিয়ে যিনি মাধুকরী বেছে নিয়েছেন, গৌর-নিতাইয়ের আশীর্বাদ যাঁর মাথায়, নিত্যানন্দ যাঁর প্রভু, সেই বণিককুল-গৌরব উদ্ধারণ দত্ত বসে আছেন তোমার সামনে। প্রণাম কর, প্রণাম কর তাঁকে—

অন্তঃপুরে মেয়েদের কান্নার স্বর শোনা যাচ্ছে—হয়তো সুপর্ণাও আছে ওদের মধ্যে। রাজশেখর ভেসে গেছেন এই ভাবের বন্যায়, মাথা খুঁড়ছেন উদ্ধারণের পায়ের সামনে। মোহগ্রস্তের মতো শঙ্খদত্তও এগিয়ে গেল, তার-পর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল সেই নিশ্চল ধ্যানস্থ মূর্তিকে।

কে একজন আকুল হয়ে গেয়ে উঠল ঃ

"যাবৎ জনম হাম তুয়া পদ না সেবলুঁ,
কুসঙ্গে রহিলুঁ সদা মেলি,
অমৃত ত্যেজি কিয়ে হলাহল পিয়লুঁ,
সম্পদে বিপদহি ভেলি—"

নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রইল শঙ্খদত্ত—মাটিতেই। ভক্তি নয়—আবেগ নয়—বহুদিন, বহু বৎসরের সঞ্চিত অবসাদ এসে যেন তাকে ঘিরে ধরেছে—মাটি থেকে মাথা তুলে বসবার মতো শক্তিও যেন সে খুঁজে পাচ্ছে না আর। এইখানে—এই মাটিতেই একটা গভীর নিশ্ছিদ্র ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে তার।

চৈতন্যেরই জয় হল শেষ পর্যন্ত। মুছে গেলেন সোমদেব।

আরো ছ'মাস কেটে কেছে তার পর।

ইতিহাসের ঢেউ উঠেছে, ইতিহাসের ঢেউ ভেঙেছে। চট্টগ্রাম—গৌড়। হুমায়ুন, শের শা, মামুদ শা, সাম্পায়ো। শক্তি আর কূটতার পাশা খেলা। দিল্লীর মসনদের ওপর ঝুঁকে পড়েছে বিহারের বাঘের উদ্যত থাবা। প্রাণভয়ে প্রহর গণছেন হুমায়ুন। চূড়ান্ত লজ্জায় আর অপমানে নিজের প্রাণ দিয়ে ফিরোজ শার রক্তের ঋণ শোধ করেছেন অভিশপ্ত আবদুল বদর।

আর তার মধ্যে একটু একটু করে ভিত পাকা হয়েছে পশ্চিমের বাণিজ্য-বাহিনীর। মালদ্বীপ থেকে সিংহল, সিংহল থেকে কালিকট গোয়া, তারপরে বঙ্গোপসাগর। 'বেঙ্গালা'। ভারতের স্বর্গ। পোর্টো পেকেনো।

ভাস্কো-ডা-গামার স্বপ্ন মিথ্যে হয়নি। আলবুকার্কের আশা মেলে দিয়েছে দুটি নবাঙ্কুরের পল্লব। সার্থক হয়েছে নুনো-ডি-কুনহা আর অ্যাফনসো ডি-মেলোর সাধনা। পর্তুগীজ নাবিকেরা মুগ্ধ চোখ মেলে তাকায় 'বেঙ্গালার' সোনা-ঝরানো আকাশের দিকে, তার শ্যাম-শস্যের বিস্তারের দিকে, তার মসলিন, তার সোনা-রুপো, তার মশলার দিকে। তারা জানে, এই সোনার দেশ এবারে ধন্য হবে মা মেরীর পুণ্যনামে—জেন্টুরদের মন্দির ছাড়িয়ে আকাশে উঠবে ইগ্রেঝার চুড়ো—ক্রীশ্চান ধর্মের আশ্রয়ে এসে তারা লাভ করবে মুক্তির পরমার্থ। খ্রীষ্টের করুণায় অভিষিক্ত হয়ে যাবে পৌত্তলিকতার দাবদাহ।

মুগ্ধ চিত্তে এক-আধজন আবৃত্তি করে সৈনিক কবির 'লুসিয়াদাসের' পংক্তি :

"Aguas do Gange e a terra de Bengala ;
Fertil de sorte que outra naao the iguala"—

'পবিত্র গঙ্গায় মোহানার মুখে এই তো বাঙলা দেশ ; যেন স্বর্গের উদ্যান বিস্তীর্ণ হয়ে আছে দিকে দিকে।'

—মাতা মেরীর জয় হোক—

—লিসবোয়ার জয় হোক—

শুধু একটুখানি বিস্ময় অবশিষ্ট ছিল শঙ্খদত্তের জন্য।

সুপর্ণার সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে। জীবনের সঙ্গে রফা করে নিয়েছে শঙ্খদত্ত। সুপর্ণা তার নিঃসঙ্গ মুহূর্তে এখনো সেই সোনালি চুল আর নীল চোখের কথা ভাবে কিনা কে জানে ; কিন্তু শঙ্খদত্ত আর ভাবতে চায় না। যতদিন রক্তে রক্তে আবার দক্ষিণ-সমুদ্রের ডাক না আসে—যতদিন সেই দুঃসাহসিক আহ্বান আবার তাকে বিভ্রান্ত না করে—ততদিন এমনিই চলতে থাকুক। ততদিন সরস্বতীর শান্ত স্রোতের মতো বয়ে চলুক জীবন, তার তীরে তীরে ছায়া বিছিয়ে দিক আম-জাম-জামরুলের বন, ততদিন ঘরের কোণে সন্ধ্যা-প্রদীপ জেলে দিক সুপর্ণা।

তবু সব সময় উদাসীন হয়ে থাকতে পারে না। একটা মৃদু বেদনা তার মনকে দহন করে। প্রতিদিনের অভ্যাসের ফলে নিজের কাছে এখন অনেকখানি সে মেনে নিয়েছে সুপর্ণাকে। শম্পাকে নিয়ে ছায়া-ধরাধরি খেলায় এখন সে ক্লান্ত ; আজ তার কি সুপর্ণাকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে ?

কিন্তু কাকে ভালবাসবে ? কে সাড়া দেবে তার ডাকে ?

—সুপর্ণা, কথা বল।

সুপর্ণা অন্যমনস্কের মতো তাকিয়ে থাকে শঙ্খের দিকে। বুঝি অজানা ভাষায় অচেনা কেউ কথা কইছে তার সঙ্গে।

—আমার দিকে ভাল করে চাও সুপর্ণা—কথা বল।

হয়তো আবার প্রার্থনা করে শঙ্খ। আস্তে আস্তে নড়ে ওঠে সুপর্ণার ঠোঁট। একটা ক্ষীণ নিঃশ্বাসের মতো আওয়াজ আসে : কী বলব ?

—যা খুশি। বল, আজকের রাত তোমার ভাল লাগছে। বল, আমাকে তোমার ভাল লাগে।

—তাই বললেই তুমি খুশি হবে ?—আবার যেন ক্ষীণ নিঃশ্বাসের সেই শব্দটা ভেসে আসে ; কিন্তু এবার আর জবাব দিতে পারে না শঙ্খ। হঠাৎ শিথিল হয়ে আসে স্নায়ুগুলো—রক্তের মধ্যে যে আগুনের ফুলকিগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছিল, কে যেন একটা প্রকাণ্ড ফু দিয়ে নিবিয়ে দেয় তাদের। যে সুপর্ণার দেহ এতক্ষণ তার শরীরে জড়িয়ে ছিল, সেটাকে মনে হয় শীতল পাথরের মতো। সুপর্ণার একখানা বাহু হয়তো তার গলার ওপরে এলিয়ে ছিল, শঙ্খদত্তের যেন মনে হয়—সেটা গুরুভারে পরিণত হয়েছে—শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার।

সরিয়ে দেয় হাতখানা। হয়তো বা হাতের কঙ্কণে একটুখানি আঁচড় লাগে, অনেকক্ষণ ধরে অকারণে জ্বালা করতে থাকে জায়গাটায়। শরীরটাকে যথাসাধ্য কুঁকড়ে নেয় শঙ্খ—সরে আসে সুপর্ণার স্পর্শ থেকে, তারপর হয়তো নেমে পড়ে খাট থেকে। চলে আসে বারান্দায়। সুপর্ণার মুখে দ্বাদশীর জ্যোৎস্না পড়ে—রাত্রির হাওয়ায় দোলন-চাঁপার গন্ধ আসে, তবু সুপর্ণা ফিরে ডাকে না শঙ্খকে। ঘুমিয়ে পড়ে ? হয়তো। হয়তো জেগে থাকে—ভাবে কার সোনালী চুল একদিন তার বুকের মধ্যে সোনার রঙ ধরিয়েছিল। আর হয়তো কিছুই ভাবে না। আজো হয়তো চেতনার ভেতরে তার খানিকটা জমাট কুয়াশা ; সেই কুয়াশায় তার মন নির্জীব হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে—কিছুই ভাবতে পারে না। ভাবতেও হয়তো ভুলে গেছে।

কিন্তু কী শান্ত-শীতল একটা পাথরের বোঝা বয়ে চলতে হচ্ছে শঙ্খদত্তকে। বারান্দায় এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সে। দূরে সরস্বতীর জলে দ্বাদশীর চাঁদ জ্বলে। লক্ষ-কোটি কাচমণি দুলতে থাকে অলৌকিক মায়ার মতো। আবার ফিরে আসে শম্পা। জলের ওপর জ্যোৎস্নার মণি-মাণিক্যের মতোই সে ঝলমল করতে থাকে—হাত বাড়িয়ে ধরা যায় না।

কতদিন চলবে এইভাবে ? কত দিন ?

সুপর্ণার মনে যদি স্পষ্ট একটা আবেগ থাকত, যদি সেই সোনালী চুলের কিশোরটিকে সত্যিই সে ভালবাসত, তাহলে তার একটা অর্থ বুঝতে পারত শঙ্খ। সুপর্ণার সঙ্গে তার মন কখনো মিলবে না, এইটে স্পষ্ট করে জেনে আর কিছু ভাববার থাকত না তার। নিজের সীমাটা জেনে নিয়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকত সে। দাবি করত না—আশা রাখত না ; কিন্তু সুপর্ণার মনের এই স্বপ্ন-জাগর অবস্থা অসহ্য। একটা চোখ সে মেলে রেখেছে, আর একটা গভীর ঘুমে জড়ানো। শঙ্খকে মেনে নিয়েছে কিন্তু চিনে নেয়নি। তার মুখের দিকে তাকায়, কিন্তু সম্পূর্ণ করে তাকে কোনোদিন দেখতে পায় না।

প্রেম। ঘৃণা। একটা না হোক—আর একটা। যে-কোনো একটাকে নিয়েই বাঁচা চলে। একটা আবিষ্ট করে রাখে, আর একটা জ্বালিয়ে রাখে ; কিন্তু মাঝখানে ? না মাটি—না আকাশ। খানিক দুঃসহ শূন্যময়তা।

সরস্বতীর জলের দিকে তাকিয়ে শঙ্খ শম্পাকে ভাবতে চেষ্টা করে। কিন্তু আশ্চর্য—শম্পাও তো মনকে জুড়ে বসে না! জ্যোৎস্নার ঝলক-লাগা ঢেউয়ের মতো তার স্মৃতি ভেঙে ভেঙে সরে যায়—কোথাও তো নির্ভর করতে পারে না শঙ্খ!

এই চলবে? এই ভাবেই চলবে?

প্রহরের পর প্রহর কাটে। দোলন-চাঁপার গন্ধ নিবিড়তর হয়। দ্বাদশীর চাঁদ যখন জানালা থেকে বিদায় নেয়, সুপর্ণা তখনো শঙ্খকে ফিরে ডাকে না। শুধু কখন হাওয়া শীতল হয়ে আসে—আকাশ বিবর্ণ হতে থাকে, তারপর ভোরের সম্ভাষণ জানিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ধনদত্তের কাঁপা-কাঁপা গলায় চৈতন্যের বন্দনা।

শঙ্খদত্ত ধীরে ধীরে নেমে আসে। পা বাড়ায় নদীর দিকে। প্রথম সূর্যের আলোয় ক্রীশ্চানদের কুঠী-বাড়ি যখন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—তখন, কেন কে জানে—সে দৃশ্যটা দেখতে তার ভাল লাগে। যেন অবাঞ্ছিত একটা নেশার মতো। জ্বলতে থাকে, কিন্তু জ্বালার লোভটা সামলানো যায় না।

এমনি করে দিন চলে। রাত্রি চলে। সময় চলে।

কিছুক্ষণের জন্যে মাদকতা নামে এক-এক রাত্রে। শম্পা-সুপর্ণা এক হয়ে যায় তার কাছে। তারপর সেই মোহের প্রহরগুলো কেটে গেলে নিজের কাছে যেন আরো সংকীর্ণ হয়ে যায় শঙ্খ। তাকিয়ে দেখে—শম্পা নয়—সুপর্ণা নয়—কেউ নয়। সে নিজে ছাড়া এই মত্ততার কোনো সঙ্গী ছিল না কোথাও।

না—এ আর চলে না। আবার বেরিয়ে পড়বে সমুদ্রে। আবার অজানা দেশ—আবার দক্ষিণের পত্তন; কিন্তু আর ভুল করবে না। বণিকের ছেলে সে—বাণিজ্য ছাড়া আর কোনো লক্ষ্যই থাকবে না তার। এবার যদি তীর্থ-দর্শনে যায়—দেবতাকে সে পুজো দিয়ে আসবে—। কোনো দেববধূ আর তাকে ভোলাতে পারবে না, জাগাতে পারবে না আত্মনাশের উন্মত্ততা।

ধনদত্ত যদি যেতে না দেন? যদি রাজী না হন?

তা হলে নিজেই চলে যাবে। উঠে পড়বে কারো বহরে। হিন্দু না হোক—মুসলমানের জাহাজেই গিয়ে উঠবে। এমন কি ক্রীশ্চানদের সঙ্গে যেতেও তার বাধা নেই। শম্পাকে ওরা কেড়ে নিয়েছে? কিন্তু সেজন্যে অভিযোগ নেই শঙ্খের। ওরা কেউ নয়। দেবতার রুদ্র ক্রোধ ওদের নিমিত্তমাত্র করে পাঠিয়েছিল।

আর একবার যেতে হবে সোমদেবের কাছে; কিন্তু কোথায় তিনি? তাঁর কোনো খবর বহুদিন সে পায়নি। এক অবাস্তব স্বপ্নে প্রলুব্ধ হয়ে ভূতগ্রস্তের মতো নাকি দেশভ্রমণে বেরিয়েছিলেন তিনি, অন্তত রাজশেখরের কাছ থেকে সেই রকমই সংবাদ পাওয়া গেছে। কী হয়েছে তাঁর? চারদিক থেকে ব্যর্থতার লজ্জা কুড়িয়ে নিয়ে তিনি কি ফিরে গেছেন চট্টগ্রামে? আবার ফুলে-বিল্বপত্রে পুজো দিচ্ছেন চন্দ্রনাথকে? নাকি শাল-অর্জুন-নাগেশ্বর বনের

ঘন ছায়ায়, তাঁর সেই গুহার ভেতরে ক্ষোভে দুঃখে মুখ লুকিয়ে দিন কাটিয়ে চলেছেন এখন ?

গিয়ে দাঁড়াবে তাঁর কাছে ? বলবে, গুরুদেব, গুরুদেব, এখনো আশা আছে ? আসুন—আবার শুরু করা যাক গোড়া থেকে ?

কিন্তু সে জোর তার নেই। সব কাজ যে সকলের জন্যে নয়—সে-কথা এর মধ্যেই প্রমাণ হয়ে গেছে।

কী করবে শঙ্খদত্ত ?

আশ্চর্যভাবে তার ইঙ্গিত এল।

সেদিনও ভোরের প্রথম আভাসে শঙ্খ তার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে ছিল। সরস্বতীর ওপারটা ফিকে হয়ে আসছে—রাত্রির তমসা-গাহনের পর একটু একটু করে মাথা তুলছে শিবমন্দিরের চূড়ো। বহু দূর থেকে ভোরাই-আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা বাতাসে একটা করুণ শান্তিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

ভাবনাহীন ভাবনার মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছিল শঙ্খদত্ত। কে যেন লঘুভাবে তাকে স্পর্শ করল।

মুখ ফিরিয়ে দেখল—সুপর্ণা।

অভ্যস্ত স্নেহভরে শঙ্খ বললে, কিছু বলবে ?

সুপর্ণা চুপ করে রইল। উত্তর দিল না।

—কী হয়েছে সুপর্ণা ? মন-খারাপ হয়েছে বাবার জন্যে ? কিছু ভেব না—আসছে মাসেই তোমাকে নিতে আসবে চাকারিয়া থেকে।

—না, সে কথা নয়।—ফিস্‌ ফিস্‌ করে সুপর্ণা জবাব দিলে।

—তা হলে ?

আবার চুপ করে রইল সুপর্ণা। ভোরের আলোয় শঙ্খ যেন স্পষ্ট দেখতে পেল, তার ঠোঁট দুটো অল্প অল্প কাঁপছে—কপালে গুঁড়ো কাচের মতো ঘামের বিন্দু চিকচিক করছে—লজ্জায় রাঙা হয়ে গেছে মুখ।

—কী হল সুপর্ণা ? কী তুমি বলতে চাও ?

—জান, কী হয়েছে ?—আবার কিছুক্ষণ যেন নিজের ভেতর খানিক তোলাপাড়া করে নিয়ে সুপর্ণা বললে, পিসিমা বলছিলেন—

—কী বলছিলেন ?

এবার অনেক কষ্টে বাঁধ ভেঙে কথাটা ছেড়ে দিল সুপর্ণা : আমাদের খোকা আসবে।

শোনবামাত্র সমস্ত মেরুদণ্ডটা শির্‌ শির্‌ করে উঠল শঙ্খের—মাথার ভেতরে সরস্বতীর ঢেউ ছলছলিয়ে উঠল।

—খোকা আসছে—সে জন্যে নয়। আমাদের খোকা আসবে।

—কী—কী বললে ?—শঙ্খদত্ত প্রায় রুদ্ধ গলায় বললে, কাদের খোকা আসবে ?

বুঝতে পারছ না ?—সুপর্ণার গলা শোনা গেল কি না : আমাদের। তোমার আর আমার।

তোমার আর আমার। শঙ্খ দুটো জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি ফেলল সুপর্ণার মুখে; কিন্তু লজ্জায় লাল সে মুখ আর দেখা গেল না। আঁচলে সে-মুখ ঢেকে ফেলেছে সুপর্ণা।

তোমার আর আমার! মাঝখানে আর কেউ নেই—কারো অস্তিত্ব নেই কোনোখানে। যে ছিল, সে ছায়া হয়ে মিলিয়ে গেছে এখন। পথ খুঁজে না পেয়ে দু-দিকে চলেছিল দুটি স্রোত; এইবার একসঙ্গে মিলে একটি প্রাণস্রোতের দিকেই এগিয়ে চলেছে!

সুপর্ণা পালিয়ে যাচ্ছিল, দু হাত বাড়িয়ে শঙ্খ টেনে নিল তাকে। পাথরের মূর্তি আর নয়। সুপর্ণার বুকের ওঠা-পড়ার মধ্যে শঙ্খদত্ত তার রক্তস্পন্দন যেন অনুভব করল আজ। তার অন্ধকার চুলের বিশৃঙ্খল রাশির দিকে তাকিয়ে সে ভাবতে লাগল: এইবারে শম্পাকেও সে ভুলতে পারবে তো?

তখন ধনদত্তের কাঁপা কাঁপা গলায় গোপাল-বন্দনা ছড়িয়ে পড়ছে:

"ওঁ নবীন নীরদশ্যামং নীলেন্দীবরলোচনম্—
বল্লবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণ গোপালরূপিণম্—"

বিকেলের রক্তিম আলোয় সরস্বতীর ওপর দিয়ে ডিঙি ভাসিয়ে চলেছিল শঙ্খদত্ত। একটা নিশ্চেষ্ট অবসাদে হাল ধরে বসে ছিল সে—ডিঙি আপনি এগিয়ে চলেছিল স্রোতের টানে।

নদীর ধারে ক্রীশ্চানদের বিরাট কুঠি গড়ে উঠেছে। তার সামনেই গীর্জা। ব্যবসা আর ধর্মপ্রচার। একসঙ্গে দুটি উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছে ওরা। **Christaos e speciarias**!

কুঠীর ঘাটে একখানা জাহাজ নোঙর করে আছে। আর সেই জাহাজ থেকে নামছে একদল ক্রীশ্চান সন্ন্যাসী আর সন্ন্যাসিনী।

শঙ্খদত্ত পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ যেন বুকের ভেতর একটা ঝড়ের ঘা লাগল এসে। হাত থেকে খসে পড়ল দাঁড়।

নিকষ কালো নিগ্রো আর দক্ষিণী শ্যামা-সন্ন্যাসিনীদের মধ্যে একজনের রঙে চাঁপার বর্ণ মেশানো; সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে একবার সে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। তার শান্ত মুখের ওপর জ্বলে উঠল বিকেলের আলো।

মাত্র মুহূর্তের জন্যেই তার মুখ দেখতে পেল শঙ্খদত্ত। তারপরই তা হারিয়ে গেল কালো অবগুণ্ঠনের আড়ালে।

কিন্তু শঙ্খদত্ত চিনেছে তাকে। সে শম্পা!

এবার আর সে দাঁড় বাইবারও চেষ্টা করল না। স্রোতের টানে নৌকা ভেসে চলল এলোমেলো ভাবে। দেবদাসী দেবতার বধূ। চিরকালই সে মানুষের স্পর্শ-সীমার বাইরে। তাই দেবতাই তাকে ফিরিয়ে নিয়েছেন; নতুন রূপে—নতুন বেশে সেই দেবতার সঙ্গেই পুনর্মিলন হয়েছে তার।

জেণ্টুর মন্দিরের 'বাল্‌হিডেরাস' (দেবদাসী) সে নয়—সে সন্ন্যাসিনী। আজ সে খ্রীষ্টের সেবিকা, নতুন বিগ্রহের সে দেবদাসী। এক দেবতা তাকে হরণ করে গ্রহণ করেছিলেন, এবারেও সে হৃতা। আশ্চর্য যোগাযোগ!

শম্পাকে আর দেখা যাচ্ছে না—সন্ন্যাসিনীদের মধ্যে তাকে আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না আর। শঙ্খদত্ত একবার তাকাল আকাশের দিকে। কত দূরে আকাশ! তার মেঘ, তার নক্ষত্র, তার ইন্দ্রধনু! সে আকাশকে নিয়ে স্বপ্ন গড়া যায়, কিন্তু তাকে স্পর্শও করা যায় না।

সেই মুহূর্তে মেঘের ডাকের মতো গুরু গুরু ধ্বনিতে কেঁপে উঠল চারদিক।

একবার—দুবার—তিনবার! পর্তুগীজদের কুঠি থেকে কামানের শব্দ।

আর বহুকাল আগে কালিকট বন্দরে ডা-গামার অট্টহাসির মতো সেই কামানের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল পূর্ব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে। বাঙলার পথ-মাঠ-পাহাড়-নদী-বন-বনান্তর পার হয়ে সেই শব্দ ভেসে চলল ইতিহাসের দিগন্তে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়াবহ জাগ্রত স্বপ্নে বুঝি চমকে উঠল বাঙলা দেশের তাঁতীরা! একটা অস্পষ্ট অস্ফুট যন্ত্রণার মতো বুঝি তাদের মনে হল—কারা যেন তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দিয়ে নিষ্ঠুর হিংসায় এক-একটি করে তাদের হাতের আঙুলগুলো কেটে চলেছে।

অসিধারা

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রথম অধ্যায়

এক

ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছবিখানার দিকে অন্যমনস্ক ভাবে তাকিয়ে ছিলেন দুর্গাশঙ্কর। গান্ধার-রীতিতে আঁকা সরস্বতীর মূর্তি। বাক্‌শ্রী ইরা বসে আছেন সন্ন্যাসিনীর পদ্মাসনে—এক হাতে উদ্যত বরাভয়। ঘরের হালকা নীলিম আলোতে দুটি আয়ত চোখ প্রসন্ন করুণায় টলমল করছে।

সামনে ফরাসে বসে একটি মেয়ে মুদিত চোখে বেহাগের বিস্তার করে চলেছিল। অস্পষ্ট নীলচে আলোয়, চন্দনধূপের মৃদু কুয়াশায়, তানপুরার উপরে রাখা আঙুলের শিথিল সঞ্চালনে আর পরনের ফিকে গোলাপী শাড়িতে তাকেও ওই সরস্বতীর মূর্তির মতোই মনে হচ্ছিল। দুর্গাশঙ্কর তার দিকে একবার তাকালেন, পরক্ষণেই চোখ আবার ছবিটির উপরে গিয়ে পড়ল।

"শ্যাম-অভিসারে চলে বিনোদিনী রাধা—
সুনীল বসনে তনু ঢাকিয়াছে আধা—"

বেহাগের সুরবিকীর্ণ এক স্বপ্নের পথ বেয়ে শ্রীমতী চলেছেন অভিসারে। রাত্রির কালিন্দী নিকষ কালো, তমালবন তিমিরস্তব্ধ। কষ্টিপাথরে সোনার রেখার মতো পায়ের নূপুরের দীপ্তি। কঙ্কণের ভীরু গুঞ্জন। মহাজন-পদাবলীর তালে তালে রাধার বুকের স্পন্দন।

এই ঘর এখন দূরের বৃন্দাবন। কান পেতে থাকলে শোনা যায় যমুনার কলধ্বনি, তমাল-বীথির নিশীথ-মর্মর। সব কিছু এখন স্বপ্নবিলীন। কিন্তু কতক্ষণ? সুর থেমে যাবে। তারপর জীবন।

সেই জীবন মনে পড়িয়ে দেবে, কত সহজে সুর কেটে যায়। যখন কাটে, আর জোড়া লাগে না।

"শ্যাম-অভিসারে চলে বিনোদিনী রাধা—"

চন্দন-ধূপের গন্ধ মিলিয়ে যাবে, ওই নীল আলোটাও এক সময়ে একটা ফুলের মতো ভেসে চলে যাবে অন্ধকারের স্রোত বেয়ে। তানপুরাটা পড়ে থাকবে ফরাসের এক কোণায়। যে মেয়েটি গান গেয়ে চলেছে, সে উঠে যাবে অনেকক্ষণ আগেই। তখন মনে পড়বে। মনে পড়বে তাকেই—গান্ধার আর্টে সরস্বতীর মূর্তিখানা এঁকে যে তাঁকে উপহার দিয়েছিল।

দুর্গাশঙ্কর নড়ে-চড়ে বসলেন। আজ চল্লিশ বছর পরে সব কেমন এলো-মেলো লাগে। ছেলেবেলার একটা দিন—সোনালী রোদ-ঝলকানো একটি দুপুর। বয়েস তখন বারো থেকে তেরো। যখন ওই রোদ এসে রক্তে মিশে যায়, যখন বুকের ভিতর শিরীষের পাতা কাঁপে, যখন অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা যায় একটু দূরে আতা গাছে চুপ করে বসে থাকা পাখিটার গলার রঙ। সেই বয়েসে, সেই দুপুরে, সেই রোদ আর ছায়া-কাঁপা মন নিয়ে, সেই পাখির রং-দেখা চোখ নিয়ে একটা সবুজ পাতার উপরে খানিকটা দুধবরণ

ভেরেণ্ডার আঠা কুড়িয়ে নেওয়া ; তারপর চোর-কাঁটার একটা ডাঁটা, আর তারও পরে কয়েকটা ছোট বুদ্বুদ। তাতে নিজের মুখের ছায়া, সূর্যের সাতটা রং, ভবিষ্যৎ।

রঙিন বুদ্বুদ। সূর্যের সাতটা রং, নিজের মুখের একটুখানি ছায়া। হাওয়ায় উড়তে উড়তে কোথায় মিলিয়ে যায়। চল্লিশ বছর তো পার হয়ে গেল সেই দিনগুলোর পরে। এখনও খুঁজছেন দুর্গাশঙ্কর। কোথায় মিলিয়ে যায় তারা? একটিকেও তো আজ পর্যন্ত খুঁজে পেলেন না। ওই গান্ধার-রীতিতে ছবিটি যে এঁকেছিল, তাকেও না।

"ওস্তাদজী!"

চোখদুটো বুজে এসেছিল—ঘুমিয়ে পড়ছিলেন নাকি? দুর্গাশঙ্কর তাকালেন।

"আমি উঠি আজ।"

সেই মেয়েটি। সুপ্রিয়া। বেহাগের সুর থেমে গেছে। তানপুরা নামিয়ে রেখেছে পাশে। বৃন্দাবন, শাল-তমাল, কালিন্দী, শ্রীমতীর অভিসার। আর একটা বুদ্বুদ মিলিয়ে গেছে হাওয়ায়।

"এসো।"

একবার বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, "আজ থাকো তুমি এখানে। সারারাত গান শোনাও আমাকে।" কিন্তু কিছুতেই সে-কথা বলা চলে না। মেয়েটির দু চোখে আশ্চর্য সরলতা, গভীর বিশ্বাসের শ্যামল ছায়া। যেখানে বিশ্বাস বেশি, সেখানে অবিশ্বাস আসে আরো সহজে। শ্রদ্ধাটা রঙিন কাঁচের পুতুল, চকমক ঝকঝক করে, যখন ভাঙে তখন একেবারেই ভাঙে। শুধু কতগুলো ধারালো খণ্ডাংশ ছড়িয়ে থাকে রক্তাক্ত করবার জন্যে।

দুর্গাশঙ্কর আবার বললেন, "এসো।"

পাশ থেকে শ্রীনিকেতনের কাজ-করা ব্যাগটা কুড়িয়ে নিলে সুপ্রিয়া। কোথায় যেন একটা অর্থহীন খোঁচা লাগল দুর্গাশঙ্করের। ব্যাগটার ভিতরে হয়তো কিছু পয়সা, একটুকরো ছোট রুমাল, একটা চাবির রিং, হয়তো দু-একটা চিঠিপত্র। জীবন। ট্রামগাড়ি। কলকাতা। কোথাও একটা লীলাকমল ছিল কোনোদিন। এখনই তার ছেঁড়া পাপড়িগুলি হাওয়ায় উড়ে গেল—উড়ে গেল বেহাগের শেষ মূর্ছনার সঙ্গে সঙ্গে।

সুপ্রিয়া বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তারপর সিঁড়িতে। সিঁড়ির কার্পেটে ওর চটির শব্দ শোনা গেল না। শুধু শাড়ির একটু খসখস আর কয়েকটা চুড়ির গুঞ্জন। তারও পরে কাঁকরের উপর কয়েকটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ—গেট খোলবার একটা আর্তনাদ—

আর শুনতে পেল না দুর্গাশঙ্কর। মাথার উপর দিয়ে একখানা এরোপ্লেন গেল।

পথে পা দিয়ে একবার থেমে দাঁড়াল সুপ্রিয়া। মাথার উপর দিয়ে একখানা

এরোপ্লেন যাচ্ছে। কয়েকটা লাল-নীল আলো। জোনাকির মতো জ্বলছে নিভছে।

সুপ্রিয়া কখনো প্লেনে চাপেনি। ভারী কৌতূহল হয় মধ্যে মধ্যে। শুধু ভয় হয় ক্র্যাশকে। তা-ও কোনো রোম্যাণ্টিক ঘুমন্ত মৃতদেহ নয়। আগুনে পোড়া কদাকার পিণ্ড একটা। উঃ—ভাবাই যায় না!

উত্তর-পূবের আকাশ বেয়ে মিলিয়ে গেল প্লেনটা। দমদম এয়ারপোর্ট বোধ হয় ওদিকেই। সুপ্রিয়া চোখ নামিয়ে সামনের দিকে তাকাল। সাদা শার্টের কলার তুলে দিয়ে কে যেন এগিয়ে আসছে রাস্তা পেরিয়ে।

আর কে? নিঃসন্দেহে অতীশ।

মনের খুশিটাকে একটুখানি ভ্রূকুটিতে বদলে নিলে সুপ্রিয়া। একটা মোটর এসে পড়লে রাস্তার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে গেল অতীশ, তারপর গাড়িটা বেরিয়ে যেতে ছুঁড়ে দিলে হাতের সিগারেটটা। গাড়ির হাওয়ায় ফুলকি ছড়াতে ছড়াতে সিগারেটটা এগিয়ে গেল অনেকখানি।

অতীশ সামনে এসে দাঁড়াল। রাস্তার আলোটা ঝিকমিক করতে লাগল চশমার রোল্‌ড গোল্‌ডের ফ্রেমের উপর। বিনা ভূমিকাতেই অতীশ বললে, "চলো—এগিয়ে দিই।"

"এই জন্যেই দাঁড়িয়ে ছিলে?" ভ্রূতে শাসনের রেখা ফুটল সুপ্রিয়ার।

"কখনো না।"

"নিশ্চয়। আমার জন্যে আধ ঘণ্টা ধরে তুমি দাঁড়িয়ে আছ। এই বকুল গাছটার তলাতে।"

দুজনে চলতে শুরু করেছে ট্রাম-লাইনের দিকে। হাওয়ায় হেমন্তের শিশিরের গন্ধ। কোথা থেকে নব-জাতকের কান্না। রাত এখন নটার কাছাকাছি।

অতীশ বললে, "আমি কারো জন্যে বকুল-গাছতলায় দাঁড়াইনি। টিউশন সেরে ফিরছিলাম। দেখা হওয়াটা অ্যাক্‌সিডেণ্ট।"

"আশ্চর্য অ্যাক্‌সিডেণ্ট বাস্তবিক।" সুপ্রিয়া হেসে উঠল, "সপ্তাহে তিনদিন।"

"তিনদিনই টিউশন থাকতে পারে।"

"আমি কোনোদিন আটটায় বেরুই, কখনো সাড়ে আটটায়, কখনো নটায়। তোমার পড়ানোরও কি কোনো নিয়ম নেই?"

"অনিয়ম জিনিসটা তোমারই একচেটে নয় সুপ্রিয়া।"

চলতে চলতে সুপ্রিয়া একবার তাকিয়ে দেখল অতীশের দিকে। চশমার ফ্রেম, কাচ আর পথের আলো অপরূপ জ্যোতির্ময় করে তুলেছে অতীশের চোখ।

"বরাবর শুনে আসছি অতীশ আমাদের মুখচোরা ভালো ছেলে—পড়ার বই ছাড়া আর কিছুই জানে না। এখন দেখছি তারও মুখে কথা ফুটেছে।"

"কৃতিত্বটা আমার নয়—" সেই জ্যোতির্ময় চোখ মেলে অতীশ বললে, "কথা যে ফুটিয়েছে, তারই।"

"কে সে ?"

"সামনে বলব না। অহঙ্কার হবে।"

"খুব হয়েছে। সায়েন্স কলেজে এই ধরনের রিসার্চই বুঝি চলছে আজকাল ?"

"সাবধান—ওটা আচার্য রায়ের কলেজ।" অতীশ হেসে উঠল, "ওখানে এসব চাপল্য মুখে আনতে নেই—মনেও না। আর এটুকু ট্রেনিঙের জন্যে হরিশ মুখুজ্যে রোডই যথেষ্ট। কষ্ট করে অত দূরে যাবার দরকার হয় না।"

পাশ দিয়ে প্রকাণ্ড একখানা ডবল-ডেকার মোড় ঘুরল। দৈত্যের মতো অদ্ভুত কালো গাড়িটা, জানলার কাচগুলো কেমন হিংস্রতায় ঝকঝক করছে। খানিকটা তপ্ত গ্যাসের গন্ধ ছড়িয়ে গেল চারদিকে। আলোচনার খেই হারিয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্যে।

সামনে ঘাসের কালো মখমলের ভিতর দিয়ে রুপোলি ট্রাম-লাইন। জমাট হয়ে থাকা গাছের সারি। তীব্র নীল আলোর ঝলক ছড়িয়ে টালিগঞ্জের ট্রাম চলে গেল। মোড় ঘুরল আর-একটা ডবল-ডেকার। উলটো দিকে।

ট্রাম-স্টপের পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সুপ্রিয়া।

"এখান থেকেই উঠবে ?" ক্ষুণ্ণ হয়ে অতীশ জানতে চাইল।

"এইখানেই গাড়ি থামে।" ঠোঁট টিপে সুপ্রিয়া হাসল, "ট্রাম কোম্পানির তাই নিয়ম। মাথার উপর তাকালেই দেখতে পাবে। লেখা আছে : এখানে সকল ডাউন গাড়ি—"

"ধন্যবাদ—উপকৃত হলাম।" অতীশ আর একটা সিগারেট ধরাল, "কিন্তু আমার বক্তব্য ছিল, আর একটু হেঁটে গেলে হয় না ?"

"সেই হরিশ মুখার্জি পর্যন্ত ?"

"না—না, তা কেন ? এই আর একটুখানি—মানে সামনের রাসবিহারীর মোড়—"

"সেখান থেকে আর-একটু গেলে কালীঘাট ডিপো, আর দু পা এগোলে হাজরার মোড়—"

"সত্যি বলছি, আজ আর সে-সব করব না। চল—আর একটু হাঁটি।"

সুপ্রিয়া হাতের ঘড়িটার দিকে একবার তাকাল, "কিন্তু বাড়িতে আমাকে যে কৈফিয়ত দিতে হয়—তা জানো ?"

"আমি সঙ্গে থাকলে দিতে হবে না। ভালো ছেলে হিসেবে আমার খ্যাতি আছে।"

"এ-ভাবে বকুলতলায় দাঁড়াতে থাকলে সে খ্যাতি বেশিদিন টিঁকবে না।" সুপ্রিয়া হাঁটতে আরম্ভ করল, "পাড়ার ছেলেদেরও চোখ আছে। তারা সায়েন্স কলেজের রিসার্চ-স্কলারকে খাতির করবে না।"

"বকুলতলা কর্পোরেশনের সম্পত্তি। যে-কেউ দাঁড়াতে পারে।"

সুপ্রিয়া হাসতে চেষ্টা করল, পারল না। একটা কাঁটা খচখচ করে উঠল বুকের ভিতরে।

"তোমাকে নিয়ে আমি কী করব বলো তো অতীশ? আমার কী কাজে তুমি লাগবে?"

"রবীন্দ্রনাথের ভাষায় জবাব দিতে পারি। আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।"

"ঠাট্টা নয়।" সুপ্রিয়ার বুকের ভিতর ব্যথার রেশটা টনটন করে বাজতে লাগল, "তবলা ধরতে জানো না যে আমার সঙ্গে সঙ্গত করবে। গান জানো না যে তোমার কাছ থেকে কিছু শিখে নেব। কবিতা লিখতে পারো না যে তোমার গানে আমি সুর দেব। সত্যি, তোমাকে নিয়ে আমি কী করব অতীশ?"

অতীশ যেন এতক্ষণ পরে হোঁচট খেল একটা। দু বছর ধরে এই একটা কথাই অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছে সুপ্রিয়া। কী কাজে লাগবে অতীশ? সুপ্রিয়ার জীবনে তার ভূমিকা কতটুকু?

অথচ আশ্চর্য, এক সুপ্রিয়া ছাড়া আর কোন মেয়েই কি এমন একটা প্রশ্ন তুলতে পারত? কী কাজে লাগবে অতীশ? এম-এস্‌সির নামজাদা ছাত্র, দুদিন পরে ডি-এস্‌সি, হয়তো একটা ফরেন স্কলারশিপ, তারপরে বড় চাকরি। এর পরে আর কী চাই? এর বেশী কোন মেয়ে আর কামনা করতে পারে?

কিন্তু সুপ্রিয়া পারে। গানের চাইতে বড় তার সামনে আর কিছু নেই। কেউ নেই সেখানে। তার গানের জগতে ডি-এস্‌সি'র ডিগ্রির জায়গা বাজে কাগজের ঝুড়িতে। কনভোকেশনের মধ্যমণি সেখানে কেউ নয়। বিরাট গানের জলসায় হয়তো একেবারে পিছনের সারির টিকিট কিনবে অতীশ, স্টেজের উপর বসে-থাকা সুপ্রিয়াকে সেখান থেকে ভালো করে দেখতেও পাওয়া যায় না। সেখানে সুপ্রিয়ার পাশে বসে যে সঙ্গত করবে সে হয়তো নিজের নামটা কোনোমতে সই করতে পারে, যে সারেঙ্গি বাজিয়ে চলবে তাকে হয়তো এখনো টিপসই করতে হয়। কিন্তু তাদের কপালে গুণীর জয়তিলক জ্বলজ্বল করছে —তার কাছে ইউনিভার্সিটির সোনার মেডেল কানাকড়ির বেশি নয়।

পায়ের তলায় ঘাসের কালো মখমল শিশিরে ভিজে উঠছে। অতীশ সিগারেটটা ফেলে দিলে। সম্পূর্ণ খেতে পারল না।

সুপ্রিয়া জোর করে হাসতে চেষ্টা করল: "অমনি গম্ভীর হয়ে গেলে?"

"গম্ভীর কেন?" আরো জোর করে হাসতে চেষ্টা করল অতীশ, "আমি হাল ছাড়ব না। কালকেই নাড়া বাঁধব কোনো বড় ওস্তাদের কাছে।"

কথাটার জের টানা চলত, আরো খানিকটা হালকা কৌতুকের জলতরঙ্গ বাজানো যেত। কিন্তু বাজল না। হাওয়াটা থমথম করতে লাগল। দুজনের ভিতর দিয়ে একটা নদীর স্রোতের মতো বয়ে চলল ট্রাম-বাস-মোটর আর মানুষের শব্দ। বয়ে চলল সেই পরিচিত ব্যবধানের প্রবাহ।

"তোমার গুরুদেব কী বলেন তোমার সম্পর্কে? দুর্গাশঙ্করবাবু?"

"কী আর বলবেন?"

"তোমার গান শেখা শেষ হতে আর কত দেরি?"

"গুরুদেব নিজেই বলেন, তাঁরও এখনো পর্যন্ত কিছুই শেখা হয়নি।"

"উঃ—কী বিদ্যাই বেছে নিয়েছ। সারাজীবন ক্রমাগত হাহাকার করতে হবে।"

আর একটা পুরনো পরিচিত ঠাট্টা। হাহাকার। গলাসাধার নামান্তর।

কিন্তু কোনো ঠাট্টাই জমল না। পায়ের নীচে হেমন্তের ভিজে ঘাস। সুপ্রিয়ার চটিটা স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে।

রাসবিহারীর মোড়টাকে কে যেন দয়া করে সামনে এগিয়ে দিলে খানিকটা। নইলে এর পরে হয়তো কথা বলাই শক্ত হয়ে উঠত। একটা অনুতাপের লজ্জায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল সুপ্রিয়া। অতীশকে সে আঘাত দিতে চায় না ; আর চায় না বলেই তীক্ষ্ণধার সত্যটা থেকে-থেকে এমন নিষ্ঠুরভাবে বেরিয়ে আসে।

সুপ্রিয়া বললে, "ট্রাম আসছে।"

ট্রাম এল। অনেক দূরের স্টেজের মতো অনেকগুলো আলো তুলে নিলে সুপ্রিয়াকে। তারপর অতীশকে ছাড়িয়ে—রাসবিহারীর মোড়কে ছাড়িয়ে অনেকখানি সামনে এগিয়ে চলে গেল ভবিষ্যৎ।

অতীশ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। সামনে গোটাকয়েক সিনেমার পোস্টার। কয়েকটা ছাড়া-ছাড়া রঙ।

ট্রামের জানলা দিয়ে একবার গলা বাড়িয়ে দেখল সুপ্রিয়া। অতীশকে দেখতে পেল না। একটা মৃদু নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল, কালকেও অতীশ আসবে, ঠিক অমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে বকুল-গাছটার তলায়। সুপ্রিয়ার খারাপ লাগবে। কিন্তু অতীশ না এলে আরো খারাপ লাগবে।

আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চমকে উঠল অতীশ। তার সামনে নিঃশব্দে কে যেন হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। পকেট থেকে পয়সা বের করতে গিয়েও অতীশ চমকে তিন পা সরে গেল। হাতটা কুষ্ঠরোগীর—খানিক বীভৎস বিকৃত ঘা দগদগ করছে সেখানে।

"নিরাপদদীর্ঘজীবেষু,

বাবা হরিপদ, আমার আশীর্বাদ জানিবে। বিশেষ সমাচার এই যে, আগামী ১২ই আষাঢ় সোমবার আমার কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী ইন্দুমতীর সহিত—"

চিঠিটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিতে চাইল কান্তি, পারল না। ছাব্বিশ বছরের পুরনো পঞ্জিকার মধ্যে দাদুর এই চিঠিখানা আজও বেঁচে আছে। কাগজটা হলদে হয়ে গেছে, জোলো হয়ে গেছে কষ-কালির রঙ, তবু শেষ পর্যন্ত পড়া যায়, প্রত্যেকটা অক্ষর পড়তে পারা যায় নির্ভুলভাবে। মুক্তোর মতো হাতের লেখা ছিল দাদুর।

হরিপদ কে, কান্তি জানে না। কেন এই চিঠিটা তাকে পাঠানো হয়নি, তা-ও জানে না কান্তি। কিন্তু ১২ই আষাঢ় ইন্দুমতীর বিয়েটায় কোনো বিঘ্ন ঘটেনি। ইন্দুমতী তার মা।

কান্তি দাঁত দিয়ে একবার নীচের ঠোঁটটা চেপে ধরল। পুরোনো হলদে

কাগজ, কষ-কালির লেখাটা ফিকে হয়ে গেছে। তবু আনন্দে আর আশ্বাসে দাদুর সইটা যেন এখনো জ্বলজ্বল করছে: "শ্রীতারাকুমার দেবশর্মণঃ—"

দাদুর হাত-বাক্সে প্রসাদী-পদাবলীর একখানা পুরনো বই খুঁজতে খুঁজতে পাওয়া গেছে এই পঞ্জিকা, তার মধ্যে এই চিঠিখানা। একটা মড়ার হাড় যেন উঠে এসেছে হাতে। কিন্তু এই চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিলেই কি সব মুছে যাবে? মুছে যাবে ছাব্বিশ বছর আগেকার সেই ১২ই আষাঢ়, সেই বিয়েটা, আর কান্তির নিজের অস্তিত্ব?

আঠারো বছর বয়েসে একবার আত্মহত্যার কথা ভেবেছিল কান্তি। এই বয়সে আত্মহত্যা করবার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে, আর থাকে আশ্চর্য তীক্ষ্ন অসংযত আবেগ। কান্তি সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত চুপ করে বসে ছিল গঙ্গাযাত্রীদের কেউটের ফোকরভরা ভাঙা কুঠরিটার পাশে, পুরোনো ঝাঁকড়া বটগাছটার কালিগোলা ছায়ার তলায়। কালপুরুষের খড়্গ কাঁপছিল গঙ্গার কালীদহ জলে, ওপারের একটা জ্বলন্ত চিতা থেকে এপারেও মাঝে মাঝে ভেসে আসছিল মড়াপোড়ার গন্ধ, পায়ের কাছে হাওয়ায় দুলছিল ছেঁড়া সিলকের টুকরোর মতো একটা সাপের খোলস আর কান্তি ভেবেছিল আত্মহত্যার কথা।

ফিরে এসেছিল অনেক রাতে, একটু দূরেই বিশ্রী গলায় একটা কুকুর কেঁদে ওঠবার পরে। সহজেই সেদিন মরে যেতে পারত কান্তি। নিশ্চিন্তে, নির্বিঘ্নে। হয়তো ওই সাপের ফোকরগুলোতে আঙুল গলিয়ে দিলেই কাজ হয়ে যেত। কিন্তু কুকুরটার কান্না শুনে যেন মনে হয়েছিল, আজ থাক। আর একদিন হবে।

আরো সাত বছর কেটেছে তার পরে। গানের সুরে ডুব দিয়েছে কান্তি—গঙ্গার জলে আর ডোবা হল না। কিন্তু সত্যিই সাপের বিষ আছে তার রক্তে। কেউটের নয়, চন্দ্রবোড়ার বিষ। একবারে ফুরিয়ে যায় না, তিলে তিলে পচিয়ে মারে। অথবা এমনও হতে পারে যে, সত্যি সত্যিই মরে গেছে কান্তি। ওই গানের স্রোতে যে এখনো ভেসে চলেছে, সে রক্তমাংসের জীবিত দেহ নয়, লখিন্দরের গলিত শব।

বারে বারে যেমন হয়, আজও তেমনি দাদুর চিঠিখানাকে পুরোনো পঞ্জিকার মধ্যে আবার ভাঁজ করে রেখে দিলে কান্তি। উঠে এসে চুপ করে বসল খাটের কোণায়, জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরের অন্ধকারের দিকে। মা কীর্তন শুনতে গেছেন, ফিরতে রাত বারোটার আগে নয়। এখন সে একেবারে একা। নিজের কাছে সে নিজে ছাড়া আর কেউ নেই।

রাত্রির আকাশ থেকে যেন একটা সুর ভেসে এল। দরবারী কানাড়া। দাদুর চিঠিটাকে মস্তিষ্কের প্রত্যেকটা কোষে কোষে অনুভব করতে করতে, সূচিকাভরণের মতো কতগুলো তীক্ষ্ন যন্ত্রণার বিন্দুকে আস্বাদন করতে করতে তবুও কান্তি একবার হাত বাড়াল তানপুরার দিকে। কেমন ঠাণ্ডা আর কঠিন মনে হল যন্ত্রটাকে, কান্তির হাত ফিরে এল। বেহালাটার কথা মনে হল। না—ওটাও থাক।

জানলার গরাদের নীচে কাঠটার উপরে আস্তে মাথাটা নামিয়ে রাখল।

বাইরে থেকে খানিক ঠান্ডা হাওয়া এসে চুলের মধ্যে খেলে যেতে লাগল। কপালে ব্যথা লাগছিল, তবুও মাথা সে তুলতে পারল না। অসম্ভব ভারী হয়ে গেছে মাথাটা—কয়েক মণ লোহা জমাট বেঁধেছে সেখানে।

জেগে জেগে কান্তি স্বপ্ন দেখল। স্বপ্ন দেখল সাতাশ বছর আগেকার।

তখনো ভোরের আলো ফোটেনি ভালো করে। ইস্কুলের হেডপণ্ডিত তারাকুমার ভট্টাচার্য ন্যায়রত্ন গঙ্গাস্নান করে মন্ত্র পড়তে পড়তে বাড়ি ফিরছিলেন। অনেক দূর পর্যন্ত ভেসে যাচ্ছিল তাঁর খড়মের শব্দ—তাঁর মন্ত্রপাঠের সুর।

বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন তারাকুমার। তাঁরই রোয়াকের উপরে চুপ করে বসে আছে একজন বিদেশী মানুষ। বয়েস বাইশ-তেইশ হবে। সুঠাম, সুন্দর চেহারা, দেখলে মনে হয় বিশিষ্ট ভদ্রঘরের ছেলে। কিন্তু জামাকাপড় তার ছেঁড়া, মুখে-চোখে অসুস্থ ক্লান্তির ছাপ। স্পষ্টই বোঝা যায়, কিছুদিন ধরে সে পেটভরে খেতে পায়নি, রাত্রে ঘুমোতে পায়নি।

"কে তুমি ?"

ছেলেটি উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করলে তারাকুমারের পায়ে।

"আমার নাম শান্তিভূষণ চট্টোপাধ্যায়। আমি বিদেশী।"

তারাকুমার বললেন, "বিদেশী সে তো দেখতেই পাচ্ছি। বাড়ী কোথায় ?"

"বর্ধমান জেলায়। শক্তিপুরে।"

"এখানে কেন ?"

"মা-বাপ নেই—আত্মীয়েরা সম্পত্তির লোভে বিষ খাওয়াতে চেয়েছিল। তাই চলে আসতে হল দেশ ছেড়ে। ভাগ্যের সন্ধানে চলেছি। হাঁটতে হাঁটতে পা ধরে গিয়েছিল, তাই একটুখানি বসেছিলাম আপনার দাওয়ায়। অপরাধ নেবেন না—আমি এখুনি চলে যাব। একটু জিরিয়েই।"

তারাকুমার তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিলেন শান্তিভূষণের মুখের দিকে। অনুমান ভুল হয়নি তাঁর। অন্তত দু'দিন এর খাওয়া হয়নি; চোখের লালচে রঙ বলে দিচ্ছে, অন্তত তিন রাত চোখের পাতা বন্ধ হয়নি মানুষটার।

বললেন, "খাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ো না। সকালবেলাতেই ব্রাহ্মণের ঘরে অতিথি এসেছ—দুটি খেয়ে যেয়ো।"

শান্তিভূষণের লাল চোখ দিয়ে টপটপ করে কয়েক ফোঁটা জল পড়ল। বললে, "পকেটে পয়সা ছিল না—রাস্তার ধারের ক্ষেত থেকে কয়েকটা আক ভেঙে খাওয়া ছাড়া পরশু থেকে কিছু আমার জোটেনি। আপনি আমায় বাঁচালেন।"

আদর করে অতিথিকে অন্দরে নিয়ে গেলেন তারাকুমার। মা-মরা একমাত্র মেয়ে কিশোরী ইন্দুমতী অতিথির জন্যে হাতমুখ ধোবার জল আর গামছা এগিয়ে দিলে।

খেতে বসে সব শুনলেন তারাকুমার। শান্তিভূষণ একেবারে মূর্খ নয়। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেছে—উপাধি আছে কাব্যতীর্থ। চেহারাটি সুন্দর। কথাবার্তা চাল-চলন বড় ঘরের মতো।

খেয়ে উঠে তামাক ধরিয়ে তারাকুমার বললেন, "চলেছ কোথায়? কলকাতায়?"

"তাই তো ভাবছি।"

"হেঁটেই যাবে?"

"পঁয়ত্রিশ মাইল হেঁটে এসেছি, এ পনেরো মাইলও পারব।"

"তা পারবে।" কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তামাক টানলেন তারাকুমার, তারপর বললেন, "কলকাতায় গেলেই কি চাকরি পাবে?"

"জানি না। চেষ্টা করে দেখব।"

"জানাশুনো কেউ আছে?"

"দেশের দু-চারজন নানা অফিসে কাজ করে। তাদের ধরব।"

"হুঁ।"—তারাকুমার কলকেটা উবুড় করে রাখলেন। "কলকাতায় চাকরি করবার একটা আলাদা লোভ আছে বটে। তবে এখানেও একটা ব্যবস্থা করা যায়। আমাদের স্কুলে টাকা চল্লিশেকের একটা চাকরি খালি আছে।"

"এখানে?"

"থাকতে পারো আমার বাড়িতে। আমার ছেলে নেই। তোমারও শুনলাম কেউ নেই। যদি ইচ্ছে করো আমার ছেলের মতোই থাকতে পারো এখানে।"

এর পরে আর কথা যোগায়নি শান্তিভূষণের। একেবারে তারাকুমারের পায়ে লুটিয়ে পড়েছিল সে।

চাকরি হয়ে গেল সেইদিনই। আর কাজ বাড়ল ইন্দুমতীর। একজনের জায়গায় দুজনকে ভাত বেড়ে দিতে হয়। দুজনের চাদর ভাঁজ করে দিতে হয়, কাচতে হয় জামা-কাপড়।

ভদ্র, নম্র মানুষ শান্তিভূষণ। ইন্দুমতীর দিকে চোখ তুলেও তাকায় না কোনোদিন।

দিন কয়েক বাদেই হেডমাস্টার তারাকুমারকে ডাকলেন। বললেন, "আপনার সঙ্গে কথা আছে পণ্ডিতমশাই। শান্তিভূষণ সম্পর্কে।"

শান্তিভূষণ সম্পর্কে? কেমন ঘাবড়ে গেলেন তারাকুমার। সেকালের ইংরেজী-জানা কড়া-মেজাজী হেডমাস্টার। এমনিতে মাটির মানুষ—কিন্তু অন্যায় দেখলে দুর্বাসা। তখন তাঁর হাতে কারো নিস্তার নেই। ছাত্রের নয়—মাস্টারেরও না।

শুকনো গলায় তারাকুমার বললেন, "কী হয়েছে শান্তিভূষণের? পড়াতে পারছে না?"

"পারছে না মানে?" হেডমাস্টার বললেন, "চমৎকার পড়ায়। আরো আশ্চর্য কী জানেন পণ্ডিতমশাই—ওকে শুধু ম্যাট্রিক পাস বলে মনেই হয় না। বি-এ পাসের চাইতেও ভালো ইংরেজী লেখে। বিদ্যে ভাঁড়ায়নি তো

পণ্ডিতমশাই ?”

গর্বে ফুলে উঠে তারাকুমার বললেন, “বিদ্যে কেউ কখনো ভাঁড়ায় না স্যার। বরং বাড়িয়ে বলে।”

“তা বটে।” হেডমাস্টার মাথা নাড়লেন : “রাইট ইউ আর। কিন্তু ছেলেটি মশাই হীরের টুকরো। ভারী খুশী হয়েছি ওর কাজ দেখে। ।ম্যাট্রিক পাস, কিন্তু আমি ভাবছি ওকে ওপরের ক্লাসে ইংরেজী পড়াতে দেব।”

হাওয়ায় উড়তে উড়তে বাড়ি ফিরলেন তারাকুমার। ডেকে বললেন, “শুনেছিস ইন্দু, হেডমাস্টার আজ আমাদের শান্তির কত প্রশংসা করলেন। বললেন, এমন টীচার তাঁর স্কুলে আর দুটি নেই।”

মাথা নিচু করে, অল্প একটু হেসে ইন্দুমতী রান্নাঘরে চলে গেল।

সেই থেকে তারাকুমার ভাবতে শুরু করলেন। ছ মাস ধরে ভাবলেন। শেষ পর্যন্ত কথাটা খুলে বললেন শান্তিভূষণকে।

একবারের জন্যে চমকে উঠল শান্তিভূষণ—একবারের জন্যে মুখের রঙ বদলে গেল তার।

“কিন্তু আমি তো—”

তারাকুমার বাধা দিলেন, “তোমায় কিছু বলতে হবে না। ছেলের মতো কাছে রয়েছ—ছেলের দায়িত্বও তোমায় দিয়ে যেতে চাই। শুধু বলো আমার ইন্দুকে তোমার পছন্দ হয় কিনা।”

কী একটা কাজে সেই মুহূর্তে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল ইন্দুমতী। শোনবার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে পালিয়ে গেল সেখান থেকে। একবারের জন্যে চোখ তুলে শান্তিভূষণ দেখল ডুরেশাড়ির উপর ভ্রমরকালো একরাশ এলোচুল, স্থলপদ্মের মতো দুখানি পা।

গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে শান্তিভূষণ বললে, “পছন্দের কথা কী বলছেন, ইন্দুকে পাওয়া সৌভাগ্যের কথা।”

উল্লসিত হয়ে তারাকুমার বললেন, “আমি জানতাম। আমার মেয়েকে কিছুতেই তুমি অপছন্দ করতে পারবে না।”

“কিন্তু—” আর একবার কী বলতে গিয়েও বলতে পারল না শান্তিভূষণ।

“কিন্তুর আর কিছু নেই।” উৎসাহিত হয়ে তারাকুমার বললেন, “তা হলে তো কথা হয়েই গেল। অবশ্য তোমার একটা ঠিকুজি পেলে ভাল হত। কিন্তু না পেলেও ক্ষতি নেই, তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি সমস্ত সুলক্ষণ আছে তোমার ভেতরে। দেখি হাতখানা—”

ইতস্তত করে হাত বাড়িয়ে দিলে শান্তিভূষণ।

“বাঃ—সুন্দর হাত। উজ্জ্বল বৃহস্পতি। দীর্ঘায়ু যোগ—অর্থভাগ্য আছে। আঙুল দেখে বোঝা যাচ্ছে দেবগণ। রাজযোটক হবে।”

আর একবার শান্তিভূষণের মুখ থেকে সব রক্ত সরে গিয়েছিল—কিন্তু মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের জন্যে। তারপর শান্তিভূষণ বলেছিল, “বেশ তাই হবে। আপনি যা আদেশ করবেন তাই আমি করব।”

ঠিক হতে লাগল আরো মাসখানেক। তারপরেই তারাকুমার কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসলেন।

"নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু,

বাবা হরিপদ, আমার আশীর্বাদ জানিবে। বিশেষ সমাচার এই যে, আগামী ১২ই আষাঢ় আমার কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী ইন্দুমতীর সহিত বর্ধমান জিলার শক্তিপুর নিবাসী স্বর্গীয় প্রতাপভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র শ্রীমান শান্তিভূষণের শুভ-বিবাহ—"

চিঠি হয়তো শেষ পর্যন্ত পোঁছয়নি হরিপদর কাছে। কিন্তু বিয়েটা হয়ে গিয়েছিল। খুব সম্ভব ওই ১২ই আষাঢ়েই।

আরো এক বছর কাটল তারপরে। রাজযোটকই বটে। মাটিতে নয়—যেন আকাশে পা ফেলে চলতে লাগলেন তারাকুমার। ইন্দুমতীর মুখ দেখে বুঝতে পারতেন যা চেয়েছিলেন তাই পেয়েছেন।

স্বপ্ন ভাঙল একদিন ভোরবেলায়। ইন্দুমতীই এনে দিল সে চিঠি। তারাকুমারের সামনে সেটা ফেলে দিয়ে ছুটে গিয়ে বন্ধ করে দিল ঘরের দরজা। সারাদিন সে-দরজা আর খোলেনি।

চিঠিতে লেখা ছিল ঃ

"আমার আর থাকবার উপায় নেই। কেমন সন্দেহ হচ্ছে পুলিসে আমার খবর পেয়েছে। আমার হাত দেখে আপনি বুঝতে পারেননি। আমি খুনী—পলাতক আসামী। আপনার কাছে আশ্রয় পেয়ে ভেবেছিলাম যে, এখানেই জীবনটা কাটিয়ে যাব। কিন্তু সে আর হল না। আপনাদের সামনে দিয়ে আমার কোমরে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাবে, সে-অপমান আমার সইবে না। বিশেষ করে ইন্দুকে অত বড় আঘাত আমি দিতে পারব না।

বুঝতেই পারছেন, আমি মিথ্যে পরিচয় দিয়েছিলাম। আমার নাম-ধাম কী তা জানিয়ে কোনো লাভ নেই। শুধু এইটুকু বলতে পারি, আপনার কন্যা আপনি ব্রাহ্মণের হাতেই সম্প্রদান করেছিলেন।

জানি না, আমার শেষ পরিণাম কী। হয়তো ফাঁসিকাঠে, নইলে দ্বীপান্তরে। কারণ, ধরা আমি একদিন পড়বই। তবু আশা আছে—আবার আমি ফিরব। আপনি আমায় সন্তান বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। সেই দাবিতেই ক্ষমা চাইতে ফিরে আসব আপনার কাছে।"

পুলিস অবশ্য এল না, শান্তিভূষণও ফিরে আসেনি আর। কিন্তু তার চলে যাওয়ার চার মাস পরে কান্তিভূষণের জন্ম হল। কান্তিভূষণ চট্টোপাধ্যায়। মিলিয়েই নাম রেখেছিলেন তারাকুমার। অজ্ঞাত-পরিচয়ের লজ্জা দিয়ে কান্তিকে তিনি পৃথিবীর সামনে ছোট করতে চাননি।

কথাটা কিন্তু চাপা থাকেনি। আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়েছে। যতদিন তারাকুমার বেঁচে ছিলেন, প্রাণপণে আড়াল দিয়ে রেখেছিলেন কান্তিকে। তাঁর আড়াল সরে গেলে কান্তি জানতে পারল। তার আগেই কুশ-পুত্তলী পুড়িয়ে মা বৈধব্য নিয়েছিলেন।

কান্তি জানতে পেরেছে সাত বছর আগে, তার আঠারো বছর বয়সের সময়। তারপরে সেই গঙ্গাযাত্রীদের সেই গোখরো সাপের ফোকরভরা ঘর, সেই পুরনো বটের ডাকিনী ছায়া, সেই কালি-ঢালা কালপুরুষের খড়্গ-কাঁপা গঙ্গার স্রোত, ওপারে চিতার আলো, আত্মহত্যার রোমন্থন, তারপরে মনে হওয়া ঃ আজ থাক।

আজ থাক। সাত বছর থেকে মনে হচ্ছে, আজ থাক। তা ছাড়া কান্তি কেমন করে ভুলবে তার কথা—সেই মেয়েটির কথা, সুপ্রিয়া যার নাম!

চমকে কান্তি জানলার কাঠ থেকে মাথা তুলল। কয়েকটা নারকেল গাছের ওপারে মজুমদারদের সাদা বাড়িটা দেখা যায়। আলো জ্বলছে তার তেতলার ঘরে। সুপ্রিয়ার ঘরে। সুপ্রিয়া এসেছে নাকি কলকাতা থেকে?

না—সুপ্রিয়া নয়। তার পাশের ঘর। সুপ্রিয়ার বিধবা পিসিমা থাকেন ও-ঘরে।

কান্তি উঠে বসল। সুপ্রিয়া। তার চাইতে বছর চারেকের ছোট—ছেলেবেলার খেলার সাথী।

আঠারো বছর বয়েসে গঙ্গার ধার থেকে উঠে কান্তি বাড়ি ফেরেনি। গিয়েছিল সুপ্রিয়ার কাছে। সুপ্রিয়া পরীক্ষার পড়া পড়ছিল—কান্তি সোজা গিয়ে ঢুকল তার ঘরে।

পাড়াগাঁয়ের পরিচয়—কেউ বাধা দেয়নি। শুধু সুপ্রিয়ার মা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কান্তি যে! এত রাতে?"

যা হোক একটা জবাব দিয়ে কান্তি উঠে গিয়েছিল উপরে।

কিশোরী বয়সের সুপ্রিয়া কী বুঝেছিল সে-ই জানে। বড় বড় চোখ মেলে শুনেছিল সব কথা। এগিয়ে এসে হাত রেখেছিল কান্তির চুলের উপর। বলেছিল, "তোমার কেউ না থাক, আমি আছি।"

"চিরদিন থাকবে?"

"চিরদিন।"

কান্তি বুঝতে পারে কেন সে আত্মহত্যা করেনি এতদিন। তার পরিচয় নেই—সে খুনীর সন্তান—হত্যাকারীর রক্তে তার জন্ম, তবু সে বেঁচে থেকেছে ওই একটি কথায়—একটি শক্তিতে।

"চিরদিন। চিরদিন আমি তোমার জন্যে থাকব।"

কলকাতার কলেজে পড়তে গেল সুপ্রিয়া। যাওয়ার সময় কান্তির চোখ জলে টলটল করে উঠেছিল।

"আমি ম্যাট্রিক ফেল। তুমি কলেজে পড়তে যাচ্ছ। তোমার কাছে আমি কত ছোট হয়ে গেলাম।"

সুপ্রিয়া সস্নেহে কান্তির কপালে একটা টোকা দিয়ে বলেছিল, "আর তুমি যে গানে এম-এ পাস করে বসে আছ। বিশেষ করে, তবলায় পি-এইচ-ডি। সেখানে তো তোমাকে আমি কোনোদিন ছুঁতে পারব না।"

সান্ত্বনা দিয়ে গেল—না মনের কথা? তবু সেই থেকে গানের জোর

নিয়েই দাঁড়াতে চেয়েছে কান্তি। ভোরের অন্ধকারে হয়তো তবলা নিয়ে বসেছে, বাজনা শেষ করেছে সন্ধ্যার অন্ধকার নামলে। বিদ্যার ঐশ্বর্য নিয়ে যতই এগিয়ে যাক সুপ্রিয়া, গুণের জোরে তার কাছে পেঁছিতে হবে কান্তিকে। সেই তার স্বীকৃতি— সেইখানেই তার মর্যাদা।

তারপর আরো এগিয়ে গেছে সুপ্রিয়া। বি-এ পাস করে একটা স্কুলে মাস্টারি নিয়েছে—আর তার গান শেখা চলছে ওস্তাদ দুর্গাশঙ্করের কাছে। আজকাল তো দেশে আসবার সময়ই পায় না। কলকাতায় গিয়ে দু-একবার দেখা করেছিল কান্তি, কিন্তু লোকের ভিড়ে ভারী দূরের মনে হয় সুপ্রিয়াকে। মনে হয়, নিজের পরিচয়হীন জীবন নিয়ে তার কাছে গিয়ে সে দাঁড়াতে পারবে না। সেখানে অনেক মানুষ, যারা দেশের সেরা জ্ঞানী গুণীর দল, যাদের গলা উঁচু করে বলবার মতো বংশপরিচয় আছে, সংসারের গ্লানি নিয়ে যাদের অন্ধকারের আড়াল খুঁজে বেড়াতে হয় না।

তবু সুপ্রিয়া যখন আসে—যখন এই গ্রামের একান্ত গণ্ডিটুকুর মধ্যে ফিরে আসে, তখন কান্তির মনে হয় এখনো তার আশা আছে। আজও কাছে গিয়ে বসলে কখনো কখনো সুপ্রিয়া তার হাত নিজের হাতের ভিতরে টেনে নেয়। বলে, "এত রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন কান্তিদা ?"

"তপস্যা করছি তোমার জন্যে।"

"আমার জন্যে!" একটু চুপ করে থেকে সুপ্রিয়া জবাব দেয়, "আমি এমন কিছু দুর্মূল্য নই কান্তিদা যে, তার জন্যে তুমি এমনভাবে শরীর নষ্ট করবে। তুমি বড় ওস্তাদ হও, গুণী হয়ে ওঠ, সারা দেশের মানুষ চিনে নিক তোমাকে। কিন্তু আমার জন্যে কোনো দাম তুমি দিচ্ছ, এ-কথা শুনলে আমার লজ্জাই বেড়ে যেতে থাকে।"

"নইলে তোমার যোগ্য হব কী করে ?"

"আমার যোগ্য! আমি কতটুকু ? কত বড় পৃথিবী রয়েছে তোমার জন্যে। সেই পৃথিবীতেই তোমার প্রতিষ্ঠা হোক কান্তিদা।"

কান্তি খুশী হবে কিনা বুঝতে পারে না। এড়িয়ে যেতে চায় ? জীবনে জায়গা দিতে পারবে না জেনেই কি ঠেলে সরিয়ে দিতে চায় পৃথিবীর ভিতরে ? নিজের ঘরের দরজা খুলে বরণ করে নিতে পারবে না সেই জন্যেই কি সভায় বসিয়ে দিতে চায় সকলের মাঝখানে ?

কান্তি উঠে বসল। বাইরে রাত বাড়ছে। সুপ্রিয়ার ঘরের জানালাটা অন্ধকার। কলকাতা থেকে ফেরেনি সুপ্রিয়া।

একটা রিকশা এসে থামল দোরগোড়ায়। মা ফিরেছেন। কড়াটা নড়ে ওঠবার আগেই দরজা খুলে দেবার জন্যে কান্তি বাইরের দিকে পা বাড়াল।

আজ সমস্ত রাত ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুমের মধ্যে বার বার মনে হবে, সুপ্রিয়া আসেনি।

তিন

হরিশ মুখার্জি রোডে সুপ্রিয়ার কাকা অমিয় মজুমদারের বাড়ি।

অবশ্য ভাড়াটে বাড়ি। মাঝারি ধরনের অ্যাড্‌ভোকেট অমিয় মজুমদার এখন পর্যন্ত নিজের বাড়ি করে উঠতে পারেননি, কেবল গল্‌ফ ক্লাব রোডে কাঠা পাঁচেক জমি সংগ্রহ করে রেখেছেন। একবার বাড়ির জন্যে অনেকখানি তোড়জোড় আরম্ভও করে দিয়েছিলেন হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, জমির দর বাড়ছে। তখন অমিয় মজুমদারের মনে হল, পাঁচগুণ বেশী দামে জমিটাকে বিক্রি করে দেওয়া যেতে পারে। অতএব জমি বেচে সেই পাঁচগুণ লাভ করবেন না বাড়ি করবেন, এখনো এই দো-টানার মধ্যে তাঁর দিন কাটছে।

হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িটিও মন্দ নয়। তেতলা, ভাড়া একশোর কিছু বেশি। প্রায় ত্রিশ বছর আছেন—যুদ্ধের বাজারে ভাড়া গোটাকুড়িক টাকা বাড়িয়েছে বাড়িওলা। অমিয় মজুমদার আপত্তি করেননি। বারোখানা ঘর, পূব-দক্ষিণে খোলা, সামনে পার্ক, তিনি ছেড়ে দিলে কম করেও সাড়ে তিনশো টাকা রোজগার হবে বাড়িওলার।

সুপ্রিয়া কাকার কাছেই থাকে।

অমিয় মজুমদার এই ভাইঝিটিকে বিশেষ ভালোবাসেন। তাঁরও এককালে গান-বাজনার শখ ছিল, ওকালতির চাপে সেটা দমবন্ধ হয়ে মারা গেছে। তাঁর ছেলেমেয়েরাও গাইয়ে-বাজিয়ে হয়ে উঠুক, এ ছিল তাঁর মনোগত বাসনা। কিন্তু বড় ছেলে হল হকি খেলোয়াড়। মেজোটি হল এমন অসাধারণ ভালো ছেলে যে গান-বাজনা দূরে থাক, থিয়েটার সিনেমায় পর্যন্ত তার রুচি নেই, এখনো বি-এ পাস করেনি, এর মধ্যে মাথার চুল ছোট ছোট করে ছেঁটেছে আর কেওড়াতলায় কোন এক বাবা কালিকানন্দের আশ্রমে যোগ দিয়ে কোরাসে কালীর মালসী গাইছে। অমিয় মজুমদার সেটাকে কিছুতেই গান বলে স্বীকার করতে রাজী নন। ছোট ছেলেটি স্কুলে পড়ে, রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিখছে। অমিয়বাবুর ঠিক ক্ল্যাসিকাল নইলে মনটা খুঁতখুঁত করে।

একমাত্র মেয়ে রেবার গানের গলা নেই, তাকে সেতার শেখাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কিনে এনেছেন দুশো টাকা দামের এক তরফদার সেতার। আজ তিন বছর ধরে রেবা সেতার শিখছে। কেমন শিখছে শোনবার জন্যে কৌতূহল হয়েছিল একবার। কিন্তু মিনিট দুই শুনেই বুঝতে পারলেন দুশো টাকার সেতারটা না কিনলেই চলত। রেবা লোককে শোনাবার মতো একটা যন্ত্রই বাজাতে পারে—সে হল গ্রামোফোন।

অমিয় মজুমদার সেদিন হিংস্রভাবে সারারাত মোটা মোটা আইনের বই পড়েছেন, পড়েছেন অসংখ্য জটিল চীটিং কেসের বিবরণ। এত জিনিস সংসারে থাকতে বেছে বেছে এগুলো যে কেন পড়তে গেলেন, তার উত্তর একমাত্র তিনিই জানেন। সারা পৃথিবীটাই অসঙ্গতভাবে তাঁকে ঠকিয়েছে, হয়তো এমনি কিছু একটাই তাঁর মনে হয়ে থাকবে। স্ত্রী শোবার কথা বলতে এসেছিলেন, গোটা দুই ধমক দিয়েছেন তাঁকে, মাঝরাত্রে একটুকরো দাম্পত্যকলহ হয়ে গেছে।

"গান কোত্থেকে হবে ? মামাবাড়ির দিকটাও তো দেখতে হয় ।"

"আমার বাপের বাড়ির বদনাম কোরো না ।" স্ত্রী চটে উঠেছেন, "আমার দাদা—"

"জানি, জানি, আই-এ-এস । তোমার বাবা এম-আর-সি-পি । তোমার ছোট ভাই মুনসেফ । ইচ্ছে করলে আরো অনেক বলতে পারো । কিন্তু গানের দিক থেকে সব একেবারে গন্ধর্ববংশাবতংস ! গলার আওয়াজ শুনলেই মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত সুরকে ধ্বংস করবার জন্যে এদের আসুরিক আবির্ভাব । তোমার ছেলেমেয়েরা সেদিক থেকে মামাবাড়ির রাস্তাই ধরেছে ।"

স্ত্রী রাগ করে চলে এসেছেন । রাত দুটো পর্যন্ত কল চালিয়ে খামোখা ডজন দুই বালিশের ওয়াড় সেলাই করেছেন—কোনো দরকার ছিল না ।

তাই সুপ্রিয়া কলকাতায় পড়তে এলে ভারী খুশী হয়েছেন অমিয় মজুমদার ।

"অসুরের দেশে সুরের লক্ষ্মীর আবির্ভাব হল ।"

ব্যাপারটায় সব চাইতে বেশী হিংসা হবার কথা ছিল সুপ্রিয়ার সমবয়সী রেবার । কিন্তু অমিয়বাবুর চাইতেও রেবা নিজে অনেক ভালো করে জানত যে সেতার-টেতার তাকে দিয়ে হবে না । একবার কলেজের সোস্যালে বাজাতে গিয়েই সেটা সে মর্মে মর্মে অনুভব করেছিল ।

তাই সুপ্রিয়া আসবার কয়েকদিন পরেই রেবা বলেছিল, "কিছু যদি মনে না করিস, তোকে একটা প্রেজেন্ট করতে চাই সুপ্রিয়া ।"

"প্রেজেন্ট করবি—তাতে মনে করতে যাব কেন ? এ তো খুশী হওয়ার খবর ।"

"নিবি তা হলে ?"

"নির্ঘাত ।"

"তবে নিয়ে নে । ভোম্বল হালদারকে ।"

"ভোম্বল হালদার ?" সুপ্রিয়া হাঁ করে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, "সে আবার কে ? তা ছাড়া পৃথিবীতে এত ভালো ভালো জিনিস নেবার থাকতে ও-রকম বিশ্রী নামওলা একটা লোককে নিতেই বা গেলাম কেন ?"

"নামটা বিশ্রী বটে—", রেবা গম্ভীর হয়ে বললে, "লোকটা নিদারুণ গুণী। পঁয়ত্রিশটা মেডেল আছে । নামজাদা সেতারী । আমাকে সেতার শেখান । আঙুল টনটন করে, প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার জো হয়, তবু ছাড়তে চান না । তুই ওঁকে নে । মনের মতো শিষ্যা পেলে উনিও খুশী হবেন, আমারও হাড়ে বাতাস লাগবে ।"

"তাই নাকি ?"

"হ্যাঁ ভাই । একেবারে মনের কথা বলছি তোকে । সেই সঙ্গে আমার সেতারটাও দিয়ে দেব তোকে । ফাউ ।"

রেবার আন্তরিকতায় সন্দেহ ছিল না, কিন্তু উপহারটা নেওয়া সম্ভব হল না সুপ্রিয়ার । তবে নিদারুণ ভাব হয়ে গেছে দুজনের । সুপ্রিয়া যেবার বি-এ

পাস করল ডিস্‌টিংশনে, সেবারে চমৎকার ভাবে ফেল করল রেবা। অমিয় মজুমদার একটা কথাও বললেন না, ঘরে গিয়ে আবার চীটিং কেসের বিবরণ নিয়ে বসলেন। আর ভাবতে লাগলেন, আইনের এখনো অনেক অ্যামেন্‌ডমেন্ট্‌ দরকার, সব রকম চীটিং চল্‌তি পেনাল কোডের আওতায় পড়ে না।

শুধু স্ত্রীকে একবার গম্ভীর গলায় বললেন, "আই-এ-এস্‌, এম-আর-সি-পি, মুন্‌সেফ মামাবাড়ি কী বলে?"

স্ত্রী বললেন, "সব কৃতিত্বটুকু মামাবাড়িকেই দিচ্ছ কেন? বাপের বাড়িও কিছু পেতে পারে।"

"বাপের বাড়ি!" উত্তেজিত হয়ে অমিয়বাবু বললেন, "বাপের বাড়িতে কেউ কখনো ফেল করেনি। তারা আই-এ-এস হয়নি বটে, কিন্তু পরীক্ষায় স্কলারশিপ পেয়েছে। তারা—"

রেবা এই পর্যন্ত শুনেই চলে এসেছিল। সোজা সুপ্রিয়ার ঘরে।

আশ্চর্য মেয়েটা। রেবার জন্যে সমবেদনায় সুপ্রিয়া যখন ম্রিয়মাণ হয়ে বসে আছে, তখন হাসির ঝঙ্কারে সমস্ত ঘরখানা রেবা ভরে তুলল।

"সত্যি—বাবা-মা'র ঝগড়া দারুন ইন্টারেস্‌টিং। ফাইন—আর্টিস্টিক ব্যাপার।"

"ফেল করে তোর দুঃখ হচ্ছে না রেবা?"

"বিন্দুমাত্র নয়। পাস করলেই দুঃখিত হতাম ইউনিভার্সিটির দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে।" রেবা সুপ্রিয়ার পাশ ঘেঁষে বসে পড়ল, "আসল কথা কী, জানিস? বাবার উচিত এবারে আমার বিয়ে দেওয়া।"

"ছিঃ ছিঃ।" সুপ্রিয়া লাল হয়ে উঠল, "তোর লজ্জা করছে না এসব বলতে?"

"তার চাইতেও লজ্জা হচ্ছে বাবার টাকা আর ভোম্বলদার পরিশ্রম নষ্ট হচ্ছে বলে। তোকে সত্যি কথা বলি, ভাই। আমি খুব ভালো গিন্নী হতে পারব।"

"বটে?"

"তুই দেখিস। এমন ভালো বাজারের হিসেব রাখব যে, চাকরে একটা পয়সা সরাতে পারবে না। কোর্টে যাওয়ার সময় কর্তা দেখবেন তাঁর কোট-ট্রাউজারের একটা বোতামেও গোলমাল নেই। গয়লা জোলো দুধ দিয়ে পার পাবে না। ধোপা যদি একটা জিনিসও খুইয়েছে, তাহলে আমার হাতে তার নিস্তার নেই। ছেঁড়া মোজা সেলাই করার ব্যাপারে আমার অ্যাচিভমেন্ট দেখে পাড়ার ঝানু গিন্নীদেরও তাক লেগে যাবে।"

সুপ্রিয়া হেসে উঠল।

"হাসির কথা নয়, খুব সিরিয়াসলি বলছি! পৃথিবীতে সব কাজ করবার জন্যে সবাই আসে না। একদল মেয়ে জন্মায় গিন্নী হবার জন্যে, আর একদল জন্মায় না-হওয়ার জন্যে। আমি প্রথম দলের। বাবা সেটা বোঝেন না—তাই এখনো আমার বিয়ে দিচ্ছেন না।"

"বলিস তো আমি কাকাকে জানাতে পারি।"

"আমার আপত্তি নেই। তবে জানিস তো, বাবা উকিল মানুষ। সোজা জিনিসটাকে ঠিক উলটো দিক থেকে দেখবেন। নির্ঘাত মনে করবেন আসলে বিয়ের ইচ্ছেটা তোরই ; নিজে বলতে পারিসনে, তাই আমার ওপরে চাপাচ্ছিস। আর বিকেলেই দেখবি প্রসপেক্‌টিভ্‌ বর আর তাদের বাবা-দাদাদের পায়ের ধুলো পড়তে শুরু হয়েছে।"

সুপ্রিয়া হেসে বললে, "ভালোই তো। আমিও বিয়ে করে ফেলব।"

"উঁহু—সে হবে না।" রেবা মাথা নাড়ল।

"কেন হবে না ? আমিও তো গিন্নী হতে পারি।"

"না। যারা গিন্নী না হওয়ার জন্যেই জন্মায়—তুই সেই দলের।"

"বলিস কী! আমার কোনো আশা নেই ?"

রেবা হাসতে যাচ্ছিল, কিন্তু হাসতে পারল না। কী মনে করে কিছুক্ষণ সুপ্রিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, "আমার কী মনে হয়, জানিস ? তোকে সবাই খুঁজবে, কিন্তু তুই কাউকে চাইতে পারবি না। তোর কাছে অনেকে আসবে, কিন্তু তোর মনে হবে, তারা সবাই যেন এক-একটা টুকরো। সকলকে মিলিয়ে একজন মানুষকে তুই পেতে চাইবি, কিন্তু সেই মানুষটি তোর জীবনে কোনোদিন ধরা দেবে না।"

কী মনে করে একসঙ্গে এতগুলো কথা রেবা এমন করে সাজিয়ে বলে গেল সে-ই জানে। হয়তো বলার জন্যেই বলা, হয়তো এমনি ভারী ভারী কথা বললে নিজের কানেই শুনতে ভালো লাগে—তাই বলা। কিন্তু এই মুহূর্তে একবারের জন্যে সুপ্রিয়ার মুখের সমস্ত রক্ত সরে গেল, একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে। এক মুহূর্ত। ঘরের বাতাসটা হঠাৎ থমথম করতে লাগল।

সুপ্রিয়া জোর করে হাসতে চেষ্টা করল, "অভিশাপ দিচ্ছিস ?"

"না—দুশ্চিন্তা হচ্ছে।" রেবার মুখে ছায়া নেমে এল, "সত্যি বলছি, তোর সম্বন্ধে প্রায়ই এমনি একটা ভয় আমার মনে ভেসে ওঠে। ভাবি তোর নামের সঙ্গে জীবনেরও কোথাও একটা মিল আছে। তুই প্রিয়াই বটে—কিন্তু কোনো জীবনেই বুঝি তুই স্থির হয়ে থাকতে পারবি না—ঘর বাঁধতে পারবি না কোথাও।"

আবার সেই থমথমে আবহাওয়া। জানলার বাইরে পার্কের পাশে পাম গাছের পাতা কাঁপছে। যেন একটা কঙ্কালের আঙুল হাতছানি দিচ্ছে বাইরে থেকে।

একটু চুপ করে থেকে রেবা বললে, "একটা কথার জবাব দিবি ?'

'বল।"

"জীবনে ক'জন মানুষকে আজ পর্যন্ত তোর ভালো লেগেছে ?"

সুপ্রিয়ার শঙ্খের মতো সাদা মুখখানা পাথরের মূর্তির কয়েকটা কঠিন রেখায় স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর সুপ্রিয়া বলল, "আজ এ-সব কথা থাক—বড় মাথা ধরেছে।"

দুর্গাশঙ্করের ওখান থেকে ফিরে নিজের ঘরে কাপড় বদলাচ্ছিল সুপ্রিয়া। উত্তেজিতভাবে রেবা এসে উপস্থিত হল।

"জানিস—আজ কে এসেছিল তোর খোঁজে ?"

"কে ?"

"লখ্‌নউয়ের দীপেন বোস।"

'দীপেন বোস !"

'বা—চিনতে পারিসনি ? তোর বাবা যখন লখ্‌নউয়ে থাকতেন তখন ওঁরা নাকি তোদের পাশের বাড়ির বাসিন্দা ছিলেন। খুব পরিচয় ছিল নাকি তোদের সঙ্গে। চিনতে পারিসনি ?"

সুপ্রিয়া ক্লান্ত হাসি হাসল, "চিনব না কেন ? অত বড় গাইয়ে, ওঁর 'আয়ি রে গগনমে কারী বদরিয়া' তো সারা ভারতবর্ষের লোকে গুনগুন করে। তা দীপেনদা কলকাতায় কেন ?"

"কী একটা কনফারেন্সে এসেছেন। নর্থ ক্যাল্‌কাটায়।"

"বুঝেছি। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখছিলাম বটে। কিন্তু দীপেনদার নাম তো চোখে পড়েনি। উঠেছেন কোথায় ?"

"পার্ক সার্কাসে। ঠিকানা রেখে গেছেন। তবে কাল সকালে নিজেই আসবেন আবার।"

সুপ্রিয়া চুপ করে রইল। দীপেন বোস। জীবনে আর-এক গ্রন্থি।

"একদিন আমাদের এখানে গান গাইতে বলিস না। অত বড় গাইয়ে। বাবা ওঁদের অ্যাসোসিয়েশনের কী একটা মীটিঙে গেছেন, দীপেনবাবুর সঙ্গে দেখা হয়নি। শুনলে তো লাফিয়ে উঠবেন। তোর সঙ্গে এত পরিচয়, বললে গাইবেন না এখানে ?"

"বলে দেখব।"

রেবা চলে গেল। আয়নার সামনে সুপ্রিয়া দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। আর-এক গ্রন্থি। আশ্চর্য, দীপেন বোসের এখনো তাকে মনে আছে !

ম্যাট্রিকের পর। বাবা লখ্‌নউয়ে পোস্টেড। ওঁর চাকরিটা বড় গোলমেলে —ছ মাস এখানে ছ মাস ওখানে। তাই বাবা বাইরে বাসা করেন না, ওরা দেশেই থাকে। কিন্তু সুপ্রিয়া যেবার পরীক্ষা দিল, সেবার হঠাৎ শক্ত অসুখে পড়লেন বাবা। টেলিগ্রামে খবর পেয়ে মা'র সঙ্গে লখ্‌নউয়ে গেল সুপ্রিয়া।

দুখানা ঘর ভাড়া করা হয়েছিল। পাশের বাড়িতেই দীপেন বোসেরা থাকত।

থাকত বলেই সে-যাত্রা রক্ষা। তারাই দেখাশোনা সেবাযত্ন করেছিল। নইলে ওরা গিয়ে বাবাকে হয়তো দেখতেই পেত না। আর সব চাইতে বেশী সেবা করত দীপেন বোস। রাত জেগে হাওয়া করত, ওষুধ খাওয়াত ঘণ্টায় ঘণ্টায়, মাঝরাতে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনত।

বাবার অসুখ সারল এক মাসেই। এর মধ্যেই দুই পরিবারের পরিচয় নিবিড় হয়ে উঠেছে।

একদিন দীপেন বললে, "শুনলাম তুমি গান গাইতে পারো সুপ্রিয়া। শোনাও আমাকে।"

"আপনাকে ? আপনি এত বড় গাইয়ে—"

"বড় গাইয়ে হলেই ছোট গাইয়ের গান শুনতে নেই এমন কথা শাস্ত্রে লেখে না। তানপুরো চলবে ?"

"চলবে।"

"নাও তবে—"

গাইতেই হল অগত্যা। মীরার ভজন। গ্রামের ওস্তাদ সারদা দাসের সবচেয়ে প্রিয় গানটি।

দীপেন সঙ্গত করছিল। গান শেষ হলে কিছুক্ষণ দুটো উজ্জ্বল চোখ মেলে তাকিয়ে রইল সুপ্রিয়ার দিকে। পনেরো বছরের কিশোরী। শঙ্খের মতো সাদা রঙ। মাথার কোঁকড়া চুলগুলো একটু লালচে। কিন্তু তাই বলে চোখদুটো পিঙ্গল নয়—গভীর কালো। পরনে সাদা জরিপাড়ের শাড়ি। ঠিক সরস্বতীর মূর্তির মতো মনে হচ্ছিল।

দীপেন বললে, "গলায় গান নিয়েই জন্মেছ তুমি। কোনো ভাবনা নেই তোমার।"

সেই শুরু। শেষ পর্যন্ত ঃ

"যদি বলি, তোমাকেই আমার সবচেয়ে বেশী দরকার ?"

দু পা সরে গেল সুপ্রিয়া। দীপেনের ঘর। বাইরে মাঝরাতের মতো দুপুর। ঘরে আর কেউ ছিল না। দীপেনের চোখে মাতলামির রঙ মাখানো।

"কী বলছেন আপনি ?"

"তুমি চলে এস আমার কাছে।"

"কেমন করে আসব ?"

"গানের ভেতর দিয়ে। আমার যা আছে সব দেব তোমাকে। আরো যা পাব—তা-ও এনে দেব।"

"এসব কী কথা দীপেনদা ?"

"আমাকে বিয়ে করো তুমি। আমার গানে তুমি প্রেরণা হও। তোমার ছোঁয়ায় আমার সুর আরো সুন্দর হয়ে উঠুক। সুপ্রিয়া—তুমি আমায় ছেড়ে যেয়ো না।"

সুপ্রিয়া কাঁপতে লাগল। দীপেনের চোখের দিকে তাকিয়ে যেন বুকের রক্ত শুকিয়ে এল তার।

"কিন্তু তা কী করে হয় দীপেনদা ? আপনার যে স্ত্রী আছে।"

"স্ত্রী আছে, কিন্তু সঙ্গিনী নেই। গান আছে, কিন্তু গানের লক্ষ্মী নেই। সেই জায়গা তুমি নাও।"

"বাবা রাজী হবেন না। তা ছাড়া এত তাড়াতাড়ি—"

"বেশ তো, আমি অপেক্ষা করব। তুমি সাবালিকা হয়ে ওঠো। তখন আর কোথাও কোনো বাধা থাকবে না। আমাকে কথা দাও সুপ্রিয়া—"

ঠিক এই সময় বাড়ির চাকর কয়েকটা চিঠিপত্র নিয়ে এসেছিল। যেন চকিতের ভিতরে একটা কঠিন জাল ছিঁড়ে গিয়েছিল সুপ্রিয়ার, মুক্তি পেয়েছিল ভয়াবহ একটা সম্মোহনের গ্রাস থেকে।

"আচ্ছা—ভেবে বলব—"

সুপ্রিয়া ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল একরকম। চাকরটা কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তার দিকে, যেন কী একটা বুঝতে চাইছিল। আর চলে যেতে যেতেও সুপ্রিয়া অনুভব করছিল, দুটো উত্তপ্ত জ্বলন্ত চোখ পিছন থেকে সমানে তাকে অনুসরণ করে আসছে।

দু-দিন পরেই তারা ফিরে এসেছিল দেশে।

দীপেনের খানতিনেক চিঠি এসেছিল তারপরে। মা'র নামে। ওঁদের কুশল জানতে চেয়েছিল। অবশ্য তার ভিতরে গোটাকয়েক লাইন ছিল সুপ্রিয়ার জন্যেও।

"কেমন আছ? গান শেখা চলছে তো ভালো? আমাকে চিঠি লেখো না কেন?"

মা সেগুলো তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সুপ্রিয়া কোনো জবাব দেয়নি। জবাব দেবার সাহস ছিল না তার।

পাঁচ বছর পরে দীপেন বোস এসেছে কলকাতায়। তার খবর জানতে চায়। কী খবর চায় দীপেন বোস—কী বলবে তাকে? সেই মাতলামি-ভরা দুপুরটার কথা কি এখনো সে ভুলে যায়নি? এখনো কি সেদিনের সেই নেশাটা তার মাথার ভিতরে জমাট বেঁধে আছে? আজও কি দীপেন বোস তাকে আবার বলবে, "আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছি? এখন তো তুমি বড় হয়ে গেছ—আর কোথাও তো কোনো বাধা নেই?"

সুপ্রিয়া পথে আসতে আসতে ভেবেছিল, আজ একটা চিঠি লিখবে কান্তিকে। আর মনে মনে অনেকগুলো কথা সাজিয়ে রাখবে অতীশের জন্যে। কাল যখন বকুলতলায় এসে অতীশ অপেক্ষা করবে তার জন্যে, তখন সেই সব কথা দিয়ে সান্ত্বনা দেবে তাকে।

কিন্তু আজ আর কিছু হবে না, কিছুই না। সারারাত চোখের সামনে একটা ছায়া দুলবে আজ। দীপেন বোসের ছায়া। লখ্‌নউ থেকে কলকাতা পর্যন্ত সেই বিরাট ছায়াটা বিশাল কালো রাত্রির মতো জমাট বাঁধতে থাকবে—তার ভিতরে কান্তি আর অতীশের মুখ কোথায় যেন হারিয়ে যাবে।

চার

অতীশ মেসে ফিরে এল।

রাসবিহারী অ্যাভেনিউয়ের মোড় থেকে কাঁকুলিয়া পর্যন্ত হেঁটে এসেছে—অনেকখানি রাস্তা। ট্রামে বাসে চড়েনি, নিজেকে নিয়ে একা থাকতেই চাইছিল।

সুপ্রিয়া। সুপ্রিয়ার সঙ্গে পরিচয় কলেজের বার্ষিক উৎসবে। ইউনিয়নের

সেক্রেটারি ছিল অতীশ।

"আপনি এত ভালো গান গাইতে পারেন। নিজেকে কেন লুকিয়ে রেখেছিলেন?"

সুপ্রিয়ার হয়ে জবাব দিয়েছিল সেকেণ্ড ইয়ারের কেকা রায়।

"খোঁজার কাজ তো আপনার। সেই জন্যেই তো আমরা আপনাকে ভোট দিয়ে ইউনিয়নের সেক্রেটারি করেছি।"

"ঠিক কথা। আমি লজ্জিত।" কলেজের রত্ন, বি এস-সি অনার্সের সেরা ছাত্র সুপ্রিয়ার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "আত্মপ্রকাশ যখন একবার করেছেন, তখন আর আত্মগোপন করতে পারবেন না। সরস্বতী পুজোর ফাংশনেও কিন্তু আপনাকে গাইতে হবে—বায়না দিয়ে রাখলাম।"

জীবনের সবচেয়ে পুরনো গল্পটা আবার নতুন করে শুরু হল।

আরো তিন বছর কেটে গেল এর মধ্যে। অতীশ এম-এসসি পাস করে রিসার্চ করছে, সুপ্রিয়া বি-এ পাস করে নিয়েছে স্কুল-মাস্টারি আর গান শেখার কাজ।

অতীশ বলেছিল, "এম-এ পড়লে না কেন?"

"কী হবে পড়ে?"

"সে কি কথা! তা হলে বি-এ পাস করলে কেন?"

"ওটুকু প্রসাধন বলতে পারো। ভদ্রসমাজে বেরুতে গেলে নিজের ওপর যেটুকু কারুকাজ করে নিতে হয়, ঠিক তাই। ও ছাড়া ও ডিগ্রিটার আর কোনো অর্থ নেই আমার কাছে।"

"কিন্তু স্কুল-মাস্টারি তো নিয়েছ। চাকরিই যদি করতে হয়, তা হলে এম-এটা কি আরো বেশী দরকার নয়?"

"সর্বনাশ! এর পরে তুমি হয়তো আমায় বি-টিও পাস করতে বলবে। অর্থাৎ একেবারে আপাদ-মস্তক মাস্টারির ছাপ—নিজের আর কোনো অস্তিত্বই থাকবে না!"

"তা হলে কী চাও তুমি?"

"গান শিখতে। চাকরি করছি কেবল হাত-খরচার জন্যে, ও নিয়ে আর বাবার ওপরে চাপ দিতে ইচ্ছে করে না। যেদিন শেখা হয়ে যাবে, সেদিন আর এত সহজে আমায় দেখতে পাবে না।"

"কোথায় যাবে?"

"সারে হিন্দুস্তানে। তামাম গুণী-জ্ঞানীর দরবারে।"

"সেখানে আমি যেতে পারব না?"

"সাধ্য কী! তোমার সোনার মেডেলগুলো সেখানে অচল। প্রকাণ্ড আসরে আমি গাইব, সেরা ওস্তাদেরা সঙ্গত করবে, সমজদারদের মাথা দুলবে, থেকে থেকে বলে উঠবে ঃ আহা-হা—সাবাস-সাবাস! সামনে ক্যামেরার ফ্ল্যাশ জ্বলবে ঘন ঘন। কুড়ি টাকার টিকেটও হয়তো তুমি কিনতে পারবে না।"

"কুড়ি টাকার টিকেটও না?"

"না। যাদের মস্ত ব্যবসা, অনেক টাকা, অনেক বড় বড় মোটরগাড়ি, তারা আগে থেকেই সব সীট বুক করে রাখবে। তুমি বরং রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে মাইকে আমার গান শুনতে পাবে। দেখতে পাবে না আমার পায়ের কাছে এসে পড়ছে বড় বড় ফুলের তোড়া, আর হাতে পাঁচ-সাতটা হীরের আংটি-পরা বড়লোকের দল কী ভাবে আমাকে স্তুতি করে বলছে : আপনার গান শুনে দিল্ ভারী খোশ হল। অ্যায়সা মিঠা গানা কোথোনো হামি শুনেনি।"

অতীশ হাসবার চেষ্টা করেছিল, "ততদিনে ব্যবসা করে আমিও তো বড়-লোক হতে পারি। আমিও তো গিয়ে তাদের দলে ভিড়ে বলতে পারি : বড় খাসা গেয়েছেন—শুনে আমি বড় খুশ্ হলাম।"

"হবে না—সে আশা নেই। ল্যাবরেটরিই তোমার মাথা খেয়েছে। তুমি বড় জোর একটা প্রফেসর হবে। আর এ-কথা তুমি নিজেও নিশ্চয় জানো যে, মিউজিক কন্‌ফারেন্সের টিকেট প্রোফেসারের মাইনের সীমানা থেকে অনেক দূরে থাকে।"

কথাগুলো সেদিন হালকাই ছিল। কিন্তু আজ আর নয়। একরাশ মেঘের মতো ঘনিয়ে আসছে মনের উপর। এই মাঝে মাঝে দেখাশুনো, বকুলতলা থেকে হাঁটতে হাঁটতে অনেকখানি এগিয়ে দেওয়া, এক-আধদিন সিনেমায় যাওয়া, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালের পাশে এক-আধটা ছেঁড়া-ছেঁড়া সন্ধ্যা, এর বেশী আর কী পাবে অতীশ? কতখানিই বা পাবে?

মেসের ঘরে বসে অতীশ ভাবতে লাগল। পাশের সীটের ছেলেটি এবারে এম-এসসি পরীক্ষার্থী, ঘাড় গুঁজে বসে আছে বইয়ের ভিতরে। ওর চশমার পাওয়ার মাইনাস সেভেন। পাস করবার আগেই চোখ দুটো যাওয়ার সম্ভাবনা।

ঠিক কথাই বলেছে সুপ্রিয়া। কী হবে পড়ে? এ-পথ ওর জন্যে নয়।

"চাকরি করার কথা ভাবতেই আমার বিশ্রী লাগে।" সুপ্রিয়া বলেছিল।

"এমন কথা বলছ এ-যুগের মেয়ে হয়ে?"

"এ-যুগের মেয়ে বলেই তো বলছি। জীবনে এত ঐশ্বর্য আছে, এত রূপ আছে, এত গান আছে। সেগুলো সব ফেলে দিয়ে কত দুঃখে মেয়েরা চাকরি করতে আসে, সে কি তুমি জানো? আজ তোমরা আর তাদের ভালোবাসার আড়াল দিয়ে ঢেকে রাখতে পারো না, আশ্রয় দিতে পারো না সেই দুঃখেই তো তারা এমন করে বাইরে বেরিয়ে আসে।"

তর্ক করা চলত। সে-তর্কে সুপ্রিয়া জিততে পারত না। কিন্তু অতীশ কথা বাড়াল না। কী হবে বাড়িয়ে? সুপ্রিয়া নিজের কথা বলছে। ওর আশার কথা, ওর বিশ্বাসের কথা।

অতীশ জানে না কী হবে। সুপ্রিয়া সত্যিই চলে যাবে কাছ থেকে। বলেছে, আর দু-বছর পরেই বেরিয়ে পড়বে। যাবে পুনা—যাবে বোম্বাই—তারপর দক্ষিণভারত। কত শেখবার আছে। সারা ভারতবর্ষে গানের তীর্থ—গীতশ্রীর দেবালয়। সেই তীর্থে তীর্থে প্রদক্ষিণ করতে হবে তাকে, প্রণাম

করতে হবে কত বিশ্বনাথের দেউলে, কত মহাকাল মন্দিরে, কত কাম্ভীভরমের জ্ঞানবাপী—গোপুরমে। কত গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হবে তার।

তার পথ সেই সারা ভারতবর্ষময় ছড়িয়ে আছে। তার গান ছড়িয়ে আছে রাজপুতানার বিশাল মরুভূমিতে, আরব-সমুদ্রের কলগর্জনে, সেতুবন্ধ-রামেশ্বরের ত্রি-সমুদ্রের সঙ্গম-রাগিণীতে। সেখানে কোথায় অতীশ, কতটুকু অতীশ।

শুধু একদিন সুপ্রিয়া বলেছিল, "যেখানে যাই, যতদূরেই যাই, তোমাকে আমি কখনো ভুলব না। যদি আর কাউকে নিয়ে কখনো ঘর বাঁধি—আমার বুকের ভেতরে তুমিই জুড়ে থাকবে।"

"সে তো আর-একজনকে ঠকানো হবে সুপ্রিয়া।"

"সংসারে মানুষ তো সব সময়েই এ-ওকে ঠকিয়ে চলেছে অতীশ। কেউ কম, কেউ বেশী। সবাই যা করে, তার জন্যে আমার লজ্জা নেই। যে পকেট মারে আর যে ব্যাঙ্ক লুঠ করায়, পাপের দিক থেকে তারা দুজনেই সমান।"

"এ যুক্তি ভালো নয় সুপ্রিয়া। লোকে একে ইম্‌মর‍্যাল বলবে।"

"বলুক। পৃথিবীতে অনেক ভালো কথা আছে অতীশ, তার সবগুলো কেউ কোনোদিন নিতে পারেনি। আমার দিক থেকেও নয় খানিকটা ফাঁক থেকেই গেল। যতদিন বাঁচব, আমি তোমাকেই ভালবাসব অতীশ। আর-একটা কথা বলি। যদি কখনো আমার সব চাইতে বড় দুর্দিন আসে, যদি তোমার কাছে আমি আশ্রয়ের জন্যে এসে দাঁড়াই, সেদিন তুমি তো আমায় ফিরিয়ে দেবে না?"

"তোমাকে ফিরিয়ে দেব সুপ্রিয়া? এ-কথা ভাবতে পারলে?"

"অতীশ, তুমিও তো মানুষ। ধরো, তখন তুমি বিয়ে করেছ, তোমার সংসার হয়েছে। সে সময় আমি যদি তোমার কাছে এসে বলি, আজ থেকে আমি তোমার কাছেই থাকব, তখন—"

"তোমার জন্যে আমি সব পারব সুপ্রিয়া। সকলকে ছেড়ে তোমাকেই বুকে তুলে নিয়ে চলে যাব।"

"কথাটা নাটকীয় অতীশ। তবু শুনতে ভালো লাগছে। তা ছাড়া জীবনের সব মিষ্টি কথাই তো মিথ্যে কথা। সত্যের নিষ্ঠুরতার ওপরে ওইটুকু রঙের আবরণ। কিন্তু আমি মনে রাখব।"

অতীশ একটা নিঃশ্বাস ফেলল। পাশের সীটে ছেলেটি ঘাড় গুঁজে সমানে পড়ে চলেছে। চোখে মাইনাস সেভেন পাওয়ারের চশমা। পিঠটা উটের কুঁজের মতো বেঁকে রয়েছে।

কী হবে পড়ে?

বাইরে হাওয়া উঠল। একটু দূরের শিরীষ গাছটার পাতায় মর্মর। রাজপুতানার মরুভূমি, বোম্বাইয়ের সমুদ্রতট, দক্ষিণাপথের গ্র্যানিট পাথরে সমুদ্রের গান।

পাঁচ

পার্ক সার্কাসের বাড়িতে নিজের ঘরে মদের বোতল নিয়ে বসে ছিল দীপেন বোস।

গীতা কাউর এসে ঢুকল। দীর্ঘচ্ছন্দা পাঞ্জাবী মেয়ে। সিল্কের সালোয়ার-পাঞ্জাবিতে গাঢ় লাল রঙের কয়েকটা ফুল। গলা জড়িয়ে নীল ওড়না।

"কী পাগলামি করছ দীপেন? প্লীজ—নো মোর।"

"হোয়াই? কেন আর না?" লাল টকটকে চোখ দীপেনের। বললে, "ইট্স নট্ ইয়োর বম্বে! নো প্রহিবিশন। আই হ্যাভ্ এভ্রি রাইট্ টু—"

"প্লীজ দীপেন—তোমার লিভার ভালো নয়?"

"মরে যাব বলছ? মরতেই তো চাই।"

দু পা এগিয়ে গীতা কাউর বোতলটা কেড়ে নিলে। মাতালের কুৎসিত হাসি হেসে উঠল দীপেন।

"বাঁচতে দেবে না—আবার মরবার সুখটুকুও কেড়ে নিতে চাও?"

বোতলটা নেবার জন্যে উঠে দাঁড়াল দীপেন, পারল না। হুড়মুড় করে টলে পড়ে গেল মেঝের উপর। গীতা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সেদিকে, তারপর আলোটা নিবিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এক

সকালে উঠেই একরাশ নোট নিয়ে বসে ছিল অতীশ। একটা জটিল ক্যালকুলেশনের জট খুলছে না কিছুতেই। অথচ এর রেজাল্টের উপর কাজের অনেকখানি নির্ভর করছে।

সামনে চা ছিল এবং সেটা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল অনেকক্ষণ আগেই। সেটাতে চুমুক দিয়েই নামিয়ে রাখল। সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেখল দেশলাইয়ে কাঠি নেই।

সব দিক থেকেই বিরক্তির মাত্রাটা যেন চরম। পাশের সীটের মনোযোগী ছাত্রটির দিকে অতীশ একবার তাকাল। যদিও ও আদর্শ ভালো ছেলে—সিগারেট কেন, সুপুরির কুচিও চিবোয় না—তবু ওর বালিসের নীচে ঘোড়ার-মুখ-আঁকা একটা দেশলাই আছে, অতীশ জানে। কখনো কখনো অনেক রাতে ও মোমবাতি জ্বেলে পড়াশোনা করে।

সিগারেট ধরাবার জন্যে ওর কাছে দেশলাই চাইবে কিনা এ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার আগেই দরজার গোড়ায় দেখা দিল মন্দিরা।

"আসতে পারি?"

"কী আশ্চর্য—আপনি!"—তটস্থ হয়ে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াতে গেল অতীশ। হাতের ধাক্কা লেগে খানিকটা ঠাণ্ডা চা ছলকে গেল অঙ্কটার উপর। ওপাশের

সীট থেকে পড়ুয়া ছাত্র শ্যামলাল তার কড়া পাওয়ারের চশমার মধ্য দিয়ে ভ্রূকুটি হানল।

মন্দিরা ঘরে পা দিয়ে বলল, "বিরক্ত করলাম ?"

"কিছুমাত্র নয়। আসুন।"

মন্দিরা এসে অতীশের বিছানার উপরে বসল। অতীশের একবার মনে হল, খবরের কাগজ দিয়ে বালিশ দুটোকে ঢেকে দিতে পারলে মন্দ হত না। ভারী নোংরা হয়ে গেছে ওয়াড়গুলো।

"কাজ করছিলেন ?"

"করতে বাধ্য হচ্ছিলাম।" অতীশ হাসল।

"ভারী অন্যায় হল তা হলে !"

"একেবারেই না। আমাকে বাঁচালেন। ভাবছিলাম সব ফেলে নিজেই উঠে পড়ব। কিন্তু এখন অন্তত একটা কৈফিয়তের সুযোগ রইল বিবেকের কাছে। আপনার অনারে অংকটাকে ছুটি দিয়েছি।"

"তার মানে আমাকেই অপরাধী করলেন শেষ পর্যন্ত।"

"ওই দেখুন !" হাতের সিগারেটটা ঠোঁটের কোণায় ছুঁইয়ে, তারপরে দেশলাই নেই সে-কথা মনে করে, অতীশ সেটাকে নামিয়ে রাখল। বললে, "আপনাদের কাছে সিন্‌সিয়ার হওয়ারও জো নেই। আপনারা কেবল মিথ্যে কথা শুনতেই ভালোবাসেন।"

শ্যামলাল ছট্‌ফট করে উঠল। পুরু চশমার মধ্য থেকে একটা বিস্বাদ দৃষ্টি ফেলল অতীশের দিকে। তারপর দুখানা মোটা মোটা বই তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মন্দিরা কিছু একটা অনুমান করল। সংকুচিত হয়ে বললে, "উনি বোধ হয় একটু বিরক্ত হয়েছেন।"

"বিরক্ত নয়—ব্যথিত হয়েছেন।" বলেই অতীশ শ্যামলালের বালিশের তলা থেকে বিদ্যুৎবেগে ঘোড়ার-মুখ-আঁকা দেশলাইটা সংগ্রহ করল।

"ব্যথিত কেন ? পড়ায় বাধা হল বলে ?"

"শুধু তাই নয়। পড়াটাকে ও তপস্যা বলে মনে করে। সেই তপস্যার ক্ষেত্রে নারীর আবির্ভাব ঘটলে ওর ব্রতভঙ্গ হয়।"

"ছিঃ—ছিঃ—আপনি আমাকে আগে বললেন না কেন ?"

"কিচ্ছু ভাববেন না।" সিগারেট ধরিয়ে দেশলাইটা আবার শ্যামলালের বালিশের তলায় চালান করে দিয়ে অতীশ বললে, "ওর চিত্তশুদ্ধির জায়গা আছে। সেখানেই গেছে।"

"সে আবার কোথায় ?"

"তেতলার ওপরে—চিলেকোঠায়। সেখানে ঘুঁটের স্তূপ আছে। তারই ওপরে গিয়ে বসবে শ্যামলাল। শরীর পবিত্র হয়ে যাবে। তারপর শান্ত চিত্তে কেমিস্ট্রির আধ্যাত্মিক রসে ডুব মারবে।"

মন্দিরা শব্দ করে হেসে উঠল।

"আপনি ওঁকে প্রায়ই বিব্রত করেন বলে মনে হয়।"

"আমি?" অতীশ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল, "নিজের চারদিকে ওর এমন শক্ত খোলা আছে যে, পৃথিবীতে কেউ ওকে বিব্রত করতে পারবে না। তেমন অসুবিধে বুঝলে ও নিজেকেই গুটিয়ে নেবে তার মধ্যে। আমার সম্পর্কে ও অত্যন্ত সন্দিগ্ধ। ওর ধারণা আমি ফাঁকি দিয়ে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছি -- রিসার্চ করি না, ইয়ার্কি দিয়ে বেড়াই।"

"নিদারুণ ভালো ছেলে!" মন্দিরা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "দিন না আলাপ করিয়ে। আমি কেমিস্ট্রিতে বড্ড কাঁচা। একটু দেখে-টেখে নেব ওঁর কাছ থেকে। যদি আমাকে প্রাইভেটে দয়া করে পড়ান তবে সে তো আরো ভালো।"

"তার মানে ওই ঘুঁটের ঘরেই ওকে পাকাপাকি নির্বাসিত করতে চান? ও কি আর ওখান থেকে নামবে তাহলে? ল্যাভের মধ্যে বিছেটিছের কামড় খেয়ে একটা কেলেঙ্কারি করে বসবে।"

মন্দিরা আবার হেসে উঠল: "আপনি সাংঘাতিক। কিন্তু একটা কথার জবাব দিন তো? আমাদের বাড়িতে যাওয়া একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন কেন?"

"এতদিন সময় পাই নি।"

"থীসিসের জন্যে?"

"খানিকটা। প্রায়ই ল্যাবরেটরি থেকে বেরুতে দেরি হয়ে যায়।"

"রবিবার?"

"ঘুমুতে চেষ্টা করি।"

"সারাদিন?"

"ইচ্ছেটা তাই থাকে বটে, তবে পেরে ওঠা যায় না।" অতীশ দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "অবিমিশ্র সুখ বলে সংসারে কিছু নেই, জানেন তো? প্রায় রবিবারেই শ্যামলালের আর-একটি সীরিয়াস বন্ধু এসে জোটে—দুজনে মিলে কেমিস্ট্রি নিয়ে নিদারুণ চ্যাঁচামেচি শুরু করে দেয়।"

"তখন বাধ্য হয়ে উঠে পড়তে হয়—এই তো? তা সে-সময় আমাদের ওখানে চলে এলেই পারেন।"

"ঘুমুবার জন্যে?"

মন্দিরা বললে, "নাঃ—আপনি হোপলেস। ও-সব থাক। যা বলতে এসেছিলাম। আজ সন্ধ্যায় আপনি আমাদের বাড়িতে আসছেন।"

"কেন আসছি?"

"ছোড়দা কেম্‌ব্রিজ থেকে ট্রাইপস নিয়ে ফিরেছে—শুনেছেন আশা করি। আজকে রিসেপ্‌শন আছে তার।"

একটু চুপ করে রইল অতীশ। বললে, "আচ্ছা, চেষ্টা করব।"

"কোনো কাজ আছে?"

'একটুখানি।"

মন্দিরার মুখে অল্প একটু ছায়া পড়ল: "কাজটা জরুরী?"

"খানিকটা।"

"ও!" মন্দিরা হাতের ব্যাগটার কারুকার্যের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। চামড়ায় খোদাই-করা নটরাজের মূর্তি। আঙুলের ঘামে ফিকে হয়ে এসেছে।

"তা হলে আসছেন না?"

"বললাম তো চেষ্টা করব।"

এতক্ষণের লঘু আবহাওয়াটা হঠাৎ ভারী হয়ে উঠল। একটা শিথিল ক্লান্তিতে অতীশ কেমন পীড়িত বোধ করল, এতক্ষণের প্রগল্‌ভতাগুলোকে অত্যন্ত অবান্তর বলে মনে হল তার। আর মন্দিরার মনে হল, সকালবেলাতেই তার এভাবে এখানে চলে আসবার কোনো প্রয়োজন ছিল না—একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিলেই চলত।

"বেশ, চেষ্টা করবেন।" মন্দিরা উঠে দাঁড়াল, "তা হলে আসি আজ।"

"এক্ষুনি চললেন?"

"হ্যাঁ,—আমাকে আরো কয়েক জায়গায় বলে যেতে হবে।"

মন্দিরা বেরিয়ে গেল। ওকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিলে হত—অতীশ একবার ভাবল। কিন্তু কী লাভ হত তাতে? অপরাধের মাত্রা এতটুকুও কমত না।

দূর-সম্পর্কের আত্মীয়তার সূত্র। কিন্তু ব্যাপারটা সেইখানেই দাঁড়িয়ে নেই। এক বছর আগেই মন্দিরার চোখ দেখে অতীশ তা বুঝতে পেরেছে। আর সেই থেকেই যাতায়াতের মাত্রা সে কমিয়ে দিয়েছে ও-বাড়িতে।

অবশ্য সুপ্রিয়া না থাকলে অন্য কথা ছিল।

মন্দিরাকে ঠিক খারাপ লাগে তা নয়। অন্তত দুটি ঘণ্টা চমৎকার কাটাতে পারে ওর সঙ্গে। অজস্র কথা বলা যায়, উচ্ছ্বসিত হয়ে গল্প করা চলে। কখনো একটা তীক্ষ্ন যন্ত্রণার মুহূর্ত এলে, কিংবা একটা গভীরতা এসে মনকে জড়িয়ে ধরলে, চুপ করে বসে থাকা যায় ওর পাশে। যে এক-একটা আশ্চর্য একান্ত দুঃখ কাউকে বলা চলে না, কাউকে বোঝানো যায় না, হয়তো সে-কথাও বলা যায় ওকে। এমন কি মন্দিরার একখানা হাত নিজের হাতেও টেনে নেওয়া যায়, তার মধ্যে বিশ্বাস থাকে, বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি থাকে।

অতীশ থামতে পারে ওখানেই। মন্দিরার বিয়ের দিনে সে খুশী হয়ে পরিবেষণের কাজে নেমে পড়তে পারে, শুভদৃষ্টির সময় মন্দিরার মুখের ঘোমটা সরিয়ে সে বলতে পারে, "চোখ মেলে তাকাও, দ্যাখো তোমার পছন্দ হয় কিনা।" বর-কনেকে ট্রেনে তুলে দিয়ে বলে আসতে পারে, "মাঝে মাঝে আমাদের খোঁজ-খবর নিয়ো, একেবারে ভুলে যেয়ো না।"

কিন্তু অতীশ জানে, মন্দিরা তা পারে না। মেয়েদের মনের সমুদ্রে যে ঢেউ ওঠে, তাকে তো ঠেকিয়ে রাখা যায় না রেখার সীমান্তে। পুরুষ বরং নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারে: কিছু স্নেহে, কিছু প্রেমে, কিছু বন্ধুত্বে। কিন্তু মেয়েরা বয়ে চলে একটি ধারায়, একমাত্র খাতে। নিজেকে তারা টুকরো টুকরো করে দিতে জানে না। যা দেয় তা একসঙ্গে, একেবারেই।

"মেয়েটি আমার বান্ধবী।"

এ-ধরনের কথা অনেক শুনেছে অতীশ। হাসি পায়। ইয়োরোপের মেয়েদের কথা ঠিক জানে না। হয়তো একটার পর একটা যুদ্ধে, চারদিকের ঘূর্ণির আঘাতে আঘাতে, তারা প্রেম আর বন্ধুত্বকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পেরেছে। কিন্তু এই দেশে, যেখানে একটুখানি কৌতুকের ছোঁয়ায় মেয়েদের গালে রঙ ধরে, ভারী হয়ে নেমে আসে চোখের পাতা, একটু পরিচয় আর একটু নিঃসঙ্গতার অবকাশ ঘটলে যেখানে গলার স্বর জড়িয়ে আসে, সেখানে—

"মেয়েটি আমার বান্ধবী।"

সেই বন্ধুত্বের পরিণামে বিয়ের সানাই, নইলে রেজিস্ট্রেশন অফিসের এগ্রিমেন্ট ফর্ম। আর নইলে পরীক্ষায় ফেল করা, মাসখানেক উদাস হয়ে বসে থাকা, নিতান্তই গদ্যসর্বস্বের হাতে কাব্যচর্চার ভয়ংকর প্রয়াস, দিনকয়েক দাড়ি রাখা। একজনকে চটেমটে নোলোক-পরা একটি ছোট মেয়েকে বিয়ে করতে দেখেছিল, আর একজন বেসুরো বেহালা-বাজিয়ে পাড়ার লোককে ঝালাপালা করে তুলেছিল।

অতীশ হাসতে গিয়েও হাসতে পারল না। একটা ছোট কাঁটা এসে বিঁধছে কোথা থেকে। মন্দিরার সঙ্গে বন্ধুত্ব হলে বেশ হত। ওর কাছে মন খুলে বলা যেত সুপ্রিয়ার কথা। কিন্তু সমুদ্রের ঢেউকে রেখার ওপারে থামিয়ে রাখা চলে না। অন্তত সে বিশ্বাস অতীশের নেই। হয়তো অন্যে পারে।

কিন্তু সত্যিই কি থামিয়ে রাখা চলে না?

সুপ্রিয়া বলেছিল, "একটা সত্যি কথা বলব?"

"বলো?"

"কষ্ট পাবে না?'

"সেটা তুমিই জানো। কিন্তু কষ্ট যদি সত্যিই পাই, তা হলে বরং না-ই বা বললে। দু-একটা মিথ্যে কথাই না হয় বানিয়ে বলো, শুনে খুশী হতে চেষ্টা করব।"

"ঠাট্টা নয়।" গড়ের মাঠের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা অন্ধকার বটগাছের দিকে চোখ মেলে দিয়ে সুপ্রিয়া বলেছিল, "আমি তোমাকে ভালোবাসি, তা তুমি জানো।"

"এইটেই তোমার সত্যি কথা? তা হলে আরো অনেকবার করে বলো। আমার যত কষ্টই হোক, আমি প্রত্যেকবারই রীতিমত মন দিয়ে শুনব।"

"না—তা নয়।" সুপ্রিয়ার চোখ অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল, "আমি আর-একজনকেও ভালোবাসি।"

চমক লাগল। তবু হার মানল না অতীশ। বেদনার উপর দিয়ে বুদ্ধিকে জাগিয়ে রাখতে চেষ্টা করল। "রানীর ভাণ্ডারে অনেক আছে; অনেককেই সে দু-হাতে দান করতে পারে।"

"তোমার হিংসে হচ্ছে না?"

"অত বড় মিথ্যে কথা বলি কী করে? তবু যথাসাধ্য সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা করব। আমি যা পেয়েছি তার মধ্যে ফাঁক না থাকলেই হল।"

"ফাঁক তো থেকেই গেল। সম্পূর্ণ তোমায় দিতে পারছি না—অর্ধেক। রাগ করলে তো?"

অতীশ একটা ঝকঝকে চকচকে কিছু বলতে চাইল, কিন্তু বলতে পারল না। সুপ্রিয়ার মনের আধখানা আর-একজন অধিকার করে আছে, সেজন্যে অতীশ একটুও আঘাত পাবে না, মনের এত বড় শক্তি তার নেই।

"রাগ করছি না। কিন্তু আমার এই অংশীদারটি কে, তাকে চিনতে পারছি না।"

"চিনতে পারবে না। সে কলকাতায় থাকে না। দুঃখ পেয়ো না অতীশ, তোমাকে সত্যি কথা বলি। আমার কী মনে হয় জানো? আমি আরো—আরো অনেককেই ভালোবাসতে পারি। কাউকে রূপের জন্যে, কাউকে গানের জন্যে, কাউকে বিদ্যার জন্যে। সব ঐশ্বর্য একজনের মধ্যে নেই। আমি সকলের কাছ থেকেই নিতে পারি। পারি না অতীশ?"

অতীশ নিঃশ্বাস ফেলল।

"ঠিক জানি না। তবে ও'নীলের এমনি একটা নাটক পড়েছিলাম বলে মনে হচ্ছে।"

"যারা বই লেখে তারা তো বানিয়ে লেখে না। একটা সত্যকে জীবন থেকেই আশ্রয় করে।" সুপ্রিয়া বলে চলল, "বড় জোর একটু রঙ বুলিয়ে দেয়, যা ঘটা উচিত তাকে ঘটিয়ে দেয়, যে-সুতোগুলোর জোড় মেলেনি তাদের জুড়ে দেয় একসঙ্গে।"

আজকে যে-কথা ভাবছে, সেই কথাই বলেছিল অতীশ, "কিন্তু ওদের মেয়েরা—"

"হয়তো আলাদা। কিন্তু অতীশ, আমিও বোধ হয় একটু আলাদা, আমার চেনাশোনা কারো সঙ্গে যা আমার মেলে না। তুমি তো জানো, কলেজে পড়বার সময় অনেকের সঙ্গে আমি মিশেছি। তাদের কেউ-কেউ অসভ্যতার চেষ্টা করেছে, কেউ-কেউ করুণ চিঠি লিখেছে, কেউ বলেছে, আমাকে না হলে তার সব কিছু মিথ্যে হয়ে যাবে। যারা নোংরা তাদের কথা বলছি না, কিন্তু বাকী সকলের কথাই আমি ভেবে দেখেছি। একজন আমাকে একতাড়া ফুল দিয়েছিল, আমি এনে ফুলদানিতে সাজিয়ে রেখেছি। কবিতার বই উপহার পেয়েছি, আমার শেল্‌ফে আছে তারা। আমি কাউকে আঘাত দিইনি অতীশ, শুধু সত্যি কথাই বলেছি। বলেছি ঃ আমার এখনো সময় হয়নি।"

"জানি।"

"না-জানার তো কথা নয়।" সুপ্রিয়া হেসেছিল, "কলেজে আমার সুনাম ছিল না। বলত ফ্ল্যার্ট। কিন্তু আমি তো কাউকে ঠকাইনি অতীশ। খুঁজেছি। তারপর তুমি এলে। তখনো আমি কাউকে সরাইনি—আপনি সরে গেল সবাই। অথচ ওদের আমি ভুলিনি।"

"সবাইকে ভালোবেসেছ?"

"না—না।" সুপ্রিয়া বলেছিল, "সে-ভয় নেই। ভালো অবশ্য কাউকে

কাউকে লেগেছে কিন্তু ভালোবেসেছি মাত্র আর-একজনকে। ছেলেবেলা থেকেই। তবু সম্পূর্ণ নয়—বাকীটুকু ছিল তোমার জন্যে। এখন ভয় করে অতীশ। হয়তো আবার কেউ আসবে। তোমাদের মাঝখানে সে-ও ভাগ বসাবে।"

অতীশ নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরেছিল এবার। এতক্ষণে যন্ত্রণা দেখা দিয়েছে। সেটাকে চেপে রাখা যাচ্ছে না কিছুতেই। অতীশ বলেছিল, "হয়তো সে-ই তোমার সম্পূর্ণ মানুষ। সেদিন আমরা দু-জন আর থাকব না।"

"সে হবে না অতীশ। আর-একজনের কথা থাক, কিন্তু তুমি তুমিই। সেখানে আর কেউ নেই, কেউ আসতে পারবে না। তা ছাড়া জীবনে যদি সবচেয়ে বড় দুঃখ কখনো পাই, তবে তোমার কাছেই আমাকে ছুটে আসতে হবে। আমি জানি, তুমি সেদিন আমায় ফিরিয়ে দিতে পারবে না।"

বড় রাস্তায় একটা মোটর বার দুই মিসফায়ার করল। অতীশ সজাগ হয়ে উঠল। একটু আগেই সামনে বসে ছিল মন্দিরা। কিন্তু সুপ্রিয়া যা পারে মন্দিরা তা পারে না। অতীশও নয়।

বারান্দায় চটির ক্রুদ্ধ শব্দ। শ্যামলাল ফিরে এল। ধপ করে বই দুটো ফেলল টেবিলের উপর, চেয়ারটা সরিয়ে নিয়ে বসে পড়ল সশব্দে।

ক্যালকুলেশনটা এ-বেলা কিছুতেই মিলবে না। অতীশ ডাকল, "শ্যামবাবু?"

শ্যামলাল গম্ভীর গলায় বললে, "বলুন।"

"একটা ভাল টিউশন করবেন? শ-খানেক টাকা দেবে মাসে?"

কৌতূহলী হয়ে শ্যামলাল ফিরে তাকাল।

"কোথায়? কী পড়ে?"

"বি. এস-সি। একটি মেয়ে। একটু আগেই যাকে দেখেছেন।"

শ্যামলাল দপ করে নিবে গেল। অতীশের চোখের উপর একটা কর্কশ দৃষ্টি ফেলে আরো গম্ভীর গলায় বললে, "না, ছাত্রী আমি পড়াই না।"

অতীশ বিষণ্ন হয়ে রইল। রাজী হলে ভালো করত শ্যামলাল। আরো ভালো করত মন্দিরাকে ভালোবাসলে। তবে মন্দিরা শক্ত ঠাঁই—ওর বাবা মল্লিক সাহেব সহজে বশ মানবার পাত্র নন। তবু প্রেমের মধ্য দিয়ে একটা নতুন জগতের সন্ধান পেত শ্যামলাল। কিন্তু সে কথা শ্যামলাল কিছুতেই বুঝবে না।

. .

হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িটাকে ছাড়িয়ে একবার হেঁটে চলে গেল কান্তি। পার্কের কোণায় একটা পানের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, এক খিলি পান কিনল, কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল হলদে বাড়িটার দিকে। জানালাগুলোতে নীল পর্দা হাওয়ায় কেঁপে উঠছে; কিন্তু একটা পর্দা সরিয়েও সুপ্রিয়া একবারের জন্যে বাইরে চেয়ে দেখল না।

দেশে থাকতে মজুমদার-বাড়িতে যেতে আসতে কোনো অসুবিধে নেই।

অবারিত দরজা। একতলায়, দোতলায়, তেতলায়। কিন্তু এখানে তা নয়। প্রথমত এ-বাড়ির কেউ তাকে ভালো করে চেনে না—অথচ তার পরিচয়ের অন্ধকার দিকটা গালগল্পের মতো শোনা আছে তাদের। সে গিয়ে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সবাই তীক্ষ্ন কৌতূহলভরা চোখে তাকে লক্ষ্য করবে, তার মুখের মধ্যে খুঁজবে পঁচিশ বছর আগে সময়ের স্রোতে মিলিয়ে যাওয়া বুদ্বুদ শান্তিভূষণকে। একটা নিঃশব্দ কোলাহল যেন সে শুনতে পাবে চারদিকে: "এই নাকি কান্তি? তারাকুমার তর্করত্নের দৌহিত্র? আরে—মনে নেই আমাদের গাঁয়ের হেডপণ্ডিত মশাইকে? হ্যাঁ—হ্যাঁ—সেই যে—যার জামাই ছিল খুনী আসামী। ঈস—কী কপাল ছেলেটার! ওর বাপ যে কে তা-ই ও জানে না।"

পানের দোকানের আয়নার দিকে একবার নিজের মুখের ছায়া দেখল কান্তি। নিজের চেহারা কেমন কান্তি ঠিক বলতে পারে না, তবে লোকে বলে দেখতে সে ভালোই। কিন্তু বাইরের চেহারা যাই হোক, ভিতরে ভিতরে তার অসংখ্য জীবাণু, তিলে তিলে তারা তাকে কেটে কেটে কুরে কুরে খাচ্ছে। যে বিষাক্ত রক্ত থেকে তার জন্ম, তাই আস্তে আস্তে ঘনিয়ে আনছে তার মৃত্যুকে।

কিছুই দরকার ছিল না কান্তির। তারাকুমার তর্করত্নের বিষয়সম্পত্তি নয়—রূপ নয়, গান নয়, কিছুই নয়। শুধু পরিচয়—বংশধারা। আর ওই পরিচয়টুকু নেই বলেই কারো কাছে গিয়ে সে দাঁড়াতে পারে না, জানাতে পারে না নিজের দাবি, কেবল মুখ লুকিয়ে পালিয়ে থাকবার জন্যে একটা অন্ধকার কোণ খুঁজে বেড়ায়।

শুধু সুপ্রিয়া আশা দিয়েছে। শুধু সুপ্রিয়াই বলেছে, "আর কেউ তোমার না থাক, আমি আছি।"

কান্তি আবার ঘুরে হলদে বাড়িটার দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল। জানালার নীল পর্দাগুলো হাওয়ায় পালের মতো ফুলে ফুলে উঠছে। অথচ পর্দা সরিয়ে কেউ একবার বাইরে তাকিয়ে দেখছে না। কেউ না।

পার্কের ভিতরে কয়েকটা নোংরা ছেলে মার্বেল খেলছে। ওদেরও একটা পরিচয় আছে নিশ্চয়।

"তোর বাপের নাম কী?"

অত্যন্ত সহজে স্পষ্ট গলায় বলতে পারবে, "কালু মেথর।"

আর কান্তি? কান্তিভূষণ চট্টোপাধ্যায়? সেদিন অন্ধকার গঙ্গার ধারে, কেউটের ফোকরভরা গঙ্গাযাত্রীদের সেই ঘরটার কাছে, বটগাছের অন্ধকার ছায়ার তলায় কেউ কোথাও ছিল না। অনায়াসে মুছে যেত। কেউ বাধা দিতে পারত না।

একটা মোটরের হর্ন। কান্তি চমকে ফিরে তাকাল। একখানা কালো রঙের গাড়ি। হলদে বাড়িটার সামনে গিয়েই সেখানা দাঁড়াল। সাদা আন্দির গিলে-করা পাঞ্জাবি পরা, নাগরা পায়ে এক ভদ্রলোক বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক এই পার্কেই, কান্তি ভাবল।

রেবা এসে খবর দিলে, দীপেনবাবু এসেছেন।

একবারের জন্যে রক্ত দোল খেয়ে উঠল সুপ্রিয়ার, মুহূর্তের দ্বিধা জাগল মনে। তারপরে সহজ গলায় বললে, "চল্—যাচ্ছি।"

রেবা হেসে বললে, "ভদ্রলোক বাবার পাল্লায় পড়েছেন। দুজন মক্কেল ছিল, তাদের বিদায় করে দিয়ে বাবা চেপে ধরেছেন দীপেনবাবুকে। এক্ষুনি সঙ্গীতরত্নাকর নিয়ে পড়বেন। তুই চল্—বিপন্নকে উদ্ধার করবি।"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে রেবা বললে, "তুই কিন্তু ওঁকে আমাদের এখানে গানের কথা বলিস মনে করে।"

"কেন—তুইও তো বলতে পারিস।"

"না ভাই, আমার ভারী লজ্জা করবে।"

রেবা আন্দাজে ভুল করেনি। অমিয়বাবু সত্যিই তুমুলভাবে আলোচনা শুরু করে দিয়েছিলেন।

"বাংলা দেশ থেকে গান প্রায় উঠে গেল মশাই। সত্যিকারের গাইয়ে আঙুলে গোনা যায়। ছিল বিষ্ণুপুর—তা-ও যাবার দশা। এখন আধুনিক গানের পালা। গান গাইছে না ছড়া কাটছে বোঝাই মুশকিল।"

দীপেন ভদ্রতা করে বললে, "হিন্দীরও ওই দশা। সিনেমার গানের উৎপাতে আর কান পাতা যায় না।"

অমিয়বাবু আরো উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, "আধুনিক গান, সিনেমার গান, সব এক। বাংলা গানের আমি একটা ফর্মুলা আবিষ্কার করে ফেলেছি—জানেন? একছড়া মালা নিয়েই যা কিছু গণ্ডগোল। হয় দিয়েছিলে, নইলে দাওনি। হয় আকাশে চাঁদ ছিল, নইলে ছিল না। বালুচরে ঘর বাঁধা হয়েছিল, সেটা ঝড়ে উড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত একটা সমাধির ব্যাপার, তাতে খানিক ফুল ছড়িয়ে দিলেই আপদ মিটে গেল।"

দীপেন শব্দ করে হেসে উঠল।

"তা হলে আধুনিক গান আপনি মন দিয়ে শোনেন দেখা যাচ্ছে। অনেকদিন ধরে চর্চা না করলে তো এমন ফর্মুলা আবিষ্কার করা যায় না।"

সুপ্রিয়াকে নিয়ে রেবা ঘরে ঢুকল।

দীপেন চোখের দৃষ্টিটা সম্পূর্ণ বুলিয়ে নিলে সুপ্রিয়ার উপরে।

"এই যে সুপ্রিয়া—অনেক বড় হয়ে গেছ, দেখছি।"

সুপ্রিয়া হাসল, "বড় হওয়ার তো কথাই। পাঁচ-ছ বছর পরে দেখছেন যে। কিন্তু আপনি ভালো আছেন তো?"

দীপেনের লালচে চোখ দুটো জ্বলে উঠল একবারের জন্যে।

"হ্যাঁ—ভালো আছি বইকি। যতদিন গলায় গান থাকবে, ততদিন খারাপ থাকবার কোনো কারণ নেই।"

"ঠিক বলছেন।" অমিয়বাবু মাথা নাড়লেন, "গানই তো গায়কের অস্তিত্ব।"

দীপেনের প্রায় মুখোমুখি বসে সুপ্রিয়া দেখতে লাগল। এই ক'বছরে সত্যিই বয়েস বেড়েছে দীপেনের। কপালে কতগুলো রেখা পড়েছে, কালির গাঢ় দাগ ধরেছে চোখের কোণায়, কানের দু পাশে কয়েকটা রুপালী চুল চিকমিক করে উঠছে।

অমিয়বাবু বললেন "রেবা, একটু চা—"

দীপেন হাত জোড় করল, "মাপ করবেন। চা আমি বেশী খাই না। সকালে দু পেয়ালা হয়েছে—আর চলবে না।"

"একটু মিষ্টি—"

"না – না—কিছু না।"

অমিয়বাবু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, "একেবারে শুধু মুখে—"

"শুধু মুখে কেন? একটা পান খাওয়ান—তা হলেই হবে।"

রেবা ছুটে ভিতরে চলে গেল। সুপ্রিয়া দেখতে লাগল দীপেনকে। দীপেনের বয়েস কত হবে এখন—চল্লিশ? কিন্তু তার চাইতেও যেন অনেক বুড়িয়ে গেছে চেহারা। শুধু রগের পাকা চুলেই নয়, সমস্ত মুখে ক্লান্তির ছায়া নেমেছে। তবে চোখদুটো তেমনিভাবে ঝকঝক করছে এখনো। আরো অশান্ত, আরো উগ্র।

দীপেন বললে, "এখনো গানের চর্চা চলছে তো সুপ্রিয়া?"

জবাব অমিয়বাবুই দিলেন, "চলছে বইকি। সঙ্গীত-সরস্বতীকে ওই তো ধরে রেখেছে এ-বাড়িতে। গান শিখছে ওস্তাদ দুর্গাশঙ্করের কাছে।"

"দুর্গাশঙ্কর?" দীপেন মাথা নাড়ল, "হুঁ—গুণী লোক। তবে কিছু করতে পারলেন না। আজকাল ও-ভাবে ঘরে বসে থাকলে কিছু হয় না। চিনতে চায় না কেউ।"

"কিন্তু সাধনা তো নীরবেই করা ভালো দীপেনদা।"

দীপেন শুকনো হাসি হাসল, "ওটা কপি-বুকের থিয়োরি। আজকালকার সাধুদের দেখতে পাও না? তপস্যা তাঁরা কোথায় করেন কে জানে, কিন্তু শহরে তাঁদের বড় বড় আশ্রম আছে, আর আছে দলে দলে শিষ্য-শিষ্যা। প্রভুর মহিমাকে তারা ঢাক-ঢোল বাজিয়ে তারস্বরে প্রচার করতে থাকে।"

রেবা একটা ছোট রুপোর প্লেটে করে পান নিয়ে এল। তারপর মুখ নামাল সুপ্রিয়ার কানের কাছে।

সুপ্রিয়া হাসল। বললে, "দীপেনদা, আমাদের রেবার একটা অনুরোধ আছে।"

"বেশ তো—বলো।"

"আজ সন্ধ্যেবেলায় আপনার কি কোনো বিশেষ কাজ আছে?"

"না, তেমন কিছু নেই। কনফারেন্স কাল থেকে শুরু।"

"তাহলে আসুন এখানে। রেবা আপনাকে রান্না করে খাওয়াবে।"

পেছন থেকে রেবা একটা চিমটি কাটল।

দীপেন বললে, "সে তো ভালো প্রস্তাব। চমৎকার কথা।"

অমিয়বাবু অত্যন্ত পুলকিত হয়ে উঠলেন। "কথাটা আমিই বলতে যাচ্ছিলাম—কিন্তু ঠিক ভরসা হচ্ছিল না। রেবাই আমার কাজটা করে দিয়েছে। সত্যিই তাহলে আসছেন আপনি? ভারী খুশী হব।"

সুপ্রিয়া বললে, "কিন্তু একটা শর্ত আছে। গান শোনাতে হবে।"

"আচ্ছা—তা-ও গাইব। তুমি?"

"আপনার আসরে গান গাইব এমন স্পর্ধা নেই। তবে রেবা সেতার শোনাবে এখন।"

"উনি বুঝি সেতার বাজান? বাঃ, চমৎকার।"

রেবা পালিয়ে গেল ঘর থেকে। অমিয়বাবু ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন, "না, না,—সে কিছু নয়। এমন কিছু বাজাতে পারে না এখনো, সবে শিখছে।"

"শিখছি আমরা সকলেই—" কথাটাকে দার্শনিকভাবে ঘুরিয়ে নিলে দীপেন, "এ-জিনিস শেখার কোনো শেষ নেই। সারাজীবন চর্চা করেও এর কিছুই পাওয়া যায় না। পানের সঙ্গে খানিকটা জর্দা তুলে নিয়ে দীপেন বললে, "কিন্তু আমি এখন উঠব অমিয়বাবু। সুপ্রিয়াকেও একটু সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাই। ঘণ্টা দেড়েক বাদে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।"

"বেশ তো, বেশ তো।" সহজভাবে কথাটা বলেও অমিয়বাবু দ্বিধাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে সুপ্রিয়ার দিকে তাকালেন, "কিন্তু স্কুল নেই তোমার?"

সুপ্রিয়া বলতে যাচ্ছিল 'আছে', কিন্তু সত্যি কথাই বেরিয়ে এল মুখ থেকে, "না, আজকে ফাউনডেশন ডে। ছুটি আছে।"

দীপেনের চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগল: "ভেরি গুড। একটু চলো আমার সঙ্গে। কয়েকটা কেনাকাটা আছে—সাহায্য করবে।" মনের ভিতরে আড়ষ্ট হয়ে গেল সুপ্রিয়া। কিন্তু দীপেনের এই সহজ ভঙ্গিটার সামনে কিছুতেই 'না' বলতে পারল না। শুধু বিপন্নভাবে বললে, "আমি কেনাকাটায় কী সাহায্য করব আপনাকে?"

"তুমিই পারবে। মেয়েদের পছন্দ ভালো। চলো।"

যেন একটা অনিবার্য কঠিন আকর্ষণে সুপ্রিয়া উঠে দাঁড়াল। মনের মধ্যে একরাশ প্রতিবাদ নিয়েও মুখে ফুটিয়ে তুলল হাসির রেখা।

"আচ্ছা—চলুন।"

হাতের ঘড়িটার দিকে তাকালো দীপেন।

"এখন দশটা। ঠিক সাড়ে এগারটায় পৌঁছে দেব তোমাকে?"

"আর সন্ধ্যেবেলার ব্যাপারটা?" অমিয়বাবু ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইলেন।

"সাতটায় আসব। আচ্ছা, আপাতত চলি তা হলে, নমস্কার। এসো সুপ্রিয়া।"

কান্তি বসে ছিল পার্কের ভিতরে। এক চোখ ছিল ছেলেদের মার্বেল

খেলার উপর, আর এক চোখ ছিল হলদে বাড়িটার দিকে। এমন সময় আবার সেই কালো মোটরটার গর্জন শোনা গেল।

কান্তি দেখল, সেই গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবি-পরা ভদ্রলোকের ঠিক পাশে বসেছে সুপ্রিয়া। সুপ্রিয়াই। আরো ভালো করে দেখবার আগেই গাড়িটা দ্রুত বেরিয়ে গেল সামনে দিয়ে।

পিছনের সীটেই বসতে চেয়েছিল সুপ্রিয়া।

দীপেন বললে, "না না, পাশে। গল্প করতে করতে যাব।"

আশ্চর্য সহজ ভঙ্গি দীপেনের, আর সহজ হওয়াটাই তার শক্তি। সুপ্রিয়া আপত্তি করতে পারল না। মিনিট দেড়েক চুপচাপ। বাঁক নিয়ে গাড়ি আশু মুখুজ্যে রোডে এসে পড়ল।

"কোথায় যাবেন ?'

"নিউ মার্কেট।" দীপেন মুখ ফেরাল, "জানো তো—কলকাতার পথঘাট আমার ভালো করে চেনা নেই। যাঁর গাড়ি তিনি সোফার দিতে চেয়েছিলেন সঙ্গে। কিন্তু আমার আত্মমর্যাদায় বাধল। ভাবলাম, গাইড যদি নিতেই হয়, তোমাকেই সঙ্গে করে নেব।"

খুব সহজ কথাটা। কিন্তু অস্বস্তি লাগল সুপ্রিয়ার। পাঁচ বছর আগেকার সেই দুপুরটাকে আবার মনে পড়ে যাচ্ছে। না বেরুলেই হত দীপেনের সঙ্গে। যে কোনো একটা ছুতো করে এড়িয়ে যাওয়া চলত।

দীপেন বলল, "কলকাতায় আসবার আগে তোমার মাকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। তাঁর কাছেই পেলাম তোমার ঠিকানা।"

"আমিও তাই ভেবেছিলাম।"

"কিন্তু আমার একটা চিঠিরও তুমি জবাব দাওনি।"

সুপ্রিয়া চুপ করে রইল। বলবার কিছু নেই।

গাড়ি এগিয়ে চলছিল চৌরঙ্গির দিকে। লাল আলোর সংকেতে দাঁড়িয়ে পড়ল।

দীপেন আস্তে আস্তে বললে, "আমি জানি। এড়াতে চেয়েছিলে আমাকে। ভেবেছিলে সেদিনের জের আর টানতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু বিশ্বাস করো সুপ্রিয়া, এই পাঁচ বছরের মধ্যে আমি তোমাকে ভুলতে পারিনি। একদিনের জন্যেও না।"

সুপ্রিয়া অবিশ্বাস করল না। সেদিনের সেই কিশোরী মেয়েটি আর নেই। এই পাঁচ বছরে জীবনকে অনেকখানি দেখেছে, অনেকখানি চিনেছে সে। বহু মানুষের মুখ থেকে শুনেছে, "তোমাকে ভুলব না—কোনোদিন ভুলব না।" প্রথম প্রথম খুব খারাপ লাগত না, কিন্তু ভারী ক্লান্তি বোধ হয় আজকাল; এত অসংখ্য মানুষ তাকে মনে রাখে, মনে রাখবে। কিন্তু সুপ্রিয়া কজনকে মনে রাখতে পারবে ?

দীপেন বললে, "জানো তো, আমি গান গেয়ে বেড়াই। আর আমরা

হচ্ছি সেই আগুন, যারা খুব সহজেই পতঙ্গের দলকে টেনে আনতে পারে। আমিও অনেক দেখেছি। আমার গান শুনে কতজনের চোখ গভীর হয়ে এসেছে, কতজনকে গান শেখাতে চেয়েছি, কিন্তু তারা গান যতটা শিখেছে তার চাইতেও অনেক বেশী করে তাকিয়ে থেকেছে আমার মুখের দিকে। কেউ কেউ পোড়েনি এমন মিথ্যে কথাও বলতে পারি না। কিন্তু এমন একজন কাউকে পেলাম না, যার কাছে আমি নিজে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারি।"

গাড়ি এগিয়ে চলেছে। প্রথম শীতের উজ্জ্বল সোনালী রোদ জ্বলছে পথের উপর। গড়ের মাঠের ঘন ঘাস এখনো ভালো করে শুকোয়নি, এখনো তারা শিশিরে কোমল হয়ে আছে।

সুপ্রিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করল, "বৌদি কেমন আছেন দীপেনদা ?"

দীপেনের মুখের রেখাগুলো শক্ত হয়ে উঠল। উইণ্ড্স্ক্রীনের উপর থেকে হঠাৎ যেন খানিকটা রোদ ঠিকরে ওর চোখের উপরে এসে পড়ল। দীপেন বললে, "ভালো।"

"তাঁকে কেন সঙ্গে করে আনলেন না কলকাতায় ?"

"এমনি। দরকার বোধ হয়নি।"

"আপনি কিন্তু ভালোবেসেই বিয়ে করেছিলেন দীপেনদা।" সুপ্রিয়া মৃদু গলায় বললে। অনেকক্ষণ ধরেই তার মনে হয়েছিল, এমনি কোন একটা আঘাত করা উচিত দীপেনকে, তাকে থামিয়ে দেওয়া উচিত।

সামনের দুখানা গাড়িকে ওভারটেক করে তীরবেগে বেরিয়ে গেল দীপেন। একজন সাইকেলযাত্রী একটুর জন্যে চাপা পড়ল না।

"এ কী করছেন ? সাবধান হয়ে চালান।" প্রায় আর্তনাদ করে উঠল সুপ্রিয়া।

"সাবধান জীবনে কখনো হইনি। আজও হবার দরকার দেখি না।" দীপেন নীচের ঠোঁটটাকে চেপে ধরল।

সুপ্রিয়া ক্লান্ত গলায় বললে, "অ্যাকসিডেণ্ট্ করে রোম্যাণ্টিক হতে হয়তো আপনার ভালো লাগে, কিন্তু আমার ঠিক ওটা ধাতে সয় না। আর একটু চোখ রেখে ড্রাইভ করুন।"

দীপেন জোর করে হাসতে চেষ্টা করল, "অলরাইট—আই অ্যাম সরি।"

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। একটা আলোচনাকে বাঁধ ভেঙে খানিকটা এগিয়ে দিয়েছিল দীপেন, কিন্তু সুপ্রিয়া যেন তার উপরে একটা পাথরের বাধা এনে ফেলেছে। গাড়ির চাকার তলায় উজ্জ্বল সোনালী রোদে ভরা পথটা পিছলে পিছলে সরে যেতে লাগল। সুপ্রিয়া দেখতে পেল, শুধু কানের পাশেই নয়, দীপেনের সারা মাথাতেই ধূসরতার ছায়া নেমে এসেছে।

আরো খানিক পরে দীপেন বললে, "ডান দিকেই তো মার্কেট ?"

"হাঁ—এইটেই লিণ্ডসে স্ট্রীট।"

কেনাকাটার বিশেষ কিছু ছিল না। একজোড়া মোজা, দুটো গেঞ্জি, খানদুই সাবান। তারপরে কিছু ফুল।

"তোমাকে দিলাম ফুলগুলো।"

"আচ্ছা দিন।"

ঘড়ি দেখে দীপেন বললে, "আরো কিছু সময় আছে হাতে। চলো, চা খাই কোথাও।"

"একটু আগেই যে বললেন চা আর খাবেন না এ-বেলা?"

"খাওয়ার জন্যে নয়। তোমার সঙ্গে একটু গল্প করব।"

"বেশ, চলুন।"

একটা নিরালা চায়ের দোকানে ঢুকল দুজন।

"কী খাবে?"

সুপ্রিয়া বললে, "কিছু না। আপনার ইচ্ছে হলে খান।"

দীপেন ম্লানভাবে হাসল, "আমার খাওয়ার পথে কিছু বাধা আছে। জানো তো, খুব সংযত হয়ে চলিনি এতদিন। লিভারের অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়।"

বয় এসে দাঁড়িয়েছিল। দীপেন বললে, "একটা চা, একটা অরেঞ্জ-স্কোয়াশ।"

বয় চলে গেলে সুপ্রিয়া বললে, "খুব বেশী ড্রিংক করেন নাকি আজকাল?"

"রোজ নয়। তবে মধ্যে মধ্যে এক-এক দিন। হঠাৎ মনে হয় সংসারে আমি একা, একেবারে নিঃসঙ্গ। পৃথিবীতে কোথাও আমার কেউ নেই, কেউ আমার দুঃখ বুঝবে না। তেমনি এক-একটা দিনে হয়তো মাত্রা ছাড়িয়ে ফেলি।"

"কিন্তু এ-দুঃখ কেন আপনার? সবই তো আপনি পেয়েছেন। টাকা, সম্মান, যা-কিছু মানুষে চায় কিছুরই তো অভাব নেই আপনার।"

"শুধু একটা জিনিসই পাইনি সুপ্রিয়া। ভালোবাসা।"

"কেন পাননি? ভালোবেসেই বৌদিকে আপনি বিয়ে করেছিলেন।"

"ভুল করেছিলাম সুপ্রিয়া। কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম যাকে আমি চেয়েছিলাম এ সে নয়। যে আমার গানের ইন্‌সপিরেশন, যে আমার সুর, আমার স্বপ্ন যাকে নিয়ে গড়ে উঠবে—তাকে আমি পাইনি।"

"কে সে?" মৃদু হাসি দেখা দিল সুপ্রিয়ার ঠোঁটের কোণে: "আমি?"

"তুমি কি তা বিশ্বাস করো না?"

বয় চা আর অরেঞ্জ-স্কোয়াশ নিয়ে এল, একটা অপ্রীতিকর উত্তর দেবার দায়িত্ব থেকে অন্তত এই মুহূর্তে মুক্তি পেল সুপ্রিয়া। বয় চলে যাওয়ার পরে চায়ের পেয়ালাটা সামনে নিয়ে চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। এই ধরনের ভাববিলাসীদের দেখতে দেখতে তার বিরক্তি ধরে গেছে। কেউ একটা নতুন কিছু বলুক, আরও গভীর কোনো বেদনা, মানুষের মর্মচারী আরো কোনো একটা আশ্চর্য যন্ত্রণাকে আবিষ্কার করুক কেউ, সেই নিবিড় নিঃশব্দ-সঞ্চারী ব্যথা সুরে সুরে অসংখ্য প্রদীপের দীপান্বিতা জ্বালিয়ে দিক, তার আলো আকাশের তারার সঙ্গে মিশে গিয়ে দূরতম দিগন্তে বিস্তীর্ণ হয়ে যাক। কিন্তু এ-ও যেন বাঁধা ছকে চলছে। সেই মদের গ্লাসের আগুন ঢেলে তিলে তিলে নিজেকে নিঃশেষে দাহন করা, দিনের পর দিন একটু একটু করে

আত্মহত্যার বিলাসিতা, স্বপ্ন-সাকীর জন্যে কান্নার আত্মরতি। সব পুরোনো, সব একঘেয়ে হয়ে গেছে।

"চিত দহে বিনু সেঁইয়া—"

জীবনের অর্ধেক বেদনাই তো কৃত্রিম। তাদের অস্তিত্ব কোথাও নেই, মানুষ তাদের সৃষ্টি করে নেয়। যে-যন্ত্রণার অনুভূতি নেই তাকে প্রাণপণে অনুভব করবার চেষ্টা করতে করতে শেষ পর্যন্ত সত্য করে তোলে। নিউরোসিস। জীবনের আধখানাই নিউরোসিস। গ্লাস থেকে স্ট্রটা তুলে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে সেটাকে ভাঁজ করছিল দীপেন। তারপর বললে, "তুমি আমার সঙ্গে যাবে সুপ্রিয়া ?"

পাঁচ বছরের অনেক পোড়খাওয়া, অনেক রোদবৃষ্টির মধ্যে পথচলা সুপ্রিয়া আজকে আর এতটুকুও দোল খেল না। সোজা চোখ মেলে ধরল দীপেনের দিকে। নিঃসঙ্কুচিত স্পষ্টতায়।

"আমাকে বিয়ে করতে চান ?"

দীপেন থমকে গেল মুহূর্তের জন্যে।

"না, তা বলছি না। এমনি চলো। তুমি সঙ্গে থাকলেই আমি খুশী হব।"

"কোথায় যাব ?"

"বম্বে।"

"কি করব গিয়ে ?"

"আমি ভাবছি বম্বেতে গিয়ে গানের স্কুল করব একটা। দু-একটা সিনেমা কোম্পানিও ডাকাডাকি করছে, সেখানেও কাজ করব। তোমার সাহায্য চাই।" একবারের জন্যে থামল দীপেন ঃ "তুমি আমার সঙ্গে যাবে সুপ্রিয়া ?"

"আমি কী সাহায্য করব ? আমি কতটুকু জানি গানের ?"

"তুমি শিখবে। আমি শেখাব। তা ছাড়া বড় বড় ওস্তাদ আছেন ওখানে, গুরু চাও তো তাঁদের পাবে। যদি নিজেকে গড়ে তুলতে চাও, যদি সারা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে চেনাতে চাও নিজেকে, দেশময় ছড়িয়ে দিতে চাও তোমার গানের সুর, তা হলে ওই তো তোমার জায়গা সুপ্রিয়া। কলকাতায় বসে দুর্গাশঙ্করের কাছ থেকে হয়তো তুমি কিছু পাবে। কিন্তু তোমার গুরুর মতোই তুমি তলিয়ে থাকবে অন্ধকারে। কেউ চিনবে না, কেউ জানবে না।"

সুপ্রিয়ার বুকে একঝলক রক্ত আছড়ে পড়ল। বোম্বাই। তাই বটে—বড় বড় গুণীর জায়গা সেখানে। যত নিতে চাও—অঞ্জলিভরে নিয়ে যাও। ঠিক কথা। নিজেকে চেনাতে হলে কলকাতার এই গণ্ডিটুকুর মধ্যেই তো পড়ে থাকলে চলবে না, আরো বড় জগতের মধ্যে পা বাড়াতে হবে, আরো বড় জীবনের মুখোমুখি হতে হবে।

গলার স্বরে স্বপ্নের রেশ মিলিয়ে দীপেন বলতে লাগল, "বোম্বাই আছে, বরোদা আছে, পুনা আছে। সময় করে বেরিয়ে পড়ো—একটু এগিয়ে গেলেই দক্ষিণ ভারত। কর্ণাটকী সঙ্গীতের দেশ। হাজার বছর আগেকার মতো আজও

মৃদঙ্গের তালে তালে বিশুদ্ধ রাগরাগিণী মূর্তি ধরে সেখানে। যাবে সুপ্রিয়া —যাবে আমার সঙ্গে?"

আশ্চর্য, সুপ্রিয়ার মনের কথা, তার রাত-জাগা কল্পনার কথা, তার এত-দিনের আশা-স্বপ্নের এত খবর কোথা থেকে জানল দীপেন? এ যেন তারই স্বগতোক্তিগুলো দীপেনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে।

"কিন্তু—", চায়ের পেয়ালা ঠোঁটে তুলেছিল সুপ্রিয়া, চুমুক না দিয়েই নামিয়ে রাখল।

'আমাকে ভয় কোরো না।" দীপেনের চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে এল, "যা আমি কিছুতেই পাব না, তার জন্যে কোন অন্যায় দাবি তুলব না তোমার কাছে। শুধু তুমি বড় হও, সার্থক হয়ে ওঠো। এর বেশী আমি আর কিছুই চাই না।"

"কিন্তু আমি বড় হলে আপনার কী লাভ?"

"তোমাকে ভালোবাসি, সেইটুকুই লাভ। যাবে সুপ্রিয়া? আমি কিন্তু আসছে মাসেই বেরুচ্ছি। বোম্বাই, বরোদা, পুনা, মহীশূর, তাঞ্জোর—"

উগ্র একটা ভয়ংকর নেশা সাপের মতো জড়িয়ে ধরছে সুপ্রিয়াকে। আরব সমুদ্র ডাক দিচ্ছে, ডাক পাঠাচ্ছে দক্ষিণ ভারতের নারিকেল-বীথির দূরমর্মর। আর মাত্র পাঁচ মিনিট। আরো পাঁচ মিনিট এমনভাবে লোভানি দিতে থাকলে সুপ্রিয়া আর ধরে রাখতে পারবে না নিজেকে। বলবে"চলুন—এখুনি চলুন। আমি তৈরি হয়েই আছি।"

কিন্তু সে পাঁচ মিনিট আর সময় দিল না সুপ্রিয়া। খানিকটা গরম চা গিলে ফেলল প্রাণপণে। কপালে একরাশ ঘাম জমে উঠেছিল, শাড়ির আঁচলে সেটা মুছে ফেলে বললে, "এবারে ওঠা যাক দীপেনদা। একটা কাজ আছে আমার, ে টা ভুলেই গিয়েছিলাম এতক্ষণ।"

তিন

কান্তি একটা ট্রামে চেপে বসল।

কাল রাত্রেও তার কলকাতায় আসবার কোনো কল্পনা ছিল না। কিন্তু কী যে হয় এক-একদিন, কিছুতেই ঘুমাতে পারল না। খোলা জানালা দিয়ে মজুমদার-বাড়ির তেতলাটা আবছায়া অন্ধকারে চোখে পড়তে লাগল বার বার। খালি মনে হতে লাগল, অনেকদিন সে সুপ্রিয়াকে দেখেনি। অন্তত দূর থেকেও একবার তাকে দেখতে না পেলে কিছুতেই থাকতে পারে না কান্তি, কোনো কাজে মন বসাতে পারবে না।

বিনিদ্র রাতের পরে আরো অসহ্য লাগতে লাগল সকালটা, একটা আগুনের চাকা ঘুরতে লাগল মাথার ভিতরে। একবার কলকাতায় যেতেই হবে তাকে। কিন্তু কি বলা যাবে মা-কে?

এমন সময় কাগজে মিউজিক্যাল কন্‌ফারেন্সের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল। উপলক্ষ পাওয়া গেল একটা।

"মা, কাল থেকে মিউজিক্যাল কন্‌ফারেন্স আছে কলকাতায়। আমি যাচ্ছি

আজ। দিন তিনেক থাকব ওখানে।”

মা তরকারি কুটছিলেন। চোখ তুলে বললেন, “কন্‌ফারেন্স তো কাল। আজই যাবি কেন?”

“নইলে টিকেট পাব না।”

ঘটনা নতুন নয়। গত বছরও গিয়েছিল কান্তি। মা বাধা দিলেন না। ছোট একটি স্যুটকেস আর ছোট বিছানা নিয়ে কান্তি হ্যারিসন রোডের একটা বোর্ডিংয়ে এসে উঠল। তারপর সেখান থেকে হরিশ মুখার্জি রোড। আধঘণ্টা ধরে বাড়ির সামনে পায়চারি করে বেড়াল। তবু হলদে বাড়িটার জানালাগুলো থেকে হাওয়ায় ফাঁপা একটা নীলপর্দা সরল না একবারের জন্যেও, একবারের জন্যেও বেরিয়ে এল না সুপ্রিয়ার মুখ।

“কান্তিদা—তুমি এখানে? বাইরে ঘুরছ কেন? এস, এস—”

সুপ্রিয়া ডাকল না। একটা কালো মোটর বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে। সাদা আদ্দির পাঞ্জাবি পরা কে আর-একজন নিয়ে গেল সুপ্রিয়াকে। সুপ্রিয়া তাকে দেখতে পেল না।

অনেক বড় কলকাতা। অনেক মানুষ, অনেক পথ। সেই মানুষের ঢেউ কান্তির কাছ থেকে বহু দূরে সরিয়ে নিয়েছে সুপ্রিয়াকে। এখানে হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অসীম কুণ্ঠা আর দ্বিধা নিয়ে অপেক্ষা করতে হয়, চোখের সামনে কালো মোটরটা বেরিয়ে যায় নিষ্ঠুর উপেক্ষায়। এ গ্রামের মজুমদার-বাড়ি নয় যেখানে ছোট্ট একটুখানি বাগানের পথ পেরিয়েই পৌঁছে যাওয়া চলে, সোজা উঠে যাওয়া যায় সুপ্রিয়ার ঘরেঃ “কী পড়ছ অত? আর দরকার নেই ওসব, এসো একটু গল্প করি।”

অনেক দূরে সুপ্রিয়া। অনেক মানুষের ঢেউ দুজনের মাঝখানে।

কিন্তু কান্তি তো আশা ছাড়তে পারে না। সুপ্রিয়াকে ছাড়া তার কিছুতেই চলবে না। তার কাছ থেকে পাওয়া ওই আশ্বাসটুকুর জোরেই তো এতদিন বেঁচে থেকেছে কান্তি—এমনভাবে অক্লান্ত চেষ্টায় তবলার তপস্যা করছে।

“আমি গান গাইব, তুমি না হলে সে গানের সঙ্গে সঙ্গত করবে কে?”

ট্রাম এগিয়ে চলল। জানালা দিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে রইল কান্তি। ঠাণ্ডা হাওয়া এসে আছড়ে পড়তে লাগল চোখে-মুখে। শুধু সঙ্গী? শুধু সান্ত্বনা?

কান্তি অনেক ভেবে দেখেছে। না, শুধু ওই টুকুতেই তার চলবে না। এই বিশাল কলকাতা। এত মানুষ, এত পথ, কালো রঙের মোটরটা। আর অপেক্ষা করা চলে না। আজকে তার কথা সুপ্রিয়াকে বলতেই হবে স্পষ্ট করে।

আজকেই। সন্ধ্যায় আবার চেষ্টা করবে কান্তি। সুপ্রিয়া তাকে আশা দিয়েছিল। সেই জোরেই দাঁড়াতে হবে কান্তিকে। না—আর দেরি করা চলবে না।

কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় গিয়েও কান্তি ঢুকতে সাহস পেল না।

একটা জোরালো আলো জেলে দেওয়া হয়েছে হলদে বাড়িটার সামনে।

আরো সাত-আটখানা মোটর দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে কালো মোটরখানাও আছে কিনা কান্তি বুঝতে পারল না।

পার্কের মধ্যেও একদল লোক দাঁড়িয়ে। তাদের দৃষ্টিও বাড়িটার দিকেই।

বুকের মধ্যে একবার ধুক করে উঠল কান্তির। একটা কোন সমারোহ চলেছে ওখানে। কিন্তু উপলক্ষটা কিসের? কারো বিয়ে? সুপ্রিয়ার?

কান্তি ঢুকতে পারল না। সেই একদল লোকের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল।

"কী হচ্ছে মশাই ও-বাড়িতে?"

"গান হচ্ছে। লক্ষ্ণৌয়ের দীপেন বোস গাইছে।"

"আঃ চুপ করুন, শুনতে দিন।"

লক্ষ্ণৌয়ের দীপেন বোস। নামটা শুনেছে বইকি কান্তি। সুপ্রিয়ার মুখেও শুনেছে। গান শুনেছে গ্রামোফোন রেকর্ডে।

কান্তি গিয়ে বসতে পারত গানের আসরে। অমিয় মজুমদারের বাড়িতে কেউ তাকে বাধা দিত না। অন্তত সুপ্রিয়া ছিল ওখানে। তবু বাইরে রবাহূতের মতোই দাঁড়িয়ে রইল সে। সাত-আটখানা মোটর সামনে রইল প্রাচীরের মতো, ভিতর থেকে গানের সুর লহরে এসে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

দীপেন বোস খেয়াল গাইছিল।

চার

ঠিক সাড়ে আটটার সময় আজো অতীশ সেই বকুল-গাছটার তলায় এসে দাঁড়াল।

নকল জোৎস্নাঝরানো আলোর সারি। বকুলের পাতা কাঁপিয়ে হাওয়া চলেছে। অতীশ একটা সিগারেট ধরাল। সুপ্রিয়ার আসবার সময় হয়েছে।

রাস্তার ওপরে দুর্গাশঙ্করের ঘরে আলো জ্বলছে। বন্ধ-করা জানলার ফিকে লাল কাচের মধ্য দিয়ে অপরূপ দেখাচ্ছে আলোর রঙ।

দুর্গাশঙ্করের ছাত্রছাত্রী বেরিয়ে চলে গেল একে-একে। রাস্তার ওপাশ থেকে অতীশ দেখতে লাগল। ওদের সে চেনে, আজ তিন মাস ধরে দেখছে নিয়মিত। কিন্তু সুপ্রিয়া কোথায়?

প্রতীক্ষা ক্রমে অধৈর্যে পরিণত হতে লাগল। আর-একটা সিগারেট শেষ করলে অতীশ, আরো একটা। এখনো আসছে না কেন সুপ্রিয়া, কেন দেরি করছে এত?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা করছে। একটা হতাশ ক্লান্তি একটু একটু করে ছেয়ে ফেলছে মনকে। সুপ্রিয়া কি আজকে গান শিখতে আসেনি? ওর কি অসুখ করেছে?

কেমন ফিকে, কেমন বিস্বাদ মনে হতে লাগল সব। আশা নেই, তবু দাঁড়িয়ে রইল অতীশ। সামনে দিয়ে মোটর আসাযাওয়া করতে লাগল, অতীশ গুনে দেখল বত্রিশখানা। মোট সাতখানা ডবল-ডেকার গেল, দুখানা লরি। তবু সুপ্রিয়া এল না।

তারপর ফিকে লাল কাচের ওপরে সেই অপরূপ আলোটা দপ করে নিবে গেল।

পাথরের মত ভারী পা নিয়ে ট্রাম-লাইনের দিকে এগোল অতীশ। সারাটা দিন অজস্র কাজ—ল্যাবরেটরি, ক্যালকুলেশন। তাদের ভিতরে এই সময়টুকু যেন একটা আবহসঙ্গীতের মত বাজতে থাকে। শুধু কয়েক মিনিটের জন্য সুপ্রিয়াকে কাছে পাওয়া—কয়েকটা কথা, ট্রামে তুলে দেওয়া—তারপর তার কথাই ভাবতে ভাবতে কাঁকুলিয়া রোডের মেসে ফিরে আসা।

অতীশ জানে এর কোনো পরিণাম নেই। সুপ্রিয়া একদিন তাকে ছেড়ে চলে যাবে। ভুলে যেতেও দেরি হবে না। ভদ্রতা করে বলেছে, 'জীবনে সব চেয়ে বড় দুঃখের সময় তোমার কাছেই চলে আসব'। কিন্তু অতীশ জানে, সে-প্রয়োজন কোনদিনই ঘটবে না সুপ্রিয়ার। নিজেকে সে এতটুকু গোপন করেনি ; তার মন অন্য মেয়েদের মতো নয় ; অনেককে ভালবাসতে পারে সে। তার অনেক আছে। দু হাতে সে যতই দান করে যাক, তার ঐশ্বর্য কোনদিন ফুরোবার নয়।

অতীশও তাদের মধ্যে একজন। কদিন মনে থাকবে—কতক্ষণ ?

তবু এমন করে আসা, এই বকুলতলায় দাঁড়িয়ে থাকা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে তার। সারাদিনের পর এইটুকুই পাওয়া, সারাটা রাত্রির জন্য এইটুকুই স্বপ্নের সঞ্চয়। কতদিন এ-ভাবে চলবে অতীশ জানে না, কবে বিশাল ভারতবর্ষের সঙ্গীতের তীর্থে তীর্থে সুপ্রিয়ার ডাক আসবে তাও জানে না। কিন্তু যতদিন সে সময় না আসে, ততদিন এই মুহূর্তটিই সত্য থাকুক। তারপর—

ট্রাম-লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে অতীশ তিক্তভাবে চিন্তা করতে লাগল, একবার গেলেও হত মন্দিরার ওখানে। কিন্তু এখন আর সময় নেই। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

ক্লান্ত পা নিয়ে অতীশ মেসে ফিরে এল।

যথানিয়মে প্রকাণ্ড মোটা একটা বইয়ের মধ্যে তলিয়ে ছিল শ্যামলাল। ওকে দেখে মুখ তুলল।

"কালকের সেই মেয়েটি দু-বার এসে আপনাকে খুঁজে গেছেন।"

তার মানে, মন্দিরা এসেছিল। এখনো কি একবার যাওয়া যায় ওদের বাড়িতে ? নাঃ, অনেক দেরি হয়ে গেছে! জামাটা খুলে অতীশ বিছানার উপরে বসে পড়ল।

সমস্ত মনটা বিস্বাদ লাগছে। সারা শরীরে শিথিল ক্লান্তি। আজ রাতে অনেক কাজ করবার ছিল। কিছুই হবে না।

শ্যামলাল হঠাৎ বললে, "আপনার কথাটা ভেবে দেখলাম অতীশবাবু।"

"কী কথা ?"

"সেই টিউশন।" শ্যামলালের কান পর্যন্ত রাঙা হল বলতে গিয়ে ঃ "শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েই গেলাম।"

অসীম বিস্ময়ে নিজের শ্রান্তি-ক্লান্তি ভুলে গেল অতীশ। বিভ্রান্ত চোখে তাকাল শ্যামলালের দিকে।

"তার মানে? ঠিক বুঝতে পারলাম না তো।"

শ্যামলাল একটা ঢোঁক গিলল, "মানে, উনি যখন সেকেণ্ড টাইম এলেন, মানে প্রায় আটটার সময়, তখন ভারী ক্লান্ত দেখাচ্ছিল ওঁকে। আমি উঠে যাচ্ছিলাম, আমাকে ডেকে বললেন, 'এক‍্গ্লাস জল খাওয়াতে পারবেন? ভারী তেষ্টা পেয়েছে।' কী আর করি। জল দিতে হল।"

বিস্ফারিত চোখে অতীশ চেয়ে রইল। শ্যামলাল মন্দিরাকে জলের গ্লাস এগিয়ে দিয়েছে, অথচ তার আগে অজ্ঞান হয়ে পড়েনি! শ্যামলালের উপর সে অনেকখানি অবিচার করেছিল বলে মনে হচ্ছে।

"হুঁ, তারপর?"

নববধূর মতো লজ্জিত ভঙ্গিতে শ্যামলাল বলতে লাগল, তারপরে উনি বললেন, 'মিনিট দশেক বসতে চাই—আপনার কোনো আপত্তি আছে?' আমি আর আপত্তি করি কী করে? চুপচাপ বসেই বা থাকা যায় কতক্ষণ? শেষে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি বুঝি অতীশবাবুকে টিউশনের কথা বলেছিলেন? কেমিস্ট্রির জন্যে?' শুনে উনি বললেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বলেছিলাম বটে। আপনি পড়াবেন? আমি আর না করতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত রাজীই হয়ে গেলাম।"

অতীশ কৌতুক বোধ করল, আশ্চর্য হল তার চাইতেও বেশী। শ্যামলালের জন্যে নয়, মন্দিরার জন্যে।

"বেশ করেছেন। মেয়েটি ভালো।"

শামলাল উৎসাহিতভাবে বলল, "আমারও তাই মনে হল।"

আরো কিছু বলার ইচ্ছে ছিল শ্যামলালের, নতুন টিউশনটার আলোচনা আরো কিছুক্ষণ চালাতে চাইছিল খুব সম্ভব। কিন্তু আজ অতীশের পালা। মনে হল, কিছুক্ষণ একা থাকা দরকার, শ্যামলালকে সে সইতে পারছে না। কোথায় যেন আজ ক্রমাগত হার হচ্ছে তার।

অতীশ ছাদে উঠে এল। চিলেকোঠায় ঢুকে ঘুঁটের স্তূপের উপরে বসল না শ্যামলালের মতো, তার বদলে ছাদের রেলিং ধরে তাকিয়ে রইল নীচের দিকে। কলকাতার সেই পরিচিত অভ্যস্ত সন্ধ্যা। অন্ধকার গাছের সার—আলোজ্বালা জানলা—রেডিয়োর গান—শিশুর কান্না।

কেন এল না সুপ্রিয়া?

শরীর ভালো নেই? অতীশকে তার আর ভালো লাগে না? না মহাভারতের গীততীর্থের ডাক তার কানে এসে পৌঁছেছে?

শোবার আগে চুলটা আঁচড়ে নিচ্ছিল সুপ্রিয়া। রেবা ঘরে এল।

"বেশ গাইলেন দীপেনবাবু—না?"

"হুঁ।"

"কী মিষ্টি গলা। এখনো যেন কানে বাজছে।"

সুপ্রিয়া হঠাৎ মুখ ফেরাল।

"আচ্ছা—রেবা ?

"কী ?"

"হঠাৎ যদি আমি কলকাতা থেকে পালিয়ে যাই, কী হয় তা হলে ?"

রেবা চমকে উঠল, "তার মানে ? এ আবার কিরকম ঠাট্টা ?"

"ঠাট্টা নয়। সত্যিই ভাবছি কথাটা। আমি পালাব এখান থেকে।"

রেবা বললে, "হঠাৎ এমন বেয়াড়া শখ হতে গেল কেন ? কিসের জন্যে পালাবি ?"

"সারা জীবন ধরে যাকে খুঁজছি, তার জন্যে।"

"এ যে কাব্যের মতো শোনাচ্ছে। কাউকে ভালোবেসে চলে যাবি নাকি তার সঙ্গে ?"

"না—ঠিক উলটো," চিরুনি নামিয়ে রেখে সুপ্রিয়া বললে, "যাদের ভালোবাসি, তাদের কাছ থেকেই আমাকে চলে যেতে হবে। নইলে যা আমি চাইছি তা কোনদিনই পাব না। ওই ভালোবাসাই আমার পথ আটকে রাখবে।"

"ভালোবাসাই তো সব চেয়ে বড় জিনিস সুপ্রিয়া। তার চাইতেও বড় তুই কী পাবি ?"

"আমার গানকে।"

"গানকে ?"

"হুঁ।"

"প্রেমের চাইতে গান বড় ?"

"তুলনা হয় ভাই ? প্রেম তো দুজন মানুষের—তাদের ভিতরেই সে জন্মাবে, আবার ফুরিয়েও যাবে। কিন্তু গান চিরকালের—লক্ষ কোটি মানুষের ভালোবাসা আর স্বপ্ন দিয়ে সে গড়া। সে আমার তিলোত্তমা—সে লোকোত্তর।"

রেবা কিছুক্ষণ সুপ্রিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

"বুঝতে পেরেছি। সেই লোকোত্তরের জন্যেই তুই চলে যেতে চাস ?"

"ঠিক ধরেছিস। মনে কর রাত্রে সকলের চোখ এড়িয়ে যদি পালিয়ে যাই—"

রেবা ভয়ংকরভাবে শিউরে উঠল, 'সে কি !"

"ভয় নেই, আজ নয়। কিন্তু হয়তো খুব শিগগিরই।" আঙুলের ডগায় খানিকটা ক্রীম নিয়ে সুপ্রিয়া মুখের উপর ঘষতে লাগল, "কিন্তু সত্যিই যদি চলে যাই, লোকে আমায় ভুল বুঝবে তো ?"

"বোঝাই তো স্বাভাবিক।"

"যারা আমায় ভালোবাসে ?"

"তারাও ভুল বুঝবে। কিন্তু—", রেবা গম্ভীর হয়ে উঠল, "কিন্তু খ্যাপামি করবার আগে একটা কথা তোকে মনে করিয়ে দেব সুপ্রিয়া। তোর রূপ

আছে—এ-কথা ভুলিসনি। আর এ কথাও ভুলিসনি যে, ভারতবর্ষে যত তীর্থই থাকুক, এখানকার মানুষগুলো এখনো সাধু-সন্তে পরিণত হয়নি। একটি সুন্দরী একা মেয়ের পক্ষে এখনো এ-দেশ নিরাপদ নয়।"

"আচ্ছা ভেবে দেখব।" সুপ্রিয়া একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, "আচ্ছা—তুই শুতে যা ভাই। অনেক রাত হয়ে গেছে।"

রেবা চলে যাচ্ছিল, দোরগোড়ায় গিয়ে একবার থেমে দাঁড়াল।

"তোর রূপ আছে, এ-কথাটা কম করে বলেছিলাম। তুই আগুন। মানুষের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, দেবতাকেও তুই জ্বালিয়ে তুলতে পারিস। এক কলকাতাই তো যথেষ্ট, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে লঙ্কাকাণ্ড করতে চাইছিস কেন?"

রেবা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আয়নার ভিতরে নিজের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সুপ্রিয়া। আগুন? এ-কথাটাও নতুন বলেনি রেবা। আরো দু-একজনের মুখেও তা শুনতে হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ নতুন করে রেবা মনে করিয়ে দিল কেন? ওর মধ্যে কি কোন ইঙ্গিত আছে তার, একটা আঘাত আছে কোথাও?

তৃতীয় অধ্যায়

এক

বাইরের ঘরে বসে একটা কী যেন সেলাই করছিল রেবা। পাশে-রাখা রেডিয়োটায় নিচু পর্দায় পদাবলী কীর্তন চলছিল, রেবা গুনগুন করছিল তার সঙ্গে:

"আমি কানু-অনুরাগে এ দেহ সঁপিনু তিল-তুলসী দিয়া—"

"আসব?"

চকিত হয়ে রেডিয়ো বন্ধ করে দিলে, "আসুন।"

ঘরে ঢুকল অতীশ।

"অতীশবাবু? এত রাতে?"

"এই দিক দিয়েই যাচ্ছিলাম, একবার খবর নিতে এলাম।"

"ভালোই হল। বসুন।" রেবার চোখের কোণায় একটুখানি কৌতুক ছলছল করে বয়ে গেল, "কিন্তু বাবা নেই বাড়িতে, সুপ্রিয়াও না। ওঁরা পূবালি সিনেমায় মিউজিক কন্‌ফারেন্সে গেছেন।"

"ও।" অতীশ পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালটা মুছে ফেলল।

"এই ঠাণ্ডার মধ্যেও বেশ ঘেমে গেছেন দেখছি। অনেকটা হেঁটে এলেন বোধ হয়?"

"না—এমন বিশেষ কিছু নয়।" অতীশ জবাব দিলে। কিন্তু এখানে আসবার প্রয়োজন তার ফুরিয়ে গেছে, এই ঘরে বসে থাকবারও কোনো অর্থ হয় না আর। যা জানবার, নিঃশেষে জানা হয়ে গেছে। আজকেও যখন

বকুলতলায় দাঁড়িয়ে সে অধৈর্য প্রতীক্ষা করছিল, ঘন ঘন দেখছিল ঘড়ির দিকে, দুর্গাশঙ্করের জানালার আরক্তিম আলোটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যখন একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা হচ্ছিল চোখে, তখন সুপ্রিয়ার মনের সামনে সে কোথাও ছিল না, সুপ্রিয়া তখন গিয়ে বসেছিল সারা ভারতবর্ষের জ্ঞানী-গুণীদের দরবারে, তাকে ঘিরে রেখেছিল ঘরের ইন্দ্রজাল, তার চোখের সামনে একটির পর একটি রাগ-রাগিণীর জ্যোতির্ময় বিকাশ ঘটছিল। সেখানে অতীশ কোথাও ছিল না।

তৎক্ষণাৎ উঠে পড়বার কথা ভেবেছিল অতীশ, কিন্তু মন এত সহজেই হার মানতে চাইল না। অন্তত এত সহজেই রেবার কাছে ধরা দেবার কোন অর্থ হয় না। নিজের অসীম ক্লান্তি আর একরাশ হতাশাকে জোর করে চেপে রেখে অতীশ বললে, "আপনি গেলেন না গান শুনতে ?"

"আমার শরীরটা ভালো নেই। ঠাণ্ডা লেগে জ্বর-জ্বর হয়েছে একটু। তা ছাড়া সত্যি কথাই বলি আপনাকে।" রেবা হাসল, "ও-সব উঁচুদরের গান বেশিক্ষণ আমার বরদাস্ত হয় না। কেমন মাথা ধরে যায়।"

"বলেন কি !" প্রাণপণ শক্তিতে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করতে লাগল অতীশ, "আপনি তো শুনেছি গানের চর্চা করে থাকেন। এ-কথা আপনার মুখে তো ঠিক মানায় না।"

"গান নয়, সেতার। কিন্তু যা শিক্ষালাভ হচ্ছে তা সেতারই জানে আর জানেন আমার গুরুজী। ও-কথা বলে আমায় আবার লজ্জা দেবেন না। সে থাক। কিন্তু আপনার রিসার্চের খবর কী ?"

"চলছে একরকম।"

"থীসিস দিচ্ছেন কবে ?"

"এই মাসেই।"

"তারপর ?"

"তারপর আর কী ? আমাদের মতো অপদার্থ যা করে। অর্থাৎ প্রোফেসরির চেষ্টা করব !" অতীশ রেবার দিকে মুখ তুলে হাসল। কিন্তু তার আগেই অতীশের চোখের ক্লান্তি লক্ষ্য করেছে রেবা। অনুভব করেছে, জোর করে কথা বলছে অতীশ ; অনেকদিন পরে এসেছে, তাই কোনোমতে সেরে নিচ্ছে ভদ্রতার পালা।

হঠাৎ রেবার মনে পড়ল কালকের রাতের কথা। সুপ্রিয়া বলছিল ঃ 'আমি যদি হঠাৎ কলকাতা থেকে পালিয়ে যাই—'

সমস্ত সংকোচ কাটিয়ে রেবা বলল, "এবার একটা বিয়ে করুন না অতীশবাবু।"

অতীশ চমকে উঠল। কিন্তু সামলে নিলে সঙ্গে সঙ্গেই।

"বিয়ে তো করতেই চাই।" কৃত্রিম সপ্রতিভতায় অতীশ বললে, "কিন্তু এ হতভাগাকে বরমাল্য দেবে কে ? পাত্রী কোথায় পাই বলুন ?"

"আপনার জন্যে পাত্রীর অভাব ! একবার মুখ ফুটে কথাটা বলুন না, দরজার গোড়ায় পুরো এক মাইল একটা লাইন পড়ে যাবে। কিন্তু এ-সব

বিনয় থাক। পাত্রী তো ঠিক করাই আছে আপনার।”

অতীশ ঘেমে উঠল। রেবা হয়তো জানে। কিন্তু কতটুকু জানে? রুমাল দিয়ে আর-একবার মুখ মুছল অতীশ, হাত কাঁপতে লাগল অল্প অল্প।

“কোথায় আর পাত্রী ঠিক করা আছে? আপনারা তো কেউ চেষ্টা করছেন না আমার জন্যে।” অতীশ হাসল। কিন্তু রেবা হাসল না। বিষণ্ন গম্ভীর দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রেডিয়োটার দিকে।

“আপনি সুপ্রিয়াকে বিয়ে করুন।”

অতীশের মুখে যেন আঘাত এসে লাগল। হাত থেকে খসে পড়ল রুমালটা। নিচু হয়ে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে অতীশ শুকনো গলায় বললে, “ঘটকালির জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু সুপ্রিয়া রাজী হবে কেন?”

“কারণ সুপ্রিয়া আপনাকে ভালোবাসে।”

অতীশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। নতুন কথা নয়। সুপ্রিয়া নিজেই বলেছে অনেকবার, “অতীশ, তোমাকে আমি ভালোবাসি। কিন্তু তার চাইতেও অনেক বড় আমার গান। সেখানে যদি তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াতে না পারো—তা হলে তোমাকে নিয়ে আমার কেমন করে চলবে?”

অতীশ আর আত্মগোপনের চেষ্টা করল না। তাকিয়ে তাকিয়ে পায়ের সামনে মেঝেতে মোজেইকের কারু-কাজ দেখতে লাগল, কান পেতে শুনতে লাগল ঘড়ির শব্দ। তারপরে মুখ তুলল।

“ভালো হয়তো বাসে। কিন্তু বিয়ে আমাকে সে করবে না।”

“কেন করবে না?”

“আমার চাইতে অনেক বড় জিনিসের জন্যে তার সাধনা।”

রেবা হাসল, “আমি জানি। অনেকবারই শুনেছি। কিন্তু একটা কথা ও বুঝতে পারে না যে, নিজের মনকে ফাঁকি দিয়ে জীবনে ও কিছুই পাবে না। ওর ও-সব পাগলামিতে কান দেবেন না অতীশবাবু।”

“কী করব তবে?”

“জোর করবেন।” রেবার গলা শক্ত হয়ে উঠল, “পুরুষমানুষের সত্যিকারের শক্তির পরিচয় পালোয়ানিতে নয়, এই তো তার জায়গা। আপনি জোর করে ওকে কাছে টেনে নিন।”

“সব কিছুই কি জোরের ওপরে চলে?”

“সব চলে না, অনেকগুলো চলে। এও তার মধ্যে একটা। সুপ্রিয়া আপনাকে ভালোবাসে, আপনি সুপ্রিয়াকে ভালোবাসেন। তা সত্ত্বেও কেন ওকে এগিয়ে দিচ্ছেন ভুলের দিকে? কেন জোর করে ফিরিয়ে আনছেন না?”

আবার কিছুক্ষণ মেঝের দিকে তাকিয়ে বসে রইল অতীশ। কপাল বেয়ে ঘামের ফোঁটা নামছে, কিন্তু মোছবার চেষ্টা করল না।

“ভুল করছে কী করে বলব?” চোখ না তুলেই অতীশ বললে, “ও শিল্পী।”

“না, ও মেয়ে। সেই পরিচয়টাই আগে। জেদের ওপরে এই সত্যি

কথাটাকেই ও স্বীকার করতে চাইছে না। কিন্তু বুঝবে অনেক দুঃখ পাওয়ার পরে। আপনি জেনে-শুনেও কেন সেই দুঃখের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন ওকে ?"

অতীশ চুপ করে রইল। সমস্ত জিনিসটাকেই বড় বেশী সহজ করে নিয়েছে রেবা, বিচার করে নিয়েছে নিজের মতো করে। কিন্তু সুপ্রিয়াকে তো আরো ভালো করে জানে অতীশ। আসলে, প্রেমের সঙ্গে গানের বিরোধ নেই সুপ্রিয়ার, বিরোধ আছে বন্ধনের সঙ্গে। প্রেম তার জীবনে অনেক আসবে, বারে বারেই আসবে। তার মধ্যে অতীশও আছে। সে তো একমাত্র নয়। কাউকে জীবনে না জড়িয়েও সুপ্রিয়া নিজের মধুচক্রটি ভরে নিতে পারবে। অনেকের অর্ঘ্যকে কুড়িয়ে নিয়ে সে তাদের সুরের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে, তার গানের দীপান্বিতায় তারা প্রদীপ হয়ে জ্বলবে।

অতীশ ক্ষীণভাবে হাসল। "ঠিক জানি না। আর দুঃখের বোধও হয়তো সকলের এক নয়। হয়তো নিজের মতো করেই সুখী হতে পারে সুপ্রিয়া।"

"মানলাম। কিন্তু আপনি ?" তীরের মতো একটা সোজা প্রশ্ন রেবা ছুঁড়ে দিলে অতীশের দিকে, "আপনার দিকটা ? ওকে ছেড়ে দেওয়াটা আপনি সইতে পারবেন ? খালি ওর কথাই ভাবছেন. নিজের মনের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন একবার ?"

বিবর্ণ হয়ে গেল অতীশের মুখ। এত দিন ধরে প্রাণপণে নিজেকেই ভুলে থাকবার চেষ্টা করেছে। ভাবতে চেয়েছে, যে-কদিন সুপ্রিয়া তার কাছে থাকতে চায় থাকুক। যত দিন সুপ্রিয়ার ভালো লাগে, ততদিন সে ওর মনটাকে সঙ্গ দিয়ে যাক! যেদিন সুপ্রিয়া সব কিছু নিজের হাতে সাঙ্গ করে দেবে সেদিন সেও জানবে, সমস্ত ফুরিয়ে গেছে, আর কিছু বলবার নেই, করবার নেই, ভাববার নেই।

আর তার মন ? তার দিনগুলো ? তার নিঃসঙ্গ দুপুর, তার বিবর্ণ সন্ধ্যা, তার ঘুমভাঙার রাত ? কেমন করে কাটবে ? জীবনে এমন কোন অপরূপ আনন্দ আছে, কোন আশ্চর্য বিস্ময় আছে, কোন অপরিমিত প্রাচুর্য আছে, যা এই সমুদ্রবিশাল শূন্যতাকে ভরে দিতে পারে ? ডি-এসসি ? সম্মান ? ভদ্র রকমের অধ্যাপনা ? এক একটা অসহ্য মুহূর্তে আর্ত কান্নার মতো অতীশের মনে হয়েছে, কিছুই না, কিছুই না। কোনো অতলস্পর্শ গভীর খাদের উপর এরা মাকড়শার জালের মতো ছড়িয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এত বড় ফাঁকিটার উপরে তারা যেন আরো কঠিন, আরো নিষ্ঠুর বিদ্রূপ।

বাইরে হাওয়া উঠল। পার্কে পামের পাতায় মর্মর। রেডিয়োতে বাঁশির সুর। ঘরের ঘড়িটা স্তব্ধতার সুযোগ নিয়ে সময়ের হৃৎপিণ্ডের মতো নিজের অস্তিত্ব জানাচ্ছে। প্রশ্নটা অতীশের দিকে এগিয়ে দিয়ে রেবাও বসে রইল চুপ করে। সেও জানে, এত সহজেই অতীশ এর উত্তর দিতে পারবে না।

অতীশ সহজ হতে চেষ্টা করল। কৃত্রিম সপ্রতিভ ভঙ্গিতে বললেন, "আমি আমার কাজ নিয়ে থাকতে চেষ্টা করব। আচ্ছা, উঠি আজ। রাত হয়ে গেছে, আর আপনাকে বিব্রত করব না।"

রেবা বাধা দিল না, বিদায়-সম্ভাষণও জানাল না। ক্লিষ্ট ক্লান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিঃশব্দেই। অতীশ আস্তে আস্তে রাস্তায় নেমে গেল।

সেলাইটা আবার তুলে নিতে গিয়ে ছুঁচ ফুটে গেল আঙুলে। চুনির বিন্দুর মতো এক ফোঁটা রক্ত দেখা দিল। রেবা দেখতে লাগল সেটাকে। একটা গভীর সহানুভূতির উচ্ছ্বাসে রেবার মনে হল, অতীশ তাকে কেন ভালোবাসল না? সে নিজের সব কিছু দিত অতীশকে, তার সমস্ত উজাড় করে দিত, কোথাও বাকী রাখত না। কিন্তু রামধনুর রঙে যার চোখ ভরে রয়েছে, মাটির ফুলকে সে কি দেখতে পায়?

মৃদু নিঃশ্বাস ফেলল রেবা। জীবন। তার সমস্ত সুতোগুলোই ছেঁড়া, কোথাও জোড়া লাগে না।

আর অতীশ হেঁটে চলল পথ দিয়ে।

মেসে ফিরবে? সেই ঘরে? আবার জটিল একরাশ অঙ্ক নিয়ে বসবে? পারবে না, কিছুতেই মন বসবে না আজকে। খালি মনে হতে থাকবে একটা অন্ধকূপের দেওয়াল তার চারদিকে, তার ভিতরে সে নিরুপায় বন্দী। একটা সন্ধ্যার কয়েকটা মিনিট ব্যর্থ হয়ে গেলে সব এমন মিথ্যে হয়ে যায়, এ-কথা এতদিন কেন বুঝতে পারেনি অতীশ?

রোমান্টিক? বিজ্ঞানের ছাত্র নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে বারবার। কিন্তু মনকে সে বিচার দিয়ে বশ মানাতে পারেনি। একা চলতে চলতে অতীশের মনে হল, এই বেদনাকে সে-ই নিন্দে করতে পারে, এমন যন্ত্রণা যার জীবনে কখনো আসেনি, যার একটি সন্ধ্যার প্রত্যাশা এমনভাবে কখনো ব্যর্থ হয়ে যায়নি।

প্রেমের জন্যে মানুষ আত্মহত্যা করেছে। দু বছর আগে এ-কথা শুনলে অতীশ ব্যঙ্গের হাসিতে কুটিল হয়ে উঠত। বলত: "এসব গর্দভের হাত থেকে পৃথিবী যত তাড়াতাড়ি নিস্তার পায় ততই ভালো।" কিন্তু আজ? আজকে কি ঠিক এত বড় জোরের সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর হাসি হাসতে পারে অতীশ!

সামনে পথ। আলো, মানুষ, গাড়ি, শব্দ। সব যেন এলোমেলো প্রলাপ। কী অর্থহীন, কী বিরাট ফাঁকি দিয়ে গড়া!

তার চাইতে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলা যাক ময়দানের দিকে। তারপর সামনে একরাশ অন্ধকার ভিজে ঘাস, আর আকাশভরা প্রথম শীতের বিষণ্ণ তারা।

সেই ভালো।

দুই

পথে মানুষের ভিড়। টিকেট কেটে যারা ভিতরে ঢুকতে পায়নি, সেই রবাহূতের দল তাকিয়ে আছে উর্ধ্বমুখে। ল্যাম্পিফায়ারের দিকে। ওরই ভিতর দিয়ে কর্তৃপক্ষের করুণায় গানের আর বাজনার সুধাবৃষ্টি হচ্ছে। ঝরে পড়ছে রাগ-রাগিণীর ঝরনা।

ভিতরে যারা অনেক টাকা দিয়ে টিকেট কেটে বসেছে, তারা হয়তো গানের ফাঁকে ফাঁকে পান খাচ্ছে কেউ কেউ। হয়তো তাদের দু-একজন এ ওর কানে কানে কথা কইছে। হয়তো ওরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে কেউ বা। কিন্তু বাইরে যে রবাহূতের দল তখন থেকে অধীর প্রতীক্ষা করছে, দাঁড়িয়ে আছে দল বেঁধে, বসে আছে রকের উপর, কিংবা ফুটপাথেই বসেছে ময়লা চাদর আর গামছা বিছিয়ে, তারা এতটুকুও ফাঁক যেতে দিচ্ছে না। তালের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মাথা নড়ছে, সমের মুখ 'আহা-আহা' করে উঠছে। পথচলতি ট্রাম-বাসগাড়ির শব্দে যখন বিঘ্ন ঘটেছে, তখন বিরক্ত ভ্রূকুটি দেখা দিচ্ছে তাদের মুখে।

ওস্তাদ জলিলুদ্দিনের সরোদ থামল। বহু দূরের থেকে বয়ে আসা বিপুল একটা সুরের ঢেউ যেন চূড়ান্ত কলোচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ে খান খান হয়ে গেল, তারপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল বালির মধ্যে। পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল জনতা। য়্যামপ্লিফায়ারে যখন কর্কশ হাততালির বেসুরো ঐকতান উঠল, তখন বাইরের কেউ একটু শব্দ পর্যন্ত করল না।

আর একটা ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল কান্তিভূষণ। সেও টিকেট পায়নি।

য়্যামপ্লিফায়ারে রুক্ষ গলার ঘোষণা। প্রথমে হিন্দীতে তারপরে বাংলায়। "এতক্ষণ মহীশূর দরবারের ওস্তাদ জলিলুদ্দিন খাঁ আপনাদের সরোদ শোনালেন, এবার খেয়াল গেয়ে শোনাবেন লখ্নউয়ের দীপেন বসু।"

কান্তি নড়ে উঠল একবার। দীপেন বসু। কোথাও একটা কিছু বুঝতে পেরেছে সে। কাল রাত্রেও সে এমনি পার্কে বসে খেয়াল শুনেছে সেই হলদে বাড়িটার সামনে। সকলের অভ্যর্থনা কুড়িয়ে, স্মিত হাসিতে দীপেন যখন নিজের গাড়িতে উঠেছে, তখনো বসে বসে দেখেছে কান্তি। রাত তখন এগারটার কাছাকাছি হয়েছিল, সে ছাড়া পার্কে দ্বিতীয় আর কেউ ছিল না।

আরো মনে পড়েছে কান্তির। কাল সকালে যার মোটরে চড়ে সুপ্রিয়া তার পাশ দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিল সে-ও দীপেন ছাড়া আর কেউ নয়।

দীপেন বসু। মনে মনে কিছু একটা যোগফল টানতে চাইল কান্তি, পারল না। একটা নিশ্চিন্ত ধারণা যত বেশী করে এগিয়ে আসতে চাইছিল তত বেশী করেই কান্তি দূরে ঠেলে দিতে চাইছিল তাকে। নিজের এত বড় সাংঘাতিক ক্ষতিকে, এমন ভয়ঙ্কর সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিতে পারছিল না কিছুতেই।

য়্যামপ্লিফায়ারে তবলার টুংটাং। কে সঙ্গত করছে? নামটা বলা উচিত ছিল, ভুলে গেছে। ভারী মিষ্টি হাত। কে বাজাচ্ছে? কাশীর পণ্ডিত লালতাপ্রসাদ? খুব সম্ভব।

ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে দুখানা ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি ছুটে গেল উর্ধ্ব-শ্বাসে। শব্দের ঝড়টা যখন শেয়ালদা স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে মিলিয়ে গেল

তখন দীপেন বোসের গান শুরু হয়েছে।

"গাগরী ভরনে যাঁউ"—

এ গান কালও শুনেছে কান্তি। আজকে আরো দরাজ, উজ্জ্বল, আরো বিকশিত। সমজদারের দরবারে গুণীর গলা আপনিই উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। ভালো লাগার একটা বিপুল উচ্ছ্বাসকে টেনে এনে মগ্ন হয়ে যেতে চাইল কান্তি, কিন্তু কিছুতেই সম্পূর্ণ পেরে উঠল না। মুখের ভিতরটা বিস্বাদ হয়ে রয়েছে, কপালের দুটো রগ টনটন করছে, কাল ঠাণ্ডায় রাত এগারটা পর্যন্ত বসে থেকে শরীরে দেখা দিয়েছে খানিকটা জ্বরের উত্তাপ, এই স্থূল সত্যগুলোকে সে কিছুতেই ভুলতে পারল না।

"ননদিয়া, গাগরী ভরনে যাঁউ—"

সাতটি সুরের লহর খেলছে—লকলকিয়ে বয়ে যাচ্ছে বিদ্যুতের মত। অমিয় মজুমদারের পাশে বসে এক দৃষ্টিতে দীপেনের দিকে তাকিয়ে ছিল সুপ্রিয়া। উৎকর্ণ আসরের ভিতরে, উঁচু মঞ্চের উপর এই মুহূর্তে বসেছে দীপেন। এখন সে স্বমহিম, সে সম্রাট। এতগুলি মানুষের চোখ এখন তারই উপরে ; এখন তারই সুরের দোলায় দোলায় দুলে উঠছে এতগুলি রক্তোদ্বেল হৃৎপিণ্ড, এতগুলি চোখকে সে-ই তুলছে স্বপ্নরসায়িত করে, এই মুহূর্তে এতগুলি মনকে নিয়ে সে যা খুশী তা-ই করতে পারে।

সম্রাট বই কি!

কাল সকালের কথা মনে পড়ল। সে আর-একজন। তার চোখের কোণায় লালচে আভা, রাত্রির নেশার ঘোর তার কাটেনি, চোখের কোলে কোলে তার কালির পোঁচ পড়েছে। রগের দুপাশে চুল সাদা হয়ে গেছে, কুঁকড়ে গেছে গালের চামড়া। ভালোবেসে একটি মেয়েকে সে বিয়ে করেছিল, অথচ জীবনের কোথাও এতটুকু স্বীকৃতির সম্মান দেয়নি তাকে। সব মিলিয়ে কেমন ক্লেদাক্ত মনে হয়েছিল। তারপর চা খেতে গিয়ে সেই প্রস্তাব, মহাকাল-তীর্থের সেই ধ্রুপদী মৃদঙ্গের ধ্বনি, সেই কর্ণাটকী রাগ, একটা অসহ্য আকর্ষণ পাঠিয়েছিল বুকের প্রতিটি রক্ত-নাড়ীতে। আর সঙ্গে সঙ্গেই চমকে উঠেছিল। আরক্তিম সূর্যোদয়ের উপরে কোথা থেকে মেঘের ছায়া যেন নেমে এসেছিল।

ভেবেছিল সাবধান হয়ে যাবে। কিন্তু রাত্রেই সব এলোমেলো করে দিল দীপেন। গান শোনাল। আবার চঞ্চলতা, আবার মৃদঙ্গের বোল ; আকাশ-ছোঁয়া বিরাট গম্ভীর মন্দিরের বিশাল চত্বরের উপর পড়ল দক্ষিণী নাচের পদক্ষেপ। অনেকক্ষণ ধরে যেন একটা ঘোরের মধ্যে তলিয়ে ছিল সুপ্রিয়া। তারপর জিজ্ঞাসা করেছিল রেবাকে, "আচ্ছা, আমি যদি কলকাতা থেকে হঠাৎ পালিয়ে চলে যাই, কেমন হয় তা হলে ?"

কলকাতায় কিছু নেই, তা নয়। দুর্গাশঙ্কর রয়েছেন। কিন্তু তাঁর চোখে জ্বালা নেই, তাঁর দৃষ্টি স্তিমিত, ধ্যানের মধ্যে সমাহিত। দুর্গাশঙ্করের দেওয়ালে গান্ধার রীতিতে আঁকা সরস্বতীর মূর্তির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তাঁর গান শুনতে শুনতে আর আবছা নীল আলোটার মধ্যে মগ্ন হয়ে যেতে

যেতে সুপ্রিয়ার মনে পড়েছে, 'কুমার-সম্ভব'। কিন্তু অপর্ণাবল্লভের লাস্যলীলাকে নয়। এ সেই শঙ্কর, কস্তুরীবাসিত অলকনন্দার শীকরবাহী বাতাস যাঁকে ঘিরে ঘিরে মুগ্ধ ভক্তের মতো প্রদক্ষিণ করছে, যিনি নিমীলিত ত্রিনেত্রে অজিনাশ্রিত, দেবদারুকুঞ্জের ছায়ামণ্ডপে শিলাবেদীতে যাঁর অন্তশ্চর মরুৎগুচ্ছ স্থির স্তব্ধ, দুর্গাশঙ্করের গানে তাঁরই প্রমূর্তি ; মগ্ন করে, মাতাল করে দেয় না।

আর আজকে এ কী গান ধরেছে দীপেন ?

এ কাল সকালের সেই বিশৃঙ্খল মানুষটা নয়, কাল রাতে যে গানের মোহচ্ছন্দ বিস্তার করেছিল সে-ও নয়। এ আর-একজন। যাকে সুপ্রিয়া কখনো দেখেনি, যার কাছে পৌঁছুতে হলে মাটিতে পা দিয়ে যাওয়া চলে না, যেতে হয় ঊর্ধ্বমুখী একটা জ্যোতিঃপথের অনুসরণ করে। সুরের সম্রাট আজ আকাশে বিছিয়ে দিয়েছে তার সঙ্গীতের সিংহাসন আর সেখান থেকে যেন এক-একটি করে সোনার পদ্মের পর্ণ পৃথিবীতে ঝরে ঝরে পড়ছে।

সেই স্বর্ণপর্ণের অভিষেকে শঙ্করের জাগরণ। কিন্তু দেবদারু-কুঞ্জের সেই ধ্যানশ্রী নয়। আকাশ-ছোঁয়া দক্ষিণী মন্দিরের চূড়া কত দূরে যে এখন উঠে গেছে, ছাড়িয়ে গেছে কোন্ সপ্তর্ষিলোক, পিতৃলোক, তা কেউ জানে না। গ্রানিট্ পাথরে গড়া মন্দিরের চত্বর এখন পৃথিবীর চতুঃসীমা পার হয়ে গেছে, পার হয়েছে সপ্ত সমুদ্র, প্রসারিত হয়েছে অনন্তে। এখন সমুদ্র হয়েছে মৃদঙ্গ, নক্ষত্রে নক্ষত্রে করতাল বাজছে, অরণ্যে ঝোড়ো হাওয়ায় বাজছে সারেঙ্গীর সুর। এখন নটরাজ শুরু করেছেন তাঁর তাণ্ডব, তাঁকে ঘিরে ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে কোটি সূর্যের কোটি কোটি সপ্তশিখার বিচিত্রবর্ণ অলাতচক্র। এ যেন সৃষ্টির সেই আদি নৃত্য, যা একদিন পৃথিবীকে জন্ম দিয়েছিল ; এ যেন সৃষ্টির সেই শেষ নৃত্য, যার শেষ পদক্ষেপে বস্তুপৃথিবী রেণু রেণু হয়ে জ্যোতির নীহারিকায় মিলিয়ে যাবে।

সুপ্রিয়া তাকিয়ে রইল।

দীপেন থামল প্রায় এক ঘণ্টা পরে।

অনেকখানি আকাশ থেকে মাটিতে নেমে এল সুপ্রিয়া। ফিরে এল পৃথিবীতে, যেখানে মানুষের করতালির অট্টরোল, কথার উচ্ছ্বাস, চিনেবাদামের খোলা ভাঙবার শব্দ, চায়ের পেয়ালা। যে নক্ষত্র-জগৎ মাটির কাছাকাছি এসে পৌঁছেছিল, আবার তা সরে চলে গেছে দূর-দূরান্তে।

কিছুক্ষণ আচ্ছন্নের মতো বসে থেকে অমিয় মজুমদার বললেন, "লোকটা যেন ম্যাজিক জানে !"

সুপ্রিয়ার হঠাৎ কেমন ক্লান্তি লাগতে লাগল। উগ্র, ভয়ঙ্কর নেশার পরে শিরাছেঁড়া অবসাদের সঞ্চয়।

"কাকাবাবু, আমি বাড়ি যাব।"

"সে কী ! এখুনি ?"

"আমার শরীরটা ভালো লাগছে না।"

অমিয়বাবু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, "চল্‌ তবে। কিন্তু জমেছিল বেশ।"

"আপনি বসুন না।" সুপ্রিয়া সান্ত্বনা দিয়ে বললে, "আমি যাই।"

"একা?" অমিয়বাবু কুণ্ঠিতভাবে বললেন, "রাত তো দশটা বেজে গেছে।'

"একটা ট্যাক্সি ডেকে নেব।"

অমিয়বাবু আবার দ্বিধাভরে বললেন, "আচ্ছা, সাবধানে যাস।"

একবারের জন্যে তাঁর মনে হল, হয়তো মেয়েটাকে পৌঁছে দেওয়া উচিত ছিল। এভাবে একা ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক হল না। কিন্তু গানের এমন জমাট আসরের প্রলোভন ওটুকু দ্বিধাকে ভাসিয়ে নিলে। তারপরে ভাবলেন, কলেজে পড়েছে, স্কুলে পড়ায়, এটুকু স্বাধীনতা ওদের দেওয়া যেতে পারে।

মাইক্রোফোনে ধ্বনিত হল ভারতবর্ষের সেরা ওস্তাদের তবলা-লহরার বার্তা। অমিয় মজুমদার উৎকর্ণ হয়ে বসলেন। আর সুপ্রিয়া বেরিয়ে এল হল্‌ থেকে।

"আপনি চলে যাচ্ছেন?"

পাশ থেকে কে জিজ্ঞেস করল। সুপ্রিয়া তাকিয়ে দেখল, শীর্ণ কালো চেহারার একজন মাঝবয়েসী ভদ্রলোক, ময়লা শার্টের উপরে বিবর্ণ কোট পরা। সুপ্রিয়া বিস্মিত হয়ে মাথা নাড়ল।

"আপনার টিকেটটা আমাকে দেবেন?" একটা মিনতির মতো শোনাল ভদ্রলোকের স্বর।

"ওটা দু দিনের জন্যে। স্পেশ্যাল কার্ড।"

"ও!"

ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ সরে গেলেন। তারপর আবার গিয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন পাশের পার্কের রেলিঙের গায়ে।

সুপ্রিয়া বেরিয়ে এসে রাস্তা পার হয়ে চলল ট্যাক্সি-স্ট্যান্ডের দিকে।

"সুপ্রিয়া।"

চকিত দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল সুপ্রিয়া। অতীশ? আজ সারাদিন ধরে অতীশের কথাটা থেকে-থেকে তাকে বিষণ্ণ করেছে, মনে পড়েছে, আজও সন্ধ্যায় দুর্গাশঙ্করের বাড়ির উলটো দিকে বকুলতলায় প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে অতীশ। সুপ্রিয়া খুশির চমকে ফিরে তাকাল।

কান্তি।

"কান্তিদা—তুমি!"

দুটো জ্বলজ্বলে চোখে সুপ্রিয়াকে লেহন করতে করতে কান্তি বললে, "কেন, আমার কি আসতে নেই তোমাদের কলকাতায়?"

"গান শুনতে এসেছিলে? কিন্তু তোমাকে তো ভেতরে দেখতে পেলুম না।"

"টিকেট পাইনি।"

সুপ্রিয়া নিজের ব্যাগ খুলল। বের করে আনল ফিকে গোলাপী রঙের

স্পেশ্যাল কার্ডটা।

"এইটে নিয়ে ভেতরে যাও। কালকেও চলবে। আমার আর দরকার হবে না।"

"কার্ড থাক।" তেমনি জ্বলজ্বলে চোখে কান্তি বললে, "তোমার সঙ্গে আমার কথা ছিল।"

সুপ্রিয়া হাতঘড়ির দিকে তাকাল। "কিন্তু রাত দশটা বেজে গেছে। আমাকে আবার ফিরতে হবে সেই ভবানীপুরে। তুমি বরং কাল সকালে আমাদের বাড়িতে যেয়ো কান্তিদা।"

মুখের উপরে যেন একটা চাবুকের ঘা এসে পড়ল কান্তির। কালকের সকাল, পথ দিয়ে একটানা পায়চারি, কেবল তাকিয়ে দেখা হলদে বাড়িটার নীল পর্দা হাওয়ায় ফুলে ফুলে উঠছে ; তারপর সন্ধ্যা, সামনে একরাশ নানা রঙের মোটর যেন একটার পর একটা প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে। আর আজ এই রাত দশটা পর্যন্ত—

দাঁতে দাঁত চাপল কান্তি। মাথার রগগুলো দপদপ করছে। সর্বাঙ্গে জ্বরের উত্তেজনা। টেম্পারেচারটা একটু বেড়েছে হয়তো। এক্ষুনি চলে যাওয়া উচিত। ফিরে যাওয়া উচিত নিজের বোর্ডিঙে, মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা উচিত ছারপোকা-কণ্টকিত ঠাণ্ডা বিছানাটার উপরে ; আর শুয়ে-শুয়ে ভাবা, নিজের এক-একটা আঙুলকে ছুরি দিয়ে কাটলে যন্ত্রণাটা কেমন লাগে ?

কিন্তু কান্তি পারল না। বললে, "বেশীক্ষণ তোমার সময় নেব না। মাত্র দশ মিনিট আমায় দিতে পারবে ? তারপরে আমি তোমায় ভবানীপুরে পৌঁছে দিয়ে আসব।"

নিজের কানেই নির্লজ্জের মতো ঠেকল কথাটা।

সুপ্রিয়া একটা মৃদু নিঃশ্বাস ফেলল।

"পাশের চায়ের দোকানটায় বসবে ?"

"থাক—কলেজ স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতে যাই। যেতে যেতেই কথা হবে।"

কান্তি আবার দাঁতে দাঁত চাপল। অর্থাৎ এতটুকু নিভৃতি দেবে না সুপ্রিয়া। একেবারে একান্ত করে পাওয়ার সুযোগ দেবে না কিছুক্ষণের জন্যেও। তার একেবারে নিজের কথাটাকেও বলতে হবে বহুজনের বিশৃঙখল বেসুরো শব্দের মধ্যে। কৌতূহলী অসহ্য ভিড়ের ভিতর।

একটা আহত গর্জনকে নিজের মধ্যে সংহত করে নিয়ে কান্তি বললে, "বেশ।"

কিন্তু কলেজ স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া ! এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে হাঁটুর জোড়গুলো পর্যন্ত যেন খুলে আসছে, মাথার মধ্যে চাকার মতো ঘুরছে কী একটা, মুখের ভিতরটা অদ্ভুত তেতো হয়ে গেছে। তবু কান্তি আচ্ছন্নের মতো সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল। মনে পড়ে গেল, পাঁচ বছর আগে এমনি একটা শারীরিক অসুস্থ যন্ত্রণার দিনে তার দিকে তাকিয়ে

করুণায় বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল সুপ্রিয়ার চোখ, নিজের কোল পেতে দিয়ে বলেছিল, "একটুখানি শুয়ে থাকো লক্ষ্মী ছেলের মতো।" দু হাতে সুপ্রিয়ার কোমর জড়িয়ে ধরে চোখ বুজে অনেকক্ষণ পড়ে ছিল কান্তি, সুপ্রিয়া তার চুলে মায়ের মতো আঙুল বুলিয়ে দিয়েছিল।

আজকে নিজের শরীরটাকে জগদ্দল পাথরের মতো টানতে টানতে কান্তি সুপ্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল।

কয়েক পা নিঃশব্দে এগিয়ে সুপ্রিয়া বললে, "তুমি ভালো আছ কান্তিদা? উঠেছ কোথায়?"

"উঠেছি শেয়ালদার একটা বোর্ডিঙে। ভালোই আছি।"

"কাকিমা?"

"ভালো আছেন।"

"তোমার গান?"

হঠাৎ কোথা থেকে রূঢ় জবাব আসতে চাইছিল, কিন্তু কান্তি নিজেকে সামলে নিলে।

"চলেছে একরকম।" তারপর চাপা গোটাকয়েক দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলে কান্তি বললে, "কিন্তু আর বেশী দিন চলবে না। এবার তোমাকে আমার দরকার। তুমি তো জানো, তার জন্যেই আমি অপেক্ষা করে আছি।"

সুপ্রিয়া শ্রান্ত চোখে কান্তির দিকে চাইল, "আমি তো আছিই তোমার জন্যে।"

"না, নেই।" কান্তির ঠোঁটের কোণা কাঁপতে লাগল, "সকলের ভেতরে তোমার এক টুকরো আমি পেতে চাই না। আমি এবার সম্পূর্ণ করে নিতে চাই তোমাকে। একেবারে আমার জন্যেই। যেখানে আমার কোনো ভাগীদার থাকবে না।"

সুপ্রিয়া একটুখানি থামল। সামনে একটা জ্বলজ্বলে নিয়ন আলোর লেখার উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, "কিন্তু আমার সবটুকু তো একা তোমাকে দিতে পারব না কান্তি। অন্য লোকও আছে, তারা দাবি ছাড়বে কেন?"

সুপ্রিয়া হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু কান্তি হাসল না। চোখ থেকে এক ঝলক আগুন ঠিকরে পড়ল তার।

"ওসব থাক সুপ্রিয়া। আজ স্পষ্ট কথাই বলতে এসেছি তোমাকে। কবে বিয়ে হবে আমাদের?"

"বিয়ে!" সুপ্রিয়া এবার দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখের পেশীগুলো তার শক্ত হয়ে গেল।

কান্তি বললে, "হ্যাঁ, বিয়ে। কবে বিয়ে করবে আমাকে?"

আর লঘুতা চলবে না। কান্তির স্বরের জ্বালা অনুভব করল সুপ্রিয়া, দেখতে পেলে তার চোখের আগুন। শান্ত কঠিন গলায় সুপ্রিয়া বললে, "আমাকে বিয়ে করা তোমার দরকার?"

"শুধু দরকার নয়।" কান্তি হিংস্রভাবে বললে, "পারলে আজকেই— এই মুহূর্তে।"

"ভেবে দেখতে পারি। কিন্তু কতকগুলো শর্ত আছে আমার।"

"বলো কী শর্ত।"

"আমি হয়তো আরো দু-একজনকে ভালোবাসব। তুমি আমাকে সবটাই পাবে, কিন্তু আমার মনের খানিকটা থাকবে তাদের জন্যেও। তারা আমার কাছে আসবে যাবে। সইতে পারবে সেটা?"

হাতের আঙুলগুলো কেমন অসাড় হয়ে যাচ্ছে, কান্তি প্রাণপণে মুঠো করে ধরল। চাপা গলায় বললে, "চেষ্টা করব।"

"চেষ্টা করা নয়, কথা দিতে হবে। তা ছাড়া আমার খরচ অনেক, তুমি চালাতে পারবে কান্তি?"

চলতে চলতে নুড়িতে হোঁচট খাওয়ার মতো প্রশ্নটা এসে আঘাত করল।

"আমার যা আছে সে তো তুমি জানোই।"

"ওতে চলবে না কান্তি। পাড়াগাঁয়ের বাড়িতে বসে তোমার ঘর-সংসার দেখব, রান্না-বান্না করব, ছেলে মানুষ করব, আর সময়-সুযোগ পেলে এক-আধদিন তানপুরা নিয়ে বসব, সে আমার সইবে না। তুমি তো জানো, আমি বিলাসী। আমি শৌখিন হয়ে, সুন্দর হয়ে থাকতে চাই। শহরের জীবন নইলে আমার একদিনও চলবে না। তোমার রান্নাঘরের হাঁড়িতে কিংবা জামায় বোতাম লাগানোর কাজে একদিনও তুমি আমায় আশা কোরো না। আমি বড় বড় ওস্তাদের কাছে গান শিখব। শিখতে যাব বোম্বাইয়ে, বরোদায়, মাদ্রাজে। হাজার হাজার টাকা আমার জন্যে তোমার খরচ করতে হবে। যদি কখনো ভালো গাইয়ে হতে পারি—" সুপ্রিয়া একবারের জন্যে থামল, "তা হলে নানা জায়গায় আমার ডাক আসবে, আমি গাইতে যাব। তখন তুমি আমায় বাধা দিতে পারবে না। রাজী আছ কান্তি?"

কান্তি দাঁড়িয়ে পড়ল। বুকের ভিতরটা তার হাপরের মতো ওঠা-পড়া করছে।

"তার মানে আমায় লাখোপতি হতে বলছ সুপ্রিয়া?"

"সে আমি জানি না। লাখোপতি কোটিপতির খবর তুমিই রাখবে। শুধু এইটুকুই বলতে পারি, আমার এই খরচের দায় তোমায় নিতে হবে কান্তি। আমাকে শুধু নিজের ঘরে রাখতে পারবে না, বাইরেও ছেড়ে দিতে হবে। পারবে তো?"

এর চাইতে নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান এমন নগ্ন ভাষায় আর করা চলে না। কান্তির একবারের জন্যে মনে হল, রুক্ষ, কর্কশ হাতে সে সুপ্রিয়ার মুখটা চেপে ধরে। তারপর আদিম যুগের বর্বর মানুষের মতো তাকে কেড়ে নিয়ে চলে যায় এখান থেকে।

সুপ্রিয়া শীতল হাসি হাসল। "তাই বলছিলাম কান্তি, কেন তুমি সম্পূর্ণ করে আমাকে চাও? তোমাকে যা দেবার আমি দিয়েছি। আর কেউ যদি

আমাকে নিয়েও যায়, তা হলেও তোমার যেটুকু পাওনা তা থেকে তুমি ঠকবে না। তাইতেই খুশী থাকো কান্তি। আমাকে সবটা পেতে গিয়ে কেন তুমি এত বড় দায় তুলে নিতে চাও।"

কান্তি দাঁড়িয়ে পড়ল। পা দুটো পাথর হয়ে গেছে।

"তা হলে আগে বড়লোক হতে চেষ্টা করব। টাকার যোগ্যতা নিয়েই পৌঁছব তোমার কাছে।"

সুপ্রিয়া একবার তাকাল। শীতল কঠিন মুখের উপর একটুখানি সমবেদনার দীপ্তি ঝলকে গেল।

"টাকা জিনিসটাকে অত ছোট করে দেখো না কান্তি। দারিদ্র্যটা মানুষের গৌরব নয়, তার লজ্জা। অভাবের জ্বালায় মানুষ যখন রুখে দাঁড়ায়, তখন তার অর্থ এই নয় যে, সারা দুনিয়াকে তারা গরিব করে দেবে। সকলেরই বড়লোক হওয়ার দরকার আছে বলে কয়েকজন অতি-বড়লোকের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই।"

কান্তি শুনতে পাচ্ছিল না। চোখের সামনে কুয়াশার মতো কী খানিকটা ঘনিয়ে আসছে যেন।

সামনে ট্যাক্সি-স্ট্যান্ড। একখানা গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল সুপ্রিয়া।

"সব চেয়ে বড় কথা, আমি শিল্পী। যারা বলে অভাব আর দুঃখের মধ্যেই শিল্পের আসল বিকাশ, তারা মিথ্যে কথা রটায়, অক্ষমতার উপরে আত্মবঞ্চনার প্রলেপ এঁকে দেয়। কিন্তু কান্তি, আমি সেভাবে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারব না। আমাকে বড় হতে হবে, আমাকে ভালো করে গান শিখতে হবে; যা কিছু বিলাসিতা তার মধ্যে দিয়ে আমার মনকে জাগিয়ে রাখতে হবে। আমার অনেক টাকা চাই কান্তি, হাজার হাজার টাকা।"

"বুঝলাম।"

ট্যাক্সির দরজা খুলে ভিতরে পা বাড়িয়ে সুপ্রিয়া বললে, "তাই বলছি কান্তি, এসবে কী দরকার? আমার যেটুকু তোমায় দিয়েছি, তার সবটুকুই তোমার, তার ভিতরে এতটুকু ফাঁকি নেই।" ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করে বাইরে গলাটা একটু বাড়িয়ে উজ্জ্বল হাসি হাসল, "পাগলামি ছেড়ে দাও তুমি। বোর্ডিঙে ফিরে গিয়ে বেশ করে একটা ঘুম লাগাও আজ। তারপর কাল সকালে এসো আমাদের ওখানে। রবিবার আছে, চা খাব একসঙ্গে, গল্প করব অনেকক্ষণ।"

কান্তি জবাব দিল না।

ট্যাক্সির ভিতর থেকে হাত বাড়িয়ে কান্তির হাতে একটা চাপ দিলে সুপ্রিয়া। চমকে উঠল তারপরেই।

"জ্বর হয়েছে নাকি তোমার?"

একটা ঠাণ্ডা সাপের ছোঁয়ায় যেন চমকে উঠল কান্তি। ঝট করে তিন পা সরে গিয়ে বলল, "না, কিছু না।" তারপরে মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে লাগল দ্রুত পায়ে।

সুপ্রিয়ার মনে হল, ওকে ফিরে ডাকা উচিত। কিন্তু ট্যাক্সিওয়ালা অধৈর্য-ভাবে বললে, "কোথায় যাবেন ?"

নিঃশ্বাস চেপে নিয়ে সুপ্রিয়া বললে, "ভবানীপুর।"

তারাকুমার তর্করত্নের দৌহিত্র, কোন এক খুনীর ছেলে—যে-খুনীর ছদ্মনাম শান্তিভূষণ—উত্তরাধিকারসূত্রে সে দাদুর কাছ থেকে পেয়েছে পাড়াগাঁয়ে একখানা পুরনো দোতলা বাড়ি, একশো বিঘে ধানী জমি, একটা পুকুর, পোস্ট অফিসের বইতে সবসুদ্ধ বারোশো টাকা। মোটের ওপর বেঁচে থাকা চলে। কিন্তু হাজার টাকা—লক্ষ টাকা—

ম্যাট্রিক পর্যন্ত বিদ্যা, তাও পাশ করতে পারেনি। তবলায় আর গানে অনেকদিন আগে ওকে পি এইচ ডি ডিগ্রি দিয়েছিল সুপ্রিয়া, কিন্তু কান্তি জানে, দেশের গুণীদের দরবারে এখনো তার পিছনের সারিতে বসবারও যোগ্যতা আসেনি। সেখানেও কেউ তাকে টাকার তোড়া নিয়ে ডেকে পাঠাবে না ঠাকুর ওঙ্কারনাথের মতো, হীরাবাঈ বরোদেকারের মতো, ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁর মতো। রেশমী রুমাল বাঁধা মোহর তার পায়ের কাছে উড়ে পড়বে না রাজদরবার থেকে।

তা হলে কী করতে পারে কান্তিভূষণ ?

স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো একটা বাসে উঠে বসে সে ভাবতে লাগল : কী করতে পারে ?

চুরি-ডাকাতি। বাটপাড়ি। খুন। আর-একটা কাজ পারে। আঠারো বছর বয়সে গঙ্গাযাত্রীদের কেউটের ফোকরভরা ঘরটার পাশে বসে যে-কথা সে ভেবেছিল। আত্মহত্যা করতে পারে।

জীবনে সেদিন যে গ্রন্থিটুকু ছিল, আজ সেটা ছিঁড়ে গেছে টুকরো টুকরো হয়ে। আজকে আর কোন মোহ নেই। একটা কথাও ঠাট্টা করে বলেনি সুপ্রিয়া। বলেছে শীতল, কঠোর, নিষ্ঠুর ভাষায়। তার ভিতরে আত্মবঞ্চনার একটুকু রন্ধ্র নেই কোথাও।

"টিকেট ?"

কণ্ডাক্টরের গলা। লোহার বালাপরা একখানা প্রসারিত রোমশ হাত।

"কোথায় যাবে বাস ?"

"শ্যামবাজার।"

একটা এক টাকার নোট বের করে দিয়ে কান্তি বললে, "শ্যামবাজারের টিকেটই দাও।"

হাতে একটা টিকেট পড়ল, সেই সঙ্গে একরাশ খুচরো। কান্তি একসঙ্গে সবগুলো পকেটে ফেলল।

পাশে কাবুলীওলা বসেছে একজন। কালো জাব্বাজোব্বা থেকে হিংয়ের উৎকট গন্ধ। কান্তি বাইরে তাকিয়ে রইল। সারা শরীরে আগুন জ্বলছে। কুয়াশা-মাখা চোখের সামনে কিছুই সে স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছে না, শুধু

একটা নিরবচ্ছিন্ন আলোর ঝড় বয়ে চলেছে বাইরের পৃথিবীতে।

সেই সিনেমা হাউসটা। একবারের জন্যে তার পাশে এসে বাসটা দাঁড়াল। নানা রঙের আলোয় মাদক আহ্বান। পথে, ফুটপাথে প্রবাহিত জনতা। য়্যাম্প্লিফায়ার থেকে তবলা-তরঙ্গ ঝরছে, দ্রুত লয়ে চলছে সিদ্ধ সাধকের হাত। মনে হচ্ছে রাজপুতানার পাথুরে পথ দিয়ে ছুটে চলেছে একদল সশস্ত্র ঘোড়সোয়ার। ঘোড়ার খুরে খুরে আগুন ঠিকরে পড়ছে।

কান্তির চোখ বুজল।

বাস আবার চলেছে। চোখের সামনে আলোর ঝড়। থেকে থেকে বাসটার থেমে দাঁড়ানো। নানা রকমের মুখ। পাশ থেকে কখন নেমে গেছে কাবুলীওয়ালা। সামনের সীটে শ্যামলী একটি মেয়ে এসে বসেছে। ফাঁপানো বার্বার ধরনের চুল, তা থেকে লাইমজুসের মতো কী একটা গন্ধ।

কিন্তু এভাবেও আর বসে থাকা চলে না। শরীরের জ্বালার স্রোতটা সাপের বিষের মতো বয়ে যাচ্ছে। কোথায় চলেছে কান্তি? শ্যামবাজার? কেন যাবে? কী আছে সেখানে? কিসের আকর্ষণ?

কান্তি নেমে পড়ল। পা দুটো আর বইছে না। মনে পড়ে গেল গঙ্গাযাত্রীদের ঘরের পাশে সেই অন্ধকার বিশাল বটগাছটা, যার তলায় এক টুকরো ছেঁড়া সিলকের কাপড়ের মতো সাপের খোলস উড়ছে। ওপারে একটা চিতা জ্বলছে, তারও পিছনে উদ্যত ভুতুড়ে হাতের মতো কলের গোটা দুই অন্ধকার চিমনি।

সেইখানে ফিরে যেতে পারলে হত। অনেকক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকা যেত ফাটলধরা ঠাণ্ডা ঘাটলাটার উপরে। তারপরে—

কিন্তু সে এখনো অনেক দূর। আজকে আর সেখানে ফিরে যাওয়ার কোনো ট্রেন নেই।

অতএব আবার সেই শেয়ালদার বোর্ডিং। ঠাণ্ডা বিছানা। ছারপোকার শরশয্যা। কালকের মতো আজও পাশের সীটের মোটা ভদ্রলোকের একটানা জান্তব নাকের ডাক। কিন্তু সেইখানেই ফিরে যেতে হবে।

রাস্তা পেরিয়ে কান্তি ওপারের ট্রামস্টপের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। একটা পোস্ট ধরে।

কতক্ষণ সময় গেল? পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট। একখানাও গাড়ি আসছে না কেন!

পেছন থেকে কে আলগা ভাবে স্পর্শ করলে তাকে। শীর্ণ, শীতল আঙুল। চকিত হয়ে কান্তি ফিরে তাকাল।

কালো একটি কদাকার মেয়ে। পরনে সস্তা ছিটের শাড়ি। চোখে কাজল। মুখে পাউডারের প্রলেপ। কোটরে বসা নিষ্প্রভ চোখের মধ্য থেকে কটাক্ষ বর্ষণের ব্যর্থ চেষ্ট করে বললে, "আসবে!"

কান্তি তাকিয়ে রইল।

"এসো না।" মৃদু বিষণ্ণ মিনতি। আজকের সন্ধ্যাটা ওর ফাঁকাই গেছে খুব সম্ভব।

কান্তি তেমনি চেয়ে রইল আরো কিছুক্ষণ। পিছনে খোলার ঘরের সারি।

কী ভেবে কান্তি বললে, "বেশ, চলো।"

আসল কথা, সে আর দাঁড়াতে পারছে না। একটা কোথাও বসা দরকার, একটু জিরনো চাই। হাত-পা ভেঙে আসছে। কিন্তু তাই বলে এদের ঘরে! গলা পর্যন্ত ঠেলে ওঠা একটা অসহ্য ঘৃণার আবেগকে নিজের মধ্যেই নিয়ন্ত্রিত করে নিলে কান্তি। তার কিসের বিচার, কিসের সংকোচ! সে খুনী শান্তি-ভূষণের ছেলে। কান্তি আরো জানে, খুনী, শয়তান, সমাজের আবর্জনাদের জায়গা এদেরই ঘরে। পৃথিবীর যত পলাতক মানুষের এরাই ক্লেদাক্ত আশ্রয়।

মেয়েটি আবার চাপা ত্রস্ত গলায় বললে, "দেরি কোরো না, পুলিস এসে পড়বে।"

একটা অন্ধকার নোংরা গলি দিয়ে, পায়ের তলায় জলকাদা মাড়িয়ে কান্তি খোলার ঘরে এসে ঢুকল। মেঝেতে একটা ময়লা বিছানা, ঘরে মিটমিট লণ্ঠনের আলো।

মেয়েটি বললে, "বোসো।"

আর একবার কান্তির শরীর শিরশিরিয়ে উঠল, আবার খানিকটা বমির বেগ ঠেলে এল গলার কাছে। এক লাফে ছুটে যেতে চাইল বাইরে। কিন্তু পা দুটো ঠকঠক করে কাঁপছে। বিছানাটার উপরেই সে ধপ করে বসে পড়ল শেষ পর্যন্ত।

মেয়েটি এইবার ভালো করে তাকিয়ে দেখল তাকে। কদাকার মুখে হেসে বললে, "কখনো এর আগে আসোনি—না?"

"না।"

"নতুন যে সে বুঝতেই পারছি। বোসো, ভালো করে বোসো।"

বসা নয়, শুয়ে পড়া দরকার। মেরুদণ্ডটা যেন হাজার টুকরো হয়ে যাচ্ছে। তবু কান্তি বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

"অমন করে চেয়ে আছ কেন?" মেয়েটি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল, "শরীর ভালো নেই তোমার?"

"সে থাক। তুমি গান জানো?"

"জানি কিছু কিছু। কিন্তু সে গান কি তোমার ভালো লাগবে?"

পাশের ঘর থেকে মাতালের চিৎকার উঠল, একটি মেয়ে হেসে উঠল ডাকিনীর মতো খলখল গলায়। কান্তির দু হাতে কান চেপে ধরতে ইচ্ছে করল।

"খুব ভালো লাগবে। তুমি গান শোনাও।"

বিছানার এক কোণায় ছোট একটা খেলো হার্মোনিয়ম। মেয়েটি সেই হার্মোনিয়ম নিয়ে বসল। খানিকটা উৎকট যান্ত্রিক আওয়াজ বেরুল কিছুক্ষণ, তারপর ভাঙা বেসুরো গলায় অমার্জিত উচ্চারণে মেয়েটি হিন্দী সিনেমার চটুল গান ধরল একখানা। আর সেই সঙ্গে হিন্দী ছবির নায়িকার মতোই কোটরে-বসা চোখের ভিতর দিয়ে কান্তির দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপের করুণ চেষ্টা করতে লাগল।

শুনতে শুনতে আবার কান্তির চোখ বুজে এল। চারদিকে একটা অবিচ্ছিন্ন শূন্যতা। শুধু আকাশ। সামনে, পিছনে, পায়ের নীচে। এই গান নয়, দীপেন বোস খেয়াল গাইছে। তার সুর যেন একরাশ জোনাকি হয়ে ঘিরে ধরছে তাকে। তার চারদিকে সুরের বিন্দু রূপ নিয়েছে আগুনের কণায়। "ননদিয়া গাগরী ভরনে যাঁউ—"

মাঝপথেই গান বন্ধ করে আর্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি।

"ও টগরদি, ও টগরদি, শিগগির এসো। এ যে মূর্ছো গেল গো! এ কী বিপদে পড়লাম! টগরদি—টগরদি—"

তিন

নাচ শেষ করে গীতা কাউর যখন পার্ক স্ট্রীটের বাসায় ফিরে এল, রাত তখন প্রায় দুটো।

চাকর এসে দরজা খুলে দিল। শ্রান্ত পায়ে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে গীতা দেখল দীপেনের ঘরে আলো জ্বলছে। গীতা আস্তে দরজায় ধাক্কা দিলে। দরজা ভেজানোই ছিল, খুলে গেল।

"তুমি তো এগারটায় ফিরেছ দীপেন। শোওনি এখনো?"

"ঘুম আসছে না।"

গীতা তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে একবার তাকাল। টেবিলে হুইস্কি, সোডার বোতল, গ্লাস।

"বসে বসে ড্রিঙ্ক করছিলে?"

"অল্প। আজ মাতাল হইনি, দেখছ তো? একটুখানি ভাবতে চেষ্টা করছিলাম। তাই সামান্য—"

গীতা বললে, "তুমি তো জান দীপেন, সামান্যও তোমার পক্ষে বিপজ্জনক। জেনে শুনে তবু কেন খাও?"

"কেন খাব না?"

"তোমার বেঁচে থাকার দরকার আছে বলে।"

দীপেন হেসে উঠল, "কার কাছে?"

"দেশের কাছে।"

"দেশ আমার কে? তার জন্যে জোর করে বেঁচে থাকতে হবে, এমন প্রতিশ্রুতি আমি দেইনি।"

গীতা নিজের ঘরে যাওয়ার কথা ভাবছিল, কিন্তু গেল না। বসে পড়ল সামনের চেয়ারটাতে। দীপেনের মুখোমুখি।

"তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে পারি দীপেন?"

"তোমাদের এই ধরনের রোমান্স কবে কাটবে বলতে পারো?"

"কিসের রোমান্স?" গীতার গলার স্বরের রূঢ়তায় দীপেন ভুরু কোঁচকাল,

"কী বলছ তুমি ?"

"আজও তোমাদের সংস্কার, মদ খেয়ে লিভার পচাতে না পারলে বড় শিল্পী হওয়া যায় না। এখনো তোমরা মনে করো, বীভৎস রকম নেশা না করলে তোমাদের ইন্‌স্‌পিরেশন আসে না। অথচ এই মদের জন্যেই তোমরা ফুটতে না ফুটতে মরে যাও, আর নেশার ফাঁস পরিয়ে একটু একটু করে হত্যা করো নিজের শিল্পকে। ওমর খৈয়ামের স্বপ্নটা ছেড়ে দাও দীপেন, ওটা মধ্যযুগের ব্যাপার।"

দীপেন ব্যঙ্গের হাসি হাসল। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলে, তারপর বললে, "মাঝরাতে তুমি কি আমাকে প্রহিবিশনের গুণগান শোনাতে এসেছ গীতা ? লেকচার ?"

"লেকচার নয় দীপেন। নিজেই ভেবে দেখ, এই মদের জন্যে কতগুলো প্রতিভার অপমৃত্যু হয়েছে দেশে।"

"আমিও না হয় মহাজনদের পথ ধরেই এগিয়ে চলব গীতা। সেইটেই কি ভালো নয় ?"

"ওটা একটা চমৎকার ডায়লগ দীপেন, তার বেশী কিছু নয়। কথা দিয়ে অনেক ফাঁকিকে সাজিয়ে দেওয়া যায়, তাই বলেই তারা সত্য হয়ে ওঠে না। তুমি মদ ছেড়ে দাও। একান্ত ছাড়তে না পারো, একটা মাত্রা রাখ। 'সজনি ভর্ দে পেয়ালা'য় রোমান্স থাকতে পারে, কিন্তু বমির মধ্যে যখন মুখ থুবড়ে পড়ে থাকো, তখন সে-দৃশ্য দেখে সজনী খুশী হয় না।"

"আজ তোমাকে ভারী উত্তেজিত মনে হচ্ছে গীতা।" দীপেন মুখের সিগারেটের ধোঁয়া রিং করতে লাগল, "খুব ভালো নেচে এসেছ বোধ হয়।"

"ঠাট্টা নয় দীপেন। তোমাকে মদ ছাড়তে হবে।"

"মদ ছেড়ে কী নিয়ে থাকব ?"

"গান নিয়ে।"

"তা হলে গানের উৎসও আমার শুকিয়ে যাবে।"

"যাবে না দীপেন। তুমি তো জানো, শাস্ত্রে গানকে তপস্যা বলা হয়েছে। মাতলামি দিয়ে আর যাই হোক, তপস্যা হয় না। অমৃতসরে আমি এক গায়ককে দেখেছি। সোনার মন্দিরে তিনি গান গাইতেন, গাইতেন গুরু নানকের ভজন। কিছু মনে কোরো না, তোমাদের দেশের অনেক নামজাদা ওস্তাদ তাঁর পায়ের ধুলোরও যোগ্য নন। কোনো নেশা, কোনো অসংযম তাঁকে স্পর্শ করেনি। প্রায় নব্বুই বছর বয়েসে তিনি মারা যান, মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তিনি বাইশ বছরের জোরালো গলায় গান গেয়েছিলেন।"

"সকলে এক নয় গীতা।"

"খুব বেশী তফাতও নয় দীপেন। সংযম জিনিসটা একজনের আসে আর একজনের আসে না, এ-কথাটা অসংযমের সাফাই। তোমরা গানের জন্যে মদ খাও না, মদের তলায় তলিয়ে দিয়েছ গানটাকে।"

দীপেন আবার ভুরু কোঁচকাল। "তুমি নিজে এ-রসে বঞ্চিত, তাই বুঝতে

পারছ না গীতা। যদি একবার—”

“একবার ?” গীতা অদ্ভুত ধরনে হাসল, “একবার নয়, অনেকবারই আমি খেয়ে দেখেছি দীপেন। একটা সময় গেছে, যখন আমিও দিনের পর দিন নেশার মধ্যে ডুবে থেকেছি।”

“তুমি !” দীপেন সকৌতুকে বললে, “তোমারও চলত নাকি এ-সব ? আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি বরাবরের গুড্ গার্ল।”

“গুড্ গার্ল !” গীতা শীর্ণভাবে হাসল, “তাই ছিলাম বটে এককালে। তখন লাহোরে আমার বাবা ব্যবসা করতেন, যখন প্রথম কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। কিন্তু তারপর বাঈজী হতে হল। স্কুলে নাচতে শিখেছিলাম, সেই নাচের মোড় ফিরল অন্যদিকে। তখন আর-এক অন্ধকারের জীবন। সে অন্ধকারে তোমার মতো আমিও মদের বোতলকেই আঁকড়ে ধরেছিলাম।”

দীপেন আশ্চর্য হল ঃ “হঠাৎ এ পরিবর্তন কেন ? কলেজ থেকে একেবারে বাঈজী ?”

গীতার মুখের উপর ছায়া নামল, ঘন আর গাঢ় হয়ে গেল চোখের দৃষ্টি। জানলা দিয়ে একবার বাইরে চেয়ে দেখল গীতা। রাস্তার ওপারে প্রকাণ্ড ম্যানসন-বাড়িটা রাত্রির সমুদ্রে একখানা জাহাজের মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ; মাথার উপরে আকাশে একটা তারাও নেই, স্তরে স্তরে মেঘ এসে জমেছে সেখানে।

গীতা বললে, “সে আরো অনেকের মতো পুরনো গল্প দীপেন। দাঙ্গা বাধল, রক্তের পিচকারি ছুটল লাহোরের রাস্তায়। সেই রক্ত মেখে জানোয়ারের দল নেচে বেড়াতে লাগল। বাবাকে খুন করল রাস্তায়, মাকে আমাদের চোখের সামনে বীভৎসভাবে টুকরো টুকরো করলো। তারপর আমাদের দু বোনকে চুল ধরে টেনে একটা ভ্যানে উঠিয়ে নিলে।”

গীতা একটু চুপ করল, মৃদু গলায় আবার বলতে আরম্ভ করল, “ফিরে এলাম দেড় বছর পরে, পাকিস্তান হয়ে গেলে। পালিয়ে এলাম। এই দেড় বছর কীভাবে কেটেছে সে আর বলে লাভ নেই। ভ্যানে উঠে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। জ্ঞান হওয়ার পরে আমার বোনকে আর দেখতে পাইনি, দেড় বছরে কোনো সন্ধানও পাইনি তার। একাই ভেসে এলাম অমৃতসরে। সরকারী আশ্রয় পেয়েছিলাম। সেখান থেকে আর-একজন চোস্ত সাহেবী চেহারার ইংরেজী-ওলা লোক বিয়ে করবে বলে এনে ভিড়িয়ে দিলে বাঈজীর আখড়ায়।”

দীপেনের সিগারেট আঙুলের পাশে এসে জ্বলছিল। জানালা গলিয়ে সেটা বাইরে ছুঁড়ে দিলে। গীতা বলে চলল, “কিন্তু তার মধ্যে তখন আর বিশেষ কিছু গ্লানি ছিল না দীপেন। চূড়ান্ত অপমানে জ্বলে গিয়েছিলাম অনেক আগেই, দ্বিধা খুব বেশী ছিল না আর। এতদিন জানতাম, ধুলোতেই পড়ে আছি ; এখন দেখলাম আমার পায়ের ধুলোয় লুটিয়ে পড়বার জন্যেও অনেকে আছে। নাচতে জানতাম, আরো ভালো করে শিখলাম। শিখলাম কেমন করে মানুষের রক্তে আগুন ধরিয়ে দিতে হয়, কেমন করে বুনো জানোয়ারদের কুকুরের মতো বশ করা চলে। যারা আমার চুলের মুঠি ধরে

টেনে নিয়ে গিয়েছিল, আমি বুঝেছিলাম এখন আমার চোখের দিকে তাকানোর শক্তিও আর তাদের নেই।"

দীপেন আস্তে আস্তে বললে, "আই য়্যাম অ-ফুলি সরি গীতা।"

"তুমি দুঃখিত হয়ে কী করবে দীপেন।" গীতা হাসল, "সেদিন নিজের সম্পর্কেও বোধ হয় কোনো দুঃখের চেতনা আমার ছিল না। তবু এক-একদিন পুরনো স্মৃতিটা জেগে উঠত। মনে পড়ত ঃ গুরুদ্বারে গান হচ্ছে, বাবা বসে আছেন চুপ করে, তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। দেখতে পেতাম, বিকালবেলা আমাদের বাড়ির সামনে ছোট্ট লনটিতে আমি আর আমার বোন ব্যাডমিণ্টন খেলছি। আর মনে পড়ত আমাদের কলেজ ঃ গেট পেরিয়ে লাল সুরকির পথ, দুধারে রাশি রাশি ফুল—আর, আর আমাদের ইংরেজীর জুনিয়র প্রফেসার সোহনলালকে। কতদিন দেখেছি, দোতলার স্টাফরুম থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছেন সোহনলাল, আমি কখন কলেজে আসব তাই দেখবার জন্যে।"

দীপেন আর-একবার হুইস্কির বোতলের দিকে হাত বাড়িয়েই সরিয়ে নিলে। বললে, "তুমি তাঁকে ভালোবাসতে ?"

"ষোল বছরের মনের খবর ঠিক জানি না দীপেন, বোধ হয় বাসতাম। তিনি যে বাসতেন, তাতে একটুকু সন্দেহ নেই। হয়তো পরে আমাদের বিয়েও হয়ে যেত।"

গীতা থামল। আকাশে কালো মেঘ। রাত্রির সমুদ্রে নোঙর-ফেলা জাহাজের মতো বিরাট ম্যানশনটা নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে।

দীপেন বললে, "সোহনলাল বেঁচে আছেন ?"

"আছেন। দিল্লী কিংবা আগ্রার কোনো কলেজে প্রফেসর তিনি।"

"তার সঙ্গে দেখা করেছিলে ?"

"তাঁকে দুঃখ দেবার জন্যে ?" গীতা বললে, "তিনি তো কোনো অন্যায় করেন নি, মিথ্যে তাঁকে দণ্ড দেব কেন ? সে যাক, যা বলছিলাম তাই বলি। বাঈজী-জীবনের এক-একটা অবসরে যেদিন এ-সব কথা মনে পড়ত, মনে পড়ত সোহনলালকে, সেদিন নিয়ে বসতাম মদের বোতল। যতক্ষণ না জ্ঞান হারিয়েছি, ততক্ষণ ছাড়িনি। কিন্তু কী লাভ হল দীপেন ? যাকে ভুলতে চেয়েছি, মদ খেলে দেখেছি আরো বেশী করে তাকে মনে পড়ে। যে-যন্ত্রণা এমনিতে অস্পষ্ট হয়ে থাকে, সেটা টনটনিয়ে ওঠে অসহ্য ভাবে। আর নেশা কেটে গেলে আরো কয়েক ঘণ্টা অবসাদের মধ্যে সেই স্মৃতিটাই বিষের মতো জ্বলে অথচ শরীরে মনে কোথাও এমন এতটুকু উদ্যম থাকে না যে তাকে জোর করে দূরে সরিয়ে দিই।"

দীপেন গীতার দিকে তাকিয়ে রইল। চোখ দুটো ঝাপসা, জল এসেছে অল্প অল্প। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না করেই গীতা বলে চলল, "মদ ছেড়ে দিলাম। ফিরে এলাম অনেকখানি স্বাভাবিক জীবনে। নাচকে জাতে তুললাম, শিখলাম ভরতনাট্যম্। নাম আমার ছড়িয়ে পড়ল, তোমরা আমাকে চিনলে। অবশ্য গীতা কাউরকেই চিনলে, কলেজের খাতায় যে নাম ছিল, সে নামে নয়।"

"গীতা তোমার আসল নাম নয় ?"

"না। কিন্তু আগের নামটাই তো এখন নকল, সে পরিচয় তো আমার কোথাও নেই। তবু আমি আর এখন এতটুকুও দুঃখ করি না দীপেন। জীবনে যে পথ দিয়েই তুমি যাও, সেখানেই তোমার কিছু না কিছু করবার আছে। মাটিতে অনেক পোড়ো জমি থাকতে পারে দীপেন, কিন্তু জীবনে নেই; ইচ্ছে করলে সব জায়গাতেই তুমি ফুল ফোটাতে পারো, ফল ধরাতে পারো। তুমি মাঝে মাঝে বলো, যা চেয়েছিলে পাওনি, তাই তোমাকে এমনি করে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়েছে। কিন্তু তোমার চাইতেও মদের মধ্যে ডুবে যাওয়ার অনেক বেশী অধিকার আমার ছিল। তবু আমি দেখছি, কিছুই ফুরোয় না, কিছুই শেষ হয় না। যে কোনোদিন তুমি আরম্ভ করতে পারো, যে কোনো জায়গা থেকেই আরম্ভ করতে পারো। আমি শিল্পী, আমি আলাদা—এমনি কতগুলো গালভারী কথা বলে আত্মহত্যার মধ্যে হয়তো কিছু রোমান্স থাকতে পারে, কিন্তু ওগুলো ভারী খেলো জিনিস। মরার চাইতেও যে বেঁচে থাকাটা অনেক বড় আর্ট, সেইটে প্রমাণ করাই যে কোনো শিল্পীর সবচাইতে মহৎ কাজ।"

গীতা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। সালোয়ারের ওড়নায় মুছে ফেলল চোখ দুটো। "চার বছর আগে তোমাকে দেখে আমার ভালো লেগেছিল দীপেন। কখনো কখনো ভাবি, হয়তো ভালোও বেসে ফেলেছি। কিন্তু আমি যখন মরে গিয়েও বেঁচে উঠতে চাই, তখন তোমরা বেঁচে থেকেও মরে যেতে চাও। আর এই জন্যেও ভারী ঘৃণা হয় তোমাদের উপরে। জীবনের দাম যে দিতে জানে না —সে আর্টিস্টই নয়।"

গীতা এবার ঘড়ির দিকে তাকাল। অপ্রতিভ হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গেই।

"ছিঃ—ছিঃ—এ যে রাত প্রায় তিনটে বাজে! নিজেও শুইনি, তোমাকেও শুতে দিলাম না। হ্যাভ্ এ গুড্ রেস্ট্। আর, প্লীজ, ওই মদের বোতল-টোতলগুলো এখন সরাও সামনে থেকে।"

গীতা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইল দীপেন, আর একটা সিগারেট বের করে ধরাল। গীতা কি সত্যি কথা বললে, না আর একটা গল্প বানিয়ে বলে গেল এতক্ষণ ?

বাইরে কালো আকাশে গুরগুর করে মেঘ ডাকল। এখনি বৃষ্টি আসবে। দীপেন আবার মদের বোতলের দিকে হাত বাড়িয়েও সরিয়ে নিলে। গীতার কাহিনী শুনেছে এতক্ষণ, উপদেশও শুনেছে, কিন্তু মনের ভিতরে তারা যে গভীর করে কোথাও আঁচড় কেটেছে তা নয়। এই নিথর রাত্রে গীতাকে কাছে পেয়ে তার ভালো লাগছিল গল্প শুনতে। কিন্তু গল্প গল্পই। তার কতকটা জীবন থেকে নকল করা, কতকটা জীবনের ফাঁকা ঘর পূরণ করা। ওগুলো শুনে নেবার জন্যে, মেনে নেবার জন্যে নয়। মানতে গেলে তার জন্যে অনেক ভালো লোকের আরো অনেক ভালো কথাই আছে, সেজন্যে গীতা কাউকে কোনো দরকার নেই।

তবু দীপেন বোস জানালা দিয়ে মেঘের দিকে তাকিয়ে রইল। নিথর জাহাজের মতো কালো বাড়িটার উপর দিয়ে লাল বিদ্যুৎ চমকে গেল, আর আবার তার মনে পড়ল সুপ্রিয়াকে।

চার

রেবা জল খেতে উঠেছিল। তার মনে হল বারান্দায় কার ছায়া নড়ছে।

"কে ওখানে ?"

"আমি সুপ্রিয়া।"

"এত রাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কেন রে ?"

"হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। আর ঘুম আসছে না। তাই অন্ধকারে এসে দাঁড়িয়েছি একটু।"

শিরশিরে ঠান্ডা। গায়ে আঁচল টেনে বেরিয়ে এল রেবা। আকাশে মেঘ জমেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন। সেই দিকে তাকিয়ে রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুপ্রিয়া।

রেবা পাশে এসে দাঁড়াল। বিদ্যুতের আলোয় দুটো জ্যোতির্ময় চোখের মতো সুপ্রিয়ার চশমা ঝলকে উঠল আর-একবার।

"কী হয়েছে তোর ?"

"কিছু হয়নি। বললাম তো, ঘুম আসছে না।"

একটু চুপ করে থেকে রেবা বললে, "রোগটা নতুন। এর আগে কখনো দেখিনি। কাল পর্যন্তও একবার ঘুমুলে ঢাক না বাজিয়ে তোকে জাগানো যেত না।"

সুপ্রিয়া ক্ষীণ রেখায় হাসল। "দিন বদলায়। মনও। কালকে আমি যা ছিলাম আজ তা নাও থাকতে পারি। কিন্তু তাকিয়ে দ্যাখ ভাই, কী সুন্দর মেঘ জমেছে আকাশে। মেঘরাগ গাইতে ইচ্ছে করছে আমার। বিশাল ঐরাবতে চড়ে আসছেন মেঘরাগ, পিছনে রাগিণীরা চলেছে সার বেঁধে, কেউ মাথার ওপরে ধরেছে চামরছত্র—"

রেবা বাধা দিলে, "মেঘরাগের কথা থাক। কিন্তু তোর কোন্ রাগ সেইটে বল।"

"আমি ?" সুপ্রিয়া আবার হাসল, "আমি বোধ হয় সোহিনী। ঝিলমিল করছে অষ্টমীর জ্যোৎস্না। ছলছল করছে জল—"

"এই রাত তিনটের সময় উঠে তুই কাব্য করছিস নাকি ?"

"সত্যি বলছি ভাই, দীপেনবাবু নেশা ধরিয়ে দিয়েছেন আজ। কী গানই গাইলেন। মনে হল, নটরাজের ডমরু শুনতে পেলাম, দেখতে পেলাম তাঁর পায়ের নীচে সুরের সমুদ্রে তুফান উঠেছে। আর ভালো লাগছে না ভাই।"

"ওস্তাদ দুর্গাশঙ্করের কাছ থেকে কিছুই পাসনি ?"

"উনি কেবল মগ্ন করে রাখেন, দোলা দিতে পারেন না। উনি যোগমগ্ন

শঙ্করের সাধনা করেন। কিন্তু আমি তাঁর লাস্যরূপকে চাই, চাই তাঁর তাণ্ডবকে। এতে আমার মন ভরছে না।"

"অর্থাৎ ?"

"অর্থাৎ চলে যেতে হবে। বহুত দূর যা-না হ্যায় ভেইয়া, বহুত দূর যা-না হ্যায়—"

রেবা গম্ভীর হয়ে গেল। একটা সুস্পষ্ট বিরক্তিতে ভরে উঠল মন।

"তুই কি সত্যিই যেতে চাস নাকি ?"

"অন্তত এই মুহূর্তে তাই তো মনে হচ্ছে। সত্যি বলছি তোকে, আমি ঘরছাড়ার বাঁশি শুনেছি।"

"লোকে কী বলবে ?"

সুপ্রিয়া সহজ গলায় বললে, "খুব খারাপ বলবে, অন্তত তোর মুখে তাই শুনেছি। তবে সেজন্যে এর আগেও আমার কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না, এখনো নেই।"

"মা—বাবা—আমরা ?"

"তোরা হয়তো পরে আর আমার মুখদর্শন করবি না। কিন্তু যদি গীতলক্ষ্মীর আশীর্বাদ পাই, তোদের মুখ আমি উজ্জ্বল করে তুলব, এ গ্যারাণ্টি দিচ্ছি। আর সে আমি পারব, সে বিশ্বাস আমার আছে।"

সুপ্রিয়া গুনগুনিয়ে একটা গানের কলি ধরেছিল। থেমে বললো, "এর পরে অনেক স্পষ্ট কথাই হয়তো বলবে অনেকে, অনেক নিন্দা, অনেক ধিক্কার শুনতে হবে দিনের পর দিন। তোকে দিয়েই সেটা শুরু হোক, আমার আপত্তি নেই।"

রেবা রাগ করে বললে, "শেষরাতে এই ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে তোর সঙ্গে কাব্যচর্চা করতে আমার উৎসাহ হচ্ছে না। আমি শুধু একটা কথা বলব। অতীশকে অত করে নাচানোর কী দরকার ছিল চার বছর ধরে ?"

কথাটা কঠিন আর নিষ্ঠুর। সুপ্রিয়া আঘাত পেল। বললে, "আমি তাকে নাচাইনি।"

"নাচাসনি ? যদি বিয়ে না-ই করবি তবে এতদিন কেন আশা দিয়ে রেখেছিলি তাকে ?"

"বিয়ে করবার কথা তো কোনোদিন ভাবিনি। তাকে ভালোবেসেছি এই পর্যন্ত।"

"যাকে ভালোবেসেছিস, তাকেই বিয়ে করবি, এই তো স্বাভাবিক।"

ঝিরঝির করে মৃদু ছন্দে বৃষ্টি পড়ছে, যেন সেতারের ঝঙ্কার বেজে চলেছে। বৃষ্টির দিকে চোখ মেলে দিয়ে সুপ্রিয়া বললে, "স্বাভাবিক কথাটা রিলেটিভ। যা আমার স্বভাবের সঙ্গে মেলে না—তাকে আমি স্বাভাবিক বলে মানব কী করে ? আমি অতীশকে ভালোবেসেছি, কান্তিকে ভালোবেসেছি, আরো অনেককে ভালো লেগেছে। দেখেছি, আমার অনেক আছে, অনেককে দিয়েও তা ফুরোয় না। তোকে একটা সত্যি কথা বলি। আমার মনের ভেতরে শুধু একজনের সিংহাসন নেই আমি সেখানে আম-দরবার বিছিয়ে

রেখেছি। সেখানে কারো স্থানাভাব ঘটবে না। কাউকে ভালোবাসব রূপের জন্যে, কাউকে গুণের জন্যে, কাউকে বিদ্যার জন্যে—"

"থাক—থাক।" রেবার ধৈর্যচ্যুতি হল, "যদি একজনের মধ্যেই সব পাওয়া যায়?"

"তা হলে সবই তাকে তুলে দেব। কিন্তু জীবনে সে-সুযোগ কখনো যে আসবে এমন ভরসা তো হয় না ভাই। এ-রকম তিলোত্তম মানুষ কবির কল্পনায় থাকতে পারে, কিন্তু বাস্তবে মেলে না। এক-একজন এক-একটা পারফেকশনের কাছাকাছি পৌঁছুতে পারে, কিন্তু সবগুলো একসঙ্গে মিলিয়ে কাউকেই পাওয়া যায় না।"

"তাহলে তুই বিয়ে করবি কাকে?"

"আমার গানকে। আমি তাকেই ডাক দিয়ে বলব :

লহো লহো তুলে লহ নীরব বীণাখানি,
তোমার নন্দন-নিকুঞ্জ হতে
সুর দেহ তায় আনি
ওহে সুন্দর হে সুন্দর—"

বাধা দিয়ে রেবা তীক্ষ্ন গলায় বললে, "আর অতীশ—"

"তাকে আমি কখনো ঠকাইনি। বলেছি গানের ডাক যখন আসবে, তখনই আমার ছুটি। সেইটুকু সে মেনে নিয়েছিল অনেক আগেই। তাই আমি যখন চলে যাব, তখন সেই যাওয়াটাকে অতীশই নিতে পারবে সবচাইতে সহজে।"

রেবার আরো বেশী শীত করছিল। দাঁতে দাঁতে ঠকঠক করে রেবা বললে, "তুই কি ভাবছিস, মানুষের মনের সামনে একটা গণ্ডি টেনে দিয়ে বলা চলে, আর এগোতে হবে না, ব্যাস, এইখানেই থাক? অতীশ কত বড় দুঃখ পাবে সে-কথা বুঝতে পারছিস তুই?"

সুপ্রিয়া বললে, "দুঃখ যদি পায়, সে দায়িত্ব তারই। আমি তাকে কখনো ভুল বোঝবার সুযোগ দিইনি। আজ কান্তিকেও আমার বিশ্রী রকমের আঘাত দিতে হয়েছে।" সুপ্রিয়ার স্বর বিষণ্ণ হয়ে এল, "বেচারার বোধ হয় জ্বর এসেছিল, তার মধ্যেই একরাশ অপ্রীতিকর কথা শোনাতে হল তাকে। কী করব, কোনো উপায় ছিল না আমার। আজ এতক্ষণ কান্তির মুখটাই মনে পড়ছিল আমার। তাই কাল যেটা তোকে হালকা ভাবে বলেছিলাম, আজ সেটাকেই সত্য করে নেবার কথা ভাবছি। কান্তির জন্যে দুঃখ হচ্ছে, অতীশ জড়িয়ে ফেলছে আমাকে। সম্পূর্ণ বাঁধা পড়বার আগে সেইজন্যেই আমাকে ছুটে পালাতে হবে।"

বৃষ্টিটা নেমেছে জোরালো হয়ে। বারান্দায় জলের ছাট আসছে। রেবা রেলিঙের কাছ থেকে সরে এসে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললে, "তোর কপালে বিস্তর দুঃখ আছে, তুই মরবি।"

"মরব?" সুপ্রিয়া হাসল, "মরিব মরিব সখী নিশ্চয় মরিব, কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব। সত্যি, অতীশকে কার হাতে দিয়ে যাই? তুই নিবি?"

রেবা দরজায় পা দিয়েছিল। সেখানে থেকে একটা অগ্নিদৃষ্টি ফেলে বললে, "চেষ্টা করব।" তারপরেই ভিতরে ঢুকে দুম করে বন্ধ করে দিলে দরজাটা।"

সেই ঠাণ্ডার মধ্যে, সেই বৃষ্টি পড়া দেখতে দেখতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল সুপ্রিয়া। আরো অনেকক্ষণ। কান্তি একটা কাঁটা রেখে গেছে বুকের ভিতর। ওর জন্যে মায়া হয়। কিন্তু কষ্টটা বোধ হয় হবে অতীশের জন্যেই। এক-একটা সন্ধ্যায় যখন কার্জন পার্কে পাশাপাশি বসতে ইচ্ছে করবে তখন অতীশ ছাড়া কে সঙ্গ দেবে আর? দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার ধারে হাতে হাত রেখে বালি ব্রিজের দিকে তাকিয়ে থাকা, একটা চলন্ত ট্রেনের এক ঝলক আলোয় মনটাকে অকারণে দুলিয়ে দেওয়া, তখন অতীশকে ছাড়া কী করে চলবে সুপ্রিয়ার?

কিন্তু আপাতত বাইরে এই বৃষ্টি। আকাশজোড়া বীণা বাজছে মেঘরাগে, তার উপরে বিদ্যুতের আঙুল নেচে নেচে চলেছে, সমস্ত পৃথিবী এখন স্বপ্নমূর্ছিত। এর মধ্যে কোথায় অতীশ? এই সুর সে কোথায় পাবে?

এ দিতে পারে দীপেন। আর পারে সেই সব সঙ্গীতগুরুর দল, ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে যাঁরা অফুরন্ত ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার নিয়ে অপেক্ষা করছেন। অতীশ পারে না।

"কিরে, কতক্ষণ ঘুমাবি আর?"

কাল রাতেই রেবা ভেবেছিল সুপ্রিয়ার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দেবে। শেষের রসিকতটা অনেকক্ষণ ধরে তার সারা গায়ে যেন বিছুটির জ্বালার মতো জ্বলছিল। শুধু কথা বন্ধও নয়, সাতদিন মুখদর্শন উচিত নয় ওর।

অতীশকে কি সত্যিই নিতে পারে না রেবা? এতই কি শক্ত কাজটা? রেবার মনে হয়েছিল সেও দেখবে একবার চেষ্টা করে, হিংসের জ্বালা ধরিয়ে দেবে সুপ্রিয়ার বুকে। অতীশ হয়তো সুলভ নয়, তাই বলে একান্তই কি দুর্লভ? প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে একবার নেমে দেখলে কেমন হয়?

কিন্তু রেবা সুপ্রিয়া নয়। আগুন নিয়ে খেলা করতে তার উৎসাহ হয় না। মনের দিক থেকেও সে রক্ষণশীল। বিয়ের ব্যাপারটা বাবার দায়িত্ব, তার নয়। যেখানে যাবে, নিজের মতো করে গড়ে নেবে ঘর। স্নেহ দিয়ে, প্রেম দিয়ে, সেবা দিয়ে। অতীশের বোঝা সে বইতে পারবে না। তার স্বামী একদিন অন্য কাউকে ভালোবেসেছিল, এটা কিছুতেই কোনোমতেই সইতে পারবে না রেবা। সে যাকে পাবে, তার কাছে সে-ই প্রথম প্রেম, প্রথম আবিষ্কার, প্রথম পদ্ম আর সূর্যোদয়।

অতীশের কথা থাক। কিন্তু কী আশ্চর্য মেয়ে সুপ্রিয়া!

বেলা নটা পর্যন্ত চটে বসে ছিল রেবা, কিন্তু তারপরে আর পারল না। নিজের প্রকাণ্ড সেতারটা নিয়ে অনেকক্ষণ যা খুশি বাজাল, অমিয় মজুমদার বার কয়েক ভ্রূকুটি করে নেমে গেলেন নীচে। পড়ুয়া ছোট ভাইটি এসে সকাতরে জানাল, "কী করছিস ছোটদি, পড়তে দিবি না?"

"কেন রে! এত চমৎকার বাজাচ্ছি, তোর তো আরো বেশী কনসেনট্রেশন আসা উচিত।"

"সত্যি বলছি, একটু থাম। কানে তালা ধরে গেল।"

"তালা ধরে গেল!" রেবা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, "বেরসিক ভূত! রবিবার অত পড়া কিসের রে? যা না, কোথাও মর্নিং শো-তে সিনেমা দেখে আয়। রাতদিন পড়ে পড়ে কুঁজো হয়ে যাচ্ছিস, চোখ দুটো প্রায় অন্ধ হওয়ার জো। কী হবে অমন যাচ্ছেতাই ভাবে পড়াশোনা করে?"

এবার মিনতি শোনা গেল, "ছোট্দি—"

"বেরো এখান থেকে।" রেবা চিৎকার করে বললে, "তোর যেমন পড়া, আমার তেমন রেওয়াজ। তুই রাতদিন ঘ্যানর ঘ্যানর করে পড়বি, অথচ আমি একটুখানি সেতার নিয়ে বসতে পারব না, আবদার নাকি? দূর হ বলছি—"

কিন্তু এত গোলমালেও সুপ্রিয়ার ঘুম ভাঙল না।

বাজিয়ে বাজিয়ে আঙুল যখন শেষ পর্যন্ত টনটন করতে লাগল, তখন সেতার ছাড়ল রেবা। কিন্তু কী আশ্চর্য, এখনো কেন ঘুম থেকে উঠছে না সুপ্রিয়া? সকাল অবধিই কি দাঁড়িয়ে ছিল নাকি বারান্দায়?

রেবা এসে দরজায় ধাক্কা দিলে। খিল দেওয়া ছিল না, খুলে গেল। একটা চাদরে বুক পর্যন্ত ঢেকে মুখের উপর একখানা হাত রেখে ঘুমুচ্ছে সুপ্রিয়া। বালিশের উপর দিয়ে মেঘের মতো চুল নেমে এসেছে অনেকখানি।

কিছুক্ষণ ক্লান্ত ঘুমন্ত সুপ্রিয়ার দিকে তাকিয়ে রেবা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এত শান্ত, এত কোমল মেয়েটার রূপ। মনে হয়, যেন চেলি-চন্দনে সেজে বিয়ের পিঁড়িতে বসবার জন্যেই জন্মেছে। চাদরের ফাঁক দিয়ে একটা পায়ের পাতা বেরিয়ে এসেছে। যেখান দিয়ে হেঁটে যাবে, লক্ষ্মীর পায়ের লেখা আঁকা পড়বে সেখানে। তবু কেন মনটা ওর এমনি অশান্ত? যখন হাতের কাছে অফুরন্ত ঐশ্বর্যের অর্ঘ্য এসে পড়েছে, তখন কিসের জন্যে ছুটে যেতে চাইছে আলেয়ার সন্ধানে?

"কিরে, তুই কি এ বেলা আর উঠবি না ঘুম থেকে?"

সুপ্রিয়া চোখ মেলল।

"সারারাতই কি বাইরে ঠাণ্ডার মধ্যে ছিলি কাল?"

সুপ্রিয়া উঠে বসল। চোখ কচলাল দু হাতে।

"বেলা কটা এখন?"

"দশটা।"

"দশটা!" বিদ্যুৎ-চমকের মতো সুপ্রিয়ার একটা কথা মনে পড়ল, "কান্তি আসেনি?"

"না, কেউ আসেনি।"

সুপ্রিয়া চিন্তিত গলায় বললে, "কিন্তু আসা তো উচিত ছিল। আমি চা খেতে ডেকেছিলাম ওকে।"

এতক্ষণ মনের মধ্যে একটা করুণা সঞ্চারিত হচ্ছিল রেবার, কিন্তু সুপ্রিয়ার কথা শোনবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল সেটা। তিক্ত বিরক্তিতে রেবা দপ করে জ্বলে উঠল।

"রাস্তায় অপমান করে বাড়িতে চা খাওয়ার নেমন্তন্ন করলে কোনো ভদ্রলোক আসে না।"

রেবা বেরিয়ে গেল। সুপ্রিয়া আরো কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল বিছানার উপরে। আজ বিকালে একবার খোঁজ নিতে হবে কান্তির। শেয়ালদার কাছে একটা বোর্ডিঙে এর আগে আরো দু-তিনবার সে উঠেছে, সুপ্রিয়া তার ঠিকানাটা জানে। আর একবার খবর নিতে হবে অতীশেরও। দু-দিন অতীশ দুর্গাশঙ্করের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এসেছে, নিশ্চয় রাগ করেছে সে।

কাল রাত নটার পর অতীশ যে খোঁজ করতে এসেছিল, বিরক্তিতে সে কথাটা বলতে ভুলেই গিয়েছিল রেবা।

সারাটা দিন একটা মানসিক অস্থিরতা নিয়ে সুপ্রিয়া কান্তির জন্যে অপেক্ষা করল। রেবা প্রায় অসহযোগ করে আছে, ভালো করে কথাবার্তাই হল না তার সঙ্গে।

শুধু কান্তির জন্যে নয়। অতীশের জন্যে আরো খারাপ লাগছে।

"আমি তো তোমার কাছে বেশী কিছু চাই না সুপ্রিয়া।" অতীশ বলেছিল।

"চেয়ো না। যদি জোর করে চাও, যেটুকু আছে তাকেই ফাঁপিয়ে দিতে হবে জলমেশানো দুধের মতো। তাতে করে তোমাকেও ঠকানো হবে, আমি নিজেও শান্তি পাব না।"

ট্রাম-লাইনের তেলতেলে কালো ঘাসগুলোর দিকে চোখ রেখে অতীশ বলেছিল, "জানি। তবু যে কদিন কাছে আছো, একটুখানি চোখের দেখা দেখতে দিয়ো। তোমাকে সারাদিন একবার দেখতে পেলেও আমি কাজ করবার দ্বিগুণ উৎসাহ পাব।"

"আর যখন আমি থাকব না?"

"তখনকার কথা তখন ভাবব, এখন নয়। তুমি যেন সেই ভবিষ্যতের কথা ভেবে এখন থেকে অদর্শনের রিহার্সাল দিতে শুরু কোরো না। সে আমি কিছুতেই সইতে পারব না।"

"আচ্ছা, তাই হবে।"

কিন্তু কথা রাখেনি সুপ্রিয়া। আজ দু-দিন অতীশ তার দেখা পায়নি। নিজের ভিতরে একটা অপরাধবোধ পীড়ন করছে তাকে। যদি গান না থাকত, যদি গীতময় ভারতবর্ষ এমনি করে সহস্র বাহু বাড়িয়ে তাকে হাতছানি না দিত, তাহলে জীবনের নিশ্চিত পরিণাম সে পেয়েছিল বইকি অতীশের মধ্যে। অতীশের বুকের ভিতরে মাথা গুঁজে সুপ্রিয়া বলতে পারত, আমি ধন্য, আর আমার চাইবার মতো কিছুই নেই।

অতীশ ভালোবাসে, কান্তিও ভালোবাসে। কিন্তু কান্তি খালি আশ্রয় চায় তার কাছে। নিজের ক্ষত নিয়ে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে তার কাছে আসে সান্ত্বনার জন্যে। আর অতীশ আসে আশ্রয় দিতে। তার চোখের দিকে তাকালে সুপ্রিয়ার মনে হয়, প্রেম নয় আরো গভীর, আরো শান্ত সমুদ্রবিশাল স্নেহ

সেখানে পুঞ্জিত হয়ে রয়েছে ; তার মধ্যে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে তলিয়ে যেতে পারে সুপ্রিয়া।

আজ বিকেলে খোঁজ নিতে হবে। দুজনেরই।

সারাটা দুপুর প্রায় ছটফট করে কাটল। বিকেলে বেরিয়ে যাবে, এমন সময় অমিয় মজুমদার ডাকলেন।

"কিরে চলেছিস কোথায় ?"

মুখের সামনে যে মিথ্যেটা বেরিয়ে এল, সেইটেকেই অবলীলাক্রমে বলে ফেলল সুপ্রিয়া।

"একটা চায়ের নেমন্তন্ন আছে। সেখানেই যাব।"

"ফিরবি কখন ?"

"একটু দেরি হবে। গানের ব্যাপারও আছে।"

"সে কি কথা!" অমিয়বাবু উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন, "জলসায় যাবি না ?"

"সময় পেলে চলে যাব ওখান থেকে। দেরি হলে বাড়িতে ফিরে আসব।"

অমিয় মজুমদার বিস্ময় বোধ করলেন। গান-পাগলা মেয়েটার এত বড় জলসা সম্পর্কে এমন উদাসীনতা তাঁর কেমন অশোভন বোধ হতে লাগল। মনে হল, সুপ্রিয়া কাজটা ঠিক করছে না।

সুপ্রিয়া বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, "আমি সময় পেলেই ওখানে চলে যাব কাকা।"

কিন্তু তার কান্তির কাছে যাওয়া হল না, অতীশের কাছেও না। তার আগেই একটা কালো মোটর পথ আটকে দাঁড়িয়ে গেল সামনে। দীপেন বোস।

"কোথায় চলেছ ?"

"একটা কাজে।"

"ওঠ গাড়িতে।"

"গাড়িতে আবার কেন ?"

"তোমায় লিফ্‌ট দেব।"

"আমি এমনিতেই যেতে পারব। আপনি বরং বাড়িতে যান, কাকার সঙ্গে দেখা করুন।"

"কাকার সঙ্গে তো দেখা করতে আসিনি—" দীপেন বোস হাসল, "এসেছি তোমার কাছেই। তোমাকেই আমার দরকার ছিল। পেয়ে গেছি যখন, আর ভাবনা নেই। উঠে পড়ো—"

"কিন্তু—"

দীপেন বোস আর বলতে দিল না। গাড়ির দরজা খুলে বললে, "উঠে পড়ো।"

কাল রাত্রের সেই সম্রাট। জ্যোতির্লোকের সিংহাসনে স্বমহিমায় সমাসীন। গানের সুরে সুরে নটরাজ জেগে উঠছেন, আকাশে ঘন কালো মেঘে মেঘে উঠছে তাঁর বিপুল নাচের মৃদঙ্গ-ধ্বনি। সুপ্রিয়া সম্রাটের আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারল না, উঠে বসল গাড়িতেই।

কান্তি নয়, অতীশ নয়, দীপেন ছাড়া আর কেউ নয়। ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে অনেকক্ষণ আর অনেক মাইল গাড়ি চালাল দীপেন। অনেক কথার গুঞ্জন বাজল সুপ্রিয়ার কানে। তারপরে সন্ধ্যা হলে চৌরঙ্গির একটা হোটেল। দীপেনের হাতে হুইস্কির গ্লাস। আর একটা অরেঞ্জ স্কোয়াস সামনে নিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে রইল সুপ্রিয়া। রক্তে ঝড় তুলে ওয়ালজ-রুম্বা ফক্‌স্‌ট্রটের উল্লাস চলতে লাগল।

রাত নটার সময় অমিয় মজুমদার দেখলেন তাঁর পাশে এসে বসেছে সুপ্রিয়া। আর মাইক্রোফোন গম্ভীর গলায় ঘোষণা করছে, "লখনউয়ের দীপেন বসু এইবার আপনাদের কাছে ঠুংরি পরিবেশন করছেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গত করছেন ওস্তাদ দ্বারিক দাস। ইনি প্রথমে গাইছেন—"

চতুর্থ অধ্যায়

এক

"ডি-এসসি হয়ে গেল আপনার?" প্রসন্ন মুখে শ্যামলাল বললে, "কাগজে দেখলাম। কিন্তু আশ্চর্য লোক আপনি, কিছুই তো বলেননি এতদিন। দিব্যি চেপে রেখেছিলেন সব।"

দাড়ি কামাতে কামাতে অতীশ বললে, "ব্যাপারটা এমন প্রলয়ঙ্কর কোনো কীর্তি নয় যে, ঢাকে ঢোলে ঘোষণা করতে হবে। ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলো থেকে প্রত্যেক বছরই কয়েক ডজন করে ডি-এসসি হয়ে বেরিয়ে আসে।"

"আপনি কোনো জিনিসকেই সিরিয়াসলি নেন না।" শ্যামলাল ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে, "আমরা হলে—"

"আপনিও হবেন।" অতীশ সান্ত্বনা দিলে।

শ্যামলাল দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "কই আর হয়! বি-এসসি'র আগে কম খেটেছি? বললে বিশ্বাস করবেন না, উনিশ থেকে কুড়ি ঘণ্টা পড়তাম ডেলি। তবুও একটা মাঝারি সেকেণ্ড ক্লাস, তার বেশি কিছু হল না।"

"এম-এসসিতে পুষিয়ে নেবেন।"

"চেষ্টা তো করছি। কিন্তু কী জানেন—" শ্যামলাল গলার স্বরটা অন্তরঙ্গতায় নামিয়ে আনল, "শুধু পড়ে হয় না। আরো কতগুলো সিক্রেট কোথাও আছে নিশ্চয়। সেগুলো বুঝতে পারলে কাজ হত।"

মুখের উপর সাবানের ফেনার এক বিপুল স্ফীতি তৈরি করে আধবোজা চোখে অতীশ বললে, "লুব্রিকেশন পেপার।"

"লুব্রিকেশন পেপার!" শ্যামলাল আশ্চর্য হয়ে বললে, "কোনো স্পেশাল পেপার বুঝি? কই, কখনো জানতাম না তো। কেমিস্ট্রিতে?"

অতীশ বললে, "উঁহু, ইউনিভার্সাল।"

শ্যামলাল হাঁ করে রইল, "বুঝতে পারলাম না।"

"বুঝতে পারলেন না ?" ফেনার স্তূপের মধ্যে ক্ষুর বসিয়ে অতীশ বললে "তেল মশাই, তেল ।"

"অ—ঠাট্টা করছিলেন ।" শ্যামলাল ব্যাজার হয়ে বললে, "শ্যামলাল ঘটক ও-সব তেল-ফেলের মধ্যে নেই । পাশ করি, ফেল করি, নিজের জোরেই করব । আমার যদি চেষ্টা থাকে, কেন আমি ফার্স্ট ক্লাস পাব না, বলুন ।"

"নিশ্চয় । এরই নাম পুরুষকার ।"

শ্যামলাল চিন্তিত মুখে বসে রইল খানিকক্ষণ । বললে, "আপনার আর ভাবনা কী, বেশ কাজ গুছিয়ে নিলেন । ফার্স্ট ক্লাস, তায় ডি-এসসি, এর পর মোটা মাইনের চাকরি ।" একটা মৃদু দীর্ঘশ্বাস পড়ল, "আমি যদি ফিজিক্সের ছাত্র হতাম, ভারী সুবিধে হত তাহলে । আপনার নোট-টোটগুলো পাওয়া যেত ।"

এক্ষেত্রে সহানুভূতি জানিয়ে লাভ নেই । অতীশ একমনে জুলপির তলা চাঁচতে লাগল ।

বাইরে একটা দেওয়াল-ঘড়ি টং টং করে উঠল ।

শ্যামলাল চমকে বললে, "এই যাঃ, সাতটা ! আমাকে যে এক্ষুনি বেরুতে হবে ।"

"সে কী মশাই ! পড়া ছেড়ে ?"

শ্যামলাল বললে, "বা-রে, আপনিই তো টিউশন জুটিয়ে দিলেন । পড়াতে হবে না ?"

"ওঃ—বালিগঞ্জ প্লেসে ?" অতীশ একবার কৌতুকভরা চোখ তুলে তাকাল, "তা কালও একবার সেখানে গিয়েছিলেন না ? উইকে তিন দিন পড়ানোর কথা ছিল, আপনি তো দেখছি রোজই পড়াচ্ছেন আজকাল ।"

কথা নেই বার্তা নেই, ফরসা শ্যামলাল লাল হয়ে গেল হঠাৎ ।

অতীশ ছোট্ট করে খোঁচা দিল আর একটা, "মাইনেও কিছু পাচ্ছেন তো ?"

"ইয়ে—" শ্যামলাল ঢোক গিলল, "না, তা ঠিক নয় । মানে ওর টেস্ট আসছে কিনা—"

"ওর কার ? মন্দিরার ?"

শ্যামলাল আবার একটা ঢোক গিলে বলল, "হ্যাঁ—হ্যাঁ—মন্দিরার । মানে ওর টেস্টের আর দেরি নেই কিনা—"

সরল গলায় অতীশ বললে, "ও । তা পড়ছে কেমন ?"

"মেয়েটি বেশ ইনটেলিজেন্ট ।" শ্যামলালকে কেমন স্নিগ্ধ মনে হল, "কখনো কখনো এমন এক-একটা কোশ্চেন করে যে আমি রীতিমত অবাক হয়ে যাই ।"

"খুব ভালো ।"

শ্যামলাল হাতঘড়ির দিকে তাকাল, "সাতটা পাঁচ । নাঃ—আর দেরি করা উচিত নয় ।"

ভাঙা কাপের মধ্যে বুরুশটা ধুতে ধুতে আড়চোখে অতীশ লক্ষ্য করতে

লাগল। ব্র্যাকেট্ থেকে একটা পাঞ্জাবি পরে নিল শ্যামলাল, সেটা আদ্দির। এর আগে ওকে বালিশের ওয়াড়ের মতো মোটা লংক্লথের জামা ছাড়া পরতে দেখা যায় নি। জামা পরে আরো মিনিট তিনেক আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ও চুলটাকে কায়দা করতে চেষ্টা করল। এ অভ্যাসও ওর কখনো ছিল না। অতীশ লক্ষ্য করে দেখল, শ্যামলাল পন্ডশ্রম করছে। বিধাতা বাম, খাড়া খাড়া চুলগুলো হাজার চেষ্টাতেও বাগ মানানোর নয়।

তারপর সবচাইতে আশ্চর্য কান্ডটা করল শ্যামলাল। জুতোটা সশব্দে বার কয়েক ব্রাশ করে নিয়ে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল।

অতীশ নিজের বিছানায় এসে বসল। সমস্ত লক্ষণই নির্ভুলভাবে মিলে যাচ্ছে, কোথাও কোনো গোলমাল নেই। মন্দিরা নামটা এখন তার কাছে গোপন কথার মতো, সহজে উচ্চারণ করতে চায় না, বলে "ও"। টিউশনের আগ্রহটা দিনের পর দিন শ্যামলালের পক্ষ থেকেই বেড়ে চলেছে, নিজের পড়ার সময়টা অর্ধেক খরচ হচ্ছে মন্দিরার জন্যে। আর সব চাইতে বড় কথা, পড়াশুনোয় মন্দিরা ইন্‌টেলিজেন্ট এটা বলবার জন্যে অনেকখানি গুণমুগ্ধ হওয়া দরকার, ঠিক সাধারণ বুদ্ধির কাজ নয়। তা ছাড়া আদ্দির পাঞ্জাবি, মাথার চুল, এরা তো সব আছেই।

অতীশ হাসল। লক্ষণ পরিষ্কার। হুবহু মিলে যাচ্ছে সব দিক থেকে।

এর নাম প্রকৃতির প্রতিশোধ, রবীন্দ্রনাথ থাকলে বলতেন। কিংবা আনা-তোল্ ফ্রাঁস। সেই 'থেইসের' গল্পটা। ওপাশের দেওয়ালে যত্ন করে খানতিনেক ছবি টাঙিয়ে রেখেছে শ্যামলাল। একখানা সরস্বতীর, একখানা স্বনামধন্য চিরকুমার রাসায়নিকের, আর একখানা পৃথিবীবিখ্যাত সেবাব্রতী সন্ন্যাসীর। এই ত্রিমূর্তিই কিছুদিন পর্যন্ত উপাস্য ছিল শ্যামলালের। এখন অবশ্য চতুর্থজনের আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু তার ছবি শ্যামলাল দেওয়ালে টাঙায়নি, টাঙিয়েছে নিজের বুকের মধ্যে।

সুতরাং ছাদ আর ঘুঁটের ঘরটা আপাতত বেকার। অবশ্য অতীশ ইচ্ছে করলে জায়গা নিতে পারে সেখানে।

কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারবে তো শ্যামলাল? মল্লিক সাহেবের নজরটা একটু উপর দিকে, তার সম্পর্কে কিছুটা প্রশ্রয় সত্ত্বেও তিনি যে ডি-এসসি পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলেন তা অতীশ জানে। তাঁর ছেলে, তাঁর জামাই, তাঁর বন্ধুবান্ধব সব কিছু নিয়ে স্বভাবতই মল্লিক সাহেব একটু ঊর্ধ্বচারী। শুরুই করেন শ-পাঁচেক ফুট ওপর থেকে।

"বুঝলে অতীশ, কাল রোটারি ক্লাবে আমার বক্তৃতা ছিল। ইট্ ও'জ্ এ ব্রিলিয়ান্ট য়্যাটেনডেন্‌স্। আমার সাবজেক্ট ছিল, সোস্যালিজম্—দি ইউটোপিয়া। দারুণ অ্যাপ্রিসিয়েশন হল।"

অতীশকে বলতে হয়, "আজ্ঞে সে তো হবেই।"

"বাই দি ওয়ে, শশাঙ্কর চিঠি এসেছে। আরে—শশাঙ্ক, আমার বড় জামাই। এখন ইউনেস্কোতে রয়েছে। মাইনেটা অবশ্য মন্দ দেয় না, তবু

আমার মনে হয়, ওর ক্যালিবারের ছেলের আরো ঢের উন্নতি করা উচিত ছিল।”

শশাঙ্ক ইউনেস্কোতে কত বড় চাকরি করে, কত টাকাই বা সে মাইনে পায় এবং কোন্ অসাধারণ ক্যালিবার নিয়ে উন্নতির কোন্ চরম শিখরে সে উঠতে পারত, এ-সব না জেনেও অতীশ মাথা নাড়েঃ “ঠিকই বলেছেন।”

“শুভেন লিখেছে, লণ্ডনে এবার খুব শীত পড়েছে। আরে বাপু, লণ্ডনে কম শীত পড়ে কবে? আমি যতবার গেছি—প্রত্যেকবারেই শীতের চোটে মনে হয়েছে, মাই গড্—ইটস্ হেল্। নতুন গেছে কিনা, তাই ওর আরো বেশী খারাপ লাগছে।” মৃদুমন্দ হাসেন মল্লিক সাহেব।

অতীশ সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দেয়, “ঠিক বলেছেন।”

“যাই বলো, ফলের রস খেতে গেলে স্ট্র-বেরির। এখানে যে-সব ফ্রুটস্ পাওয়া যায়—”

তারা যে কোনো কাজেরই নয়, অতীশকে সে-কথা অনেকবার স্বীকার করতে হয়েছে।

সেইখানেই মাথা গলিয়েছে শ্যামলাল। জীবনে যে মেয়েদের দিকে চোখ তুলে চায়নি, কেউ সামনে এসে এক-আধটা কথা কইলে যে একগলা ঘেমে উঠেছে, সে গিয়ে পড়েছে এমন বাড়িতে, যেখানে ছেলেমেয়ের মেলামেশা দিনের আলোর মতো সহজ। সে-আলোয় চোখে ধাঁধা লেগেছে শ্যামলালের, আর পদ্মপাঠ মন্দিরার প্রেমে পড়েছে!

ডি-এসসি হওয়ার পরে অতীশ যেখানে কিছু কৌলীন্য পেয়েছে, তা ছাড়া দূর আত্মীয়তার সূত্রে ছেলেবেলা থেকে আসা-যাওয়া করলেও আজো যেখানে অতীশ অন্তরঙ্গ হতে পারল না ভালো করে, সেখানে এই খাড়া চুলের ভালো ছেলে শ্যামলাল? দন্তস্ফুট করতে পারবে?

তা ছাড়া মন্দিরা। অতীশ যদি ভুল বুঝে না থাকে, তা হলে বছর খানেক ধরে মন্দিরার চোখে যে আলো সে দেখছে, তা কি আবার নতুন করে জ্বলবে শ্যামলালের জন্যে? সুপ্রিয়া যদি না থাকত—

অতীশ চকিত হয়ে উঠল। সুপ্রিয়া যদি না থাকত। কিন্তু সুপ্রিয়া তো থেকেও নেই। সেই সকলকে না জানিয়ে চলে যাওয়ার পরে মাস তিনেক আগে মাত্র টুকরো চিঠি এসেছিল তার।

“খুব তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। দেখা করবার সময় ছিল না। রাগ কোরো না। কবে কলকাতা ফিরব জানি না। যেদিন ফিরব, সেদিন আমার প্রথম গান শোনাব তোমাকেই।”

সেই প্রথম গান শোনবার আশাতেই কি বসে থাকবে অতীশ? দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর?

মল্লিক সাহেব হয়তো এইবারে রাজী হয়ে যেতেন। হয়তো মন্দিরাকে পেলে জীবনে সেই সহজ দিকটা অন্তত আসত, যেখানে নিজের দৈনন্দিনতাকে নিয়ে বিব্রত হতে হয় না। কিন্তু সেখানে সে প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করিয়েছে শ্যামলালকে। দাঁড় করিয়েছে নিজের হাতেই। শেষ পর্যন্ত হয়তো ধোপে

টিকবে না। কিন্তু শ্যামলালের চোখের সেই অসহ্য জ্বালাটার আঁচ যেন এরই মধ্যে এসে গায়ে লাগল অতীশের।

ওকে বোধ হয় সাবধান করে দেওয়া উচিত।

দেরি হয়ে গেল নাকি? অতীশের নিজেকে অপরাধী মনে হতে লাগল। আরো কিছুদিন পরে সুপ্রিয়াকে একটুখানি ভুলে যেতে পারলে হয়তো মন্দিরাকে বিয়ে করাও অসম্ভব নয় তার। কিন্তু সে যদি বিয়ে না-ও করে, তাহলেই কি কোনো আশা আছে শ্যামলালের? ধরা যাক, মন্দিরার চোখের আলোও হয়তো বদলাবে। কিন্তু মল্লিক সাহেব?

মল্লিক সাহেব শ্যামলালের জুতোটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। সেটা মচমচ করছিল।

ছোট্ট একটা নমস্কার জানিয়ে শ্যামলাল পড়ার ঘরটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, মল্লিক সাহেব ডাকলেন, "ওহে, শোনো।"

শ্যামলাল থমকে দাঁড়াল। এই মানুষটি সম্পর্কে একটা অদ্ভুত আতঙ্ক আছে তার। এই চার মাসে বার চারেক কথা হয়েছে তাঁর সঙ্গে এবং প্রত্যেক-বারই সে চেষ্টা করেছে কত তাড়াতাড়ি সরে যেতে পারে তাঁর সামনে থেকে।

মল্লিক সাহেব খবরের কাগজটা ভাঁজ করে সামনের টেবিলে রাখলেন।

"আজ তোমার এ-বেলা আসবার কথা ছিল নাকি?"

"ইয়ে—" শ্যামলাল ঘামতে লাগল, "কাল অবশ্য—"

"বুঝেছি, বলে গিয়েছিলে। কিন্তু বেবি তো নেই। গেছে দমদম এয়ারপোর্টে। কাল রাত্রে টেলিগ্রাম এসেছিল, ওঁর এক মাসিমা আসছেন আমেরিকা থেকে, তাঁর স্বামী সেখানে এমব্যাসিতে কাজ করেন। বেবি তাঁকে রিসিভ করতে গেছে।"

পাংশু মুখে শ্যামলাল বললে, "আচ্ছা, আমি তা হলে চলি।"

"বোসো না, এত ব্যস্ত কেন? একটু গল্প করা যাক।"

শ্যামলাল চলে যেতে পারল না। নিরুপায় ভাবে সসংকোচে মল্লিক সাহেবের মুখোমুখি বসে পড়ল।

"তোমাদের দেশ কোথায়?"

"আগে ঢাকায় ছিল", শীর্ণ স্বরে শ্যামলাল বললে, "এখন পুরুলিয়ায়।"

"ওঃ! সেখানে কী করেন তোমার বাবা?"

"গালার ব্যবসা।"

"শেল্যাক? সীড্‌ল্যাক? মন্দ নয়। কত হয় বছরে?"

"আজ্ঞে আমি ঠিক বলতে পারব না।"

"খালি বুক-ওয়ার্ম, না? কজন ভাইবোন তোমরা?"

শ্যামলাল বললে, "আজ্ঞে দশ।"

"মাই গড্! দশ! ওয়ান-টেন্‌থ অব কুরুবংশ!"

প্রায় মাটিতে মিশে গেল শ্যামলাল। মল্লিক সাহেবের ঘৃণাভরা দৃষ্টির

সামনে তার মনে হল, তার গালার ব্যবসায়ী বাপের মতন এমন একটা অশালীন লোক পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই।

মল্লিক সাহেব বললেন, "তোমার বাবা যত টাকাই রোজগার করুন, তোমার কপালে দুঃখ আছে।" তাঁর অভিজ্ঞ চোখ আর একবার ঘুরে গেল শ্যামলালের মচমচ-করা জুতোর উপর, তার ছোট ছোট খাড়া খাড়া চুলে, মধ্যবিত্ত পরিবারের অযত্নপালিত মুখের উপর।

শ্যামলালের বুক কাঁপতে লাগল। মল্লিক সাহেবের চোখজোড়া যেন 'এক্স-রে'র মতো দেখছে তাকে। শুধু উপরের দিকটাই নয়, একেবারে তার অস্থি-মাংস ভেদ করে চলেছে।

"ইন্ডিয়ায় গালা ইন্ডাস্ট্রির ভবিষ্যৎ কি রকম বলে তোমার মনে হয়?" —হঠাৎ একটা অর্থনৈতিক প্রশ্ন করে বসলেন মল্লিক সাহেব।

"আজ্ঞে, আমি ঠিক—"

"ঠিক বুঝতে পারো না—না?"—মল্লিক সাহেব বিতৃষ্ণাভরে তাকালেন: "অথচ ইয়োর ফাদার ইজ ল্যাক ট্রেডার। আর তোমরাই গড়বে দেশের ভবিষ্যৎ! স্ট্রেঞ্জ!"

শ্যামলালের কপাল বেয়ে ঘাম নামতে লাগল।

উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে কাঁপা গলায় বললে, "আজ আমি আসি।"

"ইয়েস—ইউ মে।"

পথে বেরিয়ে নিজের উপর কেমন একটা অশ্রদ্ধা হল শ্যামলালের। গালা সম্বন্ধে সে যে বিশেষ কিছু জানে না—কেবল সেজন্যেই নয়; তার গালার ব্যবসায়ী বাবা, যিনি ন-হাতী কাপড় পরেন এবং হুঁকোয় করে তামাক খান, যাঁর নামে ইংরেজী চিঠি এলে অন্য কাউকে দিয়ে পড়িয়ে নিতে হয়; তার ভাইবোনের দল, যারা সকালবেলা মুড়ি দিয়ে জিলিপি খায় আর তার লাল শাড়ি পরা মা, যিনি বছরে একবার সিনেমা দেখেন কি দেখেন না আর ভাদ্র মাসে থালা বোঝাই করে তালের বড়া ভাজেন, তাদের সকলের উপর একটা তিক্ত বিদ্বেষে শ্যামলালের মন কালো হয়ে উঠল।

গোড়া থেকেই সব ভুল হয়ে গেছে। আবার আরম্ভ করতে হবে নতুন ভাবে। কিন্তু পন্থাটা জানা নেই। একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল শ্যামলাল। প্রকাণ্ড আয়নায় তার ছায়া পড়েছে। নিজেকে যেন বিশ্রী একটা ক্যারিকেচারের মতো দেখাতে লাগল এবার।

স্কুলে পড়া না পেরে জীবনে একবার মাত্র কেঁদেছিল শ্যামলাল। আজকে তেমনি ভাবে হঠাৎ তার কান্না পেতে লাগল।

দুই

"তুই কী করে বেড়াচ্ছিস বাবা? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।"

রুক্ষ নিষ্ঠুর গলায় কান্তি বললে, "সব তোমার না বুঝলেও চলবে মা। আমি যা করছি, করতে দাও।"

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ইন্দুমতী শিউরে উঠলেন। অদ্ভুত দেখাচ্ছে কান্তির চোখ। বন্য একটা উগ্রতা দপদপ করছে সেখানে, চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠেছে, কয়েকটা সর্পিল রেখার কুঞ্চন পড়েছে কপালে।

মা'র বুকের ভিতরে ধ্বক করে উঠল। একটা হাতুড়ি দিয়ে কে যেন ঘা মারল সেখানে। তিনি যেন দেখতে পেলেন শান্তিভূষণকে, যে শান্তিভূষণ স্কুলের নিরীহ মাস্টার নয়, তাঁর নিরুত্তাপপ্রায় নির্বাক স্বামীও নয়; যে শান্তিভূষণ খুনী, দু'হাতে মানুষের রক্ত মেখে যে পালিয়ে এসেছিল।

মা'র মুখে যেন বোবা ধরল। গোঙানির মতো আওয়াজ বেরোল একটা।

"কান্তি!"

"আমি এক্ষুনি কলকাতায় যাচ্ছি।"

"এই তিন মাস ধরে তুই পাগলের মতো ছুটোছুটি করছিস কলকাতায়। মুঠো মুঠো টাকা নিয়ে যাচ্ছিস—"

"আমি তবলা শেখাই ওখানে।"

"কিন্তু বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে—"

"দরকার পড়লেই নিতে হয়—" কান্তি বেরিয়ে চলে গেল।

কী আর করতে পারেন মা? জীবনে অনেক কান্নাই কেঁদেছেন, শেষ কান্না হয়তো বাকী আছে এখনো। প্রায় পাগলের মতো হয়ে গেছে কান্তি। উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছৃঙ্খল চেহারা, ভালো করে কথা বলে না, কিছু জিজ্ঞাসা করতে গেলে চিৎকার করে বীভৎস ভাবে। চরম আঘাতও হেনেছে একদিন।

"কে তোমার ছেলে? কার জন্যে কাঁদছ? আমি খুনীর ছেলে, গোখরোর বাচ্ছা। এ তো তুমি জানতেই যে, আমিও একদিন ছোবল মারব। কেন বড় করে তুলেছিলে? কেন বিষ খাওয়াওনি ছেলেবেলাতেই, কেন আঁতুড়েই মুখে নুন দিয়ে মেরে ফেলতে পারোনি?"

সেদিন সারারাত মা জেগে বসে ছিলেন যন্ত্রণায় অসাড় হয়ে। আর টের পেয়েছিলেন কান্তিও ঘুমোয়নি, তাঁর মতো অস্থিরভাবে দাপাদাপি করে বেড়িয়েছে সেও।

আজকেও মা নিথর হয়েই বসে রইলেন। অতীতটা ধূসর, ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সেই অন্ধকার বেয়ে কোথায় যে নেমে যাচ্ছে কান্তি, তা তিনি জানেন না। এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন উঠোনের দিকে, দেখতে লাগলেন পেয়ারা গাছটার তলায় কখন পড়েছে একটা মরা পাখির ছানা, তাকে ঘিরে ধরেছে একদল লাল পিঁপড়ে।

সামনে কড়াইতে চাপানো তরকারিটা পুড়ে কালো হয়ে গেল।

আর কান্তি প্রায় ছুটে এল স্টেশনে, এক মিনিট দেরি হলেই গাড়ি ফেল হত।

বেলা এগারোটার গাড়ি। ডেলি প্যাসেঞ্জারের ভিড় নেই, একটা লম্বা শূন্যপ্রায় কামরার এক কোণে কাঠে হেলান দিয়ে বসল। চলন্ত গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে তিনটে দীর্ঘ মাসও যেন ছুটে যেতে লাগল।

সেই মেয়েটা। তার নাম আঙুর।

রাস্তায় টেনে ফেলে দিতে পারত, দেয়নি। উলটে মাথায় জল দিয়েছে, পাখা করেছে সারারাত। ভোরবেলা যখন জ্বরটা ছেড়ে গেল তার, উঠে বসতে পারল, তখন তার মনে হচ্ছিল স্বপ্ন দেখছে। এ কোথায় সে, কার বিছানায়? কে এই কালো কদাকার মেয়েটা, বিড়িতে পোড়া পুরু পুরু ঠোঁট নিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করছে, "কে গা তুমি? আচ্ছা বিপদেই যা-হোক ফেলেছিলে আমাকে। চা খাবে?"

চা কান্তি খায়নি, খাওয়ার প্রবৃত্তিও ছিল না। কিছু মনে পড়েছে কাল রাতের কথা, সুপ্রিয়ার নিষ্ঠুর শীতল হাসি ঃ "অনেক টাকা দরকার আমার। সে তুমি কোথায় পাবে কান্তি? তার চাইতে—"

কান্তি উঠে পড়েছে। মনিব্যাগ খুলে যা পেয়েছে ছুঁড়ে দিয়েছে মেয়েটার বিছানার উপরে। টলতে টলতে চলে এসেছে বাইরে, একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়েছে, ফিরে এসেছে বোর্ডিঙে।

দুটো দিন পড়ে থেকেছে নিজের ঘরে। খতিয়ে দেখেছে নিজেকে। ফুরিয়ে গেছে কান্তিভূষণ, আর তার কিছুই করবার নেই। আট বছর আগে যা পেরে ওঠেনি, এইবারে তার সে-কাজ করবার সময় এসেছে।

গ্রামে ফিরে এল। দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন ইন্দুমতী।

"আজ সাতদিন তোর খবর নেই, আমি কেঁদে মরি। কী করছিলি তুই? এ কি চেহারা হয়েছে তোর?"

"জ্বর হয়েছিল।" সংক্ষেপে জবাব দিয়েছে কান্তি।

আবার সেই গঙ্গার ধার। সেই কালো রাত্রি। সেই পুরনো ঘরটা, যেখানে অসংখ্য গঙ্গাযাত্রী মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ঘড়ঘড়ে গলায় শ্বাস টেনেছে। সেই ভূতুড়ে বটগাছ, কেউটের গর্ত, আর ওপারে দুটো চিতা জ্বলছিল পাশাপাশি।

তবু এবারেও হল না। বেঁচে থাকাও এমন একটা অভ্যাস যে কিছুতেই তার উপরে সহজে ছেদ টেনে দেওয়া যায় না। খানিক পরে কান্তির মনে হল, আশেপাশে দু-একটা কী যেন বটের ঝরাপাতার উপর নড়ে বেড়াচ্ছে। বুকের ভিতর ভয়ের একটা বরফঠান্ডা হাত যেন বাড়িয়ে দিলে কেউ, কান্তিভূষণ পালিয়ে এল।

পরের দিন বিকালের ট্রেনে সে এল কলকাতায়।

মনে পড়ল, একজন তার অপরিচ্ছন্ন বিছানায় সারারাত তাকে আশ্রয় দিয়েছিল, পাখার বাতাস করেছিল মাথায়, হাত বুলিয়ে দিয়েছিল আস্তে আস্তে। সে-ও আর একটি মেয়ে। বেশি টাকা সে চায় না, তার দাবি সামান্যই। তারই আছে অবারিত দরজা মাতালের জন্যে, লম্পটের জন্যে, খুনীর জন্যে, খুনীর সন্তানের জন্যে।

কান্তিভূষণ সেইখানেই এসে দাঁড়াল।

সন্ধ্যার মুখে আরো অনেক ছিল আশেপাশে। রঙিন, শাড়ি, পুরু

পাউডারের প্রসাধন, জীবন্ত প্রেতিনীর একদল বিগ্রহ। একরকম তীক্ষ্ন হাসি, এক কর্কশ কণ্ঠস্বর।

"কিগো—কাকে চাই ?"

"আঙুরকে।"

"ওলো আঙুর—তোর লোক এসেছে—"

একটু আশ্চর্য হয়ে এগিয়ে এল আঙুর। তারপরেই চমকে উঠল। চিনতে পেরেছে দেখবামাত্র।

"তুমি!"

"হ্যাঁ, আবার আসতে হল। কিন্তু ভয় নেই, এবার জ্বর নিয়ে আসিনি।"

আঙুর হেসে বললে, "এসো।"

সেই ঘর, সেই ময়লা বিছানা, সেই ক্লেদাক্ত পরিবেশ। কিন্তু আজ কান্তি মন স্থির করেই এসেছিল।

"তোমার গান শুনতে এলাম।"

"আমার আর গান। আমি কি গাইতে পারি ?"

"বেশ পারো। তুমি গান গাও, আমি সঙ্গত করব। বাঁয়া-তবলা আছে ?"

আঙুর কিছুক্ষণ অবাক হয়ে দেখল কান্তিকে। বললে, "এনে দিচ্ছি।"

পাশের ঘর থেকে বাঁয়া-তবলা নিয়ে এল আঙুর।

বেসুরো গানের সঙ্গে সাধ্যমতো বাজাচ্ছিল কান্তি, এমন সময় দোরগোড়ায় কালো চোয়াড়ে লোকটা এসে দাঁড়াল। গলায় রুমাল বাঁধা, ঘাড়টা প্রায় চাঁদির কাছ পর্যন্ত ছাঁটা।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল খানিকক্ষণ। গান নয়, তবলা। মাথা নাড়তে লাগল সমঝদারের মতো। তারপর গানটা শেষ হলে বলল, "করছ কী ওস্তাদ ? এমন বিদ্যে খরচ করছ ওই পেত্নীর গানের সঙ্গে ঠেকো দিয়ে ?"

আঙুর বিশ্রী ভাষায় তাকে গাল দিয়ে উঠল।

অতিরিক্ত পান খাওয়া একরাশ লাল দাঁত বের করে বুনো জন্তুর মতো হাসল লোকটা ঃ "আমার ওপর চটো আর যাই করো, আমি সাফ কথা বলব। ওহে ওস্তাদ, একবারটি বাইরে এসো তো দেখি।"

লোকটার নাম জগু। বাজে কথা সত্যিই বলে না, কাজের লোক।

"বাজাতে চাও তো চল আমার সঙ্গে।"

"কোথায় ?"

"তোমার জায়গা মাফিক। নামদার বাঈজী আছে, ভালো সঙ্গতী চায়। মোটা মাইনে দেবে। যাবে ?"

"কত মাইনে দেবে ?"

"সে তোমার খুশী করার ওপরে। ভাবনা নেই দাদা, গুণী লোক আমি চিনি। তুমি ঠিক কাজ বাগিয়ে নিতে পারবে। যদি চাও তো চলো আমার সঙ্গে।"

কান্তি বেরিয়ে পড়ল তখনি। তার সব সমান। তবে বাজাতে হলে একটু

সমঝদারের জায়গাই ভালো।

বাঈজীর নাম মুনিয়া। অদ্ভুত ছোট এক গলির ভিতরে অদ্ভুত এক প্রকাণ্ড বাড়ির দোতলায় দেখা পাওয়া গেল তার।

কাশ্মীরী কার্পেটে মোড়া মেঝে। ভেলভেটের তাকিয়া ছড়ানো চারিদিকে। একরাশ বাজনা, ঘুঙুর ইতস্তত। পরনে দামী বেনারসী শাড়ি। গা-ভরা গয়না, চোখে সুর্মা, ঠোঁটে পানের রঙ, নাকে জ্বলজ্বলে হীরার ফুল। তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে বাটা থেকে রুপোর তবকে মোড়া পান খাচ্ছিল।

"মুনিয়া বাঈ, সঙ্গতী খুঁজছিলে, এই এনে দিলাম।"

পানের রসে রাঙানো ঠোঁট আর নাকে হীরের ফুলপরা বাঈজী কালো তরল চোখ তুলে তাকাল। মোহিনী হাসি দেখা দিল মুখে। মধু-ছড়ানো গলায় সম্ভাষণ করলে, "নমস্তে।"

সন্দেহ নেই, বাঈজী রূপসী। বয়েস ত্রিশ পেরিয়ে ভাঁটার টান ধরলেও এখনও প্রখর। কান্তি আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"বৈঠিয়ে।"

আবার সেই মধুমাখা সম্ভাষণ। ছড়ানো পা দুটো গুটিয়ে নিয়ে ভব্য হয়ে বসল বাঈজী। একটা তাকিয়া ঠেলে দিয়ে বললে, "বৈঠিয়ে বাবুজী।"

কান্তি বসল। ঘরের তীব্র উজ্জ্বল আলোয় চোখ যেন জ্বলে যেতে লাগল। উগ্র আতরের গন্ধ এসে ক্লোরোফর্মের মতো সারা শরীরে ঘোর ছড়িয়ে দিতে লাগল তার।

"পান?"

বাটাটা এগিয়ে এল।

"পান আমি খাই না।"

"মিঠা সরবত?"

"না।"

"বীয়ার?"

"না।"

"তবে চা আনাই? মশলা-দেওয়া চা?"

"আমার কিছুই দরকার নেই।"

জগু বললে, "বাবু ভদ্দরলোক, ইয়ার নয়। তুমি সঙ্গতী চেয়েছিলে তাই এনেছি। আদর-যত্ন পরে হবে বাঈ, এখন একটু বাজিয়ে দেখে নাও।"

বাঈজী আবার মধুবৃষ্টি করে হাসল, "বহুত অচ্ছী বাত।"

একটু পরেই তৈরি হয়ে এল বাঈজী। পরে এল পেশোয়াজ, পায়ে ঘুঙুর। কোথা থেকে এসে দেখা দিল সারেঙ্গিওয়ালা। জগু আড়ষ্ট নিষ্প্রাণ কান্তির কাঁধে চাপ দিলে একটা।

"লেগে যাও ওস্তাদ। মওকা মিল্ গিয়া।"

তবলা বাঁয়া টেনে নিলে কান্তি।

ঘুঙুরের ঝঙ্কার উঠল। বাঈজীর তিরিশ-পেরুনো শরীর হঠাৎ যেন

সাপের মতো লিকলিকে হয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে একরাশ বিদ্যুৎ খেলতে লাগল ঘরের মধ্যে। সোনার কাজ-করা লাল পেশোয়াজ ঘুরতে লাগল আগুনের চাকার মতো। থেকে থেকে "আহা" "আহা" করে উঠতে লাগল সারেঙ্গিওয়ালা। ঘুঙুরের ঝঙ্কার, আগুনের ঘূর্ণি, বিদ্যুতের ঝলক আর দমকে দমকে ছড়িয়ে পড়া তীব্র আতরের গন্ধ যেন কান্তির রক্তের মধ্যে এক-একটা করে তীরের মতো ছুটে যেতে লাগল। দুটো হাত বাঁয়া-তবলার উপর নেচে চলল ঝড়ের তালে।

পেশোয়াজের ঘূর্ণি থামিয়ে বাঈজী বললে, "সাবাস।"

সারেঙ্গিওয়ালা মাথা নাড়ল: "হাঁ—হাত বহুত মিঠা হ্যায় ইনকো।"

কান্তি বাহাল হল। এখন মুনিয়া বাঈজীর সঙ্গতী সে।

চোখ মেলে তাকাল কান্তি। ট্রেন লিলুয়া ছেড়েছে। মুনিয়া বাঈজীর সঙ্গতী সে এখন। এর চাইতে ভালো পরিণাম কী আর হতে পারে তার? সমাজের কাছে এর চাইতে কতটুকু বেশী মর্যাদা পেতে পারে খুনী শান্তিভূষণের ছেলে?

মদ এখনো ধরেনি কান্তি, এখনো হার মানতে পারেনি ততখানি। তবু কখনো কখনো, মুনিয়া বাঈজীর নাচের সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতর যখন আগুনের কণা ঝরে পড়তে থাকে, নেশায় জড়ানো চোখ নিয়ে কোনো শেঠজী হীরের আংটি বসানো আঙুলে ভেলভেটের তাকিয়ায় ভুল তাল দিতে থাকে, তখন কান্তিরও নেশা ধরে। শান্তিভূষণের নেশা। একটা হিংস্র ভয়ঙ্কর কিছু করবার নেশা। তবলার উপর আঙুলগুলো লোহার আংটার মতো শক্ত হয়ে যায়।

টাকা। এই লোকটার মতো অনেক টাকা যদি তার থাকত!

একটা অসতর্ক মুহূর্তে মনের গোপন কথাটা শুনেছিল জগু। অতিরিক্ত পান-খাওয়া দাঁতগুলো থেকে রক্ত-জমাট হাসি ছড়িয়ে বলেছিল, "টাকা চাই ইয়ার? সে তো ছড়ানোই রয়েছে, নিতে পারলেই হয়।"

কান্তির চোখ চকচক করে উঠেছিল: "তাই নাকি? কোথায় পাওয়া যায়?"

কান্তির কাঁধে গোটাকয়েক থাবড়া দিয়ে তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনেছিল জগু: "একদিন চল আমার সঙ্গে—ব্যাঙ্কে।"

"ব্যাঙ্কে!"

"হাঁ—ব্যাঙ্কে। কে অনেকগুলো টাকা তুলছে, চোখ রাখতে হবে তার দিকে। যখন টাকাগুলো নিয়ে কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে সে গুনে দেখছে, তখনি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠবে, 'গির গিয়া, আপকো নোট গির গিয়া।' মাথা নামিয়ে যেই নোট খুঁজতে যাবে, অমনি খপ করে তুলে নাও টাকাগুলো। আমরা সব এধার-ওধার দাঁড়িয়ে থাকব। হাতে হাতে পাচার হয়ে যাবে টাকা।" জগুর পান-খাওয়া দাঁতগুলো জন্তুর মতো দেখাতে লাগল। "তোমাকে ধরে হয়তো কিছু মার লাগাবে, থানাতেও নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু টাকা কাছে না পেলে কিছুই করতে পারবে না। রাজী আছ দোস্ত?"

আতঙ্কে চমকে কান্তি বলেছিল, "না।"

কিন্তু মনের অগোচরে পাপ নেই সে-কথা কে আর বেশী করে জানে তার নিজের চাইতে! আজ তো এটা সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে গেছে যে সে শান্তিভূষণের সন্তান ছাড়া আর কিছুই নয়। চুরি ডাকাতি খুন সব কিছুরই সহজাত অধিকার নিয়ে সে পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলেছে। কালো অন্ধকার রাত্রির সরীসৃপ গলিগুলো সৃষ্টি হয়েছে তাদের মতো মানুষের জন্যেই; তাদেরই মুঠোর জন্যে পৃথিবীর সমস্ত চকচকে বাঁকা ছুরিতে শান পড়েছে; নিশীথের নির্জন গঙ্গার উপর দিয়ে দাঁড় টেনে টেনে যে ছায়ার মতো নৌকোটা বে-আইনী আফিং আর চোরাই পিস্তল নিয়ে আসছে, তা একান্তভাবে তাদেরই প্রয়োজনে; কোনো এক অপরিচ্ছন্ন ক্লেদাক্ত সকালে ডাস্টবিনের মধ্যে যে সদ্যোজাত শিশুর মৃতদেহ পাওয়া গেল, তার গলায় তাদেরই আঙুলের দাগ!

পারে। শান্তিভূষণের রক্তে যাদের জন্ম, তারা সবই পারে। তবু কান্তিভূষণের যে বাধে, সে খানিকটা অভ্যাস ছাড়া আর কিছুই নয়। শান্তিভূষণের মতো সাহস তার নেই।

তবু একদিন সে-ও পারবে। এক-একদিন উদ্দাম রাত্রে মুনিয়া বাঈজীর নাচ যখন সংযমের শেষ সীমাকে পার হয়ে চলে যায় সেদিন কান্তিভূষণও পারবে। এখন কেবল অপেক্ষার কাল, কেবল প্রস্তুতির পর্ব।

ট্রেন হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঢুকল। চারদিকে নেমে এল একটা গম্ভীর কালো ছায়া। যেন ওই ট্রেনটার সঙ্গে সঙ্গে সে-ও এসে প্রবেশ করল কোনো ভয়ংকর নিষ্ঠুর পরিণামের মধ্যে, যার হাত থেকে তার মুক্তি নেই।

তিন

বাড়িটা মালাবার হিল্সের ওপর। জানলা দিয়ে রাত্রির আরব সমুদ্র আর মেরিন ড্রাইভের দীপান্বিতা। বহু দূরে ট্রম্বের বিদ্যুৎবিন্দু। জেটি থেকে একটা জাহাজের গম্ভীরমন্দ্র আত্মঘোষণা।

গীতা ঘরে ঢুকে বলল, "দীপেন আসেনি?"

সুপ্রিয়া বলল, "না। কী কাজে গেছে রাওয়ের ওখানে।"

গীতা ভ্রূকুটি করলে, "রাওয়ের ওখানে কাজ তো বোঝাই যাচ্ছে। এখানে এমনিতে প্রহিবিশন, ড্রিঙ্ক করতে তো সুবিধে হয় না। তাই রাওয়ের মতো কয়েকজনই মাতালদের আশা-ভরসা।"

সুপ্রিয়া চুপ করে রইল। দীপেনের মদ খাওয়া নিয়ে সে গীতার মতো বিচলিত হয় না।

গীতা আস্তে আস্তে বললে, "যে ভাবে চলেছে, তাতে আর বছর পাঁচেক বেঁচে থাকবে। তার বেশী নয়।"

সুপ্রিয়া চমকে উঠল, "সে কি কথা!"

গীতা সামনের সোফাটায় বসে পড়ল। "তুমি জানো না? ওর লিভার বেশ কিছুদিন থেকেই তো ওকে ট্রাব্ল দিচ্ছে। ডাক্তারেরা ওকে সাবধান করে

দিয়েছে অনেকবার। দিনকয়েক ভয় পেয়ে সামলে থাকে, তারপরেই আবার আরম্ভ করে দেয়। মরবে, আর দেরি নেই।"

সুপ্রিয়ার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল: "কিন্তু তুমি তো ওকে বাঁচাতে পারো গীতা।"

"আমি?" গীতা আচ্ছন্ন চোখ মেলে তাকাল, "আমার কথা শুনবে কেন? আমি চেষ্টা করছি চার বছর থেকে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি।"

"তুমি তো ওকে ভালোবাস।"

গীতা হাসল, "তা হতে পারে। কিন্তু ও আমাকে ভালোবাসে না।"

"তা হলে এই দু বছর ধরে—"

"একসঙ্গে ঘুরে বেড়াই, এই তো?" গীতা বললে, "তাতে কী আসে যায়। আমি ওকে ভালোবাসি, তাই কাছে থাকতে চাই। ওর সঙ্গীর দরকার হয়, সেই জন্যেই ও আমাকে অভ্যাস করে নিয়েছে। কিন্তু তাই বলে ওর মনের ওপর রাশ টানতে পারি, এমন জোর আমি কোথায় পাব? সে পারো একমাত্র তুমিই।"

"আমি!"

গীতা বললে, "কারণ ও তোমাকেই ভালোবাসে।"

সুপ্রিয়া বিস্বাদ হাসি হাসল। এই তিন মাসের মধ্যে দীপেন ও-কথাটা তাকে অনেকবারই বলেছে। খানিকটা বিশ্বাস করে সুপ্রিয়া, খানিকটা করে না। দীপেনের মনে হয়তো খানিকটা রঙ লাগিয়ে রেখেছে, কিন্তু সে তো কেবল একাই নয়। আরও অনেকে এসেছে সেখানে, আরও অনেকেই আসবে। তার সুরের আসরে অবারিত দ্বার।

অবশ্য দীপেনকে সেজন্যে দোষ দিয়ে লাভ নেই। ঠিক এইরকম কথা সে নিজেই কি বহুবার বলেনি অতীশের কাছে, বলেনি কান্তিকে? আমার মনের ভিতরে অনেক বেশী জায়গা আছে, মাত্র একজনকে দিয়ে সে জায়গা ভরবে না। আমি আরো বহু মানুষকে ডেকে আনতে পারি সেখানে। তাই বলে হিংসা কোরো না। তোমার জন্যে যেটুকু মন আমি আলাদা করে রেখেছি সে কেবল তোমারই একার।

খুব ভালো কথা। অতীশ যেমন সে-কথা মেনে নিয়েছে বিষণ্ণ শান্ত মুখে, যেমন সে-কথা দাঁতে দাঁতে চেপে মেনে নিয়েছে কান্তি, তেমনি সহজভাবেই সুপ্রিয়ারও স্বীকার করে নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কোথায় যেন এখন বাধে সুপ্রিয়ার। নেশায় লাল টকটকে চোখ মেলে দীপেন যখন বলে, "তোমার জন্যেই আমি এতদিন অপেক্ষা করে বসেছিলাম—" তখন মনের ভিতর কেমন কুঁকড়ে যায় তার। দীপেন তাকে ভালোবাসবে, সারা ভারতবর্ষের অত বড় নামজাদা গায়ক সরস্বতীর ধ্যান করতে গিয়ে বুকের ভিতরে দেখতে পাবে তারই মুখ, তাকেই কল্পনা করে দীপেনের গানের সুর নির্ঝরিত হবে সহস্র বেণীতে, এর চেয়ে বড় স্বপ্ন আর কী আছে সুপ্রিয়ার? তবু কখনো কখনো দীপেনের হাত যখন তার হাতে এসে পড়ে, তখন তিক্ত ঈর্ষার সঙ্গে কোথা থেকে একরাশ তিক্ত অস্বস্তি তাকে সংকুচিত করে ফেলতে থাকে।

গীতার কথায় চকিত হয়ে উঠল সুপ্রিয়া।

"জানো সুপ্রিয়া, দীপেন কতবার বলেছে আমাকে। বলেছে, জীবনে আমার অনেকেই এসেছে, কিন্তু তারই প্রতীক্ষা করে বসে আছি এতদিন। আমার গানের সব চাইতে দুর্মূল্য সঞ্চয় যেখানে, তার সোনার চাবিটি সে-ই নিয়ে আসবে। সে এলেই আমি বেঁচে উঠব, নেশা ছেড়ে দেব, গানের তপস্যায় বসব সন্ন্যাসীর মতো। আমার চোখের সামনে থাকবে তারই বিগ্রহ। সেদিন আর তোমায় বলতে হবে না গীতা, নিজের হাতেই আমি মদের বোতল আছড়ে ভেঙে ফেলব।"

সুপ্রিয়া বললে, "তুমি কি ভাবছ আমিই সেই মেয়ে?"

"দীপেন তোমার নাম করেছিল আমার কাছে। এবার কলকাতায় যাওয়ার আগে আমাকে বলেছিল, গান গাইতে কলকাতায় যাচ্ছি না, আনতে যাচ্ছি আমার গীতলক্ষ্মীকে। নিয়ে এল তোমাকে। এবার তো তোমার সময় হয়েছে সুপ্রিয়া, এখন তো তুমি ওকে ফেরাতে পারো এই আত্মহত্যার পথ থেকে।"

সুপ্রিয়া নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল একবার। দীপেনের কথা কানে ভাসছে : "শুধু কাছে থাকবে, শুধু চোখে দেখব, এইটুকুতেই আমার সান্ত্বনা কোথায়। তোমায় আরো বেশি করে চাই।"

আরো বেশি? সে-বেশির অর্থ বুঝতে দেরি হয়নি। দীপেনের রক্তাভ চোখে সেই জ্বালা—যা আদিম, যা উলঙ্গ, যা আরণ্যক। সে চাওয়ার দাবি সুরের সাধনা থেকে আসেনি, এসেছে শরীরের ক্ষুধা থেকে। তার হাতে নিজেকে এভাবে সঁপে দিয়ে দেউলিয়া হতে রাজি নয় সুপ্রিয়া। দীপেনকে সম্পূর্ণ করে না চেনা পর্যন্ত, নিজের সাধনার সিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত, এবং শান্তনিশ্চিন্ত পরিণামে সমাজের স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত নিজেকে এত সহজেই সে শূন্য করে দিতে পারবে না।

"তুমি ওকে ফেরাও। এখনো ফেরাও।" গীতার গলায় একটা আর্ত অনুরোধ।

দেহের দাম দিয়ে? একটা বিস্বাদ হাসি আবার ভেসে উঠল সুপ্রিয়ার ঠোঁটের কোণায়। শুধু ওইটুকু? কেবল অতটুকুর জন্যেই সব কিছু আটকে আছে দীপেনের? কী করে বিশ্বাস করবে সুপ্রিয়া? কলেজ জীবনের অমরেশ্বরকে মনে পড়ল। তার জন্যে খাতার পর খাতা কবিতা লিখেছিল অমরেশ্বর, তাতে বলেছিল, আমি সমুদ্র, তুমি চাঁদ; দূরে থেকে আমার বুকে জোয়ার জাগিয়ো, তাতেই আ ম চরিতার্থ হয়ে থাকব। কিন্তু অমন সমুদ্রের মতো বিশাল রোমান্স মুহূর্তে কুশ্রী লোলুপতায় পরিণত হয়েছিল গড়ের মাঠের দুরান্তে রাত্রিগম্ভীর একটা গাছের ছায়ায়। সুপ্রিয়া কেবল প্রকাণ্ড একটা চড় বসিয়েছিল অমরেশ্বরের গালে। মাথা ঘুরে বসে পড়েছিল অমরেশ্বর। তারপর হাত ধরে তাকে উঠিয়ে বসিয়েছিল সুপ্রিয়াই। বলেছিল, "খুব হয়েছে—এবার বাড়ি ফিরে চলুন।"

ফেরার পথে ট্যাক্সিতে অনেকক্ষণ ধরে কেবল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল

অমরেশ্বর। শরীরের না মনের যন্ত্রণায়, সুপ্রিয়া জানে না ; সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু কথা খুঁজে পায়নি।

তবু আশা ছিল, ওটা ক্ষণিক দুর্বলতা, সমুদ্রের সঙ্গে চাঁদের সম্পর্ক তাতে ক্ষুণ্ণ হবে না। কিন্তু সেই থেকেই দূরে সরে গেল অমরেশ্বর। সুপ্রিয়া যেচে গেছে তার কাছে, একদিন টেনেও নিয়ে গিয়েছিল একটা চায়ের দোকানে, কিন্তু অমরেশ্বর আর ভালো করে তাকাতেও পারেনি তার দিকে। ছাইয়ের মতো নেভা চোখের দৃষ্টি মেলে রেখেছে মাটির দিকে, একটা কথা বলতে গিয়ে তিনটে ঢোক গিলেছে, তারপর খানিকটা গরম চায়ে চুমুক দিয়ে ঠোঁট পুড়িয়ে জামা নষ্ট করে একরকম ঊর্ধ্বশ্বাসেই পালিয়ে গেছে সামনে থেকে।

দীপেনের এত কল্পনা, এত স্বপ্নের শেষও কি ওইখানেই ? জোর করে কিছুই বলা যায় না। পৃথিবী সম্পর্কে অমরেশ্বর তার চোখ খুলে দিয়েছে। তার সম্পর্কে দীপেনের এতদিনের প্রতীক্ষা কেবল কি ওইটুকুর জন্যেই সমাপ্তি পাচ্ছে না ? তা হলে অমরেশ্বরের সঙ্গে দীপেনের তফাত কোথায় ? তা হলে কিসের জন্যে সে কলকাতা থেকে চলে এল এতদূরে ?

আর এ-কথাই কি জোর করে বলতে পারে সুপ্রিয়া যে, এর পরেই দীপেনের কাছে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে না ? একরাশ কাদা মাখিয়ে তার স্বপ্ন-লক্ষ্মীকে সে সমুদ্রে বিসর্জন দেবে না ? নাকি গান শেখবার জন্যে তাকে নিজের শরীর ঘুষ দিতে হবে দীপেনকে ? ছিঃ—ছিঃ—এত তুচ্ছ দীপেনের গুরুদক্ষিণা ?

গীতা আবার ওকে চকিত করে তুলল।

"কথা বলছ না যে ?"

"কী বলব ?"

"দীপেন সম্পর্কে তোমার কি কিছুই করবার নেই ?"

সুপ্রিয়া ম্লানমুখে বললে, "আমার সম্পর্কেই ওর করবার ছিল বেশি।"

গীতা বললে, "তাতে তো ত্রুটি হয়নি। এখানকার সেরা ওস্তাদ পণ্ডিতজীর কাছে ও তোমার গান শেখবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। যাতে টাকার দিক থেকে তোমার ওর কাছে হাত পাততে না হয়, তার জন্যে ওর ছবিতে তোমার প্লে-ব্যাকের বন্দোবস্ত করেছে। তুমি যা স্বপ্ন দেখেছিলে তা তো ও পূর্ণ করে দিয়েছে। তুমি কিছু করবে না সুপ্রিয়া ?"

"চেষ্টা করব।"

গীতার দৃষ্টিতে জ্বালা ফুটে উঠল : "তোমার আরো একটু কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত ছিল ওর ওপরে।"

কৃতজ্ঞতা ? সুপ্রিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করল। এমন কথা তো ছিল না। সে যে জীবনকে অনেক বেশি বিস্তীর্ণ অনেকখানি বিকশিত করে তুলতে চেয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই ; সে চেয়েছিল ভারতবর্ষের গীত-তীর্থে দেবতাকে অঞ্জলি দিতে, চেয়েছিল সুরের তীর্থ-সলিলে নিজের পূর্ণকুম্ভটি ধন্য করে নিতে। কিন্তু তার জন্যে তো দীপেনের কাছেই একান্তভাবে এসে সে প্রার্থনা জানায়

নি। দীপেন উপযাচক হয়েই এসেছে তার কাছে, হাত পেতেছে ভিক্ষার্থীর মতো, বলেছে, "দয়া করো আমাকে। আজ এতদিন ধরে তোমারই পথ চেয়ে ছিলাম। আমার সব গান এখনো কুঁড়ি হয়েই আছে, তারা ফুটতে পারছে না। তুমি এসো, তাদের ফুটিয়ে দাও, আমার মনের মালঞ্চকে ভরে তোলো।"

সেই ফুল ফোটাতেই সুপ্রিয়া এসেছে। কৃতজ্ঞতার পালা তো তার নয়, ও কাজ দীপেনেরই ছিল। আজ তার পক্ষ থেকে উলটো চাপ দিচ্ছে গীতা। মন্দ নয়!

কিছুক্ষণ চুপ। সমুদ্রের বুক থেকে উচ্ছৃঙ্খল হাওয়া। মেরিন ড্রাইভের দীপান্বিতা। ট্রেবের বিদ্যুৎ-বিন্দু। কালো সমুদ্রের উপর একটা জাহাজের বিচিত্রবর্ণ আলোর আন্দোলন।

গীতা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

"হঠাৎ তোমাকে একটা রূঢ় কথা বলে ফেললাম, কিছু মনে কোরো না। আমার মনকে আমি জানি। আমাকে যে ও ভালোবাসে না, তুমি যে ওর সবখানি জুড়ে আছ, তার জন্যে আমি তোমাকে হিংসে করি। আর সেই সঙ্গে যখন ভাবি, তুমি ইচ্ছে করলেই ওকে বাঁচাতে পারো, বাঁচাতে পারো অত বড় গুণীকে, অথচ কিছুই করছ না, তোমাকে তখন আর ক্ষমা করতে মন চায় না।"

সুপ্রিয়া জবাব দিল না। কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। শুধু এইটুকুর জন্যেই সার্থক হতে পারবে না দীপেন? সমস্ত স্বপ্ন, সমস্ত সাধনা, সমস্ত প্রতীক্ষার সমাপ্তি হচ্ছে না কেবল এরই জন্যে?

গীতা একবার হাতের ঘড়িটার দিকে তাকাল।

"বারোটা বাজে। এখনো ফিরল না! রাস্তায় পুলিশে ধরল না তো?"

"তা হলে ভাবনা নেই।" সুপ্রিয়া হঠাৎ হেসে ফেলল, "ভালোই থাকবেন আজকের রাত।"

গীতা একটা ক্রুদ্ধ উগ্র দৃষ্টি ফেলল তার দিকে, আস্তে আস্তে উঠে গেল সামনে থেকে। সুপ্রিয়া বসে রইল দূরের দিকে তাকিয়ে। তার অতীতকে মনে পড়ছে।

আশ্চর্য, সবাই চেয়েছে তার কাছে। কান্তি, অমরেশ্বর, দীপেন—আরো অনেকেই। এমন কি ওস্তাদ দুর্গাশঙ্করও। মুখ ফুটে কোনো কথা কখনো বলেননি, তবু তার মনে হয়েছে, শূন্য ব্যথিত চোখের দৃষ্টি মেলে দুর্গাশঙ্কর জানাতে চেয়েছেন, "আমি ভারী নিঃসঙ্গ—তুমি আমার কাছে থাকো। যখন আমি ঘুমিয়ে পড়ব, তখন আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দাও আমার মাথায়।" শুধু অতীশই কিছু চায়নি কোনোদিন। বরং দিতে চেয়েছে, বরং বলেছে, "আমি তোমার কাছে কোনো প্রত্যাশা নিয়ে আসিনি; শুধু কোনোদিন যদি তোমার প্রয়োজন হয়, আমাকে ভুলো না। আমি জানি, যখন তুমি থাকবে না, তখন আমার বাঁচবার সব উৎসাহ যাবে ফুরিয়ে। তবু আমি তোমার জন্যেই বেঁচে থাকব। যদি কখনো পৃথিবীতে তোমার আর কিছু না থাকে, আমি আছি।"

একটা ক্লান্ত নিঃশ্বাস পড়ল সুপ্রিয়ার। গান সে শিখছে। স্বপ্নে যে দিকপাল ওস্তাদের পায়ের ধুলো ভিক্ষা করেছে, আজ গান শিখছে তাঁরই পায়ের কাছে বসে। তবু যখন তাঁর বাড়ি থেকে সে বেরিয়ে আসে, তখন তার চোখটা অভ্যাসবশেই রাস্তার ওধারে চলে যায়। আর তখনই মনে পড়ে, এ তো কলকাতা নয়! এখানে সেই বকুলগাছের তলায় নীল অন্ধকার নেই, যেখানে সাদা শার্টের কলার তুলে দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে প্রতীক্ষা করছে অতীশ।

ভারী ফাঁকা লাগে সুপ্রিয়ার।

কিন্তু ইউনিভার্সিটির ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র তার কী কাজে লাগবে? তার সঙ্গে কোথায় ছন্দ মেলাবে অতীশ? সে তো তার গানের আসরে সঙ্গত করতে পারে না।

গীতা ফিরে এল।

"ফোন করেছিলাম। রাও বললে, কোনো চিন্তা নেই, দীপেন রওনা হয়েছে ওর ওখান থেকে।"

গীতা আবার মুখোমুখি বসল সুপ্রিয়ার। মুখে একটা বিষণ্ণ ভাবনা। কী একটা কথা বলতে এসেছে যেন, কিছুতেই সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারছে না।

সুপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করলে, "আজকে নাচ ছিল না তোমার?"

"ছিল।"

"কেমন হল?"

"ভালোই।" হঠাৎ যেন বহুক্ষণের একটা আবরণ মনের উপর থেকে জোর করে সরিয়ে দিলে গীতা: "জানো, আজ আমার নাচ দেখতে এসে-ছিলেন সোহনলাল!"

"সোহনলাল!"

"আমি ভাবতেই পারিনি—", গীতার গলা কাঁপতে লাগল, "কল্পনাই করিনি উনি বম্বেতে রয়েছেন।"

"তুমি তো বলেছিলে সোহনলাল দিল্লী কিংবা আগ্রার কোনো কলেজে প্রোফেসারি করছেন।"

"তাই তো জানতাম।" গীতা বিহ্বল চোখে বললে, "হয়তো কোনো কারণে বম্বেতে এসে পড়েছেন। আমার নাচ দেখতে এসেছিলেন, বসেছিলেন একেবারে সামনের রো'তে। আমি ও'র দৃষ্টি দেখেছি। আমাকে চিনতে পেরেছেন।"

গীতার চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল।

"একবারের জন্যে আমার নাচে তাল কেটে গেল ভাই। একবার মনে হল, আমি ছুটে পালিয়ে যাই এই স্টেজ থেকে। শুধু স্টেজ থেকেও নয়, পৃথিবীর চোখের সামনে থেকে। গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি সমুদ্রে।"

সুপ্রিয়া আস্তে আস্তে বললে, "চিনলেই কি বিশ্বাস করবেন? সোহনলাল তো জানেন তুমি আর বেঁচে নেই।"

ওড়নার প্রান্তে জল মুছে ঝাপসা দৃষ্টিতে তাকাল গীতা: "ঠিকই বিশ্বাস

করেছেন। আমি স্পষ্ট দেখলাম কালো হয়ে গেছে ওঁর মুখ। তারপর প্রত্যেকটা নাচের সময় কেবল একদৃষ্টিতে আমার দিকেই তাকিয়ে রইলেন মূর্তির মতো। মাথা নাড়লেন না, হাততালি দিলেন না, কিছুই না।"

নীরবে বসে রইল সুপ্রিয়া।

"আজ মনে পড়ছে, একবার কলেজ সোস্যাল শেষ হলে সকলের চোখের আড়ালে আমার হাতে একটা ফুটন্ত ম্যাগনোলিয়া এনে দিয়েছিলেন সোহনলাল। সেদিন ওঁর একটা দৃষ্টি দেখেছিলাম, আজ দেখলাম আর-এক দৃষ্টি।" গীতার চোখ বেয়ে আবার জল পড়তে লাগল।

বাইরে কালো সমুদ্র। মেরিন ড্রাইভের দীপান্বিতা। ঝড়ের মতো হাওয়া।

গীতা আবার বললে, "যদি মদ পেতাম, আজকে দীপেনের মতোই ড্রিঙ্ক করতাম আমি। ভোলবার জন্যে নয়, অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকবার জন্যে। আজকের রাত আমার কী করে কাটবে সুপ্রিয়া?"

বাইরে মোটরের শব্দ হল। দীপেন ফিরে এসেছে।

(কান্তি বলছিল, "তুমি কি চাও, আমি আত্মহত্যা করি?"

"আত্মহত্যা কেন করবে কান্তি? জীবনটা কি এক টুকরো বাজে কাগজ, যে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ির মধ্যে ইচ্ছে করলেই ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া চলে?"

কান্তির শান্ত মুখটা পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেল: "আমার কাছে জীবন ছেঁড়া কাগজের টুকরোর চাইতে বেশী নয়। প্রমাণ চাও? দেখাচ্ছি!"

বলতে বলতেই কান্তি নিজের একটা হাত তুলে আনল বুকের কাছে। বিস্ফারিত চোখে সুপ্রিয়া দেখল সে-হাত মানুষের নয়! ভালুকের মতো কালো কালো লোমে ভরা। আর হাতের আঙুলগুলো একরাশ সাদা ধারালো বাঘের নখ! পরক্ষণেই কান্তি সেই নখগুলো নিজের বুকের মধ্যে বসিয়ে দিলে। পুরনো কাপড় ছেঁড়বার মতো শব্দ করে ছিঁড়ে গেল বুকের চামড়া, মট্ মট্ করে ভেঙে গেল পাঁজর আর উদ্ঘাটিত বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো হৃৎপিণ্ডটা, ঝুলে পড়ল বাইরে।

একটা রক্তমাখা ভালুকের থাবা সুপ্রিয়ার কপালে রেখে কান্তি বললে, "দেখছ?")

অমানুষিক ভয়ে সুপ্রিয়া ঘরফাটানো আর্তনাদ করে উঠল। স্বপ্ন ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানায়। খোলা জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে জ্যোৎস্নার আবছা আলো। স্বপ্নের আতঙ্ক জড়ানো চোখে সুপ্রিয়া দেখল, তার পায়ের কাছে তখনো কান্তি দাঁড়িয়ে আছে ছায়ামূর্তির মতো।

যেন প্রেতলোকের পার থেকে কান্তির গলা ভেসে এল, "চেঁচিয়ো না, আমি।" তারপরেই বাঘের থাবার মতো দুটো লুব্ধ বাহু বাড়িয়ে সে ঝুঁকে পড়ল সুপ্রিয়ার দিকে।

আবার একটা আর্তনাদ তুলল সুপ্রিয়া। কান্তি! কান্তি ছাড়া এ আর কেউ নয়। বুক চিরে হৃৎপিণ্ড ঝুলছে বাইরে—রক্ত ঝরে পড়ছে অগ্নিবৃষ্টির

মতো। আর দুটো নিষ্ঠুর কঠিন হাত দিয়ে সুপ্রিয়ার গায়ের মাংসও যেন সে ছিঁড়ে নিতে চাইছে। দুটো পা তুলে প্রাণপণে সে লাথি মারল প্রেত-মূর্তিকে। চাপা যন্ত্রণার একটা গোঙানি তুলেই মূর্তিটা সোজা উলটে পড়ে গেল, সেই সঙ্গে বিকট শব্দে উলটে পড়ল একটা টিপয়, ঝনঝনিয়ে ভেঙে পড়ে গেল একটা কাচের গ্লাস।

আর সারা বাড়ি কাঁপিয়ে গীতার চিৎকার উঠল ঃ "কে—কে—কে ?"

চার

একটা কিছু মনে হয়েছিল মুনিয়া বাঈয়ের। হয়তো মেয়েদের স্বাভাবিক সংস্কারেই সে বুঝতে পেরেছিল।

"বাবুজী, ঘরে কে আছে তোমার ?"

"মা।"

"শুধু মা ? বিবি নেই ? সাদি করোনি ?"

কান্তি মুখ ফিরিয়ে নিলে। খানিক দূরে ট্রাম লাইনের তারে একঝলক নীল আলো উদ্ভাসিত হল, তার দীপ্তি দুলে গেল তার চোখের উপর।

"না, সাদি হয়নি।"

পানের বাটা থেকে লবঙ্গ তুলে নিয়ে সেটাকে দাঁতে কাটল মুনিয়া বাঈ।

"কোনো মেয়ে বুঝি দুঃখ দিয়েছে তোমাকে ? দিওয়ানা হয়েছ সেইজন্যে ?"

কান্তি চমকে উঠল। যে ছোট লোহার হাতুড়িটা দিয়ে সে তবলা বাঁধছিল, তার একটা ঘা এসে পড়ল আঙুলে।

"কেন বলছেন এ-কথা ?"

"মানুষ দেখে দেখেই তো কাটল জিন্দিগিভর।"—মুনিয়া বাঈ হাসল, ঝিকমিক করে উঠল নাকের হীরার ফুল ঃ "প্রেমের জন্যে যে দিওয়ানা হয়, তার চোখমুখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারি।"—খানিকক্ষণ গভীর চোখে চেয়ে থেকে মুনিয়া বাঈ বললে, "তুমি যদি দশ বছর আগে আসতে বাবুজী।"

সেই পুরনো ক্ষতটা থেকে রক্ত গড়াতে শুরু করে দিয়েছিল কান্তির। তবু মুনিয়া বাঈয়ের কথায় সে জবাব না দিয়ে থাকতে পারল না।

"কী হত দশ বছর আগে এলে ?"

"তখন যে কানায় কানায় ভরে ছিলাম আমি।"—মুনিয়া বাঈয়ের গভীর দৃষ্টি কান্তির মুখের ওপরে স্থির হয়ে রইল ঃ "তোমাকে আমার জওয়ানী থেকে পেয়ালা ভরে দিয়ে বলতাম ঃ পী লেও। দুনিয়া আজ আছে—কাল নেই। দিল-তোড়নেওয়ালী চলী গই ? বহুত আচ্ছা, যা-নে দেও। আমি তো আছি। এমন অনেকের দুঃখ আমি মিটিয়েছি বাবুজী।"

কান্তি চুপ করে রইল।

মুনিয়া বাঈ আশ্চর্য কোমল হাসি হাসল ঃ "হাঁ অনেকের দুঃখ মিটিয়েছি। পিয়াসে পাগল হয়ে ছুটে এসেছে আমি জ্বালা জুড়িয়েছি তাদের। জানো বাবুজী, আমরা হচ্ছি গঙ্গা মাইয়ের স্বজাত। গঙ্গাজী যেমন সকলের পাপ

টেনে নেন—তেষ্টা মেটান—আমরাও তাই করি।—" মুনিয়া বাঈ আর-একটা লবঙ্গ তুলে নিলে বাটা থেকেঃ "ভারী অদ্ভুত লাগছে কথাটা—না? তুমি মানো?"

হাতুড়ির ঘা লাগা আঙুলটায় যন্ত্রণা হচ্ছিল। তার চাইতেও বেশি যন্ত্রণা জ্বলছিল বুকের ভেতরে। কান্তি জবাব দিলে, "জানি না।"

"তুমি মানবে না। কিন্তু ওই তো আমাদের সান্ত্বনা। ওই জোরেই তো আমরা বলতে পারি, যার কেউ নেই—সংসারে আমরা আছি তার জন্যে। কিন্তু তোমাকে সেকথা বলতে পারি না। তুমি আমার চাইতে অনেক ছোট। এখন আমি তোমার বড় বহিন হতে পারি, তার বেশি কিছু নয়।"

যন্ত্রণাটা বেড়েই যাচ্ছে। সহানুভূতি হয়েছে মুনিয়া বাঈয়ের? সমবেদনা জানাচ্ছে তাকে? কিন্তু আরো অসহ্য বোধ হচ্ছে সেটা। দেউলে হয়ে যে পথে বেরিয়েছে, তার হাতের মুঠো ভরে ভিক্ষা দিলে সেটা আরো বেশি অপমান হয়ে বাজতে থাকে।

কান্তি নিঃশব্দে উঠে পড়ল। চলে গেল ঘর থেকে।

মুনিয়া বাঈ মৃদু নিঃশ্বাস ফেলল একটা। উদাস দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে গুন গুন করতে লাগলঃ "দিওয়ানা হুঁ—ম্যায় দিওয়ানা হুঁ—"

সেই রাত্রেই ঘটনা ঘটল।

মুনিয়া বাঈ নাচছিল।

নামজাদা এক শেঠ এসেছেন তাঁর ঘরে। তিনটে কোলিয়ারি, দুটো পাটের কল, একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের মালিক। আরো কী কী ব্যবসা আছে তাঁর। লাখ দশেক টাকা ইনকাম ট্যাক্স দিয়েছেন এবার, ফাঁকি দিয়েছেন তার তিনগুণ।

এসেই শেঠজী বের করেছেন একটা পেটমোটা মস্ত বড় মনিব্যাগ। দুখানা দশ টাকার নোট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছেন, "নোকর লোগ্‌কো বকশিশ।"

তারপর এসেছে আতরদান, সোনালী তবকমোড়া বাটাভরা পান, রুপোর থালায় কয়েক ছড়া মোটা মোটা মালা, আর এসেছে মদের বোতল।

মুনিয়া বাঈ বেশি মদ খায় না। কিন্তু এমন সম্মানিত অতিথির সে অমর্যাদা করতে পারেনি। শেঠজীর সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকপাত্র চড়িয়ে নিয়েছে, নিজেও উচ্ছলতম গান শুনিয়েছে একটার পর একটা, দু চোখে ছড়িয়েছে ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্নিবাণ। তারপর শুরু হয়েছে নাচ।

ত্রিশ বছর পেরিয়ে যাওয়া মুনিয়া বাঈ যেন পিছিয়ে গেছে দশ বছর। সমস্ত শরীর তার ফণা-তোলা সাপের মতো ছোবল মেরেছে শেঠজীকে। এমন কি বুড়ো সারেঙ্গিওলার চোখ পর্যন্ত চমকে উঠেছে কয়েকবার। শেঠজী একটার পর একটা গ্লাস শেষ করেছেন, শেষ পর্যন্ত আর সোডারও দরকার হয়নি।

নেশার জড়তা আর নাচের ক্লান্তিতে একসময় কার্পেটের উপর লুটিয়ে

পড়ল মুনিয়া বাঈ। তার অনেক আগেই ঘুমিয়েপড়েছেন শেঠজী। প্রকাণ্ড মুখটা হাঁ করে আছে, নাক দিয়ে বেরুচ্ছে উৎকট আওয়াজ। সারেঙ্গি রেখে বুড়ো সারেঙ্গিওলা এগিয়ে গেল, একটা তাকিয়া টেনে সস্নেহে মুনিয়া বাঈয়ের মাথাটা তুলে দিলে তার উপর, তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কান্তি তবলা সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ থেমে পড়ল আবার।

শেঠজীর গলায় চিকচিকে সোনার হার। হাতের আঙুলে সবসুদ্ধ গোটা আটেক আংটি, তার একটা থেকে কমলহীরের একটা দীর্ঘ রশ্মিরেখা কান্তির চোখে এসে আঘাত করছে। পেটমোটা মনিব্যাগটা গড়িয়ে পড়েছে কার্পেটের উপর। জামার বোতামগুলোতেও যা চিকচিক করছে, তা হীরে ছাড়া আর কিছুই নয়।

কান্তির হাত-পা যেন জমে পাথর হয়ে গেল।

কত টাকা হতে পারে সবসুদ্ধ? পাঁচ হাজার, সাত হাজার? ওই মনিব্যাগটাতেই যে কত আছে কে জোর করে বলতে পারে?

কান্তি চারদিকে তাকাল একবার। রাত একটা বেজে গেছে। একটা চাকরেরও সাড়া নেই কোথাও। তারা বোধ হয় শুয়ে পড়েছে নিজেদের জায়গায়। মুনিয়া বাঈ নেশায় অচেতন, শেঠজীর নাক ডাকছে।

কমলহীরের দীর্ঘ রশ্মিরেখাটা শয়তানের সংকেতের মতো ডাকতে লাগল কান্তিকে। পেটমোটা মনিব্যাগটা সাদর আমন্ত্রণে হাতছানি দিতে লাগল। বোতামের উজ্জ্বল বিন্দুগুলো আলোর সুতোয় পরিণত হল, তারা যেন দুপায়ে জড়িয়ে ধরতে লাগল কান্তির।

কান্তি একবার কপালের ঘাম মুছে ফেলল। তাকিয়ে রইলো মন্ত্রবদ্ধের মতো। তারপরে মনে হল, তার চোখের তারা দুটো আর চোখের ভিতরে নেই, কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়েছে তারা, ওই আংটিটার উপর, ওই মনিব্যাগটার উপর জ্বল-জ্বল ঝক ঝক করে জ্বলছে।

আলোর সুতোগুলো সরীসৃপ হয়ে কান্তির দু পা জড়িয়ে ধরে টানতে লাগল। একটা দুর্জয় লোভ বুকের ভিতরে আঁচড়াতে লাগল ক্রমাগত। মাথার ভিতরে শুধু কমলহীরের আলোটা আগুনের ঊর্ধ্বমুখী শিখার মতো জ্বলতে লাগল।

কান্তি ফিরে গেল শেঠজীর কাছে।

পাঁচটা আংটি খুলে এল সহজেই, কমলহীরেটা এল সব চেয়ে সহজে। গোটা তিনেক বাধা দিলে, আর দুটোও খোলা গেল কিছুক্ষণের মধ্যে। একটা শুধু শক্ত হয়ে আঁকড়ে রইল, আঙুলের মোটা গাঁটটা কিছুতেই পেরোতে রাজী হল না।

ওটা থাক, এমন কিছু লোভনীয় নয়। বোতামটার সঙ্গে এল বেশ মোটা সোনার চেন। আর মনিব্যাগটা তো তারই জন্যে অপেক্ষা করছিল।

ঘামে জামাটা লেপটে গেছে গায়ের সঙ্গে। কান্তির চোখের সামনে সমস্ত

ঘরটা ভূমিকম্পের মতো দোল খাচ্ছে। শেঠজীর নাক ডাকছে সমানে। একটা ছিঁড়ে আনা পদ্মের মতো লুটিয়ে আছে মুনিয়া বাঈ। কান্তি দ্রুতপদে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সেখান থেকে সোজা সিঁড়ির দিকে।

কিন্তু সিঁড়িতে প্রথম পা রাখতেই কে যেন তার কাঁধে থাবা দিয়ে চেপে ধরল। লোহার মতো শক্ত তার মুঠো। থরথর করে কেঁপে উঠল কান্তি।

সারেঙ্গিওলা।

কোটরে-বসা চোখ দুটো ঝিলিক দিচ্ছে ক্রোধে। বজ্রগর্জনে বুড়ো বললে, "কাঁহা যাতা? ঠহ্‌রো!"

"কেঁও?"

"তোম্‌ চোরি কিয়া।"

খুনী শান্তিভূষণ জেগে উঠল কান্তির রক্তে। কান্তি পাল্‌টা গর্জন করে উঠল, "মুখ সাম্‌লাও।"

"চোপরও চোট্টা। জেব দেখলাও!"

একটা ঝটকা মেরে বুড়োকে ঠেলে ফেলে দিতে চাইল কান্তি, কিন্তু পারল না। পরক্ষণেই বুড়ো প্রচণ্ড একটা ঘুষি মারল কান্তির মুখে। ঠোঁট ফেটে গেল সঙ্গে সঙ্গেই, নাক দিয়ে দরদরিয়ে নেমে এল রক্ত।

শান্তিভূষণের বিষাক্ত রক্ত সাপের মতো হিসহিসিয়ে যেন কান্তিভূষণকে বললে, "তুমি খুনীর ছেলে, সে-কথা ভুলো না।"

ফাটা ঠোঁট আর রক্তাক্ত নাক নিয়ে কান্তি বাঘের মতো বুড়োর উপরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

বাড়ির চাকরবাকরগুলো এসে যখন কান্তিকে টেনে তুলল বুড়োর বুক থেকে, তখনো বুড়োর গলায় তার আঙুলগুলো অকারণে পাকের পর পাক দিচ্ছে। ফাটা ঠোঁট আর নাকের রক্তমাখানো মুখে ফেনা তুলে কান্তি তখনো অবরুদ্ধ স্বরে বলে চলেছে, "এবার—এবার?"

পাঁচ

"দাদা, ঘুমুচ্ছেন?"

সাড়া নেই।

"ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি, ও অতীশবাবু?"

"উঁ? কী বলছেন?" অতীশ পাশ ফিরল।

শ্যামলাল নিজের তক্তপোশে ছট্‌ফট করল আরো কিছুক্ষণ। খালি মনে হচ্ছে অজস্র ছারপোকা কামড়াচ্ছে বিছানায়। উঠে বসল, বালিশের তলা থেকে দেশলাই বের করে খুঁজেও দেখল। না, একটা ছারপোকারও সন্ধান পাওয়া গেল না।

নেমে গিয়ে কুঁজো থেকে জল খেল এক গ্লাস। তারপরে আবার করুণস্বরে বললে, "ও অতীশবাবু!"

"হুঁ।"

"ঘুমুচ্ছেন ?"

"হুঁ।"

"আচ্ছা। ঘুমোন।"

অতীশ চোখ মেলল। জড়ানো গলায় বললে, "ডাকছিলেন কেন ?"

"না—এমনি। আপনি ঘুমুচ্ছেন কিনা জিজ্ঞেস করছিলাম।"

অতীশের পাতলা ঘুম সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছিল, বিরক্ত হয়ে বললে, "আমার ঘুম ভাঙিয়ে সেটা না জানলে কি আপনার চলছিল না ? নিজেও পড়ে পড়ে নাক ডাকান না—আমাকে কেন জ্বালাচ্ছেন ?"

শ্যামলাল কুঁকড়ে গেল। অপ্রতিভ হয়ে বললে, "না-ইয়ে-এমনি। আমার ঘুম আসছিল না কিনা, তাই ভাবছিলাম আপনার সঙ্গে একটু গল্প করব। তা আপনি ঘুমোন। ডিসটার্ব করলাম, কিছু মনে করবেন না।"

অতীশ হাই তুলল। আধশোয়া ভঙ্গিতে উঠে বসল বিছানায়। ঘরে আলো নেই, কিন্তু জানলা দিয়ে একফালি ফিকে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে শ্যামলালের মুখে। অত্যন্ত বিপন্ন আর কাতরভাবে তাকিয়ে আছে শ্যামলাল।

অতীশ একটা সিগারেট ধরাল। দেশলাইয়ের কাঠির চকিত আলোয় শ্যামলালের বিষণ্ণ মুখখানাকে আরো বিবর্ণ মনে হল।

"মনে করলেই বা আর করছি কী। একবার যখন জাগিয়ে দিয়েছেন, তখন সহজে আমার আর ঘুম আসবে না। কিন্তু ব্যাপার কী! পড়ছেন না অথচ জেগে রয়েছেন এমন অঘটন তো আপনার ক্ষেত্রে ঘটে না।"

শ্যামলাল বললে, "মানে—কেমন যেন মাথা ধরেছে, তাই—"

"এ-পি-সি খাবেন ? দিতে পারি এক পুরিয়া।"

"ধন্যবাদ—দরকার নেই। আমি বলছিলাম, কবে এলাহাবাদ যাচ্ছেন ?"

অতীশ বললে, "আমাকে জয়েন করতে হবে প্রায় এক মাস পরে।"

"ও! তা বেশ ভালো চাকরি আপনার। ওসব জায়গার ইউনিভার্সিটি মাইনে দেয় ভালো, তা ছাড়া ফরেন স্কলারশিপ পাওয়ার সুবিধেও আছে।" শ্যামলাল নিঃশ্বাস ফেলল।

"দেখা যাক।" টোকা দিয়ে মেজেতে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে অতীশ বললে, "কিন্তু ব্যাপারটা কী শ্যামবাবু ? আমার কুশল আর খবরাখবর নেবার জন্যেই কি এত রাতে আমাকে ডেকে তুললেন নাকি ?"

সামনের রাস্তা দিয়ে মড়া গেল একটা। হরিধ্বনির দানবিক চিৎকারটা সমস্ত অঞ্চলকে মুখর করে তুলল, কয়েকটা কুকুর সাড়া দিল তীক্ষ্ণ ভীত গলায়, একটা ঘুমভাঙা কাক ককিয়ে উঠল বাইরের শিরীষ গাছে। শ্যামলাল বিবর্ণ মুখে খানিকক্ষণ-দূরে-চলে-যাওয়া হরিধ্বনির আওয়াজ শুনল, তারপর সসংকোচ বললে, "আপনি মল্লিক সাহেবদের ওখানে যান ?"

শ্যামলালের অলক্ষ্যে অতীশ অল্প একটু হাসল।

"আজকাল বিশেষ যাওয়া হয় না। তবে মাসখানেক আগে গিয়েছিলাম একবার।"

"ওরা আপনার আত্মীয় ?"

"দূর সম্পর্কের। কেন বলুন তো ?"

"না—এমনি।" শ্যামলাল ঢোক গিলল, "মানে ওরা একটু—"

অতীশ বললে, "সাহেব-ঘেঁষা। তা ভদ্রলোকের অনেক টাকা। দুবার আই-সি-এস ফেল করেছেন ; যদ্দুর জানি, ব্যারিস্টারি ব্যাপারটাও সহজে হয় নি। কাজেই বিলেতে অনেক দিন থেকেছেন এবং সাহেবী করবার অধিকারও ওঁর আছে।"

"ওঁরা সবাই তাহলে—"

অতীশ হাসল, "না—সবাই নয়। মল্লিক সাহেবের স্ত্রী এখনো বাড়িতে পায়ে জুতো পরেন না এবং ওঁদের রান্নাঘরে এখনো বাবুর্চি ঢুকতে পায় না। আর মন্দিরাকে তো আপনি দেখেইছেন।"

"তা দেখেছি।" শ্যামলালের চোখ চকচক করে উঠল, "চমৎকার মেয়ে।"

"যা বলেছেন।" অতীশ উৎসাহ দিলে, "অমন বাড়ির মেয়ে, অথচ কোনো খটমটে চাল-চলন নেই। একেবারে সাদামাটা। মানে মেয়েটা ওর মায়ের দিকটাই পেয়েছে কিনা।"

উত্তেজনায় ভালো করে নড়ে-চড়ে বসল শ্যামলাল। ঝুঁকে পড়ল অতীশের দিকে।

"ঠিক বলেছেন। মেয়েটি একেবারেই ও-বাড়ির মতো নয়। আর দারুণ ইণ্টেলিজেণ্ট।"

অতীশ আবার সিগারেটের ছাই ঝাড়ল। "তাতে আর সন্দেহ কী ! বিশেষ করে কেমিস্ট্রিতে ওর যা মাথা খোলে, তার আর তুলনা নেই। আমি তো মধ্যে মধ্যে ভাবি, বি-এস-সি পাস করবার আগেই কোনদিন বা ও ডি-এসসি হয়ে বসবে।"

শ্যামলাল একটু চমকে উঠল। খোঁচা লাগল গায়ে। মন্দিরার যে কেমিস্ট্রিতে এতখানি মাথা, অতটা শ্যামলালও ভাবতে পারেনি।

"ঠাট্টা করছেন না তো ?"

"ঠাট্টা করব কেন ? মেয়েটা সত্যিই খুব শার্প।" অতীশ গম্ভীর হয়ে গেল।

শ্যামলাল চুপ করে রইল। নির্জন নিঃশব্দ পথের উপর সুদূর থেকে আসা হরিধ্বনির একটা ক্ষীণ রেশ তখনো কাঁপছে। পথের কুকুরগুলো ডেকে চলেছে একটানা। শিরীষ গাছটায় ঝোড়ো হাওয়ার দোলা লেগেছে, শন-শনানির আওয়াজ উঠছে একটা। কোথায় যেন তীব্র তীক্ষ্ন স্বরে পুলিশের বাঁশি বাজল।

শ্যামলাল একটু সামলে নিয়ে আবার বললে, "আচ্ছা—"

"বলে ফেলুন।"

"মানে—মনে করুন—" শ্যামলাল একটা গলাখাঁকারি দিলে, "ওই সাহেবী আবহাওয়া থেকে বাইরে যদি কোথাও—" শ্যামলাল আবার ঢোক গিলল, "বাইরে যদি কোথাও মন্দিরার বিয়ে হয়, তবে ও কি সুখী—"

"সুখী হবেই তো। সাদাসিদে গেরস্থর ঘরেই ওকে মানাবে ভালো।"

শ্যামলালের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "জানেন, আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। কোনো সাদাসিদে ঘরেই ওকে মানাবে ভালো। তাই বলে কি আর ওর রান্নাবান্না করতে হবে? চাকর-ঠাকুর সবই থাকবে। তবে হয়তো মোটরে চাপতে পারবে না, কিংবা টেবিল-চেয়ারে বসে খাওয়া-দাওয়ার সুবিধে হবে না—"

"কোনো দরকার নেই।" অতীশ জানালা গলিয়ে সিগারেটটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে, "ওসব তেমন ওর পছন্দও নয়। ও পিঁড়ে পেতে গরম বেগুন-ভাজা দিয়ে মুসুরীর ডাল খেতে খুব ভালোবাসে, গাড়ি চড়ে ঘোরাঘুরির চাইতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়ানোই ওর পছন্দ।"

"বাঃ—বাঃ!" শ্যামলালের চোখ আরো বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "একেই বলে ভারতীয় নারী।"

"পার্ফেক্ট।" অতীশ সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলে।

"কিন্তু ওঁর বাবা এ-সব পছন্দ করেন?"

"না করেই বা কী করবেন? তিনি তো জানেনই, শেষ পর্যন্ত ওর সাধারণ বাঙালীর ঘরেই বিয়ে হবে।"

শ্যামলালের হৃৎপিণ্ড লাফাতে লাগল। এত জোরে যে, সন্দেহ হতে লাগল অতীশ তার শব্দ শুনতে পাবে। উত্তেজনায় তার কান দুটো ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল।

"আপনি তো অনেক খবর জানেন দেখতে পাচ্ছি।" কোনোমতে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে শ্যামলাল বললে, "আপনাকে বুঝি সব খুলে বলে মন্দিরা? আত্মীয় বলে বুঝি খুব বিশ্বাস করে?"

"শুধু আত্মীয় কেন?" একটা হাই তুলে অতীশ বিছানায় পিঠটাকে এলিয়ে দিলে। অত্যন্ত নিরীহ ভঙ্গিতে বললে, "আমি ছাড়া এ-সব আর কে বেশি জানবে? আমাদের ঘরের সঙ্গেই তো শেষ পর্যন্ত মানিয়ে নিতে হবে মন্দিরাকে।"

শ্যামলাল কান খাড়া করল। কেমন বেসুরো ঠেকল কোথাও।

"মানে? আপনাদের ঘরের সঙ্গে কেন?"

"বা-রে!" অতীশ তেমনি সরল নিরীহ ভঙ্গিতে আলতো ভাবে ছড়িয়ে দিলে কথাটা ঃ "আমার সঙ্গেই যে বিয়ের কথা আছে মন্দিরার।"

আকাশ থেকে যেন প্রকাণ্ড একটা লোহার মুগুরের ঘা শ্যামলালের মাথায় এসে পড়ল। শ্যামলাল নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। প্রায় চিৎকার তুলে বললে, "কী বললেন?"

"একটা পাকা খবর দিলাম আপনাকে।" অতীশ নিশ্চিন্ত ভাবে বিছানায় শুয়ে পড়ল, "আমার ডি-এসসি আর চাকরির জন্যেই এতদিন অপেক্ষা করছিলেন মল্লিক সাহেব। কাল আমি একটা চিঠি পেয়েছি ওঁর। আমি এলাহাবাদে চলে যাওয়ার আগেই বিয়েটা সেরে ফেলতে চান।"

কথাটা ঠিক। মল্লিক সাহেবের দিক থেকে অন্তত।

শ্যামলাল জবাব দিতে পারল না। কী একটা বলবার উপক্রম করেছিল, গলা দিয়ে খানিকটা গোঙানি ঠেলে বেরিয়ে এল।

"কী হল আপনার ?" আবার সরল বিস্মিত প্রশ্ন অতীশের।

- "মিথ্যেবাদী—লায়ার !" হঠাৎ একটা সিংহগর্জন বেরিয়ে এল শ্যামলালের মুখ দিয়ে।

"কে মিথ্যেবাদী ? কে লায়ার ?"

"কেউ না, কাউকে বলছি না।" শ্যামলালের স্বর প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়ল, "মন্দিরার সঙ্গে আপনার ঠিক হয়ে রয়েছে এ-কথা আগে কেন বলেননি ? চেপে রেখেছিলেন কিসের জন্যে ?"

অতীশ বললে, "থামুন—আর বেশি বকাবেন না। আমার সঙ্গে মন্দিরার বিয়ে নিয়ে আপনার কী মাথাব্যথা যে, আগবাড়িয়ে বলতে যাব আপনাকে ? আপনি ও-বাড়িতে প্রাইভেট টিউশন করতে গেছেন—তা-ই করবেন। আপনার তো এ-সব দুশ্চিন্তা করবার কোনো কারণ নেই।"

শ্যামলাল বোবা-ধরা গলায় বললে, "না, চিন্তার কোনো কারণ নেই। তা হলে আপনি ইচ্ছে করেই—ওঃ—! মানুষ কি বিশ্বাসঘাতক !" শেষটা আর বলতে পারল না, বোধ হয় চোখের জলে থমকে গেল।

অতীশ চটে গেল। কড়াভাবে বললে, "এও তো জ্বালা কম নয় দেখছি ! আপনি প্রাইভেট টিউটর, বাড়ির সব খবরাখবর আপনাকে দিতেই হবে, এমন কথা কোন্ আইনে বলে বলুন দেখি। থামুন, এখন আর বেশি বকবক করবেন না। অনেক রাত হয়েছে, প্রায় দেড়টা বাজে, আমাকে ঘুমুতে দিন।"

শ্যামলাল আর কথা বললে না। ধুপ করে নেমে পড়ল তক্তোপোশ থেকে, তারপর দুমদুম করে চলে গেল ছাদের দিকে। অতীশ চুপ করে শুয়ে শুয়ে শ্যামলালের পায়ের শব্দ শুনতে লাগল। কোথায় যাবে—ছাতে ? সেই ঘুঁটের ঘরে ? সেখানেই কি শুকনো গোবরের উপর বসে বসে নতুন করে আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করবে শ্যামলাল ? তিন মাস ধরে ওর যে ব্রতচ্যুতি ঘটেছে, সারারাত ধরে সরস্বতীর কাছে জল ফেলে প্রায়শ্চিত্ত করবে তার ?

কিন্তু খামোখা শ্যামলালকে এমনভাবে আঘাত করল কেন অতীশ ? একটা উদ্দেশ্য অবশ্যই ছিল, শ্যামলাল বড্ড বকর-বকর করছিল মাঝরাতে। যেভাবে শুরু করেছিল, তাতে আর সহজে ঘুমুতে দিত না। অথচ আজ রাতে তার ভালো করে ঘুমোনোটা একান্তই দরকার। সেই ঘুম ভাঙিয়ে দেবার শাস্তি খানিকটা দেওয়া গেল শ্যামলালকে।

শুধু কি এই ? না, আরো কিছু ছিল এর ভিতরে ? তার চোখের সামনে দিয়ে শ্যামলাল একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে মন্দিরার দিকে, সেই জন্যে কি খানিকটা ঈর্ষাও ছিল তার মনে ? আর ঈর্ষা থেকেই কি এই আঘাত ?

অতীশ চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগল। একবার অবশ্য ভাবল : শ্যামলাল বড় বেশি আঘাত পেয়েছে—এই মাঝরাতে একা ছাদে গিয়ে সে কী

করছে সেটা দেখে এলে মন্দ হয় না। কিন্তু কী লাভ? মৃদু অনুকম্পার হাসি ফুটে উঠল অতীশের ঠোঁটের কোণায়। শ্যামলালের মতো হিসেবী ছেলেরা অত সহজেই ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে না। প্রেম করে বিয়ে করতে গিয়েও যদি পণের টাকার গোলমালে তার বাপ আসর থেকে তাকে তুলে আনে, তা হলে সে চোখের জল মুছতে মুছতে বাপের পিছনে পিছনে গাড়িতে এসে উঠবে। আর কিছুই করতে পারবে না।

কিন্তু সত্যিই কি মন্দিরাকে সে বিয়ে করবে? মল্লিক সাহেব চিঠিতে তো স্পষ্ট করেই সে-কথা লিখেছেন।

ক্ষতি কী! কোনো ভাবনা নেই, কোনো দায়িত্ব নেই, জীবনের ঘাটে নিশ্চিন্তে নোঙর ফেলা। নির্ঝঞ্ঝাট—নিশ্চিন্ত! নিজের গৃহিণীপনার বাইরে এতটুকুও দাবি করবে না মন্দিরা, সুপ্রিয়ার মতো অতখানি চাইবার শক্তি তার নেই।

কেবল, কেবল সুপ্রিয়াকেই যদি ভুলতে পারা যেত! মন্দিরা সম্পর্কে সাধ্যমতো রোমাণ্টিক হতে গিয়েও সে কিছুতেই পেরে উঠছে না। সুপ্রিয়ার একটা বিষণ্ণ ছায়া এসে মন্দিরার মুখখানাকে আড়াল করে দিচ্ছে বার বার।

পঞ্চম অধ্যায়

এক

অমিয় মজুমদার অপরিমিত খুশি হয়ে বললেন, "আরে এসো, এসো। কেমন আছো?"

অতীশ পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। বললে, "চলছে একরকম।"

"কাগজে পড়েছিলাম তুমি ডি-এসসি হয়েছ। ভারী খুশি হয়েছিলাম। আমি তো বরাবরই জানি, তোমার মতো ছেলে আর হয় না।" সস্নেহ দৃষ্টিতে অতীশের সর্বাঙ্গ অভিষিক্ত করে অমিয় মজুমদার বললেন, "কী করছ এখন? বিলেত-টিলেত যাবে তো?"

"না, বিলেত যাওয়া আপাতত হবে না। চাকরি পেয়েছি।"

"কোথায়?"

"এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটিতে।"

"ভালো, খুব ভালো। জয়েন করছ কবে?"

"আরো হপ্তা তিনেক দেরি হবে।"

"বেশ—বেশ!" অমিয় মজুমদার প্রসন্ন মনে বললেন, "রেবার বিয়েটাও দেখে যেতে পারবে।"

"ঠিক হয়ে গেছে নাকি?" হঠাৎ কোথায় একটা আঘাত লাগল অতীশের: "কোথায় ঠিক করলেন?"

"জামশেদপুরে। টাটায় চাকরি করে ছেলেটি, ইঞ্জিনিয়ার।" তৃপ্তভাবে অমিয়

মজুমদার বললেন, "দেখতে শুনতে মোটামুটি ভালোই। তা ছাড়া বাড়িতে গানবাজনার চর্চাও আছে। ছেলের বাবা খুব ভালো পাখোয়াজ বাজান, অনেক বড় বড় ওস্তাদের সঙ্গে সঙ্গত করেছেন।" অমিয়বাবুর চোখে খানিকটা আবিষ্ট সুখস্মৃতি ফুটে উঠল, "আমি তো গেলাম কথাবার্তা পাকা করতে। তা কথাবার্তা কী আর হবে, সারা সন্ধ্যে আমায় পাখোয়াজ বাজিয়েই শোনালেন। হাত আছে বটে। যেন পাখোয়াজেই সাতটা সুর তুলে দিলেন ভদ্রলোক।"

অতীশ চুপ করে রইল। কেউ অপেক্ষা করবে না, কেউ না। সে জানত, তার উপরেও অমিয়বাবুর লোভ আছে, শুধু সাহস করে মুখ ফুটে বলতে পারেন না। শুধু তার দিক থেকে একটুখানি ইঙ্গিতের অপেক্ষা ছিল মাত্র। আর মস্ত বড় একটা হৃদয় ছিল রেবার। সেই হৃদয় তাকে পাখির নীড়ের মতো আশ্রয় দিতে পারত।

রেবা তো জানে সুপ্রিয়া তার কাছ থেকে দূরে চলে গেছে। যদি কোনোদিন ফিরেও আসে, তা হলেই বা কী আসে যায়? মহাভারতের সঙ্গীত-তীর্থে-তীর্থে পূর্ণকুম্ভ সে ভরতে চলেছে, তা দিয়ে সে যে বিগ্রহের অভিষেক করবে, সে আর যে-ই হোক অতীশ নয়। রেবা তো জানত, একমাত্র তার কাছেই অতীশ নিজেকে সম্পূর্ণ করে মেলে ধরতে পারে, সান্ত্বনা চাইতে পারে, আশ্বাস পেতে পারে। শেষ পর্যন্ত রেবা তো তাকে বলতে পারত, "আমি তো রইলামই। সুপ্রিয়ার প্রয়োজন হয়তো আমাকে দিয়ে মিটবে না, তবু যেটুকু দিতে পারব, তার দামও কম নয়।"

কিন্তু রেবা অপেক্ষা করল না। একবারও বললেন না অমিয় মজুমদার। কেউ অপেক্ষা করে না কারো জন্যে। শুধু একা অতীশই কি সুপ্রিয়ার পথ চেয়ে বসে থাকবে?

অমিয়বাবু বললেন, "বোসো, রেবাকে ডাকি, চা খাও।"

অন্য সময় হলে অতীশ বলত, "আজ থাক, আমি যাই।" কিন্তু এই মুহূর্তে ওই বিনয়টুকুও সে করতে পারল না। সত্যিই এখন তার এক পেয়ালা চা দরকার, কোথাও কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকা দরকার। রেবা আসে তো আসুক, না এলেও ক্ষতি নেই।

কারো সময় নেই। চোখের সামনে দিয়ে রূপকথার গল্পের সেই মায়াহরিণের দল ছুটে চলেছে। সময়মত ধরতে পারলে পেলে, নইলে হারালে চিরদিনের মতো। আধবোজা দৃষ্টিতে অতীশ দেখতে লাগল ছেলেবেলার একটা দিনকে। পাহাড় ধ্বসিয়ে, অরণ্যকে উপড়ে ফেলে তিস্তার বন্যা নেমেছে, গ্লেসিয়ারের বাঁধ ভেঙে ছুটেছে উথাল-পাতাল গেরুয়া রঙের জল, দু মাইল দূর পর্যন্ত তার হাহাকার শোনা যাচ্ছে। আর সেই স্রোতের ভিতর দিয়ে ঘূরপাক খেতে খেতে চলেছে উৎপাটিত শাল-শিমুল-গামার গাছের দল। সেই ভয়ঙ্কর স্রোতের পাশে ডাঙার উপর দড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুঃসাহসী মানুষেরা। সামনে দিয়ে কাঠ ছুটে গেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে নদীতে, দড়ি বেঁধে কাঠকে টেনে আনবে ডাঙায়। কেউ পারবে, কেউ পারবে না। কখনো কখনো

এক-আধজনের সর্বাঙ্গ সেই হিমশীতল জলে কালিয়ে যাবে, কাঠের সঙ্গে সঙ্গে তিস্তার স্রোত চিরদিনের মতো ভাসিয়ে নেবে তাদেরও।

অতীশেরও কিছু একটা আঁকড়ে ধরবার প্রয়োজন ছিল। হয় পেত, নইলে তলিয়ে যেত। কিন্তু এ কোথায় কোন্ ডাঙার উপরে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখল সুপ্রিয়া ? নিজে এল না, কাউকে আসতে দিল না। রেবা চলে গেল, মন্দিরাও হয়তো চলে যাচ্ছে। আর শেষ পর্যন্ত—

অমিয়বাবু উঠে গিয়েছিলেন। রেবা এসে দাঁড়াল।

"নমস্কার। কেমন আছেন ?"

"ভালো। নমস্কার।"

অতীশ তাকিয়ে দেখল। মাস তিনেক সে আসেনি, কিন্তু এর মধ্যেই কেমন বদলে গেছে রেবা। সামান্য একটু মোটা হয়ে গেছে যেন, গাল দুটো ভরে উঠেছে, চোখে খুশির আভাস চিকচিক করছে। রেবার কোনো ক্ষোভ নেই। জীবনে সঙ্গী নির্বাচনের দায় সে নেয়নি, কাজেই যে আসছে তার জন্যে তৃপ্ত মনে সে প্রস্তুত হয়েই রয়েছে।

রেবা বসল। "চা করতে বলেছি, এখনি আসবে। আপনার ডক্টরেটের জন্যে অভিনন্দন।"

"ধন্যবাদ।"

"বাবার মুখে শুনলাম, এলাহাবাদে যাচ্ছেন।"

"কী আর করা। একটা চাকরি-বাকরি তো করতেই হবে।"

রেবা অতীশের মুখের দিকে তাকাল। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললে, "আমি সেট্‌ল করতে যাচ্ছি, শুনেছেন বোধ হয়।"

"শুনেছি।" অতীশ হাসল : "উইশ ইউ এ হ্যাপি ম্যারেড লাইফ।"

"এবারে ধন্যবাদের পালা আমার।" রেবা আবার একটু থামল, "কিন্তু আপনি ?"

"আমার কথা কী বলছেন ?"

রেবা খুব সহজেই আবরণটা ভেঙে দিয়েছে। হয়তো ওরও মনের ভিতরে তীব্র জ্বালা ছিল একটা, হয়তো অতীশের যন্ত্রণা ওকেও স্পর্শ করেছিল এসে।

"সুপ্রিয়ার জন্যে কেন মিথ্যে বসে থাকবেন আর ? কোনোদিন যে আপনার দাম দেবে না, কেন নিজেকে নষ্ট করছেন তার জন্যে ?"

অতীশ বললে, "ঠিক জানি না।"

"ক্ষতি যা সে তো আপনারই একার।"

"তাই নিয়ম। ক্ষতি চিরকাল তো একজনেরই হয়। নদীর দুটো কূল কখনো একসঙ্গে ভাঙে না।" অতীশ হাসতে চেষ্টা করল।

রেবার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, "তার মানে ওকে আপনি ভুলতে পারবেন না কোনোদিন ?"

"এতবড় কথা কেমন করে বলি ?" অতীশ হাসিটাকে জাগিয়ে রাখতে চেষ্টা করল ঠোঁটের কোণায়, "কোনোদিন কাউকে ভুলতে পারব না, এতখানি

মনের জোর আমার নেই। তবে কিছুদিন হয়তো সময় নেবে। তা ছাড়া জীবনে অনেক কাজ। এলাহাবাদে গিয়ে কিছুদিন চাকরি করলে একটা বাইরের স্কলারশিপ পেয়ে যেতে পারি। নইলে নিজেই যাব। বিলেতের একটা ডিগ্রি আমার চাই। আর এত সব কাজের মধ্যে সুপ্রিয়া নিশ্চয় মুছে যাবে মন থেকে। তখন হয়তো এসে দাঁড়াব আপনাদের কাছেই। বলব, আমি তৈরি হয়ে আছি, এবারে একটি ভালো পাত্রী খুঁজে দিন।"

চা এল।

রেবা কিছুক্ষণ নিঃশব্দে টি-পটে চামচে নাড়ল, তারপর চা ঢেলে পেয়ালা এগিয়ে দিলে অতীশের দিকে।

"সে আশা আমরাও করি। তবে অত দেরি না হলেই আরো বেশি খুশি হব।"

অতীশ জবাব দিলে না। তুলে নিলে চায়ের কাপ। চা-টা অতিরিক্ত গরম, ঠোঁট দুটো জ্বলে উঠল।

পথে বেরিয়ে অতীশ ভাবল, সত্যিই সে কেন দেরি করবে? কার জন্যে দেরি করবে?

সুপ্রিয়ার প্রয়োজনে? যদি কখনো সুপ্রিয়া এসে তার কাছে সাহায্যের জন্যে হাত পেতে দাঁড়ায়, তা হলে সেই শুভ লগ্নটিতে চরিতার্থ হওয়ার আশায়? সেইটুকুই তার চাওয়ার শেষ—তার পৌরুষের পরিণাম?

বিয়ের মরশুম পড়েছে কলকাতায়। বসন্তের ফুল ধরেছে গাছে গাছে। হাওয়াটা নেশা লাগানো। অতীশ তাকিয়ে দেখল, রাস্তার ওপারে একটা তেতলা বাড়ির ছাতের ওপর ত্রিপলের বিশাল আচ্ছাদন পড়েছে। পাশ দিয়ে বাস হর্ন দিয়ে গেল—শব্দটা শঙ্খধ্বনির মতো মনে হল। সামনে একটা 'দশকর্ম ভাণ্ডার'। অত্যন্ত স্থূল চিত্রকলার বরবধূ, মিলিত করপুট ফুলের মালা দিয়ে জড়ানো। তবুও তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করল ছবিটার দিকে।

তিন মাসের মধ্যে আর চিঠি দেয়নি সুপ্রিয়া।

তার গান, তার ভারতবর্ষ। ত্র্যম্বক মহাকালের বন্দনা উঠছে সপ্ত সুরে; জালিকাটা শ্বেত পাথরের বিরাট জলসাঘরের দেওয়ালে যেখানে সারি সারি মোগল আর রাজপুত শিল্পকলা, সেখানে এক ঝাঁক রঙিন পাখির মতো উড়ছে ঠুংরির ঝঙ্কার; দাক্ষিণী মন্দিরে যেখানে অগ্নিবলয়িত নটরাজের অষ্টধাতুমূর্তি নৃত্যোদ্যত পদক্ষেপে স্তব্ধ, সেখান থেকে শোনা যাচ্ছে গুরুগুরু মৃদঙ্গের সুর।

আর এই কলকাতা। সায়েন্স কলেজের ল্যাবরেটরি। অতীশ।

কী আছে এখানে? কতটুকু? বকুলগাছের তলায় রাত্রির একটুখানি নীল-কাজল ছায়া। কিন্তু সে-ছায়াটুকুও একান্তভাবেই অতীশের, সুপ্রিয়ার নয়। দাক্ষিণী নটরাজের তৃতীয় নেত্রে একটা জ্বলন্ত হীরা, সেই হীরার আলোয় এই ছায়াটুকু কবে মিলিয়ে গেছে সুপ্রিয়ার।

অতীশ দাঁতে দাঁত চাপল। কেন সে দেরি করবে?

এলাহাবাদ যাওয়ার আগে একবার বহরমপুরে যেতে হবে। দেখা করতে হবে মা-বাবার সঙ্গে। ভেবেছিল, দিন কয়েক পরেই যাবে বহরমপুরে। কিন্তু এই মুহূর্তে কেমন অসহ্য লাগল কলকাতাকে। আজকেই বা চলে গেলে ক্ষতি কী? এক্ষুনি? কিসের বাধা তার?

অতীশ ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখল। ঘণ্টাখানেক পরেই একটা ট্রেন আছে।

মেসের কাছাকাছি এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মন্দিরা বেরিয়ে আসছে।

অতীশ দ্রুতপায়ে ফুটপাথ পার হল। ডাকল, "মন্দিরা!"

মন্দিরা চমকে উঠল। এতদিন 'আপনি' বলে ডেকে হঠাৎ 'তুমি'তে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে অতীশ। একবারের জন্যে কালো হয়ে গেল মন্দিরার মুখ।

"এই যে।" শুকনো গলায় মন্দিরা বললে, "আপনার কাছেই গিয়েছিলাম। দেখলাম আপনি নেই।"

তীক্ষ্ন সন্ধানী দৃষ্টিতে অতীশ মন্দিরার দিকে তাকিয়ে দেখল। না, কোনো ভুল নেই। একটু আগেই কাঁদছিল মন্দিরা। এখনো লালচে আভা তার চোখে, এখনো বাঁ দিকের ভিজে গালটা চকচক করছে।

তীব্র, তীক্ষ্ন ঈর্ষায় অতীশ জ্বলে গেল। শেষ পর্যন্ত শ্যামলাল! সেই স্থূল গ্রন্থকীট, প্রায়-নির্বোধ শ্যামলাল। সে-ও ছাড়িয়ে গেছে অতীশকে! আজ একটু আগেই রেবার বিয়ের কথা শুনে মনের মধ্যে যে ঘা লেগেছিল সেটা আবার রক্তাক্ত হয়ে দগদগ করতে লাগল।

স্রোতে ভেসে চলেছে সব। অতীশ যাকে মনে করছিল হাতের মুঠোয়, ভেবেছিল চাইবামাত্র যা অর্ঘ্যের মতো লুটিয়ে পড়বে তার পায়ের কাছে, তারা সবাই ছাড়িয়ে চলেছে তাকে। সে কাউকে পাবে না, রূপকথার একটা মায়া-হরিণকেও ধরতে পারবে না। সে যখন আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকবে, তখন যে যা পারে কুড়িয়ে নিয়ে যাবে মাটি থেকে, কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না তার জন্যে। কিন্তু শ্যামলাল শেষ পর্যন্ত? মন্দিরার কী রুচি!

মাথার মধ্যে একঝলক উচ্ছলিত রক্তের আঘাতে বুদ্বুদের মতো ফেটে গেল বহরমপুর।

"মন্দিরা!"

অপরাধীর মতো মন্দিরা দাঁড়িয়েছিল, এক দৃষ্টিতে দেখছিল দূরের বস্তির কলের সামনে কতগুলো ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে। বোধ হয় অতীশের দিকে চোখ তুলে চাইতে পারছিল না।

"কী বলছিলেন?"

"তোমার সময় আছে?"

"কেন?" মন্দিরা বিব্রতভাবে হাতের ছোট ঘড়িটার উপরে চোখ বোলাল: "একটু কাজ ছিল।"

"কাজ পরে হবে। চলো আমার সঙ্গে।"

"কোথায় যেতে হবে ?"

"যেখানে হোক। যে-কোনো একটা চায়ের দোকানে। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

অতীশের চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেল মন্দিরা। ঠোঁট নড়ে উঠল বার কয়েক।

"আজকে না হলে হয় না ?"

"না।" শক্ত গলায় অতীশ বললে, "কথাটা জরুরী।"

প্রতিবাদ করতে আর সাহস পেল না মন্দিরা। একবার মুখের ঘামটা মুছে ফেলল হাতের ছোট রুমালটায়। তারপর যেমন করে মানুষ নিজেকে তুলে দেয় ভাগ্যের হাতে, তেমনিভাবেই অতীশকে অনুসরণ করলে।

চায়ের একটা মনোমত দোকান পাওয়া গেল বড় রাস্তা পেরিয়ে।

সময়টা অসময়। দোকানে লোক ছিল না। তবু পুরোনো জীর্ণ নীল পর্দা সরিয়ে দুজনে একটা কেবিনেই ঢুকল। মাথার উপর পাখাটা খুলে দিয়ে বয় বললে, "কী চাই ?"

"কিছু খাবে মন্দিরা ?"

ভয়-ধরা ফিসফিসে গলায় মন্দিরা বললে, "কিছু না।"

"শুধু চা ?"

"শুধু চা।"

বয় চলে গেল। মন্দিরা আঁচড় কাটতে লাগল চায়ের দাগধরা ময়লা টেবিল-ক্লথটার উপর। অতীশ মন্দিরার মাথার পাশ দিয়ে পিছনের কাঠের দেওয়ালটাকে দেখতে লাগল।

কিছুক্ষণ। তারপর ঃ

"তুমি কি আজ আমার খোঁজেই গিয়েছিলে মন্দিরা ?"

তীক্ষ্ন জড়তাহীন প্রশ্ন। মন্দিরা ত্রস্ত চোখ তুলল।

"এ-কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন ?"

"দরকার আছে বলেই বলছি। সত্যিই কি আমার খোঁজে তুমি গিয়েছিলে ?"

মন্দিরা পাংশু মুখে বললে, "আপনি কী বলছেন আমি ঠিক—"

"বুঝতে পারছ না ? অতীশ হিংস্র হাসি হাসল ঃ "কার জন্যে গিয়েছিলে তুমিই জানো। কিন্তু এটাও ঠিক যে, আমি না থাকাতেও তোমার কোনো অসুবিধে হয়নি। শ্যামলাল ছিল, কী বলো ?"

ভয়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে মন্দিরা হঠাৎ যেন রুখে দাঁড়াল।

"তাতে কী অন্যায় হয়েছে ? তিনি আমার মাস্টারমশাই।"

বয় চা দিয়ে গেল। তার চলে যাওয়া পর্যন্ত নিজের ভিতরে বন্য ক্রোধ-টাকে কোনোমতে সংযত করে রাখল অতীশ। তারপরে চাপা গলায় যতটা সম্ভব বিদীর্ণ হয়ে পড়ল।

"কিন্তু আমি বলব, শ্যামলালের সঙ্গে মেলামেশায় এখন তোমার সতর্ক হওয়া দরকার।"

মন্দিরার গাল রাঙা হয়ে উঠল, নিঃশ্বাস পড়তে লাগল দ্রুত। চায়ের পেয়ালা তুলেছিল, নামিয়ে রাখল।

"আপনি আমার অভিভাবক?"

"এখনো নই। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই হতে পারি। বোধ হয় জানো, দু বছর ধরে তোমার বাবা আমাদের মধ্যে বিয়ের কথা ভাবছেন। তিনি আমায় প্রস্তাবও পাঠিয়েছেন। আমি আসছে আটাশ তারিখে চাকরি নিয়ে এলাহাবাদে চলে যাব, তার আগেই বিয়েটা সেরে নিতে চাই।"

"আমার ইচ্ছে বলে কিছু নেই?"

অতীশ কঠিন ভাবে হাসল: "না, তোমার বাবার ইচ্ছেই চরম।"

যেটুকু জ্বলে উঠেছিল, তার দ্বিগুণ নিভে গেল মন্দিরা। যেন অতল জলে ডুবে যাচ্ছে, এমনি চোখ মেলে তাকিয়ে রইল অতীশের দিকে। ঠোঁট দুটো আবার থর-থর করে কাঁপল, অস্পষ্টভাবে শোনা গেল, "কিন্তু—"

"আমিও অপেক্ষা করে আছি। তুমি একসময় আভাস দিয়েছিলে, আমাকে তুমি ভালোবাসো।"

মন্দিরা বসে রইল নিথর হয়ে। অতীশ উগ্র চোখে তাকে দেখতে লাগল। একটা অদ্ভুত আনন্দ পাচ্ছে সে, হাতে-পাওয়া শিকারকে তিলে তিলে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করার আনন্দ।

মন্দিরা আবার শক্তি ফিরিয়ে আনল প্রাণপণে।

"কিন্তু আপনি তো সুপ্রিয়াকে—"

"ওটা ক্রোড়পত্র। তেমনি তুমিও ভালোবেসেছিলে শ্যামলালকে। আমার জীবন থেকে সুপ্রিয়া চলে গেছে, তোমার জীবন থেকেও শ্যামলালকে চলে যেতে হবে।"

"আপনি আশ্চর্য নিষ্ঠুর।" মন্দিরার গাল বেয়ে জলের একটা ফোঁটা নেমে এল।

অতীশ হাসল, তিক্ত বিষাক্ত হাসি।

"কিন্তু আদর্শ সুপাত্র। আমাকে কন্যাদান করে মল্লিক সাহেব সুখীই হবেন। তুমিও। আজকে যে কাঁটাটা বুকের মধ্যে বিঁধছে, দু দিন পরে তার অস্তিত্বও খুঁজে পাবে না কোথাও।"

মন্দিরা আর সহ্য করতে পারল না। ছট্‌ফট করে উঠে দাঁড়াল।

"আমি আর চা খাব না। চললাম।"

"আচ্ছা, যাও। কিন্তু আজই তোমার বাবার সঙ্গে আমি দেখা করব। আশা করি, দশ-বারো দিনের মধ্যেই তিনি রেডি হতে পারবেন, কারণ এর পরে এলাহাবাদ থেকে চট করে চলে আসা আমার পক্ষে শক্ত হবে।"

মন্দিরা বেরিয়ে চলে গেল। বোধ হয় চোখের জল মুছতে মুছতেই। চায়ের দোকানের ছোকরাটা একটা কিছু অনুমান করে পর্দা সরিয়ে কৌতূহলী

গলা বাড়াল। আর সঙ্গে সঙ্গে বজ্রের মতো গর্জে উঠল অতীশ।

"কী দেখতে এসেছিস ? থিয়েটার ?"

সভয়ে পালিয়ে গেল ছেলেটা।

চায়ের পেয়ালা তুলে অতীশ চুমুক দিলে। কটু বিস্বাদ চা। রেবার এগিয়ে দেওয়া চায়ের মতোই অসহ্য গরম। পৃথিবীর সমস্ত চা-ই কোনো একটা প্রাকৃতিক কারণে আজ অপেয় হয়ে গেছে।

দুই

গীতা এসে বলেছিল, "এটা বাড়াবাড়ি। এত রাতে চাকরগুলোকে জাগিয়ে এভাবে সীন ক্রিয়েট না করলেও চলত।"

সুপ্রিয়া জবাব দেয়নি। খুলে বলেনি কোনো কথা। বলেও কোনো লাভ হবে না। দীপেন সম্পর্কে গীতার একটানা পক্ষপাত।

গীতা ক্রুদ্ধ কটু গলায় আরো বলেছিল, "বাড়ি থেকে পালিয়ে আসবার মতো নার্ভ যার আছে, তার অতটা সেন্টিমেন্টাল হওয়ার কোনো মানে হয় না।"

দীপেন বেরিয়ে গিয়েছিল নিঃশব্দে। মাথা নীচু করে। নেশার ঘোরটা তার কেটে এসেছে ততক্ষণে।

সুপ্রিয়া তেমনি বসে ছিল চুপ করে। আরো অনেকক্ষণ পর্যন্ত।

"ভারতবর্ষের তীর্থে তীর্থে দেবতা আছেন বটে, কিন্তু মানুষ এখনো দেবতা হয়ে যায়নি।" রেবার গলা।

না, দেবতা যে হয়নি, সে-কথা সুপ্রিয়াও বিশ্বাস করে। দেবতা হয়ে গেলে কি মানুষকে সহ্য করা যেত ? অমন দাবি নেই সুপ্রিয়ারও।

কিন্তু তবু—

খালি ঘৃণা হয় দেহটার জন্যে। সে-দেহ মাটি দিয়েই গড়া। মাটির ফুল, মাটির ফল, মাটির আনন্দ, মাটির ক্লেদ—এরাই তার উপকরণ। তবু সেই মাটির উপরে একটা আকাশ আছে, যেখানে সপ্তর্ষি ঝলমল করে, যেখানে আশ্চর্য রঙ দিয়ে আঁকা হয় মেঘের ছবি, যেখানে ছায়াপথের আকাশগঙ্গা ঝরনার মতো নেমে আসে মানস সরোবরে। মাটির ফুলকে ফুটিয়ে তোলো সেই আকাশের বেণীবন্ধ তারায় তারায়, মাটির ফলকে সুধা-সুনিবিড় করে দাও স্নিগ্ধ শিশির-বিন্দু দিয়ে, বর্ষার বিষণ্ণ চক্ররেখাকে উজ্জ্বল করো ইন্দ্রধনুর রঙে। মাটিকে আকাশে ছড়িয়ে দেওয়াই তো আর্টের কাজ। ধুলোর ঘূর্ণিকে নীহারিকায় রূপায়িত করার নামই তো শিল্প।

আর দেহ ? তার কামনা হোক প্রেম, তার আশা হোক আদর্শ, মাটির দাবি চরিতার্থ হোক হেমন্তের হিরণ্যে। তার দেহকে সেই শিল্পীর চোখ দিয়েই দেখুক দীপেন। নারী হোক মোনালিসা, বাসনা ব্যাপ্ত হোক মুন-লাইট সোনাটায়। সেই ভাবের চোখ নিয়ে যদি কোনদিন দীপেন তাকে দেখত—তা হলে নিজের সব কিছু নিঃশেষে সঁপে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করত না সুপ্রিয়া।

কিন্তু কোথায় সেই চোখ ? কার আছে ? কোথায় সেই শিল্পীর আঙুল,

যা মাটির সেতারে বাজিয়ে তুলবে রাগ জয়-জয়ন্তী ?

অথবা তারই দোষ। হয়তো তার নিজের প্রচ্ছদপটটাই এত বেশি উজ্জ্বল, এত বেশি তার প্রলুব্ধি যে তাকে ছাড়িয়ে ভিতরে কেউ যেতে পারল না। কেউ না। দীপেনও নয়। এ লজ্জা তো তারই।

শব্দ করে দরজা বন্ধ হল একটা। দীপেনের ঘরেই। নিজের উপর অভিমানেই হয়তো শক্ত করে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে সে। আত্মরক্ষা করতে চায়। কী গ্লানি—কী অসহ্য গ্লানি।

অনেকদিন পরে সুপ্রিয়ার একটা প্রশ্ন জাগল নিজের কাছে। সে যদি কালো হত ? অসাধারণ কুৎসিত ? তা হলেও কি দীপেন এমন করে কাছে টানত তাকে ? বলত, "তোমার গলায় আমার না-পাওয়া সুরগুলো ধরা দিয়েছে, তুমি আমার গীতলক্ষ্মী ?" বলত, "তোমার বাইরের রূপ আমি দেখিনি, দেখছি অন্তরের ঐশ্বর্যভান্ডার, যেখানে তুমি অনন্যা ?"

বলতে পারত দীপেন ?

প্রচ্ছদপট। হয়তো প্রচ্ছদপটটাই একমাত্র সত্যি। সুপ্রিয়ার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল।

বারান্দায় গানের আওয়াজ। কে যেন গেয়ে চলেছে। গীতাই খুব সম্ভব। কান পাতল সুপ্রিয়া ঃ

"এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর।
তেরো চরণপর শির নাবেঁ।
সেবক জনকে সেব সেব পর,
প্রেমী জনাঁকে প্রেম প্রেম পর,
দুঃখী জনাঁকে বেদন বেদন
সুখী জনাঁকে আনন্দ এ——"

ভজন গাইছে গীতা। তার নিজের ভাষায়, বিশেষ ধরনের সুরে। কেমন আশ্চর্য কোমল, কেমন অশ্রুসিক্ত। কোথায় একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে এর। ঠিক এখানে এই গান যেন মানায় না। বহুদিন পার হয়ে বহু দূরে থেকে এর সুরটা ভেসে আসছে যেন।

সুপ্রিয়া জানত না, এ-গান গীতা শেষবার শুনেছিল অমৃতসরের গুরুদ্বারে।

"ক্যায়সে চাঁদনী রাত প্যারে—"

প্লে-ব্যাক। হিন্দী ছবির গান। খুব সম্ভব উদ্‌গীর্ণ হবে কোনো নৃত্য-পটীয়সী নায়িকার ওষ্ঠস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে।

পিছনে সারি সারি বাদ্যযন্ত্রের উগ্র ঝঙ্কার। সামনে মাইক্রোফোন। মিউজিক ডিরেক্টরের নির্দেশ ঃ "মনিটার।"

"ক্যায়সে চাঁদনী রাত—"

সাউন্ড ট্রাকের প্রতিধ্বনি ঃ "ও-কে—ও-কে।"

"টেক—"

গান শেষ হল।

“চমৎকার হয়েছে রেকর্ডিং।” অভিনন্দন জানালেন ডিরেক্টর।

মিউজিক ডিরেক্টরের মাথা নড়ল সঙ্গে সঙ্গে। দীপেনের পুরোনো বন্ধু। তারই অনুরোধে সুযোগ দিয়েছেন সুপ্রিয়াকে।

“শুধু হিট্ নয়—সুপার হিট্ হবে এই গান।”

সুপার হিটের অর্থ খুব সহজ। বাড়ির রোয়াকে। হাটে বাজারে। পুজো-পার্বণের অ্যামপ্লিফায়ারে।

সুপ্রিয়া বসে রইল ক্লান্তভাবে। সুপার হিট্। ঠিক এই জন্যেই কি এত দূরে ছুটে আসা? এই জাপানী খেলনার বেসাতি? মন্দিরের বাইরে যেখানে মেলার বেচা-কেনা, সেখানে রঙিন বেলুনের পশরা সাজিয়ে বসা?

দীপেন বলেছে, “কী করা যায় বলো। ভালো গান তো তুমি শিখবেই। কিন্তু টাকারও দরকার আছে। আর. অনেক বড় বড় গুণীকেও বাগানবাড়িতে গিয়ে আসর জমিয়ে বসতে হয়। তোমাকে একটা গল্প বলি—”

গল্পটা শুনেছে সুপ্রিয়া। একটা নয়, পর পর অনেকগুলো। বহু দিকপাল ওস্তাদকেই চুটকি গজল আর খেম্‌টা শোনাতে হয়েছে স্বর্ণগর্দভ মাতালের জলসায়। কিছুটা মানিয়ে নিতে হবেই জীবনের সঙ্গে। নইলে দীপেনই কি আসত এত দূরে, সিনেমার বইতে চটুল সুর দেবার জন্যে?

হয়তো তাই। কিন্তু সুপ্রিয়ার মন সাড়া দেয় না। কোথায় কী যেন অশুচি হয়ে যাচ্ছে। মন্দিরের বাইরে বসে রঙিন বেলুনের বেসাতি। দোকানে বসে লাভ-লোকশানের হিসেব করতে করতে সময় ফুরিয়ে যাবে কি না কে জানে! তার পরে বিগ্রহ দর্শনের সুযোগও হয়তো আর ঘটবে না।

চেক আর ভাউচার নিয়ে এলেন প্রোডাকশন ম্যানেজার। টাকার অঙ্কটা তুচ্ছ করবার মতো নয়, একবার ভালো করে সেটা না দেখে থাকতে পারল না সুপ্রিয়া।

আয়ার এল। মিউজিক ডিরেক্টরের অ্যাসিস্টান্ট।

“মিস্টার আয়ার, এবার আমায় যেতে হবে।”

আয়ার বললে, “চলুন রেডি। আমার গাড়িতেই পৌঁছে দেব আপনাকে।”

স্টুডিয়ো থেকে বেরিয়ে গাড়ি ছুটল তীরবেগে।

আয়ার পাশেই বসে ছিল। একটা সিগারেট রোল করে বললে, “মিস্ মজুমদার!”

“বলুন।”

“এখনি ফিরবেন? তার চাইতে চলুন না আমার ফ্ল্যাটে। কফি খেয়ে আসবেন।”

“আপনার ফ্ল্যাটে?” সুপ্রিয়া চকিত হয়ে উঠল।

আয়ার হাসল। কালো রঙ, কোঁকড়া চুল, বুদ্ধিতে মুখ উদ্ভাসিত। সিগারেটটা ঠোঁটে ছুঁইয়ে বললে, “ভাববেন না কিছু। সেখানে আমার মা আছেন। আলাপ করিয়ে দেব তাঁর সঙ্গে।”

"আপনার স্ত্রী ?"

উইণ্ডস্ক্রীনটা নামিয়ে দিতে দিতে আয়ার আবার হাসল।

"তিনি এখনো এসে জোটেননি। মানে আমিই জোটাতে পারিনি। কিন্তু তাতে কোনো ক্ষতি নেই।" প্রসন্ন পরিতৃপ্ত গলায় আয়ার বললে, "বাড়িতে আমার মা রয়েছেন। তাঁর হাতের তৈরি কফি বিখ্যাত। তা ছাড়া আমরা বম্বে মার্কেটের কফি খাই না। নিয়ে আসি নিজের দেশ নীলগিরি থেকে।"

চমৎকার সাদা আয়ারের দাঁতগুলো। টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করবার মতো।

"আসবেন আমাদের ওখানে ?"

"বেশি দেরি হবে ?"

"না—না—পনেরো মিনিট। জাস্ট।"

ছোট বাংলো ধরনের বাড়ি বোম্বাইয়ের শহরতলিতে। সামনে একটুখানি লন। কিছু ফুল। গোছানো, ছিমছাম। আয়ার গুণী মানুষ, বুঝতে কষ্ট হয় না।

আয়ারের মা এলেন। পঞ্চাশ পেরিয়েছে বয়েস। মাথার চুলে পাক ধরেছে। গম্ভীর শান্ত চেহারা।

"মা, ইনি আমাদের ছবির নতুন ভোকাল আর্টিস্ট। খুব ভালো গলা, দারুণ প্রমিসিং।"

মা হাসলেন। ঝরঝরে পরিষ্কার ইংরেজীতে কথা বললেন।

"বেশ বেশ, ভারী সুখী হলাম।"

"কফি খাওয়াও। তোমার হাতের নীলগিরি কফি। সেই জন্যেই ডেকে এনেছি। কিন্তু দেরি করতে পারবে না, ঠিক পনেরো মিনিটের মধ্যে।"

"দিচ্ছি।" মা ভিতরে চলে গেলেন।

আয়ার বললে, "জানেন, মা আমার একটুও খুশি নন।"

"কেন বলুন তো ?"

"আমার বাবা ছিলেন আই-সি-এস। দাদা ফরেন সার্ভিসে। মা চেয়েছিলেন আমিও অমনি একটা কিছু দিকপাল হয়ে পড়ি। কিন্তু এই গানই আমার সর্বনাশ করল। আমাদের পরিবারে যা কখনো হয়নি, আমি তাই করলাম। অর্থাৎ বি-এ ফেল করলাম দু-দুবার। দাদা তো আমার মুখ দেখাই বন্ধ করলেন। কিন্তু আমি গান ছাড়িনি।" আয়ার একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল ঃ

"অবশ্য তার পরিণাম এই ফিল্মে। কী বলেন, ভুল করেছি নাকি ?"

সুপ্রিয়া মৃদু নিঃশ্বাস ফেলল, "জানি না।"

এমনি করে গান তো অনেককেই ঘরছাড়া করেছে। অনেকেই ছুটে এসেছে তীর্থদেবতার আহ্বানে। তারপর ? কে কতখানি পেয়েছে, কতটাই বা সিদ্ধিলাভ করেছে ? ব্যাগের ভিতরে চেকটা যেন খসখসিয়ে সাড়া দিয়ে উঠল, সুপ্রিয়াকে কী একটা বলতে চাইল অবোধ্য ভাষায়।

আয়ারও একটা নিঃশ্বাস ফেলল, "ঠিক কথা, আমিও জানি না। কিন্তু কেবল ক্ল্যাসিক্যাল শেখবার আশায় ছুটোছুটি করলে তো আর পেট চলবে না। রোজগার আমাকে করতেই হবে।"

দীপেনও এই কথাই বলেছিল। সুপ্রিয়া যেন হঠাৎ অনুভব করল ঃ স্বপ্নের দরজা সব সময়েই খোলা আছে, কিন্তু জীবন অত সহজেই পথ ছেড়ে দেয় না। তার দুর্গাশঙ্করের কথা মনে পড়তে লাগল। অনেক কষ্টেই তাঁর চলে। অথচ এখানকার অনেক বড় বড় মিউজিক ডিরেক্টর যারা তাঁর পায়ের কাছে বসে গান শিখতে পারত, তাদের বাড়ি-গাড়ি-ব্যাঙ্ক ব্যালান্স দেখলে—

সুপ্রিয়ার কেমন অস্বস্তি লাগতে লাগল। পায়ের তলায় যে সোজা পথটা সে দেখেছিল চলন্ত বম্বে মেলে বসে, সেটা এখন লুপের মতো বাঁক নিচ্ছে, কুণ্ডলী পাকাচ্ছে সাপের মতো। তীর্থেও পারানি চাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই পারানিই কি একান্ত হয়ে ওঠে? তারই হিসেব করে তীর্থদর্শন ফুরিয়ে যায়?

সবচেয়ে বড় কথা, আগে বাঁচা চাই। ক্ষিদেয় গলা চিঁচি করলে যা বেরিয়ে আসে, তা আর যাই হোক, তাকে গান বলে না। আয়ারের দোষ নেই, দীপেনেরও না। মিথ্যে কেন খুঁতখুঁত করে সুপ্রিয়া?

আয়ারও চুপ করে কী ভাবছিল। চোখ তুলল।

"জানেন, একটা ছবিতে আমি ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্ট চান্স পাচ্ছি এবার।"

"সে তো খুবই ভালো কথা।"

"আপনি আমায় সাহায্য করবেন?"

"আমি? আমি কী করতে পারি?"

"আপনাকে এরা পুরো ইউটিলাইজ করে না। কিন্তু দেখবেন, আমি করব। আমি জানি, সোনার খনি আছে আপনার গলায়। এমন গান গাওয়াব আপনাকে দিয়ে যে এখানকার ঝানু প্লে-ব্যাক আর্টিস্টেরাও একেবারে ম্লান হয়ে যাবে!"

আয়ারের চোখ দুটো উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। নতুন সৃষ্টির আনন্দে? সুপ্রিয়া কেমন সংকুচিত বোধ করল। এমনি করে তার দিকে তাকিয়ে এমনি কথা দীপেনও বলেছিল তাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী দশা হয় পিগম্যালিয়নের?

কিন্তু সত্যিই গান? না এখানেও সেই প্রচ্ছদপট? সুপ্রিয়া ভাবল, একটা কোনো অ্যাকসিডেন্টে তার সমস্ত মুখটাই যদি পুড়ে বীভৎস কালো হয়ে যায়, তাহলেও কি আয়ার এ-কথা তাকে বলবে? দেখতে পাবে তার গলার সোনার খনি?

আয়ারের মা ফিরে এলেন।

কফির পেয়ালা। কিছু বাদাম। ইডিলি।

"আচার দিলে না মা?"

"সে ওরা খেতে পারবে না। ভয়ঙ্কর ঝাল লাগবে।"

"তাও তো বটে।" আয়ার হেসে উঠল. "আচ্ছা, তবে খানকয়েক বিস্কুট নিয়ে আসি—"

"না—না—দরকার নেই—" সুপ্রিয়া প্রতিবাদ করল। আয়ার কথা শুনল না, উঠে গেল চেয়ার ছেড়ে।

বিস্কুট খুঁজতে দু-তিন মিনিট দেরি হল আয়ারের। তার মধ্যেই গল্প জমিয়ে ফেললেন মা।

"বিয়ে করোনি, না ?"

মাথা নিচু করে সুপ্রিয়া ঘাড় নাড়ল।

আই-সি-এসের গিন্নী গম্ভীর হয়ে গেলেন, "কী যে তোমরা হয়েছ আজ-কালকার ছেলেমেয়ে! আমার ছেলেটাকেও রাজী করাতে পারছি না। অথচ ফিল্মে কাজ করে, ভারী খারাপ লাগে আমার। জায়গাটা তো ভালো নয়! শেষে—"

কিছুক্ষণ সুপ্রিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখলেন তিনি।

"তোমাদের আলাপ কতদিন ?"

"মাস দেড়েক

"ও!" একটু চুপ করে থেকে ভদ্রমহিলা বললেন, "ছেলে বলছিল, বাঙালী মেয়েদের ওর ভারী পছন্দ। সুবিধেমত মেয়ে পেলে ও বাঙালীই বিয়ে করবে। আমরা অবশ্য একটু কনজারভেটিভ, তা হলেও ছেলে যদি চায়—"

কফিটা আটকে গেল গলায়। সুপ্রিয়া বিষম খেল।

আয়ার ফিরে এল। যেন একটা দুঃসাধ্য কিছু করে ফেলেছে, এমনি মুখের চেহারা।

"উঃ, কোথায় রেখেছিলে বিস্কুটের টিন। প্রায় রিসার্চ করে খুঁজে আনতে হল আমাকে।" একমুখ হাসি নিয়ে আয়ার সশব্দে টিনটা টেবিলে রাখল, "নিন, আসুন—"

সুপ্রিয়া বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল। বললে, "বিস্কুট থাক। পনেরো মিনিট কিন্তু হয়ে গেছে আপনার। এবার আপনার কফিটা শেষ করে আমাকে পৌঁছে দেবেন চলুন।"

আয়ার নিভে গেল। স্তিমিত হয়ে গেল এতক্ষণের উৎসাহ।

"সরি, কিছু মনে করবেন না।"

তিন

গান চলছিল গুরুদ্বারে।

"এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর!
তেরো চরণপর শির নাবেঁ—"

মাথা নিচু করে বসে আছে ভক্তের দল। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

কে বলবে, জীবন আছে, জীবিকা আছে? কে বলবে, অনেক দুঃখ, অনেক গ্লানি, অনেক মিথ্যার মধ্য দিয়ে মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়? এই বিশাল দরবারে খেলছে সুরের ঢেউ। ভক্তের বুকে দুলছে আনন্দের তরঙ্গ। কোনো ব্যথা নেই, কোনো শোক নেই, কোনো পরাজয় নেই কোথাও। জীবন

আর জীবিকা বহু দূরের মরীচিকা হয়ে মিলিয়ে গেছে এখন।

আনন্দ—অমৃত।

গুরু সেই আনন্দের সন্ধান পেয়েছিলেন, পেয়েছিলেন অমৃতের সংবাদ। মানুষকে তা দান করতে চেয়েছিলেন দু-হাতে। কিন্তু অত সহজে দিতে পারেননি। আঘাত এসেছে, দুঃখ এসেছে, রক্ত ঢেলে দিতে হয়েছে বুক থেকে, ঘাতকের কুঠারে ছিন্ন মুণ্ড গড়িয়ে পড়েছে মাটিতে।

তবু গুরু শুনিয়েছেন শেষ কথা। আনন্দের বার্তা, অমৃতের মন্ত্র। মলিন মৃত্তিকা পবিত্র রক্তরেখায় কৃতকৃতার্থ হয়ে'গেছে। ভক্তের কণ্ঠে সুরের ঝঙ্কার বেজে চলেছে ঃ

"বনা-বনামে সাবল সাবল,
গিরি-গিরিমেঁ উন্নিত-উন্নিত,
সরিতা-সরিতা চঞ্চল চঞ্চল,
সাগর-সাগর গম্ভীর এ।"

সবই তো তার। অরণ্যের শ্যামশ্রী, আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়ের চূড়া, খর-স্রোতা নদীর প্রবাহ, গম্ভীর সাগর, সব বয়ে আসছে একই আনন্দের উৎস থেকে। প্রাণ পাচ্ছে, গতি পাচ্ছে। পল্লবিত, বিকশিত হয়ে উঠছে।

"চন্দ্র সূরয বরৈ নিরমল দীপা,
তেরো জগ-মন্দির উজাড় এ—
এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর,
তেরো চরণপর শির নাবেঁ—"

গুরু-দরবার হয়ে যায় বিশ্বমন্দির। তার চূড়া ছড়িয়ে পড়ে নীলকান্ত আকাশে, ত্রিভুবনব্যাপী মহাবিগ্রহের এই মহামন্দিরকে আলো করে জ্বলে অনির্বাণ চন্দ্র-সূর্য। "এ হরি সুন্দর—"

ওস্তাদের তানপুরা থামে। সুর থামে না। ভক্তেরা অশ্রু-চোখে বসে থাকে ছবির মতো। অনেকক্ষণ।

বাবা প্রণাম করেন ওস্তাদজীর পায়ে।

"এ দুটি আমার মেয়ে। এটি প্রেম, এ সূরয।"

স্নেহস্নিগ্ধ চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন ওস্তাদজী। বিশেষ করে তাঁর চোখ আটকে থাকে বড় মেয়েটির উপরে।

"এদের আশীর্বাদ করুন।" বাবা বলেন।

"আমি কী আশীর্বাদ করব ? গুরুই এদের আশীর্বাদ করবেন। তিনিই তো আমাদের ভরসা।"

"ভারী ভাবনা হয়। সামান্য ব্যবসা আমার। ছেলে নেই—এ দুটি মেয়েকে—"

ওস্তাদজী জবাব দেন, "ভাবনা নেই, কোনো ভাবনা নেই। গুরু আছেন মাথার ওপর। এটি প্রেম ? আহা, দেখলে জুড়িয়ে যায় চোখ। আর এর নাম সূরয ? বাঃ, ভারী সুলক্ষণা! তুমি কি ভাবতে পারো এদের কোনো

অকল্যাণ হবে কোনোদিন।"

বিশ্রী শব্দে করোগেটেড-টিন-বোঝাই একটা লরি চলে গেল সামনে দিয়ে। গীতা চমকে উঠল। কতক্ষণ ধরে সে দাঁড়িয়ে আছে এইভাবে? কতক্ষণ ধরে সে গুরু-দরবারের স্বপ্ন দেখছিল?

সামনে বোম্বাইয়ের বিখ্যাত কালো ঘোড়া। একটা বিরাট-বিশাল উদ্ধত মূর্তি। চন্দ্র-সূর্যের নির্মল দীপকে যেন স্পর্ধা করছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ট্রাফিকের কর্কশ চিৎকার। সোনার মন্দির এখান থেকে বহু দূরে। ওস্তাদজীর তানপুরা এতদিনে কোথায় ধুলোর মধ্যে মিলিয়ে গেছে। আর তাঁর আশীর্বাদ? এদের কি অকল্যাণ হবে কোনোদিন?

গীতা জেগে উঠল। দুরুদুরু করে কেঁপে উঠল বুক।

চারটে বাজতে আরো দশ মিনিট। পালাবে! পালিয়ে যাবে সময় থাকতে থাকতে?

"চারটের সময় দেখা কোরো কালো ঘোড়ার সামনে। ডানদিকের ফুট-পাথে। আমি আসব।"

চিঠিটা পেয়েই প্রথমে বুকের স্পন্দন যেন থমকে গিয়েছিল গীতার। ভেবেছিল, চরম লজ্জা, চরম পরাজয়ের খবর বয়ে এনেছে এই চিঠি। কিছুতেই সে দেখা করবে না। তার আগে মাটিতে মুখ লুকিয়ে মরে যাবে।

তবু ঠিক তিনটে বাজতে না বাজতেই সে উঠে পড়ল। দু কান ভরে বাজতে লাগল—"চন্দ্র সূর্য নিরমল দীপা।" সেই গান তাকে পথ ভুলিয়ে নিয়ে এল এখানে। নিয়ে এল তার প্রথম-ফোটা দিনগুলির ভিতরে।

মন শেষ চেষ্টা করেছিল। ছুটে যেতে চেয়েছিল ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে। ভেবেছিল সামনে যে-ট্রেনটা পাবে, তাতেই উঠে পড়বে। যে-কোনো মেল, যে-কোনো লোক্যাল।

সোহনলালের চিঠি। এই চিঠির প্রতিটি লাইনে লাইনে বাজছে ঃ "এ হরি সুন্দর!" আর সেই সঙ্গে—

কলেজ-সোশ্যাল শেষ হলে একফাঁকে আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সোহনলাল। ইংরেজীর তরুণ অধ্যাপক সোহনলাল। প্রায় রুদ্ধগলায় বলেছিলেন, "এই ফুলটা তোমায় দিলাম, প্রেম! আজকে এর চাইতে বড় তোমায় আর কিছু দিতে পারব না।"

একটা ফুটন্ত ম্যাগনোলিয়া।

কিন্তু প্রেম! তার নাম! যে নাম ছিল জন্ম-জন্মান্তরের ওপারে ঃ যে-নাম শুনে তার মুগ্ধ চোখে চেয়েছিলেন ওস্তাদজী, আর যে-নামে তাকে জানতেন প্রোফেসার সোহনলাল, যে-নামে তাকে তিনি ভালোবেসেছিলেন।

"এ ফুল শুকিয়ে যাবে, প্রেম। কিন্তু এই ফুলের সঙ্গে যা দিলাম, তা কোনো দিন শুকোবে না।"

মনে হয় যেন কালকের কথা। এর মধ্যে কিছুই ঘটেনি, কিছুই না। সেই দাঙ্গা, সেই রক্ত। অবিশ্বাস্য দুঃস্বপ্নের বীভৎসতা দিয়ে ভরা সেই দেড়

বছর। তার পরে আর এক পথ, বাঈজীর জীবন। গীতা কাউর। এরা কোথাও নেই, কোথাও ছিল না। শুধু সেই আঠারো বছরের প্রেম প্রথম ফোটা একটি ম্যাগনোলিয়ার মতো তাকিয়ে আছে সূর্যের দিকে। ওস্তাদজীর আশীর্বাদ ঝরে পড়ছে মাথার উপর।

গীতা পালাতে পারেনি। দুর্নিবার একটা আকর্ষণ এখানে টেনে এনেছে তাকে।

নাচের আসরে তাকে দেখে ঠিকই চিনেছিলেন সোহনলাল, তাঁর অভিজ্ঞ চোখ ভুল করেনি।

আসবে না, কিছুতেই আসবে না, ভেবেছিল বার বার। তবুও তাকে আসতে হয়েছে। এত ঝড় বয়ে গেছে, এত মানুষের কলুষিত ছোঁয়া তাকে চিহ্নিত করে দিয়েছে, তবু তো মনের ভিতর এমন একটা আসনে বসেছিলেন সোহনলাল যেখানে এর কিছু গিয়েই পৌঁছতে পারেনি। সেখানে আঠারো বছরের ভালোবাসা একটা নিভৃত মন্দির গড়ে রেখে দিয়েছে। সে-মন্দির এতকাল লুকিয়ে ছিল ধুলোকাদা-মাখা আবরণের অন্তরালে। আজ সে আবরণ সরে গিয়ে আবার সেই মন্দির দেখা দিল, আর দেখা দিল শ্বেত পাথরের বেদীতে সোহনলালের বিগ্রহ-মূর্তি। তাঁর পায়ে মাথা লুটিয়ে দিয়ে মন বলতে লাগল : "তেরো চরণপর শির নাবেঁ—"

কালো ঘোড়াকে ঘিরে ঘিরে ট্রাফিকের কর্কশ ছন্দ। ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি-সাইকেল-পদাতিক। গীতা দাঁড়িয়ে রইল। এখনো তিন মিনিট। এখনো পালিয়ে যাওয়া চলে। ছুটে যাওয়া যায় ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে—উঠে পড়তে পারে যে কোনো একটা গাড়িতে। ক্যালকাটা মেল, দিল্লী মেল, মাদ্রাজ মেল—

গীতা পালাতে চাইল, কিন্তু প্রেম তাকে ধরে রাখল কঠিন হাতে। গীতার চাইতে আজ প্রেমের শক্তি অনেক বেশী।

পাশে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। একেবারে তার গা ঘেঁষেই। গীতা চমকে সরে গেল।

ট্যাক্সির দরজা খুলে সোহনলাল বললেন, "প্রেম !"

সময় তখনো ছিল। কিন্তু গীতা কাউরকে প্রেম কাউর কিছুকেই পালাতে দিলে না। "তেরো চরণপর—"

সোহনলাল আবার বললেন, "এসো।"

গীতা গাড়ির মধ্যে পা বাড়াল।

জুহুর নারকেল-বীথির মর্মর, অবিশ্রান্ত হাওয়া, সমুদ্রের কলধ্বনি, তরল অন্ধকার। আকাশের তারাগুলোর মুখের উপর মেঘের ঘোমটা থমথম করছে।

কাহিনী শেষ করে গীতা তখনও কাঁদছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। সোহনলাল সহানুভূতির দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, কয়েকটা কাঠি নষ্ট করে চুরুট ধরালেন একটা।

"দিস্ ইজ লাইফ!" দার্শনিকের মতো বললেন সোহনলাল। এর চাইতে ভালো কথা আপাতত কী বলা যায় আর। অথচ কথাটা যে অত্যন্ত কর্কশ শোনাল সোহনলাল নিজেই সেটা অনুভব করলেন।

নারকেল-পাতার মর্মর আর সমুদ্রের গর্জন চলল আরো কিছুক্ষণ। গীতা মুখ তুলল। কেঁদে কী লাভ? কী হবে সোহনলালের সহানুভূতি কুড়িয়ে? ভাঙা কাচ তাতে জোড়া লাগবে না। এখন কেবল একবার প্রণাম করেই সে ফিরে যাবে।

গীতা বললে, "আপনি বিয়ে করেছেন?"

"বিয়ে?" সোহনলাল কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন, "হ্যাঁ, তা আর কী করা যাবে! আমি ভেবেছিলাম, তুমি মরেই গেছ—তাই শেষ পর্যন্ত—"

ঠিক কথা, সোহনলালের কোনো দোষ নেই। শারীরিক মৃত্যু যদি না-ও হয়ে থাকে তবু তো সত্যিসত্যিই মরে গেছে প্রেম কাউর। জীবনে আসবার আগেই যে মরে গেছে, তার জন্যে বসে কেন কৃচ্ছ্রসাধন করতে যাবেন সোহনলাল?

"ছেলেপুলে?"

সোহনলাল আরো অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।

"হয়েছে, দুজন।"

"দুটিই ছেলে?"

"না—এক মেয়ে, এক ছেলে।"

কিন্তু এ সব প্রশ্ন কেন জিজ্ঞাসা করছে গীতা? জেনে তার কী হবে? এর ভেতরে সে কি নিজের কল্প-কামনাই মেটাতে চায়? সোহনলালের কাছে গিয়ে সে কী পেতে পারত, তাই শুনে মনের বুভুক্ষা তৃপ্ত করতে চায় খানিকটা?

সোহনলালের চুরুটের আগুন কণায় কণায় বাতাসে উড়ে যেতে লাগল। কড়া তামাকের গন্ধ ঢেউয়ের মতো এসে আছড়ে পড়তে লাগল গীতার মুখের উপর।

জিজ্ঞাসা করবে না মনে করেও কিছুতেই লোভ সামলাতে পারল না গীতা।

"ওদের আনেননি এখানে? বম্বেতে?"

"নাঃ।" সোহনলাল বললেন, "আমি এসেছি অন্য ব্যাপারে, একটা ইন্টারভিউ দিতে। আজকেই ফিরে যেতাম। কিন্তু পরশু সন্ধ্যায় তোমার নাচ দেখার পরে সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। শো শেষ হওয়ার পরে তোমার খোঁজ করলাম, পেলাম না। তখন ঠিকানা নিয়ে তোমায় চিঠি দিলাম।"

"গেলেই তো পারতেন আমার কাছে।"

"ইচ্ছে করেই গেলাম না।" সোহনলাল চুরুটে একটা টান দিলেন, "জানোই তো, আমরা প্রফেসর মানুষ, সব দিক আমাদের একটু সামলে-টামলে চলতে হয়। হয়তো বম্বেতেও আমার ছাত্র আছে এদিকে-ওদিকে। তারা যদি কেউ দেখত যে আমি বাঈয়ের বাড়িতে যাচ্ছি—"

গীতার হাতে আগুনের মতো কী একটা এসে পড়ল। চুরুটের খানিকটা মোটা ছাই। এতক্ষণের অবসন্ন কাতর শরীরটা মুহূর্তের মধ্যে শক্ত আর সজাগ হয়ে উঠল।

সোহনলাল বললেন, "জানো প্রেম, আমি তোমাকে আজও ভালোবাসি।"

একটু আগে, মাত্র আর একটু আগেই কথাটা বললে গীতার বুকের ভেতরে সামনের সমুদ্রের মতোই ঢেউ উঠত। কিন্তু কানের ভিতরে তখনো কথাটা বাজছে—'বাঈয়ের বাড়ি'। সম্মানের ভয়ে, ছাত্রদের চোখে নেমে যাওয়ার আশঙ্কায় সেখানে যেতে পারেননি সোহনলাল। তাই চিঠি দিয়ে যোগাযোগ করেছেন, তাই তাকে অপেক্ষা করতে বলেছেন কালো ঘোড়ার সামনে। হাতের যেখানে ছাইটা এসে পড়েছিল, সে জায়গাটা যেন জ্বলে যেতে লাগল গীতার।

সোহনলাল বললেন, "তুমি কি আমাকে ভুলে গেছ প্রেম ?"

গীতার হাহাকার করে উঠতে ইচ্ছা হল ঃ তা কি পারি ? কিন্তু কিছুই বলল না—বসে রইল দাঁতে দাঁত চেপে। হাতটা জ্বলছে, মাথার ভিতরেও জ্বলছে এখন।

সোহনলাল একবার আড়চোখে গীতার দিকে তাকালেন।

"তুমি আসবে আমার সঙ্গে ?"

গীতা আর থাকতে পারল না। একটু আগেকার অপমানটা তৎক্ষণাৎ খানিক বন্যার উচ্ছ্বাসে ভেসে যেতে চাইল।

"কোথায় যাব ? কোথায় নিয়ে যাবেন আমাকে ?"

"আমি যেখানে থাকি। আমার হোটেলে।"

"তারপর ?"

তারপর ? তারপর কী বলবেন সোহনলাল ? নিজের প্রত্যেকটি হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে মুহূর্ত গণনা করতে লাগল গীতা। একটিমাত্র কথার উপরেই এখন যেন তার সব কিছু নির্ভর করছে। বন্যার শেষ উচ্ছ্বাসটা আসছে আকাশছোঁয়া একটা ঢেউ তুলে।

সোহনলালও দ্বিধা করলেন একটু। চুরুটের আগুনটা ঘন ঘন দীপিত হল বার কয়েক।

"চলো আমার হোটেলে।"

হৃৎপিণ্ডে এবার হাতুড়ি পড়তে লাগল।

"সেখান থেকে কোথায় নিয়ে যাবেন আমাকে ?"

"কোথায় আর নিয়ে যাব ? সে-উপায় তো নেই।" সোহনলাল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন, "তোমাকে একেবারে নিজের করে পাব, এই স্বপ্নই তো আমার ছিল। অন্তত একটা রাতও তুমি থাকো আমার কাছে।"

একটা রাত, মাত্র একটা রাত! তবু এইটুকুই থাক গীতার। অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও আবার ফিরে আসুক প্রেম কাউর। অন্ধকারে আঁকা থাক একটি সোনার রেখা।

"কিন্তু হোটেলে কোনো অসুবিধে হবে না আপনার ?"

সোহনলাল হাসলেন। সামনের বাঁধানো দাঁতের একটা রিং ঝিলিক দিয়ে উঠল।

বললেন, "না। ও-হোটেলে কোনো ক্ষতি হবে না। 'রাতকে রহনেওয়ালী'র ব্যবস্থা ওদের আছে। ওখানে অনেকেই ও-রকম আনে।"

'রাতকে রহনেওয়ালী!' 'অনেকেই ও-রকম আনে!'

কোথা থেকে যেন একটা বন্দুকের গুলি এসে লাগল গীতার কপালে। গুরুদরবারের প্রকাণ্ড বাড়িটা টুকরো টুকরো হয়ে এলিয়ে পড়ল চারদিকে। কী ভেবেছেন তাকে সোহনলাল? তাঁর চোখে আজ নিজের এ কোন্ রূপ দেখতে পেলো গীতা?

অসহ্য, কল্পনাতীত যন্ত্রণায় সে দাঁড়িয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ।

"মাপ করবেন, এবার আমাকে ফিরে যেতে হবে।"

"তুমি যাবে না আমার সঙ্গে?"

প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল গীতার। প্রাণপণ চেষ্টায় বললে, "রাত্‌কে রহনেওয়ালী বম্বেতে আপনি অনেক পাবেন। আপনার হোটেলের লোকেই তা যোগাড় করে দেবে আপনাকে।"

সবিস্ময়ে সোহনলালও উঠে পড়লেনঃ "কী হল তোমার? আমি যে তোমাকে ভালোবাসি। আর তুমিও আমাকে—"

"না।" প্রায় চিৎকার করে উঠল গীতাঃ "ভালোবাসার পালা আমার শেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই। এখন আমাকে রোজগার করে খেতে হয়। আমি যাই—"

"রোজগার!" সোহনলাল শব্দ করে হেসে উঠলেনঃ "বুঝেছি!" তাঁর চুরুট আর চোখ দুটো একসঙ্গেই ঝকঝক করতে লাগলঃ "তুমি কি ভাবছ, তোমাকে ভালোবাসি বলেই আমি তার অ্যাডভান্টেজ নেব? তুমি ভেবো না প্রেম, আমি তোমায় ঠকাব না।" মৃদু হেসে সোহনলাল হাত পুরে দিলেন ট্রাউজারের পকেটে।

কী বার করবেন সোহনলাল? টাকা? অসীম ধৈর্যে সোহনলালকে একটা চড় বসানোর দুর্জয় হিংস্রতাকে সংযত করল গীতা।

"থামুন বলছি!" এমন একটা বিকৃত আর্তনাদ শুনতে পেলেন সোহনলাল যে ট্রাউজারের পকেটের ভিতর তাঁর হাতটা থমকে গেল।

এই সোহনলালই একদিন তাকে এনে দিয়েছিলেন সেই প্রথম-ফোটা ম্যাগনোলিয়া ফুলটি। বলেছিলেন, "প্রেম, এই ফুল শুকিয়ে যাবে কাল-পরশুই। কিন্তু এর সঙ্গে যা দিলাম, তা কোনোদিনই—"

সেই সোহনলালই সেই হাতে আজ টাকা দিতে চাইছেন তাকে। রাত্‌কে রহনেওয়ালীর প্রণামী!

বুকফাটা কান্না হঠাৎ বুকফাটা হাসিতে ফেটে পড়ল গীতার। আগুন ঠিকরে বেরুল চোখ দিয়ে।

"পারবেন না, অত অল্প টাকা দিয়ে একটা খেলো হোটেলে আমায় নিয়ে

যেতে পারবেন না। সারা হিন্দুস্থানের অনেক শেঠ তাদের পাগড়ি খুলে রাখে আমার পায়ের তলায়। আমাকে কেনা একজন প্রোফেসরের কাজ নয়, তার সারা বছরের মাইনের টাকাতেও কুলোবে না।"

বার দুই হাঁ করলেন সোহনলাল, কিন্তু একটা কথাও বলতে পারলেন না। দাঁড়িয়ে রইলেন নির্বোধের মতো। তাঁর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টির সামনে দিয়ে প্রায় ছুটে চলে গেল গীতা কাউর, পিছন থেকে ফিরে ডাকবার সাহস পর্যন্ত খুঁজে পেলেন না তিনি।

শুধু খানিক পরে দার্শনিকের মতো স্বগতোক্তি করলেন, "স্ট্রেঞ্জ! উইমেন্ আর স্ট্রেঞ্জ!" আবার নিজের কানে কথাটাকে ভারী কর্কশ শোনাল।

আর ও-দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল গীতা। হাতে যে আগুনের ছোঁয়াচটা লেগেছিল, এখন তা ছড়িয়ে গেছে সারা গায়ে, লাক্ষার মূর্তির মতো পুড়ে ছাই হচ্ছে সর্বাঙ্গ। যন্ত্রণায় জ্বলতে জ্বলতে সে ছুটে চলল।

ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে? এয়ারপোর্টে? অ্যাপোলো বন্দরে?

না-না-না। কোথাও নয়। এ জ্বালার হাত থেকে কোথাও তার নিস্তার নেই!

তবে একমাত্র জায়গা আছে। রাওয়ের কাছে। গোপনে সব রকম মদের ব্যবস্থা রাখে রাও। কড়া প্রহিবিশনের শহরে তারই মতো দু-চারজন বিপন্নের পরিত্রাতা, অগতির গতি, দুর্দিনের বান্ধব।

সে-ই ভুলিয়ে দিতে পারবে এই সন্ধ্যাটাকে। ভুলিয়ে দিতে পারবে সেই গান:

"এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর
তেরো চরণপর শির নাবে—"

আর ভুলিয়ে দিতে পারবে সেই মেয়েটিকে, একদিন যার নাম ছিল 'প্রেম', যার হাতে একটা ফুটন্ত ম্যাগনোলিয়া এনে দিয়েছিলেন সোহনলাল।

চার

সেই প্রসন্ন উজ্জ্বল সাদা হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ, সেই চকচকে কোঁকড়া চুলের রাশ, তেমনি স্মার্ট ভঙ্গি। আয়ার এসে তরতর করে ঘরে ঢুকল।

"আপনার টেলিফোন পেয়ে কালকের রেকর্ডিং ক্যান্‌সেল করতে হল। কী হয়েছে—জ্বর? মুখটুখও কেমন লাল হয়ে উঠেছে দেখছি!" সুপ্রিয়ার বিনা নিমন্ত্রণেই সে সামনের চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল।

"জ্বর আছে একটু। গায়ে আর গলাতেও ব্যথা হয়েছে।"

"ডাক্তার দেখিয়েছিলেন?"

"দরকার হবে না। বোধ হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা।" বিছানার উপর উঠে বসে সুপ্রিয়া জবাব দিলে।

"তাই বলুন। অসুখ বেশী বাড়লে আমাদেরই মুশকিল।" আয়ার বললে, "ভালো হয়ে উঠুন চটপট।"

"চেষ্টা করছি।" বলেই সুপ্রিয়া চকিত হয়ে উঠল: "ও কী! ওগুলো

আবার কী রাখলেন টেবিলের ওপর ?"

"কিছু না, গোটাকয়েক ফল। আঙুর, বেদানা, আপেল—"

"ছিঃ, ছিঃ, কেন আনতে গেলেন এগুলো ?"

আয়ার বললে, "আনতে নেই ? রোগীর জন্যে রোগীর খাবার নিয়ে এলাম। দোষ আছে তাতে ?" দীপ্ত দৃষ্টি সুপ্রিয়ার মুখের উপর ছড়িয়ে দিলেঃ "খাবেন কিন্তু—ফেলে দেবেন না পচিয়ে।"

"না, তা করব না।" সুপ্রিয়া ক্লান্ত হেসে বললে, "আপনি চা খাবেন একটু ?"

"নাঃ—থ্যাঙ্কস্। চায়ে আমার সুবিধে হয় না।"

? তাও আছে।"

"খাঁটি নীলগিরির নেই।" আয়ার সকৌতুকে বললে, "বম্বে মার্কেটের কফি আমার ঠিক জমবে না। ও-সব আতিথেয়তার জন্যে ভাববেন না আপাতত। বেশ ভালো করে সেরে উঠে পেটভরে একদিন বাঙালী রান্না খাইয়ে দেবেন—ব্যাস।"

বাঙালী রান্না ! কথাটা খচ করে বিঁধল সুপ্রিয়ার কানে। মনে পড়ল আয়ারের মা'র কথাঃ "আমার ছেলের ভারী শখ বাঙালী মেয়ে বিয়ে করে—"

র্তের জন্যে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল সুপ্রিয়ার মন। সামলে নিয়ে বললে, রান্না খেতে পারবেন ? ভালো লাগবে ?"

"চমৎকার লাগবে।" আয়ার এবার সশব্দে হেসে উঠলঃ "দরকার হলে গোটাকয়েক লঙ্কা না হয় মেখে নেব তার সঙ্গে। ন্যাশনাল মশলা। কেবল মাছটা চলবে না। ওর গন্ধ সইতে পারি না।"

"বেশ, নিরামিষই খাওয়াব।"

"হ্যাঁ—খাওয়াবেন। সেই সঙ্গে বাঙালী পায়েস। আমি একবার খেয়েছিলাম। খুব চমৎকার ! কিন্তু খাওয়ার কথা পরে হবে। আগে খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠুন। আমার সেই কাজটা মেটিরিয়েলাইজ করেছে, জানেন তো ?"

"তাই নাকি ?"

উৎফুল্ল মুখে আয়ার বললে, "ইনডিপেন্ডেন্ট চান্স। কসটিউম ছবি, বিস্তর গান আছে। অন্তত ছখানা প্লে-ব্যাক করাব আপনাকে দিয়ে। সেনসেশন এনে দেব।" ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা, এবার উঠি।"

"এত তাড়া কেন ?"

"একবার অর্কেস্ট্রায় যেতে হবে। সেখান থেকে একটা রি-রেকর্ডিংএ। চলি তবে—"

আয়ার দাঁড়িয়ে পড়ল। দোর পর্যন্ত এগিয়ে মুখ ফিরিয়ে আবার বললে, "সেরে উঠতে দেরি করবেন না কিন্তু। পারি তো কাল খবর নেব আবার।"

আয়ার চলে গেল। সুন্দর ওর চোখ দুটো। অতীশকে মনে পড়ে।

কিন্তু সবাই তো অতীশ নয়। আশ্রয় দিতে কেউ চায় না, সবাই আশ্রয় চায়

ওর কাছে। তা ছাড়া ঠেকে শিখেছে সুপ্রিয়া। প্রচ্ছদপটেই চোখ ভোলে সকলের। মাটিকে ছাড়িয়ে উঠতে চায় না কেউ, দেখতে জানে না আকাশকে। অত সহজেই আঁকা হয় না মোনালিসার ছবি।

অথচ সুপ্রিয়া তো নিজেকে দেবার জন্যে তৈরি হয়েই আছে। নাও—নাও—আমাকে নাও। রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষায় বলছি ঃ 'বাকী আমি কিছুই রাখব না।' কিন্তু কেবল আমার একটা খণ্ডকে চেয়ো না—কেবল আমার এই আচ্ছাদনটার মধ্যেই আমার পূর্ণ পরিচয় দাবি কোরো না। সব দিতে পারি তখনই—যখন তুমি আমাকে সম্পূর্ণ করে চাইতে পারবে—যখন তোমার দৃষ্টিপ্রদীপের আলোয় আমার সব কিছু উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

আয়ারকে যাই বলুক, সুপ্রিয়া বুঝতে পারছিল জ্বর বাড়ছে। গায়ে প্রচুর ব্যথা। গলার যন্ত্রণাটাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বড় বেশী, দিনকয়েক স্টুডিয়োতে স্টুডিয়োতে বেশি রিহার্সাল দেবার জন্যেই কি না কে জানে। সমুদ্রের নীল ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ দুটো জ্বালা করছিল। ঝাঁকে ঝাঁকে সী-গাল উড়ছে। দূরে একটা প্রকাণ্ড সাদা জাহাজ। জাহাজ দেখলে তার মন খারাপ হয়ে যায়, অনেক দূরে চলে যেতে ইচ্ছা করে। গঙ্গার ঘাটে বসে সে-কথা অতীশকে সে বলেছে অনেকবার।

সুপ্রিয়া শুয়ে পড়বে ভাবছিল, এমন সময় দীপেন এল। সেদিনের পর থেকে একটু কুণ্ঠিত, একটু এড়িয়ে চলে। ক্ষমা চেয়েছিল পরদিন সকালে। বলেছিল, "নেশা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল, ব্যালান্স ছিল না।"

সুপ্রিয়া সহজ করে দিতে চেয়েছিল ঃ "মন খারাপ করবেন না দীপেনদা। আমি জানি, আপনি ইচ্ছে করে ও-ভাবে এসে পড়েননি।"

আজ কিন্তু সেই কুণ্ঠার ভাবটা দেখা গেল না। কেমন উত্তেজিত দীপেন, একটু চঞ্চল।

বিনা ভূমিকাতেই বললে, "একটু আগেই আয়ার এসেছিল না ?"

'হ্যাঁ, এসেছিলেন।" সুপ্রিয়ার কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না, গলায় কষ্ট হচ্ছিল, শরীরে যেন ছুঁচ বিঁধছিল। তবু বললে, "কয়েকটা ফলও দিয়ে গেলেন।"

"ও।" দীপেনের স্বর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল ঃ "ওর সঙ্গে অত মেলামেশা কিন্তু না করাই ভালো সুপ্রিয়া।"

সুপ্রিয়ার শরীরটা আরো জ্বালা করে উঠল ঃ "ওঁর অপরাধ ?"

"অপরাধ কিছু নেই। তবে ফিল্ম লাইনের লোক সম্পর্কে সতর্ক থাকাই উচিত।"

মুহূর্তে সব স্বচ্ছ হয়ে গেল সুপ্রিয়ার কাছে। সেই চিরদিনের ইতিহাস! আদিম পুরুষের সেই চিরন্তন ঈর্ষা! তাই দীপেনও নীতিবাক্য শোনাচ্ছে। আর তার উৎস চিরকালের দেহ—রক্তমাংসের উপর সেই পুরোনো অধিকারবোধ, সেই এক অন্ধতা! কারো সঙ্গে কারো কোনো তফাত নেই!

"গানের লাইনের লোককেও সব সময়ে সবাই ভালো বলে না দীপেনদা'।"

কপালটা ফেটে পড়ছে, গলায় বিশ্রী যন্ত্রণা, মনে হচ্ছে লোহার বলের মতো কী একটা আটকে আছে সেখানে। বিকৃত গলায় সুপ্রিয়া বললে, "আপনার নিজের সম্বন্ধেই কি আপনি সুনাম দাবি করতে পারেন যথেষ্ট ?"

দীপেনের মুখে যেন মস্ত বড় একটা চড় এসে পড়ল। চমকে বললে, "আমি—"

"আপনি ভালো নন, হয়তো আয়ারও নয়। আপনি আমাকে সুরের লক্ষ্মী বলেন, আয়ারও হয়তো পুজোর থালা সাজাচ্ছে আমার জন্যে।" যন্ত্রণা বেড়ে উঠছে, গলার শিরায় আগুন জ্বলছে যেন। মুখ দিয়ে যে কাতরোক্তি বেরুতে চাইছিল, একরাশ তিক্ততায় সেটাকে মুক্তি দিলে সুপ্রিয়া ঃ "কেন এসব মিথ্যে দুশ্চিন্তা করছেন আমাকে নিয়ে? চরিত্রের খুঁটিনাটি নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর অভ্যেস নেই।"

দীপেন কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই জ্বরের তীব্রতা একটা অস্বাভাবিক বাঁক নিলে। যেন প্রলাপের ঘোরে কথাটা মনে এল সুপ্রিয়ার।

"আমাকে বিয়ে করবেন দীপেনদা ?"

কানের কাছে বোমা ফাটল দীপেনের।

"কী বলছেন ? করবেন বিয়ে ?" সুপ্রিয়ার গলা কাঁপতে লাগল।

একটা ভূমিকম্পের নাড়া খেয়ে দীপেন বললে, "বিয়ে !"

"তা ছাড়া উপায় কী। আপনারা সবাই তো একই জিনিস চান। চান অধিকার করতে। তাহলে আর অন্যকে আসতে দিচ্ছেন কেন ? কেন সুযোগ দিচ্ছেন আয়ারদের ?" সুপ্রিয়া বললে, "এখনো হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট পাশ হয়নি। পাশ হলে আর সময় পাবেন না।"

"তুমি ঠাট্টা করছ না তো ?" দীপেনের গলা শীর্ণ হয়ে গেল।

"ঠাট্টা আমি করিনি। বলুন, রাজী আছেন আমাকে বিয়ে করতে ?"

দীপেন স্তম্ভিত হয়ে রইল। কিন্তু সুপ্রিয়া নিজে আর সহ্য করতে পারছে না, যন্ত্রণায় তার চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করছে। গলার শিরাটা যে-কোনো সময় টুকরো টুকরো হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।

দীপেন বিড় বিড় করে বললে, "এ সৌভাগ্য আমি আশা করতে পারিনি।"

"সৌভাগ্য আপনার নয়, আমার। এত বড় গুণীর স্ত্রী হব আমি। তাঁর যা কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তার সব কিছু আমিই পাব সকলের আগে।" বিকৃত মুখে সুপ্রিয়া বললে, "রাজী আছেন দীপেনদা ?"

"তোমাকে যেদিন প্রথম দেখেছিলাম—", দীপেন রুদ্ধশ্বাসে বললে, "সেদিন থেকেই আমি তৈরি হয়ে আছি।"

"তা হলে সামনের সপ্তাহে ?"

"সামনের সপ্তাহে !"

"ভয় পাচ্ছেন ?"

"না, ভয় পাইনি।" দীপেন বিপন্ন হাসি হাসল ঃ "বলছিলাম—মানে—এত তাড়াতাড়ি ?"

"আমি ভেবে দেখলাম দীপেনদা", যন্ত্রণায় প্রলাপের মতো সুপ্রিয়া বলে

চলল, "আমার আর একা থাকা উচিত নয়। আমি তাতে করে আরো অনেকের দুঃখের বোঝাই বাড়াব। তার চাইতে জীবনের কোথাও নিজেকে বেঁধে ফেলাই আমার ভালো। সেই জায়গাটি আপনার কাছেই তো পেয়েছি। আপনি গানের রাজা। নিজের যা আছে, সে তো দেবেনই। যা নেই, তা-ও আমাকে এনে দেবেন। তাই আপনার ঘাটে আমি নোঙর ফেলব। আর আয়ারের মতো কাউকে ভয়ও করতে হবে না আপনাকে।"

"বেশ আমি তৈরী।" দীপেন জোর করে বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু গলায় সংশয় কাটল না।

"কেবল শর্ত আছে একটা।"

"বলো।"

"বৌদিকে আপনার ত্যাগ করতে হবে। গীতার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারবেন না। ওই যে মারাঠী মেয়েটি মাঝে মাঝে আসে, যার নাম অনসূয়া, তাকে মোটরে করে রাত্রে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসাও চলবে না আর।"—জ্বরের ঘোরে একটানা বলতে লাগল সুপ্রিয়া, "এক সময় ভাবতাম, আমার অনেক বড় প্রেম আছে, যেখানে অনেকের জায়গা দিতে পারি। আজ দেখছি তা হয় না। এক-একজন এত বড় হয়ে আসে যে, সবটুকু জায়গাতেও তার কুলোয় না। আমি সইতে পারব না, একজনকে ছাড়া। আমি আপনারই হতে চাই সম্পূর্ণ করে। আপনিও আমাকে ছাড়া আর কাউকে চাইতে পারবেন না এর পরে।"

"সুপ্রিয়া!"

সুপ্রিয়া তেমনি উদ্‌ভ্রান্তভাবে বলে চলল, "না, আমি সইব না। আপনি বৌদিকে ত্যাগ করুন, গীতাকে ছেড়ে দিন। দু চোখে অমন করে খিদে নিয়ে কিছুতেই আপনি চাইতে পারবেন না অনসূয়ার দিকে। আমি যাকে ভালো-বাসি তাকে নিয়ে ভাগাভাগি কিছুতেই সহ্য করব না। যে আমার, সম্পূর্ণ করেই সে আমার। রাজী আছেন দীপেনদা?"

"সুপ্রিয়া—শোনো—"

"শোনবার কিছু নেই। স্পষ্ট জবাব দিন। বৌদিকে আপনি ত্যাগ করতে পারবেন? গীতাকে? বলুন!"

দীপেনের শরীর শিরশির করে উঠল। একবারের জন্য মনে পড়ল স্ত্রী সুধার দুটো কালো কালো বিশ্বাসভরা চোখ। মনে পড়ে গেল সুধার গায়ের শান্ত শ্যামশ্রী, তার চলার সেই বিশেষ ভঙ্গিটি। দীপেন যখন তাকে ভালো-বেসে বিয়ে করে, তখন নাম দিয়েছিল, "পুনিয়া ধানশ্রী"। আর গীতা? কত দুর্দিনের সঙ্গী, কত একান্ত কান্নার আশ্রয়। তারপর অনসূয়া—

"পারবেন না?"

"পারব।" দীপেন জবাব দিল। কাপুরুষ মনের একটা রেশ কেঁপে গেল গলায়।

"গীতা?"

"তাকেও ছেড়ে দেব।"

"আর অনসূয়া ?"

"সে-ও আর কোনোদিন এখানে আসবে না।"

দীপেনের আবার মনে পড়ল অনসূয়ার সে নাম দিয়েছিল : "রাগিণী মধুবন্তী"।

"তা হলে কথা দিচ্ছেন ?" সুপ্রিয়ার চোখ-মুখ অস্বাভাবিক হয়ে উঠল, "কথা দিচ্ছেন আপনি ? আমি ছাড়া পৃথিবীর আর কাউকে আপনি মনের ভাগ দিতে পারবেন না ?"

"কথা দিচ্ছি।"—দীপেনের মনটা ক্রমাগত বিতৃষ্ণ হয়ে উঠতে লাগল সুপ্রিয়ার উপরই।

"তবে কাল, কালই বিয়ের ব্যবস্থা করুন। আমি এক সপ্তাহ দেরি করতে পারব না। আমার বড্ড তাড়া।"

কিন্তু এতক্ষণে কেমন যেন খটকা লাগল দীপেনের। না, সবটাই স্বাভাবিক নয়। অদ্ভুত লাল সুপ্রিয়ার মুখের চেহারা—গলার একটা শিরা কেমন ফুলে উঠেছে। সুপ্রিয়ার চোখ দুটো একটা উদগ্র আলোয় দপদপ করছে।

মুহূর্তের কুণ্ঠার পর দীপেন সুপ্রিয়ার কপালে হাত ছোঁয়াল। অনেকখানি গরম, অল্প একটুখানি জ্বর এ নয় !

সুপ্রিয়া ততক্ষণ হাতটা চেপে ধরেছে দীপেনের।

"কথা দিয়েছেন ?"

আগুনতপ্ত হাতটা সভয়ে ছাড়িয়ে নিলে দীপেন। বললে, "বলছি তো। তুমি যদি চাও, তা হলে কালই বিয়ে হবে। এখন দাঁড়াও, একটা কাজ সেরেই আসছি।"

দীপেন উঠে পড়ল। চলে এল পাশের ঘরে। ফোন করল ডাক্তারকে।

ততক্ষণে জ্বরের ঘোরে আর অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণায় বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করছে সুপ্রিয়া। বলছে, "সইব না, আর কাউকেই আমি সইব না—! অতীশ, তোমাকেও না।"

দীপেন বাধ্য হয়ে মাথায় একটা আইসব্যাগ ধরল।

ডাক্তার এসে পৌঁছুলেন। সুপ্রিয়াকে পরীক্ষা করেই গম্ভীর হয়ে উঠল তাঁর মুখ।

বললেন, "এঁকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে। এক্ষুনি। আর এক মিনিট দেরি করা চলবে না।"

গীতা কেবল কিছু টের পেল না। কাল অনেক রাতে মাতাল অবস্থায় তাকে থানা থেকে উদ্ধার করেছে দীপেন, এখনো সে তার বিছানা ছাড়েনি।

পাঁচ

"চল্ মুসাফির, চল্ মুসাফির চল্—"

কাঠগড়ার রেলিং বাজিয়ে গান গেয়ে উঠল কাশ্তি।

সমস্ত আদালত চমকে উঠল। একটা প্রচণ্ড ধমক লাগাল পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পাহারাওয়ালা।

কান্তি হেসে বললে, "ও, গানে অসুবিধে হচ্ছে বুঝি? তাহলে তবলাই বাজিয়ে শোনাই—" কাঠের উপর দ্রুত তালে তার হাত চলতে লাগল।

সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে একবার ভিজে ভিজে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল মুনিয়া বাঈ। করুণার রেখা ফুটে উঠল কপালে।

সরকারী উকিল বললেন "এ শেঠজীর টাকা আর বোতাম নিয়েছিল? আর আংটি?"

মুনিয়া বাঈ একটা ঢোক গিলল।

"না, তা ঠিক নয়।"

উকিল আশ্চর্য হয়ে গেলেন, "এ চুরি করেনি?"

মাটির দিকে মুখ নামিয়ে মুনিয়া বাঈ বললে, "না।"

কান্তির তবলা বাজানো থেমে গেল। চেয়ে রইল অদ্ভুত দৃষ্টিতে।

উকিল বললেন, "চুরি করেনি? তবে কী হয়েছিল?"

মুনিয়া বাঈ আর একবার সিক্ত চোখে তাকাল কান্তির দিকে। গড়গড় করে বলে গেল তারপর:

"শেঠ তো ঘুমিয়ে পড়লেন। আমারও জবর নেশা ধরেছিল। বুঝলাম আর বেশিক্ষণ হোঁশ থাকবে না। তখন আমি বললাম, 'বাবুজী দিনকাল ভালো নয়। আপনি সাঁচ্চা আদমি—শেঠের আঙ্গুঠি বোতাম ব্যাগগুলো একটু দেখবেন। কাল সকালে দিবেন শেঠজীকে। এ-সব কাজ আমাদের এখানে হামেশাই হয়। বাবুজী মালুম হচ্ছেন তা-ই করেছিলেন। লেকিন বুড়া ওস্তাদ সে-কথা জানত না। সে বাবুজীকে চোট্টা বলে পাকড়াও করে—"

কিন্তু মুনিয়া বাঈ আর বলতে পারল না। তার আগেই চেঁচিয়ে উঠল কান্তি।

"না—না—না—"

পাহারাওয়ালা ধমকে উঠল, "চুপ!"

কিন্তু কান্তি চুপ করল না। তেমনি চিৎকার করে বলে গেল, "আমি ওগুলো চুরি করে পালিয়ে যেতেই চাইছিলাম। এমন সময় সারেঙ্গিওয়ালা এসে ধরল আমাকে। পালাতে চাইলাম পারলাম না।" কান্তি উৎসাহিতভাবে হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে বললে, "তখন এই দু হাতে আমি তার গলা টিপে মেরে ফেললাম!"

মুনিয়া বাঈ প্যাংশু হয়ে গেল। রেলিং চেপে ধরল শক্ত করে।

উকিল একবার তাকালেন তার দিকে।

"আচ্ছা বাঈ, আপনি যেতে পারেন। আর দরকার নেই।"

কান্তির মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে আর একবার তাকিয়ে কাঠগড়া থেকে নেমে গেল মুনিয়া বাঈ।

আদালতের নিঃশ্বাস পড়ছিল না। নিস্তব্ধতা ভাঙল জজের গলার স্বরে।

"ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে আপনি এমন জঘন্য অপরাধ করলেন কান্তি-বাবু?"

কান্তি প্রচণ্ড অট্টহাসি করে উঠল। আঁতকে সরে দাঁড়াল পাহারাওয়ালাটা।

"ভদ্রলোকের ছেলে! কে ভদ্রলোকের ছেলে? আমার বাপও খুন করেছিল, খুনীর রক্ত আমার শরীরে। এমন কাজ আমি করব না তো কে করবে!"

একটা তীক্ষ্ন আর্তনাদে ভরে গেল আদালত। জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়েছেন একজন ভদ্রমহিলা। কান্তির মা। তারাকুমার তর্করত্নের একমাত্র মেয়ে ইন্দুমতী।

জুরীরা উঠে গেলেন। বেশী সময় লাগল না তাঁদের। আসামীর স্বীকারোক্তিতে এতটুকুও কুয়াশাও নেই কোথাও।

"গিল্টি।"

আরো আধ ঘণ্টা মাত্র সময় নিলেন জজ।

সংক্ষিপ্ত রায়। শাস্তি একটু কম করেই দিয়েছেন। কারণ, আসামী যে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ নয়, তাতে সন্দেহের কিছুমাত্র অবকাশ নেই।

"দশ বছর কারাদণ্ড।"

"দশ বছর!" কান্তি অট্টহাসি হেসে বললে, "আমার ফাঁসি হল না? ভারী আশ্চর্য তো!" এই বলে সে কাঠগড়ায় রেলিঙের উপর অত্যন্ত কঠিন একটা তাল বাজাতে লাগল। পাহারাওয়ালাকে বললে, "দেখছ হাত? এমনি তৈরি হয়নি দাদা, অনেক মেহনত করতে হয়েছে এর জন্যে।"

রায়টা শুনতে পেলেন না ইন্দুমতী। তিনি তখন হাসপাতালে। তখনো তাঁর জ্ঞান ফিরে আসেনি। ডাক্তারেরা সন্দেহ করেছিলেন, মাথার শিরা ছিঁড়ে গেছে।

ছয়

আজকে অনেকক্ষণ ধরেই ট্রাম-স্টপের কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল শ্যামলাল। উপায় নেই, কারণ ইদানীং সে মল্লিক সাহেবের বাড়িতে পড়াতে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। যেদিন থেকেই শুনেছে অতীশের সঙ্গে মন্দিরার বিয়ের আওয়াজ শুরু হয়ে গেছে বাড়িতে, আর পড়তে বসে যেদিন জলভরা চোখ তুলে মন্দিরা বলেছে, 'এমনি করেই কি সবকিছু ফুরিয়ে যাবে আমাদের—', সেদিন থেকেই শ্যামলাল আর বালিগঞ্জ প্লেসের ত্রিসীমানাও মাড়ায় না।

আগে রবিবারে প্রায়ই মেসে থাকত না অতীশ। আর সেই ফাঁকে দুপুর-বেলার দিকে মন্দিরা আসা-যাওয়া করত। কিন্তু কী যে হয়েছে আজকাল। অতীশ তার বিছানার উপর প্রায় সব সময়ই লম্বা হয়ে পড়ে থাকে, সিগারেট টেনে যায় একটার পর একটা। অসহ্য নিরুপায় ক্রোধে শ্যামলাল বজ্রদৃষ্টি ফেলে তার দিকে। অতীশ ভ্রূক্ষেপ করে না। বরং বলে:

"আমাদের বিয়েতে কিন্তু আপনাকে বরযাত্রী যেতেই হবে শ্যামবাবু।"

কাটা ঘায়ের উপরে নুনের প্রলেপ পড়ে যেন। না-শোনবার প্রাণপণ চেষ্টায় যেন যোগাভ্যাস করতে থাকে শ্যামলাল।

"ও শ্যামবাবু শুনছেন? আরে, ও-মশাই শ্যামবাবু।"

যোগাভ্যাসে আর কুলিয়ে ওঠে না এরপর; ক্ষিপ্ত চোখ তুলে শ্যামলাল বলে, "কী, কী বলছেন? দেখছেন না পড়ছি? কেন বিরক্ত করছেন এ সময়ে?"

"আরে পড়া তো মশাই আছেই আপনার বারো মাস। একটু গল্প করুন না।"

"আমার সময় নেই।" শ্যামলাল কান্না চাপতে চেষ্টা করে।

"সময় কি আর কারো থাকে মশাই, ওটা তৈরি করে নিতে হয়। শুনুন না, যা জিজ্ঞেস করছিলাম। আমাদের বিয়েতে আমি মন্দিরাকে খুব একটা ভালো জিনিস প্রেজেণ্ট করতে চাই। কী দেওয়া যায় বলুন তো?"

শ্যামলালের এইবারে ইচ্ছে হয় কেমিস্ট্রির মোটা একখানা বই তুলে ছুঁড়ে মারে অতীশের মুখ লক্ষ্য করে। কিন্তু এমন সহিংস প্রতিশোধ নিতে তার শক্তিতে কুলোয় না, সাহসেও নয়। অসহ্য হয়ে উঠে পড়ে তক্তপোশ থেকে, চটির ক্ষিপ্ত প্রতিবাদ তুলে বেরিয়ে চলে যায় ঘর থেকে।

"যাচ্ছেন কেন? আরে ও মশাই, ও শ্যামলালবাবু। আরে শুনুন ও শ্যামবাবু—"

পিছন থেকে অতীশ ডাকছে।

"আরে অত উত্তেজিতভাবে কোথায় চললেন। শুনুন না—"

আবার সেই ছাতের ঘরে। সেই ঘুঁটের স্তূপের উপর।

কিন্তু সব অন্য রকম হয়ে গেছে। এখন আর ও ঘুঁটের মধ্যে এসে বসলেই সঙ্গে সঙ্গে চিত্তশুদ্ধি হয় না। চারদিকের শুকনো গোবর আর কয়লার গন্ধ তার ইড়াপিঙ্গলায় সুড়সুড়ি দিয়ে তাকে আত্মস্থ করে তোলে না। চোখের সামনে আবির্ভূত হন না সরস্বতী, তাঁর এক হাতে কেমিস্ট্রির বই, আর এক হাতে টেস্ট টিউব; পিছনে এসে মাথার উপর হাত রাখেন না স্বনামধন্য রাসায়নিক আচার্য, বলেন না, 'বৎস তোমার কাজ তুমি করে যাও। সাধনায় সিদ্ধিলাভ তোমার হবেই!'

কিছুতেই কিছু হয় না শ্যামলালের। আগে মন চঞ্চল হলেই এখানে ধ্যানে বসত শ্যামলাল। কিছুক্ষণের ভিতরেই সব একদম প্রশান্ত হয়ে যেত, একেবারে সমাধির অবস্থা। কিন্তু সব এলোমেলো হয়ে গেছে। ঝড় বয়ে গেছে তার তপস্যার উপর দিয়ে।

এখন শ্যামলালের মনে হয়, ঘুঁটের স্তূপের মধ্যে অসংখ্য পিঁপড়ে আছে। পায়ের কাছে কী একটাকে সেদিন নড়তে দেখেছিল, কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল—তেঁতুল বিছে। এক লাফে সে বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল।

আগে কখনো এমন হয়নি। এ-সব তুচ্ছ জিনিসকে সে গ্রাহ্যও করত না। কিন্তু তবু এর ভিতরে এসেই এখনো বসতে হয় তাকে। আত্মশুদ্ধির

জন্যে নয়, অন্তর্জ্বালার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে। সামনে দুটি পথ খোলা আছে। হয় অতীশকে খুন করা, নইলে পালিয়ে যাওয়া এখান থেকে।

প্রথমটা অসম্ভব। দ্বিতীয়টাও খুব সম্ভব নয়। মেসে আর কোনো ঘরেই জায়গা নেই; আর থাকলেও যারা আছে তাদের সঙ্গে শ্যামলালের বনিবনা হওয়া শক্ত। তাদের অনেকেই সুযোগ পেলে শ্যামলালের পিছনে ফিঙের মতো লাগে। তারপর মেসে এ-ঘরটাই একেবারে দক্ষিণমুখী, দরজা খুললেই পুবের আকাশ। আরো বড় কথা, কোনো নতুন জায়গায় গিয়ে পড়াশোনার আবহাওয়াটা সৃষ্টি করে নিতেই বেশ খানিকটা সময় লাগে।

কী করা যায় তা হলে?

একটা মাত্র উপায় ভেবে পেয়েছে শ্যামলাল। কেওড়াতলার শ্মশানে গিয়ে এক-আধটু খোঁজখবর করে দেখলে মন্দ হয় না। ওখানে নাকি মধ্যে মধ্যে একজন দুজন তান্ত্রিক সাধু-সন্ন্যাসী আসেন। তাঁদের দ্বারস্থ হলে হয় না? হয়তো কোনো তুকমন্তরের ব্যবস্থা তাঁরা করতে পারেন, যাতে করে অতীশ—

কিন্তু তখনি জিভ কেটেছে শ্যামলাল। ছি-ছি! একজনকে মেরে ফেলবে সে? এত নীচে নামবে? ছিঃ!

কী করা যায়?

কিছুই করা যায় না। শুধু যন্ত্রণা, অবিচ্ছিন্ন যন্ত্রণা। আজ পনেরো দিন ধরেও একটা লাইনও সে পড়তে পারেনি। কলেজে গেছে, অথচ যা কিছু শুনেছে তাদের কোনো অর্থবোধ হয়নি তার। ল্যাবরেটরিতে গিয়ে অ্যাসিডে হাত-পা পুড়িয়েছে, ভেঙে ফেলেছে একরাশ কাচের অ্যাপারেটাস। গচ্চা দিতে হবে। অথচ—

কিছুই করা যায় না।

আর এর মধ্যে থেকে থেকে অতীশ জুড়ে দেয়: "বসে বসে অত কী দুশ্চিন্তা করছেন ও মশাই শ্যামলালবাবু? আসুন, গল্প করি একটু।"

যখন পারে রাস্তায় চলে আসে। যখন রাস্তায় সম্ভব হয় না, তখন ঘুঁটের ঘরে। আর বেলা দশটায়, বিকেল পাঁচটায় ট্রাম-স্টপের সামনে এসে এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে থাকে। দুটো উদগ্র চোখ মেলে প্রতীক্ষা করে মন্দিরার।

আজও দাঁড়িয়ে ছিল শ্যামলাল।

এর ভিতরে জন সাত ভিক্ষুক পয়সা চেয়ে গেল, চারজন লোক তাকে পথের কথা জিজ্ঞেস করল, তিনজন জানতে চাইল কটা বেজেছে, কোথা থেকে এক ভদ্রলোক এসে খামোকা গায়ে পড়ে বলতে লাগলেন, "শীত শেষ হয়ে গেল মশাই, এখন বাঁধাকপি গোরুতে খায়!" আরো উত্তেজিত হয়ে শ্যামলালের কানের কাছে তিনি সমানে শুনিয়ে চললেন, "তবু ব্যাটারা বলে ছ আনা সের। বলুন—এতে কারো মাথা ঠিক থাকে? না এমন চললে বাজার করা যায়? বুঝলেন—ছ্যাঁচড়া, সব ছ্যাঁচড়া।"

শ্যামলাল সরে গেল। ভদ্রলোকও সরে এলেন সঙ্গে সঙ্গে।

"মশাইয়ের মুখখানা যেন চেনা-চেনা।"

"আমি আপনাকে চিনি না।"

"দাঁড়াও—দাঁড়াও। তুমি কেদার নও? মগরাহাটের নিতাইদার ছোট ছেলে না?"

শ্যামলাল চটে গিয়ে বললে, "না। আমার নাম শ্যামলাল ঘটক।"

"অঃ—ভুল হয়েছে।" বলেই ভদ্রলোক সামনের একটা চলতি বাসে লাফিয়ে উঠে পড়লেন।

দশটা। শ্যামলাল তীর্থের কাকের মতো ট্রাম-স্টপের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সমানে। বেশি কিছু আশা তার নেই—বড় কোনো লাভের ভরসাও নয়। কলেজে যাবে মন্দিরা। সে কেবল দূর থেকে একবার তাকে যেতে দেখবে। ব্যাস—এইটুকুই।

একদল মেয়ে এল কলরব করতে করতে। আরো কয়েকটি দাঁড়িয়ে ছিল ইতস্তত। সবই কলেজের ছাত্রী। কিন্তু ওদের মধ্যে মন্দিরা নেই।

তখন আর-একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথা মনে এল। যদি মোটর করে কলেজে চলে যায় মন্দিরা?

শ্যামলাল দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আর একটু অপেক্ষা করবে, না চলে যাবে, এ-সম্পর্কে একটা কিছু ভেবে নেবার আগেই পিছন থেকে ডাক এলঃ "শোনো?"

তীরবেগে ফিরে দাঁড়াল শ্যামলাল। মন্দিরা।

আশেপাশে কেউ আছে কি না দেখে নিয়ে চাপাগলায় মন্দিরা বললে, "রোজই দেখি এখানে এসে এমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকো। সাহস করে কাছে আসতে পারো না একবার? ভীতু কোথাকার!"

সংকোচে আড়ষ্ট হয়ে শ্যামলাল দাঁড়িয়ে রইল, কথা বলতে পারল না। বুকের ভিতরে তুফান চলতে লাগল।

মন্দিরা বললে, "চলো।"

"কোথায়?"

"কলেজ পালাব আজ।"

"আর আমি?" নির্বোধের মতো শ্যামলাল জিজ্ঞেস করলে।

"তোমার সঙ্গেই তো পালাব।" মন্দিরা ভ্রূকুটি করলে, "নইলে কি একা একা ঘুরে বেড়াব সারা দুপুর?"

"আচ্ছা!"

"তোমার খাওয়া হয়েছে?"

শ্যামলাল মিথ্যে কথা বললে, "হয়েছে।"

"তা হলে উঠে পড়ো।"

"কিসে?"

"আঃ—ওই যে ডালহৌসির ট্রাম আসছে, ওটাতেই।"

"কিন্তু ডালহৌসির ট্রামে চেপে যাব কোথায়?"

মন্দিরা বিরক্ত হয়ে বললে, "ওঠো না তুমি। কোথায় যাওয়া হবে, সে-ভার

আমার ওপরেই ছেড়ে দাও। ওঠ চটপট। দেখছ না কলেজের মেয়েগুলো তাকিয়ে রয়েছে আমাদের দিকে?"

অগত্যা ট্রামেই উঠতে হল।

কিন্তু বেলা দশটার ট্রামে ওঠা কাজটা খুব সহজ নয়। বরাবর সে এই সমস্ত ভয়াবহ ট্রামকে এড়িয়েই এসেছে সাধ্যমত। আজ কী করে যে উঠল শ্যামলাল, তা সে নিজেই জানে না। আর ওরই ভিতরে ফাঁক দিয়ে গলে কখন উঠে পড়ল মন্দিরাও।

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল শ্যামলাল, প্রাণপণে সামলাতে লাগল চশমা। দুজনকে আসনচ্যুত করে বসবার জায়গা পেল মন্দিরা।

কেন চলেছে শ্যামলাল? কিসের আশায়? এখনো তার খাওয়া হয়নি। অত্যন্ত জরুরী একটা ক্লাস ছিল আজকে। একজনের কাছ থেকে ভালো একটা নোট পাবার কথা ছিল। সব ছেড়েছুড়ে সে কেন চলেছে, কোথায় চলেছে? মন্দিরা কি কোনো উপায় বলে দিতে পারবে?

কিসের উপায়? যার বাবা পুরুলিয়ায় গালার ব্যবসা করেন, হাঁটুর নীচে কাপড় পরেন না, দশটা ভাইবোন, মল্লিক সাহেবের বাড়িতে তার এতটুকুও আশা কোথায়? "ওয়ানটেনথ অব কুরুবংশ!" কানের কাছে বাজছে এখনো।

বাপ মা, জিলিপি-দিয়ে-মুড়ি-খাওয়া ভাইবোন, সব কিছুর উপর একটা তীব্র ক্রোধে জ্বলে যেতে লাগল শ্যামলাল। মনে হল, সবাই ঠকিয়েছে তাকে, চক্রান্ত করে বঞ্চনা করেছে। মল্লিক সাহেবের সেদিনের চোখদুটো মনে পড়ল। যেন একটা এক্স-রে ক্যামেরা দিয়ে তার ভিতরের সব কিছু দেখে নিচ্ছিলেন। তাঁকে কোথাও ফাঁকি দেবার জো নেই।

আর অতীশ। ছেলেবেলার পরিচয়। আত্মীয়তা। ডি-এসসি ডিগ্রী। ভালো চাকরি পেয়েছে এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটিতে।

মন্দিরা কী করতে পারে?

শ্যামলাল ভাবতে পারল না। একটা ফাঁকা মন নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ট্রামের রড ধরে। দুটো টিকিট মন্দিরাই কিনল। শ্যামলাল ভাসতে লাগল শূন্যতার উপরে। যাত্রীদের ওঠা-নামা দেখতে লাগল আচ্ছন্ন চোখে।

বেলা এগারোটার ইডেন গার্ডেন। ইতস্তত দু-চারজন বেকার। নানা রঙের কয়েকটা ফ্লাওয়ার-বেড। গাছের ছায়া। শ্যাওলাজমাট কালো জল ঝিলের। তার উপর কয়েক টুকরো ভাসমান কাগজ, একটা সিগারেটের প্যাকেট।

শ্রীহীন অপরিচ্ছন্ন বর্মী প্যাগোডার পাশে, জলের দিকে মুখ রেখে এক-রাশ মুমূর্ষু ঘাসের উপরে বসল দুজনে।

মন্দিরা বললে, "আর সাত দিন।"

শ্যামলাল রক্তহীন মুখে জবাব দিলে, "জানি।"

"অতীশদা আমাকে জোর করে বিয়ে করছে।"

শ্যামলাল ঠোঁট কামড়াল, "তা-ও জানি।"

"কিছুই করা যাবে না ?" মন্দিরার চোখে ক্ষুব্ধ নিরাশার জ্বালা জ্বলতে লাগল, "কিছুই করবার নেই ?"

"তোমার বাবাকে—"

"বাবাকে ?" মন্দিরা অধৈর্যভাবে থামিয়ে দিলে কথাটা, "বাবাকে বলে কী হবে ? কী যে তিনি তোমাকে"—একটা অত্যন্ত অপ্রিয় কথা মুখে এসেছিল, মন্দিরা সামলে নিলে।

"কেন, আমি কি মানুষ নই ?" শ্যামলালের পৌরুষে খোঁচা লাগল।

"তাঁর স্ট্যান্ডার্ডে নয়। তুমি যদি কুলীন জাতের কোনো চাকরি-বাকরি করতে, বিলেতে যদি তোমার কোনো আত্মীয়স্বজন থাকত, তোমার বাবা যদি বালিগঞ্জ না হোক অন্তত রিজেন্ট পার্কেও একটা বাড়ি করতেন—"

যদি। বলবার কিছু নেই। সবই শ্যামলাল জানে। খুব বেশি করেই জানে। অনেক দিন অনেক রাতের অনেক অসহ্য জ্বালার মধ্য দিয়েই তাকে তা জানতে হয়েছে।

"কী করা যায় ?"

মন্দিরা ক্ষেপে উঠল হঠাৎ।

"কী করা যায় ? এ-কথা তুমি হাজারবার বলেছ, আমিও বলেছি। কিন্তু বলে লাভ নেই আর। এবার যা হয় কিছু একটা করে ফেলো। সাত দিন পরে আর সময় পাবে না।"

শ্যামলাল একটা মরা ঘাসের শিষ ছিঁড়ে নিলে। চিবুতে লাগল হিংস্রভাবে।

"পালাবে ?" মন্দিরা ফিসফিস করে বললে।

"অ্যাঁ !" দাঁতের কোণায় ঘাসের শিষটা আটকে গেল শ্যামলালের।

"চলো, পালিয়ে যাই।" মন্দিরার চোখ চঞ্চল হয়ে উঠল।

"পালাব !" শ্যামলালের হৃৎপিণ্ড হঠাৎ স্প্রীং-ছিঁড়ে-যাওয়া ঘড়ির মতো থমকে গেল। জাবরকাটা গোরুর মতো ঘাসের শিষটা আটকে রইল গালের পাশে।

"তা ছাড়া আর উপায় কী ?" মন্দিরার মুখে রক্তের উত্তেজিত উচ্ছ্বাস ভেঙে পড়ল, "আমরা চলে যাই কলকাতা ছেড়ে। যেখানে খুশি যাই। গিয়ে বিয়ে করব।"

একটা ধাক্কা খেয়ে শ্যামলালের হৃৎপিণ্ডটা আবার চলতে আরম্ভ করল। "কিন্তু থানা-পুলিশ—"

"কোর্টে দাঁড়িয়ে বলব আমি সাবালিকা। সেটা প্রমাণ হতে সময় লাগবে না।"

"তারপর ?"

"তারপর আবার কী ? আমরা ঘর বাঁধব।"

শ্যামলাল ঘাসের শিষটা তুলে জলের দিকে ছুঁড়ে দিলে, "কিন্তু আমার এম-এসসি পরীক্ষা—"

"এ-বছর না হয় পরের বার দেবে।"

পরের বার দেবে ? কত সহজে বলে বসল মন্দিরা। কিন্তু তার বাবা

হরলাল ঘটককে তার চাইতে কে আর বেশি করে জানে! চিৎকার করে বলবেন, "পরীক্ষা দেবার মতলবই যদি ছিল না, তা হলে কলকাতায় বসে বসে আমার টাকার শ্রাদ্ধ করলে কেন? টাকা কি এতই সস্তা যে রাস্তায় খুঁজলেই কুড়িয়ে পাওয়া যায়?"

সে-ও না হয় এক রকম সইবে, কিন্তু নিজের আশা? পাশ করে রিসার্চ করবে, তার স্বপ্ন?

"নইলে চল, আমরা রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করি।"

"তারপর?"

"আমি তোমাদের বাড়িতে গিয়ে থাকব। আর এখান থেকে তুমি পরীক্ষার পড়া করবে।"

"কিন্তু তোমার বাবা—"

"গোলমাল একটা তো করবেনই। কিন্তু আইন আমাদের পক্ষে আছে। আমি সাবালিকা।"

কত সহজ সমাধান। গোলমাল হবে, কিন্তু আইন আছে পক্ষে! আর ওদিকে হরলাল ঘটক? এই সমস্ত উৎপাত দেখলে তিনি ঘরে জায়গা দেবেন ছেলের বউকে? আরো তাঁর বিনা অনুমতিতে বিয়ে করবার পরে?

"আমাকে না জানিয়ে লভ্ করা হয়েছে, বিয়ে করা হয়েছে! তবে আর এ-বাড়িতেই বা কেন? এবার বউ নিয়ে নিজের পথ দেখ। অমন কুলাঙ্গার পুত্রের আমি মুখদর্শনও করতে চাইনে।"

তাতে ক্ষতি নেই হরলাল ঘটকের, পিণ্ডলোপের আশঙ্কা নেই বিন্দুমাত্রও। শ্যামলালের পরে আরো পাঁচ ভাই। পরলোকের ব্যবস্থা আগে থেকেই গুছিয়ে রেখেছেন হরলাল।

নিজের পথ দেখবে শ্যামলাল। তার মানে আলাদা বাসা করতে হবে তাকে। সে-বাসা যোগাড় করা কি এতই সহজ? আর যোগাড়ও যদি হয়, তার খরচ চালাবে কে? তার মানে যেমন করে হোক একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে হবে শ্যামলালকে এবং সেটা বড় জোর স্কুল-মাস্টারি। পড়ে থাকবে এম-এসসি, পড়ে থাকবে ভবিষ্যৎ, চোখের সামনে এতদিন যে রামধনুর জগৎটা ভাসছিল, সেটা মিলিয়ে যাবে ছায়াবাজির মতো। পুরুলিয়ার গালার ব্যবসায়ী হরলাল ঘটকের ছেলের মনের উপর দিয়ে এতগুলো সম্ভাবনা এক-রাশ ফুলকির মতো ঝরে পড়ল।

"কী ভাবছ? কথা বলছ না?" ব্যগ্র-আকুল জিজ্ঞাসা মন্দিরার।

শ্যামলাল একটা অতল অন্ধকার থেকে নিজেকে টেনে তুলবার চেষ্টা করতে লাগল: "একটা কথা বলব?"

মন্দিরা উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে বললে, "আর কিছু বলতে হবে না। চলো, এখুনি যাই। যদি রেজিস্ট্রি অফিসে না হয়, তবে কালীঘাটেই। ওখান থেকেই সিঁদুর পরিয়ে দেবে আমার কপালে। তারপরে যা হবার হোক।"

যা হবার হোক। অত সহজেই যে জিনিসটাকে নিতে পারবে না শ্যামলাল।

শুধু পা বাড়িয়ে দিলেই তো চলে না। সেটা শক্ত মাটিতে না খাদের উপর, পথে না অথই সমুদ্রে, সেটাও তো ভেবে নিতে হবে।

"আমি বলছিলাম—", শ্যামলাল গলাখাঁকারি দিলে।

"কী বলছিলে?"

"আরো দু বছর তোমার বাবাকে ঠেকানো যায় না?" সম্পূর্ণ অর্থহীন জেনেও অবান্তর দুরাশায় শ্যামলাল বলে চলল, "এর মধ্যে এম-এসসি পাশ করে আমি থীসিসটা দিয়ে ফেলি। তখন আর তোমার বাবা—"

আগুন-ধরা হাউইয়ের মতো সোজা দাঁড়িয়ে গেল মন্দিরা।

"চেষ্টা করব।" গলা থেকে একরাশ বিষাক্ত ধিক্কার ছড়িয়ে বললে, "শুধু দু বছর কেন, সারাজীবন শবরীর প্রতীক্ষা করব তোমার আশায়!"

"মন্দিরা—"

"শুধু আমি কেন? আমার বাবাও বসে বসে তোমারই নাম জপ করবেন। তুমি এম-এসসি হবে, ডক্টরেট পাবে, তিন বছর ইয়োরোপে গিয়ে থাকবে, বড় চাকরি নিয়ে আসবে। আর ততদিন তোমার জন্য বাবা তোরণ সাজিয়ে রাখবেন, আর সমানে নহবত বাজাতে থাকবেন!"

ভীত বিবর্ণ শ্যামলাল যেন চোরাবালির মধ্যে ডুবে যেতে যেতে বললে, "আমি—"

"তুমি কাপুরুষ, তুমি এক নম্বরের অপদার্থ!" চোখের আগুনে শ্যামলালকে ছাই করে দিয়ে মন্দিরা বললে, "আমি অতীশকেই বিয়ে করব। আর শোনো, এর পরে কোনোদিন যদি তুমি ট্রাম-স্টপের সামনে আমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকো, আমি পুলিসে খবর দেব—বলে রাখলাম সে-কথা।"

হাউইয়ের মতোই উড়ে গেল মন্দিরা। শ্যামলাল বসে রইল।

সামনে ঝিলের শ্যাওলা-কালো অপরিচ্ছন্ন জল। শ্যামলাল ভাবতে লাগল ওর মধ্যে ডুবে আত্মহত্যা করা যায় কিনা। ঠিক এমনি সময় জলের মধ্যে থেকে একটা ব্যাঙ লাফিয়ে এসে পড়ল তার পায়ের কাছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আরো জোরে লাফ মারল শ্যামলাল। তার ভারী বিশ্রী লাগে ব্যাঙকে।

সাত

আর চার দিন পরে বিয়ে।

আজ বহরমপুরে যেতে হবে, সামাজিক কর্তব্যের তাগিদেই। ওখান থেকে বাবা আসবেন, কাকা আসবেন, আরো অনেকে আসবেন। অতীশকে সেজে আসতে হবে বরবেশে।

যেমন কুৎসিত, তেমনি বিরক্তিকর।

ঘণ্টা তিনেক পরে ট্রেন। অতীশ ঘরে ঢুকে বিছানার মধ্যে বসে পড়ল। দু-তিন দিন এলোমেলো ভাবে ঘুরেছে। কোনো লক্ষ্য ছিল না, কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। পরশু একবার শুধু গিয়েছিল অমিয় মজুমদারের বাড়িতে। একই দিনে রেবারও বিয়ে।

রেবা বেশি কিছু বলেনি। খালি কিছুক্ষণ সন্ধানী চোখে তাকিয়ে ছিল অতীশের দিকে।

"মন্দিরাকে বিয়ে করছেন?"

"পাত্রী হিসাবে তো মন্দ নয়।"

"হুঁ—তা ভালোই। তবে—"

তবে রেবা আর বলেনি, অতীশও জানতে চায়নি। কিন্তু এমন কী আছে, যেখানে 'তবে' নেই? সব কিছুই তো শর্তসাপেক্ষ। কে বলতে পারে, এখানেই সব ঠিক মিলে গেছে, কোথাও এতটুকু সংশয় অবশিষ্ট নেই আর? জীবনের অর্ধেক অঙ্কেই ঠিকে ভুল।

রেবা বলেছিল, "সুখী হবেন আশা করি।"

"দেখি চেষ্টা করে।"

বিছানার উপরে বসে পড়ল অতীশ। ভারী ক্লান্ত লাগছে, অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে মন। আজ কুড়ি দিন ধরে যেন একটা নেশার মত্ততায় তার দিন কাটছিল। সেই নেশার ঘোর কেটে গেছে। এখন মনে হচ্ছে, কী দরকার ছিল এ-সবের? কী লাভ হবে এমনভাবে মন্দিরাকে বিয়ে করে?

মন্দিরা তাকে চায় না। সেই কি মন্দিরাকে চায়? শুধু ভাবছিল, জীবনে কোথায় সে হেরে যাচ্ছে বার বার, সকলেই তাকে পিছনে ফেলে চলে যাচ্ছে। সবাই যখন নিজের পাওনা হিসেব করে নিলে, তখন তার একার ফাঁকির পালা। কেন সে হার মানবে? আরো বিশেষ করে ওই শ্যামলালের কাছে?

মন্দিরা তাকে ঘৃণা করবে। অনেকদিন পর্যন্ত। করুক। আসে যায় না, কিছু আসে যায় না। অন্তত মন্দিরার সঙ্গে ওইটুকুই তার বন্ধন। পৃথিবীতে স্বামী-স্ত্রী মাত্র দুটো সম্পর্কই তো রাখতে পারে নিজেদের মধ্যে। হয় প্রেম, নইলে ঘৃণা। ওর জন্যে ক্ষোভ নেই অতীশের। না,এতটুকুও নয়।

মোট কথা, আর সে অপেক্ষা করবে না।

অতীশ বিস্বাদ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল। একটা চাদর মুড়ি দিয়ে তক্ত-পোশের উপর মড়ার মতো লম্বা হয়ে পড়ে আছে শ্যামলাল। একবার মনে ভাবল সুইসাইড করে নি তো? খানিকটা পটাশিয়াম সায়ানাইড? ল্যাবরেটরি থেকে ওটা সংগ্রহ করা খুব কঠিন কাজ নয়।

শ্যামলাল নড়ে উঠল। বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা।

মরেনি তাহলে। ওর মতো মানুষের কাছে অতটা রোমান্টিকতা আশা করা যায় না। ছ মাস পরেই হয়তো ময়ূরপঙ্খী মোটরে চড়ে টোপর মাথায় দিয়ে কন্যাদায় উদ্ধার করতে ছুটবে আর-এক জায়গায়।

ক্লান্তি, ভারী ক্লান্তি বোধ হচ্ছে। সারা শরীরে, সমস্ত মনে, নেশা কেটে যাওয়ার একটা শিথিল অবসাদ। মন্দিরাকে মুক্তি দিলে হয়। কিন্তু কী হবে তাতে? তা হলেও শ্যামলাল ওকে পাবে না। মল্লিক সাহেব তাঁর নতুন কেনা বাঘা চেহারার কুকুরটা লেলিয়ে দেবেন শ্যামলালের দিকে।

এদিকে দু-ঘণ্টা পরে বহরমপুরে যেতে হবে। সুটকেসটা ঠিক করে নেওয়া দরকার।

অতীশ উঠে দাঁড়াল। আর উঠে দাঁড়াতেই কেন কে জানে সমস্ত জিনিসটাই তার একটা বিরাট প্রহসনের মতো মনে হল। কী মানে হয়—কী মানে হয় এর? বিজ্ঞানের ছাত্র অতীশ কি আজ মধ্যযুগীয় বর্বরের মতো জোর করে ছিনিয়ে আনতে চায় নারীকে? ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করতে চায় মন্দিরাকে? পাগলামি। একেবারে অর্থহীন পাগলামি। সুপ্রিয়ার উপরে প্রতিশোধ নেবার উপকরণ কি মন্দিরা? মন্দিরাকে দুঃখ দিলে সুপ্রিয়া কি এতটুকুও দুঃখ পাবে? তার উপরে আবার শ্যামলালের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা! ছিঃ ছিঃ! একটা অন্ধ বিদ্বেষের তাড়নায় এ কত নীচে নেমে চলেছে অতীশ!

তারপর—

তারপর সুপ্রিয়ার জন্য হয়তো অনেকদিন তার খারাপ লাগবে। হয়তো পড়া ভুল হয়ে যাবে—দরকারী এক্সপেরিমেণ্ট করতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়বে। তবু অনেকদিন চিরদিন নয়; আস্তে আস্তে সুপ্রিয়া স্মৃতি হয়ে আসবে—স্মৃতি থেকে স্বপ্ন! তখন রাত্রির ঘুমকে সুপ্রিয়া সুরভিত করে রাখবে, কিন্তু ভোরের আলোয় মনের উপর এতটুকু ছায়া থাকবে না। কে জানে, তখন প্রথম সূর্যের রঙ মেখে আর-একজন ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াবে কিনা—যার চুলে শিশিরের ছোঁয়া—যার সর্বাঙ্গে প্রভাতপদ্মের গন্ধ, যার কণ্ঠে ভৈরবী রাগিণীর গুঞ্জন তাকে স্পর্শ দিয়ে বলবেঃ "জাগো পীতম প্যারে—"

অতীশ বিজ্ঞানের ছাত্র। এত সহজেই কেন সে নিজের সব কিছু মিটিয়ে দেবে? কেন সে মন্দিরাকে বলি দেবে সুপ্রিয়ার খড়্গে? তারপর সারাটা জীবন ধরে একটা ছিন্নকণ্ঠ শবকে সে বয়ে বেড়াবে!

কী ভয়ঙ্কর!

অতীশ নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মিনিট দুই। মন্দিরাকে বিয়ে করবার কথা, শ্যামলালকে আঘাত দিয়ে দিয়ে একটা জৈবিক হিংস্র আনন্দ, প্রেমহীন দাম্পত্য-জীবনের আত্মনিগ্রহের বিলাস, সবগুলোকে মনে হল একটা খেয়ালের ক্ষ্যাপামি। সূর্যের মতো দেখা দিল সুস্থ উজ্জ্বল বিজ্ঞানীর বুদ্ধি, ভোরের কুয়াশার মতো মিলিয়ে গেল মন্দিরাকে বিয়ে করার অবিশ্বাস্য কল্পনা। অসম্ভব! এর কোনো অর্থ হয় না!

"শ্যামবাবু?"

শ্যামলাল জবাব দিলে না। আর-একবার পাশ ফিরল। তার যে কানটা নীচের দিকে ছিল, সেটাকে শক্ত করে চেপে ধরল বালিশে।

"মন্দিরাকে বিয়ে করতে চান শ্যামবাবু?"

চাদরের মধ্যে চকিতে সাইক্লোন দেখা দিলে একটা। গা থেকে চাদরটা মেঝের উপর তাল পাকিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে সটান বিছানার উপরে খাড়া হয়ে উঠে বসল শ্যামলাল। চোখ দুটো রক্ত মাখানো। থাবার মতো পাকানো হাত।

উত্তেজনার বারুদে আর-একটা ফুলকি লাগলেই বিস্ফোরণ। তারপরে সে মানুষ খুন করতে পারে।

"ঠাট্টা করছেন?" দানবিক মুখভাঙ্গ করে শ্যামলাল বললে, "অনেক আমি সহ্য করেছি অতীশবাবু। কিন্তু রসিকতারও সময়-অসময় আছে একটা, তা মনে রাখবেন।"

"ঠাট্টা করছি না, খুব সিরিয়াস্‌লিই বলছি। আপনিই বিয়ে করুন মন্দিরাকে। আমার দরকার নেই।"

শ্যামলাল রক্তাভ চোখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। গলার দু-পাশে রগ দুটো কাঁপতে লাগল থরথরিয়ে। না, ঠাট্টা করছে না অতীশ। তার মুখের উপর একটা বিষণ্ণ ছায়া নেমে এসেছে।

"আমাকে বিশ্বাস করুন শ্যামবাবু।"

জীবনে এই তৃতীয়বার কাঁদল শ্যামলাল। মুখ ঢেকে ফেলল দু হাতে।

অতীশ এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখল।

"আপনি কিছু ভাববেন না। কেবল গোটা কয়েক চমৎকার মিথ্যে কথা বলতে হবে। ও-পাপটা আমিই করব এখন। শুধু একটা কথার জবাব দিন। মন্দিরা সত্যিসত্যিই আপনাকে ভালোবাসে তো?"

"ভালোবাসে মানে?" শ্যামলালের অধৈর্য উচ্ছ্বাস ফেটে পড়ল, "জানেন, আপনি তাকে বিয়ে করলে সেই রাত্রেই সে আত্মহত্যা করবে? আমাকে না পেলে একদিনও সে বাঁচবে না?"

অতীশের মনের মধ্যে আবার একটুখানি কৌতুক দুলে গেল। মন্দিরা আত্মহত্যা করবে! ওই গোলগাল পুতুলের মতো মেয়েটি, যে এখনো রাতদিন চকোলেট খায়? তার অতখানি জোর থাকলে অনেক আগেই সে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিত অতীশকে, অমনভাবে বলির পশুর মতো প্রতীক্ষা করত না।

কিন্তু ঠাট্টা করবার মতো মনের অবস্থা অতীশের আর ছিল না। বললে, "তা হলে সব ঠিক আছে। আর একটা কথা বলি। বিয়ের পরে মল্লিক সাহেব দারুণ চটবেন, হয়তো মুখদর্শন করবেন না আর। ও-বাড়ির জামাই-আদর থেকে বঞ্চিত হলে খুব কি মনখারাপ হবে আপনার?"

"ও-বাড়ির উপর আমার কোনো লোভ নেই। আদরও চাই না। বিশেষ করে মল্লিক সাহেবের নতুন কুকুরটা যাচ্ছেতাই। আমার শুধু মন্দিরাকে পেলেই চলবে।"

"বাপের বাড়ির জন্যে মন্দিরার মন খারাপ করবে না?"

"না। আমার কাছে থেকেই সে সব চাইতে খুশি হবে।"

অতীশ হাসল, "দ্যাট সেট্‌ল্‌স। উঠে পড়ুন তা হলে।"

কান্না-জড়ানো বিস্ময়ে শ্যামলাল বললে, "কিন্তু কী করতে চান আপনি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"বুঝবেন পরে। এখন উঠে আসুন আমার সঙ্গে।"

আকাশ থেকে পড়লেন মল্লিক সাহেব। রাগে আর আতঙ্কে লাল টকটকে হয়ে উঠল মুখ।

"আর চার দিন মাত্র সময় আছে। বিয়ে করবে না মানে? এ কি ছেলে-খেলা?" হিংস্র গলায় বললেন, "তোমার নামে কেস্ করতে পারি তা জানো?"

শ্যামলাল সোফার ভিতরে লুকোবার গর্ত খুঁজতে লাগল।

অতীশ বিচলিত হল না। বললে, "কেস্ হয়তো আপনি করতে পারেন, আইনের খবর আমার জানা নেই। কিন্তু কথা দিচ্ছি, আমার চাইতে সুপাত্র আপনাকে আমি এনে দেব।"

প্রায় বিদীর্ণ হওয়ার সীমান্তে এসে মল্লিক সাহেব বললেন, "তোমার চাইতে সুপাত্র বাংলা দেশে বিস্তর আছে, সে আমি জানি। কিন্তু তারা তো বাজারের ল্যাংড়া আম নয় যে, গিয়ে ঝুড়ি ভরে আনলেই হল।"

"পাত্র আপনাকে আমি এক্ষুনি দিচ্ছি। তার আগে ধৈর্য ধরে আমার একটা কথা শুনবেন আপনি?"

দাঁতে-দাঁতে চেপে মল্লিক সাহেব বললেন, "গো অন্!"

"সুপ্রিয়া বলে একটি মেয়েকে আমি ভালোবাসতাম।"

"আই নো, আই নো! ওসব কাফ-লাভ সকলেরই থাকে।"

"না, কাফ-লাভ নয়। আমি ভেবে দেখলাম, তাকে ছাড়া কাউকেই আমি বিয়ে করব না।"

"দেন্ হোয়াই—" মল্লিক সাহেব বজ্রস্বরে বললেন, "তা হলে কেন তুমি এত দূর এগোলে? এ কি ছেলেখেলা? বেবিকে তোমারই বিয়ে করতে হবে। ইচ্ছেয় না করো আইন দিয়ে বাধ্য করব!"

"কেন মিথ্যে পণ্ডশ্রম করবেন? বলছি তো অনেক ভালো সুপাত্র আপনাকে দেব।"

"বটে!"

"বিশ্বাস করুন। আরো বিশ্বাস করুন, আপনার মেয়ে তাকে ভালো-বাসে।"

"ইজ ইট? ইজ ইট?" যেন কলিকের যন্ত্রণা টন্‌টনিয়ে উঠেছে এমন ভাবে মল্লিক সাহেব বললেন, "কোথায় সে সুপাত্র? আমার মেয়ের যিনি মনোহরণ করেছেন তিনি কে?"

সোফার মধ্যে এমন গর্ত নেই, যেখানে শ্যামলাল লুকোতে পারে। পাণ্ডুর হয়ে ঠায় বসে রইল।

"এই ছেলেটি। এই শ্যামলাল ঘটক।"

"শ্যামলাল!" সোফা ছেড়ে প্রায় দু-হাত শূন্যে উঠে গেলেন মল্লিক সাহেব: "ইয়ার্কির একটা মাত্রা আছে অতীশ!"

"আজ্ঞে ইয়ার্কি নয়। চমৎকার ছেলে।"

"চমৎকার ছেলে! আই মাস্ট ব্রিঙ গান অ্যাণ্ড শুট ইউ বোথ! ইয়েস, আই মাস্ট!"

শ্যামলালের প্রায় চৈতন্যলোপ হল। বন্দুকের একটা নল এক্ষুনি তার বুকে এসে ঠেকছে।

অতীশ বললে, "সত্যিই ভালো ছেলে। গালার ব্যবসা ছাড়াও ওর বাবার প্রায় দশ লাখ টাকার প্রোপার্টি আছে সেটা ভুলবেন না।"

প্রায় অজ্ঞান অবস্থাতেও পেটের মধ্যে শ্যামলালের বিবেক মোচড় খেয়ে উঠল। কিন্তু নড়তে পারল না।

"দশ লাখ!" মল্লিক সাহেব আবার ভালো করে চেপে বসলেন সোফায়। সবিস্ময়ে বললেন, "কিন্তু চেহারা দেখে তো—"

"আজ্ঞে, প্লেন লিভিং হাই থিংকিং!"

"অঃ।"

"তা ছাড়া ওঁর বড়মামা লণ্ডনের স্থায়ী বাসিন্দা। ডাক্তার। কুড়ি বছর রয়েছেন, বাড়ি করেছেন গোলডার্স গ্রীনে। ফ্রেঞ্চ ওয়াইফ। এম-এসসি দিয়েই তাঁর কাছে চলে যাচ্ছেন শ্যামবাবু। লণ্ডনে ডি-এসসির জন্যে।"

বড়মামা! শ্যামলালের পেটের মধ্যে বিবেকটা লাঠি খাওয়া ঢোঁড়া সাপের মতো দাপাদাপি করতে লাগল। বড়মামা! লণ্ডন! ডাক্তার! তার একজন মাত্র মামা। তিনি চাকরি করেন খড়্গপুরে রেলওয়ে ইয়ার্ডে। তার মামীমার নাম নলিনীবালা, তাঁর বাপের বাড়ি নোয়াখালি জেলায়!

মল্লিক সাহেব কেমন দিশেহারা হয়ে গেলেন।

"কিন্তু এ সব কথা তো—"

"ইচ্ছে করেই বলেননি শ্যামবাবু। দেখছেন তো কি রকম বিনয়ী ছেলে!"

"সম্ভব, সবই সম্ভব। মফঃস্বল পিপ্‌ল্ একটু সিম্‌প্‌ল্ হয়।" মল্লিক সাহেব মাথা নাড়তে লাগলেন, "আচ্ছা ভেবে দেখি তবে।"

"ভাববার আর কী আছে। আপনার হাতে তো মাত্র তিন দিন আর সময়।"

"হুঁ।"

"তা ছাড়া মন্দিরাও শ্যামবাবুকে—"

"তুমি বলেছিলে বটে।" মল্লিক সাহেব একবার বিরূপ দৃষ্টিতে শ্যামলালের দিকে তাকালেন, "তা হলে এই জন্যেই বেবি পরশু থেকে বাড়িতেই মুখ গুঁজে বসে আছে, চকোলেটও খায় না! তা যাই বলো, বেবির টেস্ট ভালো নয়!"

আট

ঘরে ম্লান আলো। জানলার কাচের উপর রক্তপদ্মের আভা জ্বলছে। মৃদু ধূপের ধোঁয়া উঠেছে পাকিয়ে পাকিয়ে। দেওয়ালের গায়ে গান্ধার-রীতিতে আঁকা বরাভয় মুদ্রা সরস্বতীর দিকে তাকিয়ে রইলেন দুর্গাশঙ্কর।

এই ছবি যে এঁকে দিয়েছিল তাকে আর খুঁজে পাওয়ার জো নেই। দুর্গাশঙ্করের হৃদয়-পদ্মের সব কটি পাপড়ি সে ফুটিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু সেই পদ্মবেদীটিতে সে আর আসন পাতল না। কোথায় কোনখানে যে হারিয়ে গেল, আজও তার সন্ধান পাননি।

সামনে তানপুরা নিয়ে একটি মেয়ে গান গেয়ে চলেছে। মীরার ভজন!

"চাকর রহাসুঁ, বাগ লাগাসুঁ,
নিতি উঠি দরশন পাসুঁ,
বৃন্দাবন কি কুঞ্জ গলিঁমে
তোরি লীলা গাসুঁ—"

কিন্তু এ তো সে নয়। এর পরনে লাল শাড়ি, উগ্র রঙ। এর দেহের রেখায় কাঠিন্য। এর গানে সবই আছে, সুর-তাল-লয়—কোনো কিছুরই ত্রুটি নেই। কিন্তু কোথায় সেই মাধুর্য, যা সুরের মধ্যেও নিয়ে আসে সুরের অতীতকে! কোথায় সেই ঝংকার যা আলোর মতো, শিখা ছাড়িয়ে যা জ্যোতিঃপ্রকাশ!

একজন এসেছিল। তার সঙ্গে মিল ছিল সেই হারিয়ে-যাওয়া মানুষটির। তার মাথার উপর গান্ধারী ইরার বরাভয় প্রসারিত হয়ে থাকত। সে-ও দূরে চলে গিয়েছিল, কিন্তু ফিরে এসেছে। এখন সে মাটির সরস্বতী, এখন সে ছবি হয়ে গেছে। তার বীণাটিকে সে বিসর্জন দিয়ে এসেছে ত্র্যম্বকতীর্থের নীল-সমুদ্রে।

কী করবেন তাকে দিয়ে? তাকে দিয়ে কী করবেন দুর্গাশঙ্কর?

একটা ক্লান্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। ধূপের ধোঁয়া উঠছে কুয়াশার মতো, ছবিটা আড়াল হয়ে যাচ্ছে তার ভিতরে। সামনে বসে মেয়েটি সমানে গান গেয়ে চলেছে:

"সাঁবরিয়াকে দরশন পাউ:
পহির কুসুম্মি সারি—'

মিলবে না, সে-সুর আর মিলবে না। জীবনে একবার তাকে পাওয়া যায়, বড় জোর দুবার। কিন্তু তার বেশি নয়।

জানলার কাছে রক্তপদ্মের আভা জ্বলছে। অনেক দূরের দুরাশার মত রঙ।

সাতটা প্রায় বাজে। অতীশ পায়ের গতিটা বাড়িয়ে দিলে। এবার রেবাকে খবর দিয়ে আসতে হবে যে বিয়েটা এ-যাত্রার মতো ভেঙে গেছে, বন্ধ হয়ে গেছে একটা নির্বোধ প্রহসনের অভিনয়।

শ্যামলাল কি সহজে বশ মানবার পাত্র? রাস্তায় বেরিয়ে দস্তুরমত কেলেঙ্কারি শুরু করে দিলে। মাথার কাছে মাননীয়দের ছবি টাঙিয়ে রেখে এতদিন সে সততার সাধনা করেছে। কিছুতেই বোঝানো যায় না তাকে।

অতএব পরম জ্ঞানের বাক্যটি শোনাতে হল।

"প্রেমে আর যুদ্ধে অন্যায় বলে কোনো বস্তু নেই। ঋষিরা বলে গেছেন মশাই।"

"কিন্তু সবই তো উনি জানতে পারবেন।"

"বিয়ের আগে নয়।"

"যদি পুরুলিয়ায় খোঁজ করেন?"

"এই তিন দিনের মধ্যে পেরে উঠবেন না, সে-সময় ওঁর নেই। তা ছাড়া

ওঁদের কাছে আমি অত্যন্ত সত্যবাদী ভালো ছেলে, আমার কথায় কিছুতেই অবিশ্বাস করবেন না। পরে অবশ্য আমাকে প্রচুর গালাগালি করবেন। কিন্তু সে আমি শুনতে পাব না, তখন আমি এলাহাবাদে।" শ্যামলালের মুখের উপর একটা ক্ষুণ্ণ দৃষ্টি ফেলে অতীশ বললে, "আপনার জন্যে আমি কতবড় স্যাক্রিফাইস করলাম জানেন মশায়? ওঁদের বাড়িতে চমৎকার বিরিয়ানি পোলাও হয়, ভবিষ্যতে সে-পোলাও খাওয়ার জন্যে কোনোদিন আর আমার ডাক পড়বে না।"

কিন্তু অতীশের আত্মত্যাগের ব্যাপারে কান দেবার সময় ছিল না স্বার্থপর শ্যামলালের।

"আর আমার বাবা?"

"ওই তো কাজ বাড়ালেন। আমাকে কালই ছুটতে হবে পুরুলিয়ায়, তাঁকে ম্যানেজ করতে। আশা করি, পেরে উঠব। কারণ, তিনি ব্যবসায়ী মানুষ, তাঁর বড় ছেলেটি এম-এসসি ফেল করে দেশান্তরী হবে, এ তিনি চাইবেন না। ভালো কথা, ট্রেন-ভাড়াটা দেবেন মশাই। গাঁটের কাঁড় খরচ করে অতটা পরোপকার পোষাবে না।"

তিনখানা দশটাকার নোট তক্ষুনি বাড়িয়ে দিয়েছে শ্যামলাল: "এই নিন ভাড়া—"

আকাশে নবমীর চাঁদ। করুণ শান্ত জ্যোৎস্না ঝরছে চারদিকে। নরম আঙুলের আলতো ছোঁয়ার মতো হাওয়া। ট্রাফিকের কর্কশ কোলাহল ছাপিয়েও কোথায় যেন নিঃশব্দে বাঁশি বেজে চলেছে। চলতে চলতে নিজেকেই ভালো লাগতে লাগল অতীশের। শ্যামলাল নিশ্চয় সুখী করতে পারবে মন্দিরাকে। যতই সাদাসিধে হোক—ওর মতো ছেলের মধ্যে এক ধরনের জোর আছে—একটা নিষ্ঠার নিশ্চয়তা আছে। জীবনে শেষ পর্যন্ত শ্যামলাল পিছিয়ে পড়বে না। আর মন্দিরা—খুব বেশি করে যে ভাবতে জানে না, সে শ্যামলালকে খুব সহজেই নিজের করে নিতে পারবে; এই সরল কাজের মানুষটিকে করুণা দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, বাৎসল্যরঞ্জিত প্রেম দিয়ে ধন্য করে দিতে পারবে।

ভালো হল—এই সব চাইতে ভালো হল।

হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়ির সামনে কতগুলো বাঁশ এনে জড়ো করা হয়েছে। ছোট তোরণের মতো তৈরী হচ্ছে একটা। অতীশ জানে। চার দিন পরের একই তারিখে রেবার বিয়ে।

আর বসবার ঘরে পা দিতেই আজও প্রথম দেখা হল রেবার সঙ্গেই। শুধু রেবা নয়—দুটি বান্ধবীও তার ছিল। অতীশ তাদের চেনে না।

কিন্তু অতীশকে দেখেই রেবা চমকে উঠল। কালো হয়ে গেল মুখ।

"আপনি!"

"একটা খবর দিতে এলাম।"

"বসুন—বসুন।"

বান্ধবীরা কী একটা অনুমান করেছিল। সংক্ষেপে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে তারা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বর্ণহীন মুখে—অদ্ভুত শঙ্কিত দৃষ্টিতে রেবা কিছুক্ষণ অতীশের দিকে তাকিয়ে রইল। আর কথাটা বলবার জন্যে নিজের মনের মধ্যে প্রস্তুত হতে লাগল অতীশ।

ঘড়িতে আটটা বাজল। তারপর শেষ শব্দটার বিলম্বিত রেশ থেমে গেলে অতীশ বললে, "জানেন, বিয়েটা ভেঙে দিলাম।"

"ভেঙে দিলেন?"—রেবা প্রায় চাপা গলায় চিৎকার করল একটা।

"হ্যাঁ, ভেবে দেখলাম মন্দিরাকে নিয়ে এ ধরনের প্র্যাক্‌টিক্যাল জোক করবার কোনো মানে হয় না। বড্ড ছেলেমানুষ মেয়েটা। কী বলেন, ভালো করিনি?"

সহজ গলায় সে হাসতে শুরু করল।

রেবা হাসল না, দ্বিতীয় প্রশ্নও করল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঘড়ির ক্লান্ত স্বর শুনল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, "সুপ্রিয়ার সঙ্গে দেখা করবেন?"

"কোথায় সুপ্রিয়া?"—অতীশের হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল।

"এই কলকাতায়।"

দমবন্ধ-করা গলায় অতীশ বললে, "কবে এসেছে?"

"কাল।"

"কাল এসেছে—তবু খবর দেয়নি!"—হৃৎপিণ্ডের মত্ততা অনুভব করতে করতে অতীশ বললে, "কেমন আছে?"

রেবা মুখ তুলে তাকাল, কেমন ঝাপসা-ঝাপসা দেখাল তার চোখ। বললে, "সব খবর তার মুখ থেকেই শুনবেন। সামনেই পার্কে বসে আছে পাম গাছের নিচে।"—রেবা ধরা গলাটা একবার পরিষ্কার করে নিলে: "এক্ষুনি বোধ হয় তার সঙ্গে আপনার দেখা করা উচিত অতীশবাবু। পরে হয়তো আর সময় পাবেন না।"

অতীশ রেবার শেষ কথাগুলো শুনতে পেল না। তার আগেই সে ঘরের বাইরে পা দিয়েছে।

* * *

পাম গাছের একরাশ তরল ছায়ার নিচে একটা বেঞ্চির ওপরে চুপ করে বসে ছিল সুপ্রিয়া। মনে হচ্ছিল একটা সাদা মাটির মূর্তিকে কেউ ওখানে এনে রেখে দিয়েছে।

অতীশ সামনে এসে দাঁড়াল।

সুপ্রিয়া যেন দেখেও তাকে দেখতে পেল না। আস্তে আস্তে মুখ ফেরাল। পামের পাতার ফাঁক দিয়ে খানিক জ্যোৎস্না পড়ল তার পাণ্ডুর মুখের উপর। কালো চোখে অতলস্পর্শ নিশ্চেতনা নিয়ে সুপ্রিয়া তাকিয়ে

রইল তার দিকে।

"সুপ্রিয়া!"

চমকিতে উঠে দাঁড়াল সুপ্রিয়া। যেন সাপ দেখেছে। অস্বাভাবিক ফিসফিসে গলায় বললে, "কেন এলে—কেন তুমি এলে এখানে? আমি তো তোমায় আসতে বলিনি!"

মুহূর্তের জন্যে অতীশ মূঢ় হয়ে গেল—তৎক্ষণাৎ তার ইচ্ছে হল চলে যায় সামনে থেকে। কিন্তু সহজে সে অসংযত হয় না, আজও সামলে নিলে নিজেকে। তারপর বললে, "তোমাকে বেশিক্ষণ বিব্রত করব না। একবার দেখতে এসেছিলাম—এখনি চলে যাব।"

"তাই যাও।"—তেমনি অদ্ভুত গলায় সুপ্রিয়া বললে, "সকলের কাছে ছোট হয়ে যেতে পারি অতীশ, কিন্তু তোমার কাছে পারব না। আমাকে এখন কান্তির জন্যে কাঁদতে দাও—যে আমার দলের। তুমি চলে যাও।"

অতীশ তবু যেতে পারল না। কী একটা সন্দেহের ঢেউ উঠে সেখানে তাকে আরো নিশ্চলভাবে দাঁড় করিয়ে দিলে।

"কী বলছ তুমি? কী হয়েছে কান্তির?"

"আমার জন্যে সব চেয়ে বড় দাম দিয়েছে সে। জেল খাটছে খুনের দায়ে।"

"সুপ্রিয়া, মানে কী এসবের?"

"ভেবেছিলাম, তার জন্মের লজ্জা ঢেকে দেব আমার ব্যর্থতার লজ্জা দিয়ে। আমার আর কোনো রূপ সে তো দেখেনি, শুধু আমাকেই সে চেয়েছিল। মনে করেছিলাম তার কাছেই শেষ পর্যন্ত আমি সান্ত্বনা পাব। কিন্তু সে আশ্রয়ও হারিয়েছি অতীশ।"

"সুপ্রিয়া!"

স্বগতোক্তির মতো তেমনি বিচিত্র গলায় সুপ্রিয়া বলে চলল, "ওস্তাদজী দুর্গাশঙ্কর অবশ্য থাকতে বলেছিলেন, কিন্তু সে তো শুধুই করুণা। তাঁর গান্ধার আর্টের সরস্বতীর সঙ্গে এখন আর কোথাও আমার মিল নেই। এখন কান্তির জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর আমি কী করতে পারি অতীশ?"

"এমন করে কী সব বলছ সুপ্রিয়া? তোমার গলার স্বর ও রকম কেন? তুমি মহাভারতের তীর্থ পরিক্রমায় বেরিয়েছিলে—এত সহজেই তা শেষ হয়ে গেল?—" ব্যাকুল বিস্ময়ে অতীশ বললে, "তোমার কী হয়েছে সুপ্রিয়া? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না!"

সুপ্রিয়া উঠে দাঁড়াল। গলায় সিল্কের চাদর জড়ানো ছিল, সরিয়ে দিলে সেটা। তারপর অনেক নীচে, পাহাড়ের তলায় দাঁড়িয়ে কথা কইলে চূড়োর ওপর থেকে যেমন তার শব্দটা শোনা যায়, তেমনি অতল-নিহিত স্বরে বললে, "দেখো তাকিয়ে।"

আতঙ্কে বিস্ময়ে এক পা সরে গেল অতীশ। নবমীর জ্যোৎস্না পড়েছে, সেই সঙ্গে এসে মিলেছে ইলেকট্রিকের আলো। নির্ভুল স্পষ্টতায় দেখা যাচ্ছে

সব। সুপ্রিয়ার শঙ্খ-শুভ্র মরালগ্রীবা আর নিষ্কলঙ্ক নয়—তার ঠিক মাঝখানটিতে সদ্য শুকিয়ে যাওয়া একটি গভীর ক্ষত—যেন সবে তার স্টিচ কাটা হয়েছে। অতীশ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না।

"এ কি—এ কি!"

সুপ্রিয়া বললে, "ডিপথিরিয়া।"

অতীশ দাঁড়িয়ে রইল পাথর হয়ে। চারদিকে থমকে গেছে সব। হাওয়া বইছে না, চাঁদ নিভে আসছে, মাথার উপর মর্মরিত হচ্ছে না পামের পাতা। সময় থেমে গেছে।

যেন অনন্তকাল পরে সুপ্রিয়া বললে, "গান ফুরিয়ে গেল, স্বপ্ন ফুরিয়ে গেল, দীপেন—আমার সবই ফুরিয়ে গেল, আমি ফুরিয়ে গেলাম। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে কলকাতায় ছুটে এসেছিলাম কান্তির কাছে। সে-ও নেই। তবু তার জন্যেই দশ বছর আমি অপেক্ষা করব। তুমি যাও অতীশ।"

"না।" অতীশ বললে, "তুমি তো বলেছিলে, সব চেয়ে বড় প্রয়োজনে আমার কাছে ছুটে আসবে।"

"বলেছিলাম। কিন্তু প্রয়োজন আর শূন্যতা এক জিনিস নয় অতীশ। নিঃশেষ হয়ে গিয়ে তোমার করুণার দান নিয়ে আমি বাঁচতে পারব না। বরং অপেক্ষা করব কান্তির জন্যে—যে আমার চাইতে আরো বেশি করুণার পাত্র। তুমি যাও অতীশ, মন্দিরাকেই বিয়ে করো। আমি রেবার মুখে সবই শুনেছি।"

"সে বিয়ে ভেঙে দিয়েছি সুপ্রিয়া।"

"তা হলেও আরো তো অনেক মেয়ে আছে।"

"তারা থাক। আজকে শুধু তোমাকেই আমার দরকার।"

"আমাকে নিয়ে তুমি কী করবে? তোমার করুণার বদলে আমি তো তোমায় ভালোবাসতে পারব না।"

"বেশ তো, যেদিন করুণার সীমা ছাড়িয়ে উঠবে, সেইদিনই ভালোবাসা দাবি করব তোমার কাছে।"

সুপ্রিয়া তাকিয়ে রইল।

অতীশ সুপ্রিয়ার কাছে এগিয়ে এল। বলে চলল, "ফুরিয়ে গেছে কেন ভাবছ এ-কথা? জীবন একদিকে শূন্য হয়ে গেলেও অন্যদিকে তো নতুন ভাবে আরম্ভ করা চলে। কিছুই কোনোদিন মিথ্যে হয়ে যায় না। গলার গান নয় গেল—কিন্তু মনের সুর তো মুছে যায় নি। সেতার আছে, বেহালা আছে, স্বরোদ আছে। তুমি শিল্পী। যা ধরবে পরশমণির ছোঁয়ায় তাই সুরের সোনা হয়ে উঠবে।"

"কিন্তু তাতে তো সময় লাগবে। যতদিন আমি বড় হয়ে না উঠব, যতদিন মনে না হবে এবার তোমার চোখে আমার মহিমার রূপ ধরা পড়েছে—ততদিন যে আমি তোমায় কিছুই দিতে পারব না অতীশ।"

"আমি অপেক্ষা করব।"—অতীশ নিজেকে প্রস্তুত করে তুলল। তারপর সুপ্রিয়ার একটা প্রাণহীন শীতল হাতকে টেনে নিলে নিজের ঘর্মাক্ত মুঠোর ভেতরে।

"আমি অপেক্ষা করব"—অতীশ বলে চলল, "দশ বছর তোমাকে মিথ্যে কাঁদতে না দিয়েই তার ভেতরেই তোমাকে নতুন করে গড়ে নেব। ততদিন আমাদের মাঝখানে তোমার সাধনা অসিধারা ব্রতের তলোয়ারের মতো জ্বলতে থাকুক। জোর করে যদি কিছু চাইতে যাই—সেই তলোয়ার যেন তখনি আমাকে আঘাত করে।"

সুপ্রিয়া কথা বলল না। কিন্তু অতীশ বুঝতে পারল। তার মুঠোর মধ্যে সুপ্রিয়ার হাত আত্মসমর্পণের করুণায় আরো কোমল হয়ে এসেছে।

নবমীর চাঁদের কোল ঘেঁষে কালো মেঘ ঘনাচ্ছিল একরাশ। দীর্ঘ বিলম্বিত মূর্ছনায় গুরুগুরু করে শব্দ উঠল তাতে। যেন চন্দ্রচূড় আকাশ-মন্দিরের কালো গ্রানিট্ চত্বরে সাড়া জেগে উঠল দক্ষিণী নটরাজের মহামৃদঙ্গে।

কালা বদর

উৎসর্গ

শিশুসাহিত্যের কিরীটী রায়

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

বন্ধুবরেষু

টোপ

সকালে একটা পার্সেল এসে পৌঁছেচে। খুলে দেখি একজোড়া জুতো।

না, শত্রুপক্ষের কাজ নয়। একজোড়া পুরোনো ছেঁড়া জুতো পাঠিয়ে আমার সঙ্গে রসিকতার চেষ্টাও করেনি কেউ। চমৎকার, ঝকঝকে বাঘের চামড়ার নতুন চটি। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, পায়ে দিতে লজ্জা বোধ হয় দস্তুরমতো। ইচ্ছে করে বিছানায় শুইয়ে রাখি।

কিন্তু জুতোজোড়া পাঠাল কে? কোথাও অর্ডার দিয়েছিলাম বলেও তো মনে পড়ছে না। আর বন্ধুদের সব কটাকেই তো চিনি, বিনামূল্যে এমন একজোড়া জুতো পাঠাবার মতো দরাজ মেজাজ এবং ট্যাঁক কারো আছে বলেও জানি না। তাহলে ব্যাপারটা কী?

খুব আশ্চর্য হব কিনা ভাবছি, এমন সময় একখানা সবুজ রঙের কার্ড চোখে পড়ল। উইথ্ বেস্ট কম্‌প্লিমেন্টস্ অব রাজাবাহাদুর এন. আর. চৌধুরী, রামগঙ্গা এস্টেট্।

আর তখনি মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল আট মাস আগেকার এক আরণ্যক ইতিহাস, একটি বিচিত্র শিকারকাহিনী।

রাজাবাহাদুরের সঙ্গে আলাপের ইতিহাসটা ঘোলাটে, সূত্রগুলো এলোমেলো। যতদূর মনে হয়, আমার এক সহপাঠী তাঁর এস্টেটে চাকরি করত। তারই যোগাযোগে রাজাবাহাদুরের এক জন্মবাসরে আমি একটি কাব্য সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছিলাম। ঈশ্বর গুপ্তের অনুপ্রাস চুরি করে যে প্রশস্তি রচনা করেছিলাম তার দুটো একটা লাইন এই রকম ঃ

ত্রিভুবন প্রভা কর ওহে প্রভাকর,
গুণবান্ মহীয়ান্ হে রাজেন্দ্রবর।
ভূতলে অতুল কীর্তি রামচন্দ্র সম—
অরাতিদমন ওহে তুমি নিরুপম।

কাব্যচর্চার ফললাভ হল একেবারে নগদ নগদ। পড়েছি—আকবরের সভাসদ আবদুর রহিম খান্‌খানান হিন্দী কবি গঙ্গের চার লাইন কবিতা শুনে চার লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন। দেখলাম সে নবাবী মেজাজের ঐতিহ্যটা গুণবান্ মহীয়ান্ অরাতিদমন মহারাজ এখনো বজায় রেখেছেন। আমার মতো দীনাতিদীনের ওপরেও রাজদৃষ্টি পড়ল। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন, প্রায়ই চা খাওয়াতে লাগলেন, তারপর সামান্য একটা উপলক্ষ্য করে দামী একটা সোনার হাতঘড়ি উপহার দিয়ে বসলেন এক সময়ে। সেই থেকে রাজাবাহাদুর সম্পর্কে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়ে আছি আমি। নিছক কবিতা মেলাবার জন্যে যে বিশেষণগুলো ব্যবহার করেছিলাম, এখন সেগুলোকেই মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতে শুরু করেছি।

রাজাবাহাদুরকে আমি শ্রদ্ধা করি। আর গুণগ্রাহী লোককে শ্রদ্ধা করাই তো স্বাভাবিক। বন্ধুরা বলে, মোসাহেব। কিন্তু আমি জানি ওটা নিছক

গায়ের জ্বালা, আমার সৌভাগ্যে ওদের ঈর্ষা। তা আমি পরোয়া করি না। নৌকা বাঁধতে হলে বড় গাছ দেখে বাঁধাই ভালো, অন্তত ছোটখাটো ঝড়-ঝাপটার আঘাতে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

তাই মাস আষ্টেক আগে রাজাবাহাদুর যখন শিকারে তাঁর সহযাত্রী হওয়ার জন্যে আমাকে নিমন্ত্রণ জানালেন তখন তা আমি ঠেলতে পারলাম না। কলকাতার সমস্ত কাজকর্ম ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে পড়া গেল। তাছাড়া গোরা সৈন্যদের মাঝে মাঝে রাইফেল উঁচিয়ে শকুন মারতে দেখা ছাড়া শিকার সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণাই নেই আমার। সেদিক থেকেও মনের ভেতরে গভীর এবং নিবিড় একটা প্রলোভন ছিল।

জঙ্গলের ভেতরে ছোট একটা রেললাইনে আরো ছোট একটা স্টেশনে গাড়ি থামল। নামবার সঙ্গে সঙ্গে সোনালী তকমা আঁটা ঝকঝকে পোশাক পরা আর্দালি এসে সেলাম দিল আমাকে। বলল—হুজুর, চলুন।

স্টেশনের বাইরে মেটে রাস্তায় দেখি মস্ত একখানা গাড়ি—যার পুরো নাম রোলস রয়েস, সংক্ষেপে যাকে বলে 'রোজ'। তা 'রোজ'ই বটে। মাটিতে চলল, না রাজহাঁসের মতো হাওয়ায় ভেসে গেল সেটা ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারলাম না। চামড়ার খট্‌খটে গদী নয়, লাল মখমলের কুশন। হেলান দিতে সংকোচ হয়, পাছে মাথার সস্তা নারকেল তেলের দাগ ধরে যায়। আর বসবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়—সমস্ত পৃথিবীটা চাকার নিচে মাটির ডেলার মতো গুঁড়িয়ে যাক—আমি এখানে সুখে এবং নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তে পারি।

হাঁসের মতো ভেসে চলল 'রোজ'। মেটে রাস্তায় চলেছে অথচ এতটুকু ঝাঁকুনি নেই। ইচ্ছে হল একবার ঘাড় বার করে দেখি গাড়িটা ঠিক মাটি দিয়েই চলেছে, না দুহাত ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে ওর চাকাগুলো।

পথের দুপাশে তখন নতুন একটা জগতের ছবি। সবুজ শালবনের আড়ালে আড়ালে চা-বাগানের বিস্তার। চকচকে উজ্জ্বল পাতার শান্ত, শ্যামল সমুদ্র। দূরে আকাশের গায়ে কালো পাহাড়ের রেখা।

ক্রমশ চা-বাগান শেষ হয়ে এল, পথের দুপাশে ঘন হয়ে দেখা দিতে লাগল অবিচ্ছিন্ন শালবন। একজন আর্দালি জানাল, হুজুর, ফরেস্ট এসে পড়েছে।

ফরেস্টই বটে। পথের ওপর থেকে সূর্যের আলো সরে গেছে, এখন শুধু শান্ত আর বিষণ্ণ ছায়া। রাত্রির শিশির এখনও ভিজিয়ে রেখেছে পথটাকে। 'রোজে'র নিঃশব্দ চাকার নিচে মড়মড় করে সাড়া তুলছে শুকনো শালের পাতা। বাতাসে গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির মতো শালের ফুল ঝরে পড়ছে পথের পাশে, উড়ে আসছে গায়ে। কোথা থেকে চকিতের জন্যে ময়ূরের তীক্ষ্ন চীৎকার ভেসে এল। দুপাশে নিবিড় শালের বন। কোথাও কোথাও ভেতর দিয়ে খানিকটা দৃষ্টি চলে, কখনো কখনো বুনো ঝোপে আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে এক এক টুকরো কাঠের গায়ে লেখা ১৯৩৫, ১৯৪০। মানুষ বনকে শুধু উচ্ছন্ন করতে চায় না, তাকে বাড়াতেও চায়। এই সব প্লটে বিভিন্ন সময়ে নতুন করে শালের চারা রোপণ করা হয়েছে, এ তারই নির্দেশ।

বনের রূপ দেখতে দেখতে চলেছি। মাঝে মাঝে ভয়ও যে না করছিল এমন নয়। এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ যদি গাড়ির এঞ্জিন খারাপ হয়ে যায়, আর তাক বুঝে যদি লাফ মারে একটা বুনো জানোয়ার তা হলে—

তা হলে পকেটের ফাউণ্টেন পেনটা ছাড়া আত্মরক্ষার আর কোনো অস্ত্রই সঙ্গে নেই।

শেষটায় আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে বসলাম—হাঁরে, এখানে বাঘ আছে?

ওরা অনুকম্পার হাসি হাসল।

—হাঁ, হুজুর।

—ভালুক?

রাজ রাজড়ার সহবৎ, কাজেই যতটুকু জিজ্ঞাসা করব ঠিক ততটুকুই উত্তর। ওরা বলল—হাঁ হুজুর।

—অজগর সাপ?

—জী মালিক।

প্রশ্ন করবার উৎসাহ ওই পর্যন্তই এসে থেমে গেল আমার। যে রকম দ্রুত উত্তর দিয়ে যাচ্ছে তাতে কোনো প্রশ্নই যে 'না' বলে আমাকে আশ্বস্ত করবে এমন তো মনে হচ্ছে না। যতদূর মনে হচ্ছিল গরিলা, হিপোপোটেমাস, ভ্যাম্পায়ার কোনো কিছুই বাকি নেই এখানে। জুলু, কিংবা ফিলিপিনোরাও এখানে বিষাক্ত বুমেরাং বাগিয়ে আছে কিনা এবং মানুষ পেলে তারা বেগুনপোড়া করে খেতে ভালোবাসে কিনা এজাতীয় একটা কুটিল জিজ্ঞাসাও আমার মনে জেগে উঠেছে ততক্ষণে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলাম।

খানিকটা আসতেই গাড়িটা ঘস্‌ করে ব্রেক কষল একটা। আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলাম—কিরে, বাঘ নাকি?

আর্দালিরা মুচকি হাসল—না হুজুর, এসে পড়েছি।

ভালো করে তাকিয়ে দেখি, সত্যিই তো। এসে পড়েছি সন্দেহ নেই। পথের বাঁ দিকে ঘন শালবনের ভেতরে একটুখানি ফাঁকা জমি। সেখানে কাঠের তৈরী বাংলা প্যাটার্নের একখানি দোতলা বাড়ি। এই নিবিড় জঙ্গলের ভেতরে যেমন আকস্মিক, তেমনি অপ্রত্যাশিত।

গাড়ির শব্দে বাড়িটার ভেতর থেকে দু-তিন জন চাপরাসী বেরিয়ে এল ব্যতিব্যস্ত হয়ে। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, এবার দেখলাম বাড়ির সামনে চওড়া একটা গড়খাই কাটা। লোকগুলো ধরাধরি করে মস্ত বড় একফালি কাঠ খাদটার ওপরে সাঁকোর মতো বিছিয়ে দিল। তারই ওপর দিয়ে গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল রাজাবাহাদুর এন. আর. চৌধুরীর হান্টিং বাংলোর সামনে।

আরে আরে কী সৌভাগ্য! রাজাবাহাদুর স্বয়ং এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছেন আমার অপেক্ষায়। একগাল হেসে বললেন, আসুন আসুন, আপনার জন্য আমি এখনো চা পর্যন্ত খাইনি।

শ্রদ্ধায় আর বিনয়ে আমার মাথা নিচু হয়ে গেল। মুখে কথা যোগাল

না, শুধু বেকুবের মতো কৃতার্থতার হাসি হাসলাম একগাল।

রাজাবাহাদুর বললেন—এত কষ্ট করে আপনি যে আসবেন সে ভাবতেই পারিনি। বড় আনন্দ হল, ভারী আনন্দ হল। চলুন, চলুন, ওপরে চলুন।

এত গুণ না থাকলে কি আর রাজা হয়! একেই বলে রাজোচিত বিনয়।

রাজাবাহাদুর বললেন—আগে স্নান করে রিফ্রেশড্ হয়ে আসুন, টি ইজ গেটিং রেডি। বোয়, সাহাবকো গোসলখানামে লে যাও।

চল্লিশ বছরের দাড়িওয়ালা বয় নিঃসন্দেহে বাঙালী। তবু হিন্দী করে হুকুমটা দিলেন রাজাবাহাদুর, কারণ ওটাই রাজকীয় দস্তুর। বয় আমাকে গোসলখানায় নিয়ে গেল।

আশ্চর্য, এই জঙ্গলের ভেতরেও এত নিখুঁত আয়োজন। এমন একটা বাথরুমে জীবনে আমি স্নান করিনি। ব্র্যাকেটে তিন-চারখানা সদ্য-পাট-ভাঙা নতুন তোয়ালে, তিনটে দামী সোপ কেসে তিন রকমের নতুন সাবান, র‍্যাকে দামী দামী তেল, লাইম জুস। অতিকায় বাথ্‌টাব—ওপরে ঝাঁঝরি। নিচে টিউবওয়েল থেকে পাম্প করে এখানে ধারাস্নানের ব্যবস্থা। একেবারে রাজকীয় কারবার—কে বলবে এটা কলকাতার গ্র্যান্ড্ হোটেল নয়!

স্নান হয়ে গেল। ব্র্যাকেটে ধোপদুরস্ত ফরাসডাঙার ধুতি, সিল্কের লুঙ্গি, আদ্দির পাজামা। দামের দিক থেকে পাজামাটাই সস্তা মনে হল, তাই পরে নিলাম।

বয় বাইরেই দাঁড়িয়েছিল, নিয়ে গেল ড্রেসিং রুমে। ঘরজোড়া আয়না, পৃথিবীর যা কিছু প্রসাধনের জিনিস কিছু আর বাকি নেই এখানে। ড্রেসিং রুম থেকে বেরুতে সোজা ডাক পড়ল রাজাবাহাদুরের লাউঞ্জে। রাজাবাহাদুর একখানা চেয়ারে চিত হয়ে শুয়ে ম্যানিলা চুরুট খাচ্ছিলেন। বললেন, আসুন চা তৈরী।

চায়ের বর্ণনা না করাই ভালো। চা, কফি, কোকো, ওভ্যালটিন, রুটি, মাখন, পনির, চর্বিতে জমাট ঠান্ডা মাংস। কলা থেকে আরম্ভ করে পিচ্ পর্যন্ত প্রায় দশ রকমের ফল।

সেই গন্ধমাদন থেকে যা পারি গোগ্রাসে গিলে চললাম আমি। রাজাবাহাদুর কখনো এক টুকরো রুটি খেলেন, কখনো একটা ফল। অর্থাৎ কিছুই খেলেন না, শুধু পর পর কাপ তিনেক চা ছাড়া। তারপর আর একটা চুরুট ধরিয়ে বললেন—একবার জানালা দিয়ে চেয়ে দেখুন।

দেখলাম। প্রকৃতির এমন অপূর্ব রূপ জীবনে আর দেখিনি। ঠিক জানালার নিচেই মাটিটা খাড়া তিন-চারশো ফুট নেমে গেছে, বাড়িটা যেন ঝুলে আছে সেই রাক্ষুসে শূন্যতার ওপরে। তলায় দেখা যাচ্ছে ঘন জঙ্গল, তার মাঝ দিয়ে পাহাড়ী নদীর একটা সংকীর্ণ নীলোজ্জ্বল রেখা। যতদূরে দেখা যায়, বিস্তীর্ণ অরণ্য চলেছে প্রসারিত হয়ে; তার সীমান্তে নীল পাহাড়ের প্রহরা।

আমার মুখ দিয়ে শুধু বেরুল—চমৎকার।

রাজাবাহাদুর বললেন—রাইট্। আপনারা কবি মানুষ, আপনাদের তো ভালো লাগবেই। আমারই মাঝে মাঝে কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে মশাই! কিন্তু নিচের ওই যে জঙ্গলটি দেখতে পাচ্ছেন ও'টি বড় সুবিধের জায়গা নয়। টেরাইয়ের ওয়ান্ অব্ দি ফিয়ার্সেস্ট্ ফরেস্ট্স্। একেবারে প্রাগৈতিহাসিক হিংস্রতার রাজত্ব।

আমি সভয়ে জঙ্গলটার দিকে তাকালাম। ওয়ান অব্ দি ফিয়ার্সেস্ট্! কিন্তু ভয় পাওয়ার মতো কিছু তো দেখতে পাচ্ছি না। চারশো ফুট নিচে ওই অতিকায় জঙ্গলটাকে একটা নিরবচ্ছিন্ন বেঁটে গাছের ঝোপ বলে মনে হচ্ছে, নদীর রেখাটাকে দেখাচ্ছে উজ্জ্বল একখানা পাতের মতো। আশ্চর্য সবুজ, আশ্চর্য সুন্দর। অফুরন্ত রোদে ঝলমল করছে অফুরন্ত প্রকৃতি—পাহাড়টা যেন গাঢ় নীল রঙ্ দিয়ে আঁকা। মনে হয়, ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে ওই স্তব্ধ গম্ভীর অরণ্য যেন আদর করে বুকে টেনে নেবে—রাশি রাশি পাতার একটা নরম বিছানার ওপরে। অথচ—

আমি বললাম—ওখানেই শিকার করবেন নাকি?

—ক্ষেপেছেন, নামব কী করে! দেখছেন তো, পেছনে চারশো ফুট খাড়া পাহাড়। আজ পর্যন্ত ওখানে কোনো শিকারীর বন্দুক গিয়ে পৌঁছোয়নি। তবে হ্যাঁ, ঠিক শিকার করি না বটে, আমি মাঝে মাঝে মাছ ধরি ওখান থেকে।

—মাছ ধরেন!—আমি হাঁ করলাম। মাছ ধরেন কী রকম? ওই নদী থেকে নাকি?

—সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য। দরকার হলে পরে দেখতে পাবেন—রাজাবাহাদুর রহস্যময়ভাবে মুখ টিপে হাসলেন: আপাতত শিকারের আয়োজন করা যাক, কিছু না জুটলে মাছের চেষ্টাই করা যাবে। তবে ভালো টোপ ছাড়া আমার পছন্দ হয় না, আর তাতে অনেক হাঙ্গাম।

—কিছু বুঝতে পারছি না।

রাজাবাহাদুর জবাব দিলেন না; শুধু হাসলেন। তারপর ম্যানিলা চুরুটের খানিকটা সুগন্ধি ধোঁয়া ছড়িয়ে বললেন—আপনি রাইফেল ছুঁড়তে জানেন?

বুঝলাম, কথাটাকে চাপা দিতে চাইছেন। সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বাকে দমন করে ফেললাম আমি, এরপরে আর কিছু জিজ্ঞাসা করাটা সঙ্গত হবে না, শোভনও নয়। সেটা কোর্ট ম্যানারের বিরোধী।

রাজাবাহাদুর আবার বললেন—রাইফেল ছুঁড়তে পারেন?

বললাম—ছোট বেলায় এয়ার গান ছুঁড়েছি।

রাজাবাহাদুর হেসে উঠলেন—তা বটে। আপনারা কবি মানুষ, ওসব অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপার আপনাদের মানায় না। আমি অবশ্য বারো বছর বয়সেই রাইফেল হাতে তুলে নিয়েছিলাম। আপনি চেষ্টা করে দেখুন না, কিছু শক্ত ব্যাপার নয়।

উঠে দাঁড়ালেন রাজাবাহাদুর। ঘরের একদিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁকে

অনুসরণ করে আমি দেখলাম—এ শুধু লাউঞ্জ নয়, রীতিমতো একটা ন্যাচারাল মিউজিয়াম এবং অস্ত্রাগার। খাওয়ার টেবিলেই নিমগ্ন ছিলাম বলে এতক্ষণ দেখতে পাইনি, নইলে এর আগেই চোখে পড়া উচিত ছিল।

চারিদিকে সারি সারি নানা আকারের আগ্নেয়াস্ত্র। গোটাচারেক রাইফেল, ছোট বড় নানা রকম চেহারা। একটা হুকের সঙ্গে খাপে আঁটা একজোড়া রিভলবার ঝুলছে; তার পাশেই দুলছে খোলা একখানা লম্বা শেফিল্ডের তরোয়াল—সূর্যের আলোর মতো তার ফলার নিষ্কলঙ্ক রঙ। মোটা চামড়ার বেল্টে ঝকঝকে পেতলের কার্তুজ—রাইফেলের, রিভলবারের। জরিদার খাপে খানতিনেক নেপালী ভোজালি। আর দেওয়ালের গায়ে হরিণের মাথা, ভালুকের মুখ, নানা রকমের চামড়া—বাঘের, সাপের, হরিণের, গো-সাপের। একটা টেবিলে অতিকায় হাতীর মাথা—দুটো বড় বড় দাঁত এগিয়ে আছে সামনের দিকে। বুঝলাম—এরা রাজাবাহাদুরের বীরকীর্তির নিদর্শন।

ছোট একটা রাইফেল তুলে নিয়ে রাজাবাহাদুর বললেন—এটা লাইট জিনিস। তবে ভালো রিপিটার; অনায়াসে বড় বড় জানোয়ার ঘায়েল করতে পারেন।

আমার কাছে অবশ্য সবই সমান। লাইট রিপিটার যা, হাউইট্জার কামানও তাই। তবু সৌজন্য রক্ষার জন্যে বলতে হল—বাঃ, তবে তো চমৎকার জিনিস।

রাজাবাহাদুর রাইফেলটা বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে: তা হলে চেষ্টা করুন। লোড করাই আছে, ছুঁড়ুন ওই জানালা দিয়ে। আমি সভয়ে তিন পা পিছিয়ে গেলাম। জীবনে বেকুবি অনেক করেছি, কিন্তু তার পরিমাণটা আর বাড়াতে প্রস্তুত নই। যুদ্ধ-ফেরৎ এক বন্ধুর মুখে তাঁর রাইফেল ছোঁড়ার প্রথম অভিজ্ঞতা শুনেছিলাম—পড়ে গিয়ে পা ভেঙে নাকি তাঁকে এক মাস বিছানায় পড়ে থাকতে হয়েছিল। নিজেকে যতদূর জানি—আমার ফাঁড়া শুধু পা ভাঙার ওপর দিয়েই কাটবে বলে মনে হয় না।

বললাম—ওটা এখন থাক, পরে হবে না হয়।

রাজাবাহাদুর মৃদু কৌতুকের হাসি হাসলেন। বললেন—এখন ভয় পাচ্ছেন, কিন্তু একবার ধরতে শিখলে আর ছাড়তে চাইবেন না। হাতে থাকলে বুঝবেন কতবড় শক্তিমান আপনি। ইউ ক্যান ইজিলি ফেস অল দ্য রাস্কেল্স অব্—অব্—

হঠাৎ তাঁর চোখ ঝক্ঝক্ করে উঠল। মৃদু হাসিটা মিলিয়ে গিয়ে শক্ত হয়ে উঠল মুখের পেশীগুলো: অ্যান্ড এ রাইভ্যাল—

মুহূর্তে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল আমার। রাজাবাহাদুরের দুচোখে বন্য হিংসা, রাইফেলটা এমন শক্ত মুঠিতে বাগিয়ে ধরেছেন যেন সামনে কাউকে গুলি করার জন্যে তৈরী হচ্ছেন তিনি। উত্তেজনার ঝোঁকে আমাকেই যদি লক্ষ্যভেদ করে বসেন তা হলে—

আতঙ্কে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম আমি। কিন্তু ততক্ষণে মেঘ

কেটে গেছে—রাজা-রাজড়ার মেজাজ ! রাজাবাহাদুর হাসলেন।

—ওয়েল, পরে আপনাকে তালিম দেওয়া যাবে। সবই তো রয়েছে, যেটা খুশি আপনি ট্রাই করতে পারেন। চলুন, এখন বারান্দায় গিয়ে বসা যাক, লেট্স্ হ্যাভ সাম এনার্জি।

প্রাতরাশেই প্রায় বিন্ধ্যপর্বত উদরসাৎ করা হয়েছে, আর কী হলে এনার্জি সঞ্চিত হবে বোঝা শক্ত। কিন্তু কথাটা বলেই রাজাবাহাদুর বাইরের বারান্দার দিকে পা বাড়িয়েছেন। সুতরাং আমাকেও পিছু নিতে হল।

বাইরের বারান্দায় বেতের চেয়ার, বেতের টেবিল। এখানে ঢোকবার পরে এত বিচিত্র রকমের আসনে বসছি যে আমি প্রায় নার্ভাস হয়ে উঠেছি। তবু যেন বেতের চেয়ারে বসতে পেয়ে খানিকটা সহজ অন্তরঙ্গতা অনুভব করা গেল। এটা অন্তত চেনা জিনিস।

আর বসবার সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেল এনার্জি কথাটার আসল তাৎপর্য কী। বেয়ারা তৈরীই ছিল, ট্রেতে করে একটি ফেনিল গ্লাস সামনে এনে রাখল —অ্যাল্‌কোহলের উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে গেল বাতাসে।

রাজাবাহাদুর স্মিত হাস্যে বললেন—চলবে ?

সবিনয়ে জানালাম, না।

—তবে বিয়ার আনাবো ? একেবারে মেয়েদের ড্রিঙ্ক। নেশা হবে না।

—নাঃ, থাক। অভ্যেস নেই কোনোদিন।

—হুঁঃ, গুড কন্ডাক্টের প্রাইজ পাওয়া ছেলে! রাজাবাহাদুরের সুরে অনুকম্পার আভাস : আমি কিন্তু চোদ্দ বছর বয়সেই প্রথম ড্রিঙ্ক ধরি।

রাজা-রাজড়ার ব্যাপার—সবই অলৌকিক। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই কেউটের বাচ্চা। সুতরাং মন্তব্য অনাবশ্যক। ট্রে বার বার যাতায়াত করতে লাগল। রাজাবাহাদুরের প্রখর উজ্জ্বল চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে এল ক্রমশ, ফর্সা গোলাপী রং ধরল। হঠাৎ অসুস্থ দৃষ্টিতে তিনি আমার দিকে তাকালেন।

—আচ্ছা বলতে পারেন, আপনি রাজা নন কেন ?

এরকম একটা প্রশ্ন করলে বোকার মতো দাঁত বের করে থাকা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। আমিও তাই করলাম।

—বলতে পারলেন না ?

—না।

—আপনি মানুষ মারতে পারেন ?

এ আবার কী রকম কথা ! আমার আতঙ্ক জাগল।

—না।

—তা হলে বলতে পারবেন না। ইউ আর্ অ্যাব্‌সোলিউট্‌লি হোপলেস।

উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের দিকে পা পাড়ালেন রাজাবাহাদুর। বলে গেলেন : আই পিটি ইউ।

বুঝলাম নেশাটা বেশ চড়েছে। আমি আর কথা বাড়ালাম না, চুপ করে বসে রইলাম সেখানেই। খানিক পরেই ঘরের ভেতরে নাক ডাকার শব্দ।

তাকিয়ে দেখি তাঁর লাউঞ্জের সেই চেয়ারটায় হাঁ করে ঘুমুচ্ছেন রাজাবাহাদুর, মুখের কাছে কতকগুলো মাছি উড়ছে ভনভন করে।

* * * *

সেই দিন রাত্রেই শিকারের প্রথম অভিজ্ঞতা।

জঙ্গলের ভেতরে বসে আছি মোটরে। দুটো তীব্র হেড লাইটের আলো পড়েছে সামনের সংকীর্ণ পথে আর দুধারের শালবনে। ওই আলোকরেখার বাইরে অবশিষ্ট জঙ্গলটায় যেন প্রেত-পুরীর জমাট অন্ধকার। রাত্রির তমসায় আদিম হিংসা সজাগ হয়ে উঠেছে চারিদিকে—অনুভব করছি সমস্ত স্নায়ু দিয়ে। এখানে হাতীর পাল ঘুরছে দূরের কোনো পাহাড়ের পাথর গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে, ঝোপের ভেতরে অজগর প্রতীক্ষা করে আছে অসতর্ক শিকারের আশায়, আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় উৎকর্ণ হয়ে আছে হরিণের পাল আর কোনো একটা খাদের ভেতরে জ্বলজ্বল করছে ক্ষুধার্ত বাঘের চোখ। কালো রাত্রিতে জেগে আছে কালো অরণ্যের প্রাথমিক জীবন।

রোমাঞ্চিত ভীত প্রতীক্ষায় চুপ করে বসে আছি মোটরের মধ্যে। কিন্তু হিংসার রাজত্ব শালবন ডুবে আছে একটা আশ্চর্য স্তব্ধতায়। শুধু কানের কাছে অবিশ্রান্ত মশার গুঞ্জন ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। মাঝে মাঝে অল্প অল্প বাতাস দিচ্ছে—শালের পাতায় উঠছে এক একটা মৃদু মর্মর। আর কখনো কখনো ডাকছে বনমুরগী, ঘুমের মধ্যে পাখা ঝাপটাচ্ছে ময়ূর। মনে হচ্ছে এই গভীর ভয়ংকর অরণ্যের ভয়ংকর প্রাণীগুলো যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে একটা নিশ্চিত কোনো মুহূর্তের প্রতীক্ষা করে আছে।

আমরাও প্রতীক্ষা করে আছি। মোটরের মধ্যে নিঃসাড় হয়ে বসে আছি আমরা—একটি কথা বলবার উপায় নেই। রাইফেলের একটা ঝকঝকে নল এঞ্জিনের ওপরে বাড়িয়ে দিয়ে শিকারী বাঘের মতোই তাকিয়ে আছেন রাজাবাহাদুর। চোখদুটো উদগ্র প্রখর হয়ে আছে হেড লাইটের তীব্র আলোকরেখাটার দিকে, একটা জানোয়ার ওই রেখাটা পেরুবার দুঃসাহস করলেই রাইফেল গর্জন করে উঠবে।

কিন্তু জঙ্গলে সেই আশ্চর্য স্তব্ধতা। অরণ্য যেন আজ রাত্রে বিশ্রাম করছে, একটি রাত্রের জন্যে ক্লান্ত হয়ে জানোয়ারগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে খাদের ভেতরে, ঝোপের আড়ালে। কেটে চলেছে মন্থর সময়। রাজাবাহাদুরের হাতের রেডিয়াম ডায়াল ঘড়িটা একটা সবুজ চোখের মত জ্বলছে, রাত দেড়টা পেরিয়ে গেছে। ক্রমশ উসখুস করছেন উৎকর্ণ রাজাবাহাদুর।

—নাঃ, হোপলেস। আজ আর পাওয়া যাবে না।

বহুদূর থেকে একটা তীক্ষ্ণ গম্ভীর শব্দ, হাতীর ডাক। ময়ূরের পাখা ঝাপটানি চলছে মাঝে মাঝে। এক ফাঁকে একটা প্যাঁচা চেঁচিয়ে উঠল, রাত্রি ঘোষণা করে গেল শেয়ালের দল। কিন্তু কোথায় বাঘ, কোথায় বা ভালুক? অন্ধকার বনের মধ্যে দ্রুত কতকগুলো খুরের আওয়াজ—পালিয়ে গেল হরিণের পাল।

কিন্তু কোনো ছায়া পড়ছে না আলোকবৃত্তের ভেতরে। মশার কামড় যেন অসহ্য হয়ে উঠছে।

—বৃথাই গেল রাতটা।—রাজাবাহাদুরের কণ্ঠস্বরে পৃথিবীর সমস্ত বিরক্তি ভেঙে পড়ল: ডেভিল্‌ লাক। সীটের পাশ থেকে একটা ফ্লাস্‌ক তুলে নিয়ে ঢক্‌ ঢক্‌ করে ঢাললেন গলাতে, ছড়িয়ে পড়ল হুইস্কির উগ্র কটু গন্ধ।

—থ্যাঙ্ক হেভেন্‌স।—রাজাবাহাদুর হঠাৎ নড়ে বসলেন চকিত হয়ে। নক্ষত্রবেগে হাতটা চলে গেল রাইফেলের ট্রিগারে। শিকার এসে পড়েছে।

আমিও দেখলাম। বহুদূরে আলোর রেখাটার ভেতরে কী একটা জানোয়ার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এমন একটা জোরালো আলো চোখে পড়াতে কেমন দিশেহারা হয়ে গেছে, তাকিয়ে আছে এই দিকেই। দুটো জোনাকির বিন্দুর মতো চিক চিক করছে তার চোখ।

ড্রাইভার বললে—হায়না।

—ড্যাম।—রাইফেল থেকে হাত সরিয়ে নিলেন রাজাবাহাদুর। কিন্তু পরমুহূর্তেই চাপা উত্তেজিত গলায় বললেন—থাক, আজ ছুঁচোই মারব।

দুম্‌ করে রাইফেল গর্জন করে উঠল। কানে তালা ধরে গেল আমার, বারুদের গন্ধে বিস্বাদ হয়ে উঠল নাসারন্ধ্র। অব্যর্থ লক্ষ্য রাজাবাহাদুরের—পড়েছে জানোয়ারটা।

ড্রাইভার বললে—তুলে আনব হুজুর?

বিরক্তমুখে রাজাবাহাদুর বললেন, কী হবে? গাড়ি ঘোরাও।

রেডিয়াম ডায়ালের সবুজ আলোয় রাত তিনটে। গাড়ি ফিরে চলল হান্টিং বাংলোর দিকে। একটা ম্যানিলা চুরুট ধরিয়ে রাজাবাহাদুর আবার বললেন—ড্যাম!

কিন্তু কী আশ্চর্য—জঙ্গল যেন রসিকতা শুরু করেছে আমাদের সঙ্গে। দিনের বেলা অনেক চেষ্টা করেও দুটো একটা বনমুরগী ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না—এমন কি একটা হরিণ পর্যন্ত নয়। নাইট্‌-সুটিংয়েও সেই অবস্থা। পর পর তিন রাত্রি জঙ্গলের নানা জায়গায় গাড়ি নামিয়ে চেষ্টা করা হল, কিন্তু নগদ লাভ যা ঘটল তা অমানুষিক মশার কামড়। জঙ্গলের হিংস্র জন্তুর সাক্ষাৎ মিলল না বটে, কিন্তু মশাগুলোকে চিনতে পারা গেল। এমন সাংঘাতিক মশা যে পৃথিবীর কোথাও থাকতে পারে এতদিন এ ধারণা ছিল না আমার।

তবে মশার কামড়ের ক্ষতিপূরণ চলতে লাগল গন্ধমাদন উজাড় করে। সত্যি বলতে কি, শিকার করতে না পারলেও মনের দিক থেকে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ ছিল না আমার। জঙ্গলের ভেতরে এমন রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন কল্পনারও বাইরে। জীবনে এমন দামী খাবার কোনো দিন মুখে তুলিনি, এমন চমৎকার বাথরুমে স্নান করিনি কখনো, এত পুরু জাজিমের বিছানায় শুয়ে অস্বস্তিতে প্রথম দিন তো ঘুমুতেই পারিনি আমি। নিবিড় জঙ্গলের নেপথ্যে

গ্র্যান্ড হোটেলের স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাচ্ছি—শিকার না হলেও কণামাত্রও ক্ষতি নেই আমার। প্রত্যেক দিনই লাউঞ্জে চা খেতে খেতে চারশো ফুট নিচেকার ঘন জঙ্গলটার দিকে চোখ পড়ে। সকালের আলোয় উদ্ভাসিত শ্যামলতা দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়ে আছে অপরূপ প্রসন্নতায়। ওয়ান অব দি ফিয়ার্সেস্ট্ ফরেস্ট্স্। বিশ্বাস হয় না। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি বাতাসে আকারঅবয়বহীন পত্রাবরণ সবুজ সমুদ্রের মত দুলছে, চক্র দিচ্ছে পাখির দল—এখান থেকে মৌমাছির মতো দেখায় পাখিগুলোকে ; জানালার ঠিক নিচেই ইস্পাতের ফলার মতো পাহাড়ী নদীটার নীলিমোজ্জ্বল রেখা—দুটো একটা নুড়ি ঝকমক করে মণিখণ্ডের মতো। বেশ লাগে।

তার পরেই চমক ভাঙে আমার। তাকিয়ে দেখি ঠোঁটের কোণে ম্যানিলা চুরুট পুড়ছে, অস্থির চঞ্চল পায়ে রাজাবাহাদুর ঘরের ভেতরে পায়চারি করছেন। চোখে মুখে একটা চাপা আক্রোশ—ঠোঁঠ দুটোয় নিষ্ঠুর কঠিনতা। কখনো একটা রাইফেল তুলে নিয়ে বিরক্তিভরে নামিয়ে রাখেন, কখনো ভোজালি তুলে নিয়ে নিজের হাতের ওপরে ফলাটা রেখে পরীক্ষা করেন সেটার ধার, আবার কখনো বা জানালার সামনে খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন নিচের জঙ্গলটার দিকে। আজ তিন দিন থেকে উল্লেখযোগ্য একটা কিছু শিকার করতে পারেননি—ক্ষোভে তাঁর দাঁতগুলো কড়মড় করতে থাকে।

তার পরেই বেরিয়ে যান এনার্জি সংগ্রহের চেষ্টায়। বাইরের বারান্দায় গিয়ে হাঁক দেন—পেগ।

কিন্তু পরের পয়সায় রাজভোগ খেয়ে এবং রাজোচিত বিলাস করে বেশি দিন কাটানো আর সম্ভব নয় আমার পক্ষে। রাজাবাহাদুরের অনুগ্রহ একটা দামী জিনিস বটে, কিন্তু কলকাতায় আমার ঘর সংসার আছে, তার একটা দায়িত্ব আছে। সুতরাং চতুর্থ দিন সকালে কথাটা আমাকে পাড়তে হল।

বললাম, এবারে আমাকে বিদায় দিন রাজাবাহাদুর।

রাজাবাহাদুর সবে চতুর্থ পেগে চুমুক দিয়েছেন তখন। তেমনি অসুস্থ আর রক্তাভ চোখে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, আপনি যেতে চান?

—হাঁ, কাজকর্ম রয়েছে—

—কিন্তু আমার শিকার আপনাকে দেখাতে পারলাম না।

—সে না হয় আর একবার হবে।

—হুম্। চাপা ঠোঁটের ভেতরেই একটা গম্ভীর আওয়াজ করলেন রাজাবাহাদুর : আপনি ভাবছেন আমার ওই রাইফেলগুলো, দেওয়ালে ওই সব শিকারের নমুনা—ওগুলো সব ফার্স?

আমি সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম, না, না, তা কেন ভাবতে যাব। শিকার তো খানিকটা অদৃষ্টের ব্যাপার—

—হুম্!—অদৃষ্টকেও বদলানো চলে।—রাজাবাহাদুর উঠে পড়লেন : আমার সঙ্গে আসুন।

দুজনে বেরিয়ে এলাম। রাজাবাহাদুর আমাকে নিয়ে এলেন হাণ্টিং বাংলোর পেছন দিকটাতে। ঠিক সেখানে—যার চারশো ফুট নিচে টেরাইয়ের অন্যতম হিংস্র অরণ্য বিস্তীর্ণ হয়ে আছে।

এখানে আসতে আর একটা নতুন জিনিস চোখে পড়ল। দেখি কাঠের একটা রেলিং দেওয়া সাঁকোর মতো জিনিস সেই সীমাহীন শূন্যতার ওপরে প্রায় পনেরো ষোলো হাত প্রসারিত হয়ে আছে। তার পাশে দুটো বড় বড় কাঠের চাকা, তাদের সঙ্গে হুক্ লাগানো দুজোড়া মোটা কাছি জড়ানো। জিনিসগুলো কী ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—আসুন।—রাজাবাহাদুর সেই ঝুলন্ত সাঁকোটার ওপরে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমিও গেলাম তাঁর পেছনে পেছনে। একটা আশ্চর্য বন্দোবস্ত। ঠিক সাঁকোটার নিচেই পাহাড়ী নদীটার রেখা, নুড়ি মেশানো সংকীর্ণ বালুতট তার দুপাশে, তাছাড়া জঙ্গল আর জঙ্গল। নীচে তাকাতে আমার মাথা ঘুরে উঠল। রাজাবাহাদুর বললেন, জানেন এসব কী ?

—না।

—আমার মাছ ধরবার বন্দোবস্ত। এর কাজ খুব গোপনে—নানা হাঙ্গামা আছে। কিন্তু অব্যর্থ।

—ঠিক বুঝতে পারছি না।

—আজ রাত্রেই বুঝতে পারবেন। শিকার দেখাতে আপনাকে ডেকে এনেছি, নতুন একটা শিকার দেখাব। কিন্তু কোনোদিন এর কথা কারো কাছে প্রকাশ করতে পারবেন না।

কিছু না বুঝেই মাথা নাড়লাম—না।

—তা হলে আজ রাতটা অবধি থাকুন। কাল সকালেই আপনার গাড়ির ব্যবস্থা করব। রাজাবাহাদুর আবার হাণ্টিং বাংলোর সম্মুখের দিকে এগোলেন ঃ কাল সকালের পরে এমনিতেই আপনার আর এখানে থাকা চলবে না।

একটা কাঠের সাঁকো, দুটো কপিকলের মতো জিনিস। মাছ ধরবার ব্যবস্থা। কাউকে বলা যাবে না এবং কাল সকালেই চলে যেতে হবে। সবটা মিলিয়ে যেন রহস্যের খাসমহল একেবারে। আমার কেমন এলোমেলো লাগতে লাগল সমস্ত। কিন্তু ভালো করে জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না, রাজাবাহাদুরকে বেশী প্রশ্ন করতে কেমন অস্বস্তি লাগে আমার। অনধিকার চর্চা মনে হয়।

বাংলোর সামনে তিন-চারটে ছোট ছোট নোংরা ছেলেমেয়ে খেলা করে বেড়াচ্ছে, হিন্দুস্থানী কীপারটার বেওয়ারিশ সম্পত্তি। কীপারটাকে সকালে রাজাবাহাদুর শহরে পাঠিয়েছেন, কিছু দরকারী জিনিসপত্র কিনে কাল সে ফিরবে। ভারী বিশ্বাসী আর অনুগত লোক। মাতৃহীন ছেলেমেয়েগুলো সারাদিন হুটোপুটি করে ডাকবাংলোর সামনে। রাজাবাহাদুর বেশ অনুগ্রহের চোখে দেখেন ওদের। দোতলার জানালা থেকে পয়সা, রুটি

কিংবা বিস্কুট ছুঁড়ে দেন, নিচে ওরা সেগুলো নিয়ে কুকুরের মতো লোফালুফি করে। রাজাবাহাদুর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন সকৌতুকে।

আজও ছেলেমেয়েগুলো হুল্লোড় করে তাঁর চারিপাশে এসে ঘিরে দাঁড়ালো। বলল—হুজুর, সেলাম।—রাজাবাহাদুর পকেটে হাত দিয়ে কতকগুলো পয়সা ছড়িয়ে দিলেন ওদের ভেতরে। হরির লুটের মতো কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।

বেশ ছেলেমেয়েগুলি। দুই থেকে আট বছর পর্যন্ত বয়েস। আমার ভারী ভালো লাগে ওদের। আরণ্যক জগতের শাল শিশুদের মতো সতেজ আর জীবন্ত প্রকৃতির ভেতর থেকে প্রাণ আহরণ করে যেন বড় হয়ে উঠেছে।

সন্ধ্যায় ডিনার টেবিলে বসে আমি বললাম, আজ রাত্রে মাছ ধরবার কথা আছে আপনার।

চোখের কোণা দিয়ে আমার দিকে তাকালেন রাজাবাহাদুর। লক্ষ্য করেছি আজ সমস্ত দিন বড় বেশি মদ খাচ্ছেন আর ক্রমাগত চুরুট টেনে চলেছেন। ভালো করে আমার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেননি। ভেতরে ভেতরে কিছু একটা চলেছে তাঁর।

রাজাবাহাদুর সংক্ষেপে বললেন—হুম্।

আমি সসংকোচে জিজ্ঞাসা করলাম, কখন হবে ?

একমুখ ম্যানিলা চুরুটের ধোঁয়া ছড়িয়ে তিনি জবাব দিলেন—সময় হলে ডেকে পাঠাব। এখন আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন। স্বচ্ছন্দে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে পারেন।

শেষ কথাটা পরিষ্কার আদেশের মতো শোনালো। বুঝলাম আমি বেশিক্ষণ আজ তাঁর সঙ্গে কথা বলি এ তিনি চান না। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে বলাটা অতিথিপরায়ণ গৃহস্থের অনুনয় নয়, রাজার নির্দেশ। এবং সে নির্দেশ পালন করতে বিলম্ব না করাই ভালো।

কিন্তু অতি নরম জাজিমের বিছানায় শুয়েও ঘুম আসছে না। মাথার ভেতরে আবর্তিত হচ্ছে অসংলগ্ন চিন্তা। মাছ ধরা, কাঠের সাঁকো, কপিকল অত্যন্ত গোপনীয়! অতল রহস্য!

তারপর এপাশ ওপাশ করতে করতে কখন যে চৈতন্য আচ্ছন্ন হয়ে এল তা আমি নিজেই টের পাইনি।

মুখের ওপরে ঝাঁঝালো একটা টর্চের আলো পড়তে আমি ধড়মড় করে উঠে পড়লাম। রাত তখন ক'টা ঠিক জানি না। আরণ্যক পরিবেশ নির্জনতায় অভিভূত। বাইরে শুধু তীব্রকণ্ঠ ঝিঁঝিঁর ডাক।

আমার গায়ে বরফের মতো ঠাণ্ডা একটা হাত পড়েছে কার। সে হাতের স্পর্শে পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে গেল আমার। রাজাবাহাদুর বললেন—সময় হয়েছে, চলুন।

আমি কী বলতে যাচ্ছিলাম—ঠোঁটে আঙুল দিলেন রাজাবাহাদুর।

—কোনো কথা নয় আসুন।

এই গভীর রাত্রে এমনি নিঃশব্দ আহ্বান সবটা মিলিয়ে একটা রোমাঞ্চকর উপন্যাসের পটভূমি তৈরী হয়েছে যেন। কেমন একটা অস্বস্তি, একটা অনিশ্চিত ভয়ে গা ছমছম করতে লাগল আমার। মন্ত্রমুগ্ধের মতো রাজাবাহাদুরের পেছনে পেছনে বেরিয়ে এলাম।

হাণ্টিং বাংলোটা অন্ধকার। একটা মৃত্যুর শীতলতা ঢেকে রেখেছে তাকে। একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক—চারদিকে অরণ্যে কান্নার শব্দের মতো পত্রমর্মর। গভীর রাত্রিতে জঙ্গলের মধ্যে মোটর থামিয়ে বসে থাকতে আমার ভয় করছিল, আজও ভয় করছে। কিন্তু এ ভয়ের চেহারা আলাদা—এর মধ্যে আর একটা কী যেন মিশে আছে ঠিক বুঝতে পারছি না, অথচ পা-ও সরতে চাইছে না আমার। মুখের ওপর একটা টর্চের আলো, রাজাবাহাদুরের হাতের স্পর্শটা বরফের মতো ঠাণ্ডা, ঠোঁটে আঙুল দিয়ে নীরবতার সেই দুর্বোধ্য কুটিল সংকেত।

টর্চের আলোয় পথ দেখিয়ে রাজাবাহাদুর আমাকে সেই ঝুলন্ত সাঁকোটার কাছে নিয়ে এলেন। দেখি তার ওপরে শিকারের আয়োজন। দুখানা চেয়ার পাতা, দুটো তৈরী রাইফেল। দুজন বেয়ারা একটা কপিকলের চাকা ঘুরিয়ে কী একটা জিনিস নামিয়ে দিচ্ছে নিচের দিকে। এক মুহূর্তের জন্য রাজাবাহাদুর তাঁর নয় সেলের হাণ্টিং টর্চটা নিচের দিকে ফ্ল্যাশ করলেন। প্রায় আড়াইশো ফুট নিচে সাদা পুঁটলির মতো কী একটা জিনিস কপিকলের দড়ির সঙ্গে নেমে যাচ্ছে দ্রুতবেগে।

আমি বললাম, ওটা কী রাজাবাহাদুর ?

—মাছের টোপ।

—কিন্তু এখনো কিছু বুঝতে পারছি না।

—একটু পরে বুঝবেন। এখন চুপ করুন।

এবারে স্পষ্ট ধমক দিলেন আমাকে। মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ করে হুইস্কির তীব্র গন্ধ বেরুচ্ছে। রাজাবাহাদুর প্রকৃতিস্থ নেই। আর কিছুই বুঝতে পারছি না আমি—আমার মাথার ভেতরে সব যেন গণ্ডগোল হয়ে গেছে। দুর্বোধ্য নাটকের নির্বাক দ্রষ্টার মতো রাজাবাহাদুরের পাশের চেয়ারটাতে আসন নিলাম আমি।

ওপরে ঘন কালো বনান্তের ওপরে ভাঙা চাঁদ দেখা দিল। তার খানিকটা ম্লান আলো এসে পড়ল চারশো ফুট নিচের নদীর জলে, তার ছড়ানো মণিখণ্ডের মতো নুড়িগুলোর ওপরে। আবছা ভাবে যেন দেখতে পাচ্ছি—কপিকলের দড়ির সঙ্গে বাঁধা সাদা পুঁটলিটা অল্প অল্প নড়ছে বালির ওপরে। এক হাতে রাজাবাহাদুর রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে আছেন, আর এক হাতে মাঝে মাঝে আলো ফেলছেন নিচের পুঁটলিটায়। চকিত আলোয় যেটুকু মনে হচ্ছে—পুঁটলিটা যেন জীবন্ত, অথচ কী জিনিস কিছু বুঝতে পারছি না। এ নাকি মাছের টোপ। কিন্তু কী এ মাছ—এ কিসের টোপ ?

আবার সেই স্তব্ধতার প্রতীক্ষা। মুহূর্ত কাটছে, মিনিট কাটছে, ঘণ্টা

কাটছে। রাজাবাহাদুরের টর্চের আলো বারে বারে পিছলে পড়ছে নিচের দিকে। দিগন্তপ্রসার হিংস্র অরণ্য ভাঙা ভাঙা জ্যোৎস্নায় দেখাচ্ছে তরঙ্গিত একটা সমুদ্রের মতো। নিচের নদীটা ঝকঝক করছে যেন একখানা খাপখোলা তলোয়ার। অবাক বিস্ময়ে আমি বসে আছি। মিনিট কাটছে, ঘণ্টা কাটছে। টোপ ফেলে মাছ ধরছেন রাজাবাহাদুর।

অথচ সব ধোঁয়াটে লাগছে আমার। কান পেতে শুনছি—ঝিঁঝিঁর ডাক, দূরে হাতির গর্জন, শালপাতার মর্মর। এ প্রতীক্ষার তত্ত্ব আমার কাছে দুর্বোধ্য। শুধু হুইস্কি আর ম্যানিলা চুরুটের গন্ধ নাকে এসে লাগছে আমার। মিনিট কাটছে, ঘণ্টা কাটছে। রেডিয়াম ডায়াল ঘড়ির কাঁটা চলেছে ঘুরে। ক্রমশ যেন সম্মোহিত হয়ে গেলাম, ক্রমশ যেন ঘুম এল আমার। তার পরেই হঠাৎ কানের কাছে বিকট শব্দে রাইফেল সাড়া দিয়ে উঠল—চারশো ফুট নিচ থেকে ওপরের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠল প্রচণ্ড বাঘের গর্জন। চেয়ারটা সুদ্ধ আমি কেঁপে উঠলাম।

টর্চের আলোটা সোজা পড়ছে নুড়িছড়ানো বালির ডাঙাটার ওপরে। পরিষ্কার দেখতে পেলাম ডোরাকাটা অতিকায় একটা বিশাল জানোয়ার সাদা পুঁটলিটার ওপরে একখানা থাবা চাপিয়ে দিয়ে পড়ে আছে, সাপের মতো ল্যাজ আছড়াচ্ছে অন্তিম আক্ষেপে। ওপর থেকে ইন্দ্রের বজ্রের মতো অব্যর্থ গুলি গিয়ে লেগেছে তার মাথায়। এত ওপর থেকে এমন দুর্নিবার মৃত্যু নামবে আশঙ্কা করতে পারেনি। রাজাবাহাদুর সোৎসাহে বললেন—ফতে!

এতক্ষণে মাছ ধরবার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। সোৎসাহে সোল্লাসে বললাম, মাছ তো ধরলেন, ডাঙায় তুলবেন কেমন করে?

—ওই কপিকল দিয়ে। এই জন্যেই তো ওগুলোর ব্যবস্থা।

ব্যাপারটা যেমন বিচিত্র, তেমনি উপভোগ্য। আমি রাজাবাহাদুরকে অভিনন্দিত করতে যাব, এমন সময়—এমন সময়—পরিষ্কার শুনতে পেলাম শিশুর গোঙানি। ক্ষীণ অথচ নির্ভুল। ও কিসের শব্দ!

চারশো ফুট নিচ থেকে ওই শব্দটা আসছে। হ্যাঁ—কোনো ভুল নেই! মুখের বাঁধন খুলে গেছে, কিন্তু বড় দেরিতে। আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল, আমার চুল খাড়া হয়ে উঠল। আমি পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলাম, রাজাবাহাদুর, কিসের টোপ আপনার! কী দিয়ে আপনি মাছ ধরলেন?

—চুপ—একটা কালো রাইফেলের নল আমার বুকে ঠেকালেন রাজাবাহাদুর। তার পরেই আমার চারদিকে পৃথিবীটা পাক খেতে খেতে হাওয়ায় গড়া একটা বুদ্বুদের মতো শূন্যে মিলিয়ে গেল! রাজাবাহাদুর জাপটে না ধরলে চারশো ফুট নিচেই পড়ে যেতাম হয়তো।

* * *

কীপারের একটা বেওয়ারিশ ছেলে যদি জঙ্গলে হারিয়ে গিয়ে থাকে, তা অস্বাভাবিক নয়, তাতে কারো ক্ষতি নেই। কিন্তু প্রকাণ্ড রয়্যাল বেঙ্গলটা

মেরেছিলেন রাজাবাহাদুর—লোককে ডেকে দেখানোর মতো।

তার আট মাস পরে এই চমৎকার চটিজোড়া উপহার এসেছে। আট মাস আগেকার সে রাত্রি এখন স্বপ্ন হয়ে যাওয়াই ভালো, কিন্তু এই চটিজোড়া অতি মনোরম বাস্তব। পায়ে দিয়ে একবার হেঁটে দেখলাম যেমন নরম, তেমনি আরাম।

শৈব্যা

শেষ পর্যন্ত ট্রেনটা যখন রাজঘাটে গঙ্গার পুলের ওপরে এসে উঠল, তখন নীরদা আর চোখের জল রোধ করতে পারল না। তার গাল দুটি অশ্রুতে প্লাবিত হয়ে গেল।

চারদিক মুখরিত করে জনতার জয়ধ্বনি উঠেছে। হর হর মহাদেব, জয় বাবা বিশ্বনাথ। যাত্রীরা মুঠো মুঠো করে পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছে গঙ্গার জলে। বেণীমাধবের উদ্ধত ধ্বজা দুটো সকালের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, চিতার নীলাভ ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে দুর্নিরীক্ষ্য মণিকর্ণিকার ঘাট থেকে। অর্ধচন্দ্রাকার গঙ্গার তীরে হিন্দুর তীর্থশ্রেষ্ঠ বারাণসী সবে ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে।

রাধাকান্ত বিব্রত বোধ করছিলেন। চাপা গলায় বললেন, চুপ কর্, সবাই দেখতে পাচ্ছে যে।

আকুল কণ্ঠে নীরদা বললে, দেখুক গে।

—আঃ থাম্ থাম্। কোনো ভয় নেই তোর, আমি বলছি সব ঠিক হয়ে যাবে।

সব ঠিক হয়ে যাবে। একথা আগেও অনেক বার বলেছেন রাধাকান্ত। কিন্তু কিছুই ঠিক হয়নি। জটিলতা ক্রমেই বেড়ে উঠেছে এবং শেষ পর্যন্ত গ্রন্থিমোচন করবার জন্যে রাধাকান্ত নীরদাকে সর্বং-সহ পুণ্যভূমি কাশীধামে এনে হাজির করেছেন। তাঁরই বাড়িতে আশ্রিত বালবিধবা জ্ঞাতির মেয়ের কাছ থেকে বংশধর তিনি কামনা করেন না। ধার্মিক এবং চরিত্রবান বলে তাঁর খ্যাতি আছে এবং পত্নী-পুত্র-কন্যা পরিবৃত সংসার আছে, সর্বোপরি সমাজ তো আছেই। আর যাই হোক তিনি সাধারণ মানুষ—দেবতা নন!

ক্যান্টনমেন্টে এসে ট্রেন থামল। চেনা পান্ডাকে আগেই চিঠি দেওয়া ছিল—টাঙ্গা করে সে-ই নিয়ে গেল কচুরিগলির বাসায়। তারপর যথানিয়মে বেনারসের পুলিস চৌষট্টি যোগিনীর ঘাটে কুড়িয়ে পেল আর একটি নামগোত্রহীন নবজাতকের মৃতদেহ।

ততদিনে রাধাকান্ত দেশে ফিরে গিয়েছেন। বৈঠকখানায় হুঁকো নিয়ে বসে আলোচনা করছেন নারীজাতির পাপপ্রবণতা সম্পর্কে। বাচস্পতির দিকে হুঁকোটা বাড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন, সেই যে হিতোপদেশে আছে না? গাভী যেরূপ নিত্য নব নব তৃণভক্ষণের আকাঙ্ক্ষা করে, সেইরূপ স্ত্রীলোকও

কদর্য একটা সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করে বাচস্পতি রাধাকান্তের বক্তব্যটাকে আরো প্রাঞ্জল করে দিলেন।

এদিকে পাণ্ডা মহাদেব তেওয়ারীর আর ধৈর্য থাকল না।

একদিন অগ্নিমূর্তি হয়ে এসে বললে, এবার বেরোও আমার বাড়ি থেকে।

মড়ার চোখের মতো দুটো ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি মহাদেবের মুখের ওপরে ফেলে নীরদা কথা বললে। এত আস্তে আস্তে বললে যে বহু যত্নে কান খাড়া করে কথাটা শুনতে হল মহাদেবকে।

গাঁজার নেশায় চড়া মেজাজ মুহূর্তের জন্যে নেমে এল মহাদেবের। ওই অদ্ভুত চোখ দুটো—ওই শবের মতো বিচিত্র শীতল দৃষ্টি তার কেমন অমানুষিক বলে মনে হয়, কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হয় তার। যেন পাথরের ওপরে ঘা দিচ্ছে, পাথরের কিছুই হবে না, প্রতিঘাতটা ফিরে আসবে তারই দিকে। ভয়, উৎকণ্ঠা, অপমান ও অপরাধ—সবকিছু জড়িয়ে কোন্ একটা নির্বেদলোকে পৌঁছে গেছে নীরদা।

মহাদেব কুঁকড়ে গিয়ে বললে, আজ চার মাহিনা হয়ে গেল টাকাপয়সা কিছু পাইনি। আমি তো আর দানছত্র খুলে বসিনি।

নীরদা তেমনি অস্পষ্ট গলায় বললে, আমি কী করব ?

আবার জ্বলে উঠল মহাদেব, বিশ্রী একটা অঙ্গভঙ্গি করে বললে, ডালমণ্ডি থেকে রোজগার করে আনো।—তোমার যৌবন আছে, কাশীতে রেইস আদমিরও অভাব নেই।

কিন্তু কথাটা বলেই মহাদেব আবার লজ্জা পেলো। নীরদার দিক থেকে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিয়ে চলে যেতে যেতে বললে, নইলে পথ দেখো।

পথই দেখতে হবে নীরদাকে। যে পঙ্ককুণ্ড আর গ্লানির ভেতরে তাকে নামিয়ে রেখে রাধাকান্ত সরে পড়েছে, তারপরে পথ ছাড়া কিছু আর দেখবার নেই। যাওয়ার আগে রাধাকান্ত তাঁর অভ্যস্ত রীতিতে সান্ত্বনা দিয়ে গিয়েছিলেন, কোন ভাবনা নেই, মাসে মাসে আমি খরচা পাঠাব। কিন্তু দু মাস পরেই সংসারী রাধাকান্ত, চরিত্রবান ভদ্র রাধাকান্ত এই চরিত্রহীনা সম্পর্কে তাঁর প্রতিশ্রুতিটা অবলীলাক্রমে ভুলে যেতে পেরেছেন। না ভুলে যাওয়াটাই আশ্চর্য ছিল।

হিন্দুর পরমতম পুণ্যতীর্থ। ভিখারী বিশ্বনাথের ক্ষুধার্ত করপুটে অমৃত ঢেলে দিচ্ছেন অন্নপূর্ণা। কিন্তু যুগের অভিশাপে অন্নপূর্ণাও ভিখারিণী। বিশ্বনাথের গলিতে, গঙ্গার ঘাটে ঘাটে, দেবালয়ের আশেপাশে সহস্র অন্নপূর্ণার কান্না শোনা যায়ঃ একটা পয়সা দিয়ে যা বাবা, বিশ্বেশ্বর তোর ভালো করবেন—

বাবা বিশ্বনাথের কাশীতে কেউ উপবাসী থাকে না।

কেউ হয়তো থাকে না, কিন্তু দুদিন ধরে নীরদার খাওয়া জোটেনি। বোধ হয় বিশ্বনাথের আশ্রয় সে পায়নি, বোধ হয় নীরদার পাপে তিনি মুখ

ফিরিয়ে নিয়েছেন।

ক্লান্ত দুর্বল পায়ে বেরিয়ে এল নীরদা। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। মন্দিরে মন্দিরে আলো জ্বলেছে, আরতি দেখবার আশায় যাত্রীরা রওনা হয়েছে বিশ্বনাথের বাড়ির উদ্দেশে। কর্মব্যস্ত শহরের দোকানপাটে বিকিকিনি চলেছে, চায়ের দোকানে উঠছে হুল্লোড়, পথ দিয়ে সমানে চলেছে টাঙ্গা, এক্কা, মোটর আর রিকশার স্রোত। বাঙালিটোলা ছাড়িয়ে নীরদা এগিয়ে চলল।

খানিক এগিয়ে যেখানে আলো আর কোলাহল কিছুটা ক্ষীণ হয়ে এসেছে, সেখানে বাঁ দিকে একটা বাঁক নিলে নীরদা। পথ প্রায় নির্জন। খোয়াওঠা নোংরা রাস্তা—সোজা গিয়ে নেমেছে হরিশ্চন্দ্র ঘাটে। সমস্ত কাশীতে এই ঘাটটাই নীরদার ভালো লাগে, এখানে এসেই যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে।

আগে দু-চার দিন দশাশ্বমেধ ঘাটে, অহল্যাবাই ঘাটে গিয়ে সে বসেছে। কিন্তু কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হয় তার—কেমন যেন মনে হয় ওসব জায়গাতে সে অনধিকারী। ঘাটের চত্বরে চত্বরে যেখানে কীর্তন শোনবার জন্যে পুণ্যকামী নরনারীরা ভিড় জমিয়েছে, ছত্রের নিচে নিচে যেখানে বেদপাঠ আর কথকতা চলছে, সামনে গঙ্গার জলে ভাসছে আনন্দতরণী আর ঘাটের ওপরে পাথরের ভিত-গাঁথা প্রাসাদগুলো বিদ্যুতের আলোয় ইন্দ্রপুরীর মতো জ্বলছে—ওখানকার ওই পরিবেশ নীরদার জন্যে নয়। ওখানে যারা আসে ওরা সবাই শুদ্ধ, সবাই পবিত্র। তাদের জীবনে কখনো মলিনতার এতটুকু আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি। ওরা সহজ ভাবে হাসে, সহজ ভাবে কথা বলে, নির্মল নিষ্কলঙ্ক মুখে গলায় আঁচল দিয়ে কথকতা শোনে, কীর্তনের আসরে ওদের চোখ দিয়ে দরদর করে জল নেমে আসে। আর নীরদার চারপাশে কলঙ্কের কালো ছায়া, অশুচিতার স্পর্শ একটা বৃত্তের মতো বেষ্টন করে আছে, মনে হয় সকলের শান্ত পবিত্র দৃষ্টি মুহূর্তে ঘৃণায় কুটিল কুৎসিত হয়ে ওর অপরাধী মুখের ওপরে এসে পড়বে।

অদ্ভুত ভাবে নির্জন, আশ্চর্য ভাবে পরিত্যক্ত। পাশেই কেদারেশ্বর শিবের মন্দির থেকে নেমেছে ঝকঝকে চওড়া সিঁড়ির রাশি—ওখানে ভিড় জমিয়েছে দণ্ডীরা, কথকেরা, তীর্থকামীরা, স্বাস্থ্যলোভীরা এবং ভিক্ষুকেরা। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজছে কেদারের মন্দিরে। ঘাটের ওপরে জ্বলছে জোরালো বিদ্যুতের আলো। কিন্তু তার থেকে দু'পা সরে এলেই তরল অন্ধকারের মধ্যে হরিশ্চন্দ্র ঘাট নির্জনতায় তলিয়ে আছে।

দু-তিন বছর আগে জোর বান ডেকেছিল গঙ্গায়। ফেঁপে উঠেছিল, ফুলে উঠেছিল জল—পাহাড়প্রমাণ সিঁড়ির ধাপ ডিঙিয়ে সে জল ঢুকেছিল শহরের ভেতরে। তারই ফলে পুঞ্জিত বালি হরিশ্চন্দ্র ঘাটের ভাঙা সিঁড়িগুলোকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। সে বালি কেউ পরিষ্কার করেনি—করবার দরকারই হয়তো বোধ করেনি কেউ। শুধু যারা মড়া নিয়ে আসে তারাই বালির স্তূপ ভেঙে নিচে নেমে যায়, দু-একজন দণ্ডী স্নান করে যায় সকালে সন্ধ্যায়।

বুড়ীরা ক্বচিৎ কখনো হয়তো এসে বসে, তারপর সন্ধ্যা এলেই চলে যায় কেদারঘাটের দিকে। দু-একটা চিতার রাঙা আলোতে হরিশ্চন্দ্রের ছোট মন্দিরটা আলো হয়ে ওঠে—সেই রক্তশিখায় গঙ্গার জলে একটা দীর্ঘ ছায়া ফেলে মাথায় পাগড়ী বাঁধা চণ্ডাল লম্বা বাঁশ দিয়ে চিতা ঝাড়তে থাকে।

এইখানে এসে বসল নীরদা।

ঘাটে জনপ্রাণী নেই। শুধু গঙ্গার ধারে সদ্য নিভে যাওয়া একটা চিতায় যেন রাশি রাশি আগুনের ফুল ফুটে আছে। ওপারের অন্ধকার দিগন্তে চোখে পড়ছে রামনগরের দু-একটা আলো। পেছনে ছিপিটোলার দিক থেকে আসছে উৎকট গানের হুল্লোড়, মদ খেয়েছে ওরা।

নীরদা স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিভন্ত চিতাটার দিকে। বাবা বিশ্বনাথের কাশীতে তার স্থান হল না। এই জনবিরল ঘাটে—নিঃসঙ্গ শ্মশানে বসে মনে হচ্ছিল একটা পথ ওর খোলা আছে এখনো। বিশ্বনাথ কৃপা করলেন না, কিন্তু শ্মশানে শ্মশানে জেগে আছেন ত্রিশূলপাণি ভয়ালমূর্তি কালভৈরব। চোখের ওপর থেকে যখন পৃথিবীর আলো নিভে যাবে, যখন এই দেহের অসহ্য বোঝাটা টানবার দায় থেকে মুক্তি পাবে সে, তখন চিতার ধোঁয়ার মতো বিশাল জটাজুট এলিয়ে দিয়ে মহাকায় কালভৈরব সামনে এসে দাঁড়াবেন, কানে দেবেন তারকব্রহ্ম নাম।

হঠাৎ মাথার ভেতরটা ঘুরে উঠল নীরদার। মরে যাওয়া স্বামীর মুখ, রাধাকান্তের মুখ আর মহাদেব তেওয়ারীর কদর্য বিকৃত মুখগুলো একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে একটা নতুন মুখের সৃষ্টি করল—কালভৈরবের মুখ। সময় হয়েছে—কালভৈরব এসে দাঁড়িয়েছেন! সামনের অগ্নিময় চিতাশয্যা থেকে আগুনের পিণ্ডগুলো যেন ছিটকে লাফিয়ে উঠল, তারপর শ্মশানপ্রেতের লক্ষ চোখের মতো সেগুলো ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত ঘাটে, রাশি রাশি বালির ওপর, গঙ্গার কালো জলের উচ্ছল তরঙ্গে তরঙ্গে।

সেই সময় হরিশ্চন্দ্র মন্দিরের চাতালে বসে এক পয়সা দামের একটা সিগারেট খাচ্ছিল জীউৎরাম।

জীউৎরাম চাঁড়ালের ছেলে। বংশানুক্রমিক ভাবে এই ঘাটে তারা মড়া পুড়িয়ে আসছে। কিন্তু জীউৎরামের যৌবনকাল এবং অল্প অল্প সখও আছে। মাঝে মাঝে রুমাল বেঁধে বিলিতী নেটের মিহি পাঞ্জাবি পরে পান চিবুতে চিবুতে সে বেরিয়ে পড়ে, একটুকরো তুলোয় সস্তা আতর মেখে গুঁজে দেয় কানের পাশে, চোখের পাতায় হালকা করে আঁকে সুর্মার রেখা। এই হরিশ্চন্দ্র ঘাটে মড়া পোড়ানোর চাইতেও আর একটা বৃহত্তর জীবনের দাবি যে আছে সেইটেকেই সে অনুভব করতে চায় মাঝে মাঝে, ভুলে যেতে চায় নিজের ব্রাত্য পরিচয়।

আজ একটু রঙের মুখে ছিল জীউৎরাম। মুসম্মার রস দিয়ে বেশ কড়া করে লোটাখানেক সিদ্ধি টেনেছে, তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে কোনো অজানা অচেনা 'প্যারে'র উদ্দেশে হৃদয়ের আকূতি নিবেদন করছে, এমন সময়

দেখতে পেলো সিঁড়ির মাথার ওপরে সাদামতো কী একটা পড়ে রয়েছে।

প্রথম দু-একবার দেখেও দেখেনি, তারপর কেমন সন্দেহ হল। জীউৎরাম আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকের ভেতরটা—মড়া নয় তো?

একটা ঝাঁকড়া গাছের ছায়ায় পড়েছিল নীরদা। পাশের কেদারঘাট থেকে একফালি বিদ্যুতের আলো পাতার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে দুলে যাচ্ছিল নীরদার মুখের ওপর। সেই আলোয় জীউৎ দেখল নিঃশ্বাস পড়ছে—অজ্ঞান হয়ে গেছে মেয়েটা। কাশীর ঘাটে এমন দৃশ্য বিরল নয়।

কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটা কিছু এখনি করা দরকার। কিন্তু কী করতে পারা যায়?

আজ মাথার মধ্যে নেশা রনরন্ করছিল জীউৎরামের—নইলে এমন সে কিছুতেই করতে পারত না। কিছুতেই ভুলতে পারত না সে চণ্ডাল, তার ছোঁয়া লাগলে বাঙালী ঘরের মেয়েকে চান করতে হয়। কিন্তু আজ সে নেশা করেছিল, খেয়েছিল একমুখ জর্দা দেওয়া মিঠে পান, কানে গুঁজে নিয়েছিল গুলাবী আতর। মনটা অনেকখানি উড়ে গিয়েছিল তার নিজের সীমানার বাইরে, তার সহজ স্বাভাবিক বুদ্ধি খানিকটা বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, নিজেকে ভেবে নিয়েছিল ভদ্রলোকদের সগোত্র বলে।

জীউৎরাম ঝুঁকে পড়ল, পাঁজাকোলা করে তুলে নিলে নীরদাকে। চণ্ডালের কঠিন বুকের ভেতর মিশে গেল নীরদার দুর্বল কোমল দেহ—। বুকের রক্তে কলধ্বনি বাজতে লাগল জীউৎরামের, রোমকূপগুলো যেন ঝিঁঝিঁ করতে লাগল।

নীরদাকে এনে সে নামালো গঙ্গার ধারে। আঁজলা আঁজলা জল দিলে চোখেমুখে। গঙ্গার হাওয়ায় নীরদার জ্ঞান ফিরে এলো ক্রমশ, বিহ্বলের মতো সে উঠে বসল।

—আমি কোথায়?

—হরিশ্চন্দ্র ঘাটে, গঙ্গাজীর ধারে। কী হয়েছে তোমার?

মুহূর্তে বর্তমানটা নীরদার ঝাপ্সা সাদা চেতনার ওপরে একটা কালো ছায়ার মতো এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জীউৎরাম আবার জিজ্ঞাসা করলে, তোমার কী হয়েছে?

হঠাৎ নীরদা কেঁদে ফেলল। বাবা বিশ্বনাথের কাশীতে সে এই প্রথম শুনল বিশ্বনাথের এই কণ্ঠ—শুনল স্নেহের স্বর। দু'হাতে মুখ ঢেকে উচ্ছ্বসিত ভাবে কেঁদে উঠল সে।

—আমার কেউ নেই, আমার কিছু নেই—

জীউৎ আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। কী করা উচিত, কী বলা সঙ্গত কিছু বুঝতে পারছে না। নিভন্ত চিতাটার রাঙা আলোর আভায় নীরদার বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখখানা দেখে একটা কিছু সে অনুমান করে নিলে।

—তোমার আজ খাওয়া হয়নি, না ?

নীরদার আর সংশয় রইল না। সত্যি—কোনো ভুল নেই। শ্মশানচারী বিশ্বেশ্বর ছদ্মবেশে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। অশ্রুপ্লাবিত মুখে তেমনি করেই চেয়ে রইল সে।

জীউৎ বললে, তুমি বোসো, আমি আসছি।

দু'পা এগিয়েই কেদারের বাজার। জীউৎ পকেটে হাত দিয়ে দেখলে একটা টাকা আর কয়েক আনা খুচরো রয়েছে। কিছু দই, মিষ্টি আর তরি-তরকারি কিনে জীউৎ ফিরে এল।

নীরদা তখনো সেখানে স্তব্ধ একটা মূর্তির মতো বসে ছিল। গঙ্গার দিকে তাকিয়ে কী ভাবছিল সে-ই জানে। নীরদার সামনে এসে জীউৎ বললে, এই নাও।

মুখ দিয়ে কথা যোগাচ্ছে না নীরদার। সীমাহীন কৃতজ্ঞতায় যেন আচ্ছন্ন অভিভূত হয়ে গেছে সে। ক্ষণিকের জন্যে মনে হল কোনো বদ মতলব নেই তো লোকটার ? কিন্তু চিন্তাটা অস্পষ্ট ভাবে ভেসে উঠেই আবার তলিয়ে গেল। তরল অন্ধকারে ঘেরা হরিশ্চন্দ্র ঘাট, সামনে গঙ্গার কলোল্লাস, বাতাসে চিতার অস্ফুট গন্ধ আর চারদিকের একটা থমথমে নিঃসঙ্গতা নীরদার বাস্তব বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে, বুকের ভেতর থেকে আকস্মিক একটা আবেগের জোয়ার ঠেলে ঠেলে উঠছে ঃ বাবা বিশ্বনাথের কাশীতে কেউ উপবাসী থাকে না।

আর ভাঙের নেশাটা তখনো থিতিয়ে আছে জীউৎয়ের মগজে। সে যে কী করছে নিজেই জানে না। এত বড় দুঃসাহস তার কোনোদিন যে হতে পারে এটা সে কল্পনাও করতে পারেনি। অনুকম্পা নয়, দয়া নয়, পুরুষের চিরন্তন প্রেরণা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তার চেতনায়। কেমন যেন মনে হচ্ছে এই সন্ধ্যার শ্মশানের এই পরিবেশে এই মেয়েটি একান্ত তারই কাছে চলে এসেছে—তারই প্রতীক্ষার মধ্যে ধরা দেবার জন্যে।

হাত বাড়িয়ে ঠোঙাটা নিয়ে নীরদা বললে, বিশ্বনাথ তোমার ভালো করবেন। তুমি কে ?

এক মুহূর্তে গলার ভেতরে কী একটা আটকে গেল জীউৎয়ের। একবার চেষ্টা করলে মিথ্যা কথা বলবার, চেষ্টা করলে নিজের তুচ্ছ কদর্য পরিচয় গোপন করবার। কিন্তু পরম সত্যাশ্রয়ী মহারাজ হরিশ্চন্দ্র একদিন যে শ্মশানে দাঁড়িয়ে নিজের ব্রত পালন করে গিয়েছিলেন, শিবচতুর্দশীর রাত্রে যে আদি মণিকর্ণিকার ঘাটে স্বয়ং বিশ্বনাথ স্নান করতে আসেন, সেই পুণ্যতীর্থে মিথ্যা কথা সে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারল না।

অস্পষ্ট স্বরে জীউৎ বললে, আমি জীউৎরাম।

—তুমি পান্ডা ? ব্রাহ্মণ ? দন্ডবৎ—

যেন সাপে ছোবল মেরেছে এমনিভাবে জীউৎ পিছিয়ে গেল। চমকে উঠেছে চেতনা, তর্জন করে উঠেছে বংশানুক্রমিক ক্ষুদ্রতাবোধের সংস্কার।

জিভ কেটে জীউৎ বলে ফেলল, না, আমি চণ্ডাল।

—চণ্ডাল!

জীউৎয়ের যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, কোনোক্রমে উচ্চারণ করতে পারল ঃ হাঁ, আমি চণ্ডাল।

—চণ্ডাল!—বিদ্যুৎবেগে দাঁড়িয়ে উঠল নীরদা। কেদারঘাট থেকে পিছলে পড়া আলোর ফালিতে দেখা গেল অপরিসীম ঘৃণায় নীরদার সমস্ত মুখ কালো হয়ে গেছে। একটা নিষ্ঠুর আঘাতে মুছে গেছে বিশ্বেশ্বরের অলৌকিক মহিমার প্রভাব—সরে গেছে অভিভূত আচ্ছন্নতার জাল।

বিষাক্ত তীক্ষ্ন গলায় নীরদা চেঁচিয়ে উঠল ঃ চাঁড়াল হয়ে বামুনের বিধবাকে ছুঁলি তুই? মুখে জল দিলি?

সভয়ে তিন পা পিছিয়ে গেল জীউৎ।

নীরদা তেমনি চেঁচাতে লাগল ঃ তোর প্রাণে ভয় নেই? এত বড় সাহস—আমাকে খাবার দিতে আসিস? তোর মতলব কী বল্ দেখি?

জীউৎয়ের পায়ের তলায় মাটি সরতে লাগল।

এক লাথি দিয়ে খাবারগুলো ছড়িয়ে দিলে নীরদা, উলটে দিলে দইয়ের ভাঁড়। তারপর সোজা উঠে হনহন করে হাঁটতে শুরু করলে মদনপুরার রাস্তার দিকে। আর লজ্জায় অপমানে জীউৎ মাটির দিকে তাকিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে রইল—তার নেশা ছুটেছে এতক্ষণে। ভাঙা সিঁড়ির ওপর দিয়ে দইয়ের একটা শুভ্র রেখা গড়িয়ে গড়িয়ে বালির মধ্যে গিয়ে পড়তে লাগল।

খানিক দূরে এগিয়ে গিয়ে নীরদার খেয়াল হল, চাঁড়ালে ছুঁয়েছে, গঙ্গাস্নান করে নেওয়া দরকার। কিন্তু ক্ষিদেয় আর তেষ্টায় সমস্ত শরীরটা তার টলছে। বাড়িতে গিয়ে কলেই স্নান করবে একেবারে, এখন আর ঘাটের অতগুলো সিঁড়ি ভাঙা সম্ভব নয়।

পথ চলতে চলতে ক্রমাগত মনে হচ্ছিল আজ ভারী রক্ষা পেয়েছে সে। লোকটার মনে কী ছিল কে জানে। নির্জন ঘাটে যা খুশি তাই করতে পারত, টেনে নিয়ে যেতে পারত যেখানে-সেখানে। অন্নপূর্ণা রক্ষা করেছেন। উত্তেজনায় রক্ত জ্বলজ্বল করতে লাগল, হরিশ্চন্দ্র ঘাটের সঙ্গে দূরত্বটা বজায় রাখবার জন্যে যথাসম্ভব দ্রুতবেগে সে চলতে শুরু করে দিলে।

বাড়িতে এসে যখন ঢুকল, সব নির্জন। শুধু তেতলার ঘরে একটা আলো জ্বলছে, আর সমস্ত অন্ধকার। বিশ্বনাথের আরতি দেখতে গেছে সকলে। কলতলায় স্নান সেরে ঘরে ঢুকতে গিয়েই মনে হল, দরজায় শিকল নেই কেন? ঘর খুললে কে?

কিন্তু অত কথা ভাববার আর সময় ছিল না। আর দাঁড়াতে পারছে না সে, সমস্ত শরীরটা অস্থির করছে, বোঁ বোঁ করে ঘুরছে মাথাটা। এক ঘটি জল খেয়ে আজ কোনোমতে গড়িয়ে পড়বে, তারপর উপায়ান্তর না দেখলে কাল থেকে না হয় বিশ্বনাথের গলিতেই বসবে হাত পেতে। কাশীতে ভিক্ষা করে খেলেও সুখ।

দরজা খুলে অন্ধকার ঘরে পা দিতেই অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল নীরদা।

যেমন করে জীউৎরাম তাকে বুকে তুলে নিয়েছিল, তার চাইতে অনেক কঠিন, নিষ্ঠুর পেষণে কে তাকে সাপটে ধরেছে। তার মুখে মদের গন্ধ, অন্ধকারে তার চোখ সাপের চোখের মতো জ্বলছে।

ফিস্ ফিস্ করে সে বললে, ডরো মৎ প্যারে, রুপেয়া মিল্ যায়েগা।

নীরদার দুর্বল হতচেতন দেহ বিনা প্রতিবাদে আত্মসমর্পণ করলে, আর অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সাবধানে টাকাগুলো মুঠো করে ধরলে মহাদেব তেওয়ারী। রেইস্ আদমির প্রাণটা দরাজ আছে, আর পাওনা টাকাটাও তাকে উসুল করতেই হবে। বিশ্বনাথের কাশীতে নীরদাকে ঋণী রেখে সে পাপের ভাগী হতে পারবে না, তা সে টাকা নীরদা ইচ্ছায় নিক আর অনিচ্ছায়ই নিক।

ঠিক সেই সময় বৈঠকখানার আসরে বসে জিতেন্দ্রিয়ের লক্ষণগুলো বাচস্পতিকে বোঝাচ্ছিলেন রাধাকান্ত। সামনে মহাভারতের পাতা খোলা, ব্যাসদেব বলছেন, হে ভীষ্ম, যে পুরুষ ইন্দ্রিয়জয়ে সক্ষম—

কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে জীউৎরাম।

ফর্সা জামা পরে না, কানে আতরমাখা তুলো গোঁজে না, একমুখ পান চিবিয়ে ভদ্রলোক হবার চেষ্টা করে না। কোথা থেকে এক কঠিন রূঢ় আঘাত এসে আকস্মিক ভাবে তাকে নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ও সজাগ করে দিয়েছে।

জীউৎরাম মড়া পোড়ায়। একটা লম্বা বাঁশ দিয়ে মড়ার মাথা ফটাস করে ফাটিয়ে দেয়, চিতার কয়লাগুলো ছড়িয়ে ছড়িয়ে ফেলে দেয় গঙ্গার জলে। কেমন একটা অন্ধ আক্রোশ বোধ করে, বোধ করে একটা অশোভন উন্মাদনা। জীবন্তে যাদের তার স্পর্শ করবার অধিকার পর্যন্ত নেই, চিতার ওপরে তাদের আধপোড়া মৃতদেহগুলোর ওপরে যেন সে প্রতিশোধ নিতে চায়, তাদের অপমান করতে চায়, লাঞ্ছিত করতে চায়।

মাঝে মাঝে যখন অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকে, মনে পড়ে যায় নীরদাকে। ঘৃণা-বীভৎস মুখে বলছে: চণ্ডাল! তার পায়ের ধাক্কায় সিঁড়ির ওপরে উলটে পড়েছে দইয়ের ভাঁড়, পরম অবহেলায় গড়িয়ে চলে যাচ্ছে তার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ, তার প্রথম নিবেদন।

হঠাৎ জীউৎয়ের শরীরের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠতে চায়, হাতের মুঠিগুলো থাবার মতো কঠিন হয়ে ওঠে। কী হত যদি সেদিন সে তুলে আনত নীরদাকে, যদি জবরদস্তি করত তার ওপরে? কে জানতে পারত, কে কী করতে পারত তার? সেই ভালো হত—তাই করাই উচিত ছিল তার। ভুল হয়ে গেছে, অন্যায় হয়ে গেছে সেদিন।

লাফিয়ে উঠে পড়ে জীউৎ, হাতের বাঁশটা তুলে নিয়ে প্রচণ্ড বেগে খোঁচা দেয় চিতার মড়াটাকে। কালো রবারের পুতুলের মতো শিরা-সংকুচিত দেহটা

পোড়া কাঠের ভেতর থেকে খানিকটা লাফিয়ে ওঠে—একরাশ আগুন ঝুরঝুর করে ছড়িয়ে যায় আশেপাশে। তারপর নির্মমভাবে বাঁশ দিয়ে পিটতে শুরু করে, সাদা হাড়ের ওপর থেকে থেঁতলে থেঁতলে পোড়া মাংস খসে পড়তে থাকে—দুর্গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে যায়।

কিছুদিন পরে টের পেলো জীউৎয়ের বন্ধু-বান্ধবেরা।

একটা কিছু গন্ডগোল হয়েছে, তার মাথার ভেতরে কিছু একটা ঘুরপাক খাচ্ছে। গাঁজার আসরে তারা জীউৎকে ঘিরে ধরল।

—কী হয়েছে তোর ?

—কুছ্ নেহি।

—দিল খারাপ ?

—হাঁ—

—তবে চল্ আজ মৌজ করে আসি—

—না—

কিন্তু বন্ধুরা ছাড়লে না, সেদিন সন্ধ্যার পরেই সাজগোজ করিয়ে তাকে টেনে নিয়ে গেল। দেশী মদের দোকানে এক এক পাঁইট করে টেনে সকলে যখন রাস্তায় বেরুল, তখন বহুদিন পরে জীউৎয়ের রক্তে আগুন ধরেছে আবার। জোর গলায় একট অশ্রাব্য গান জুড়ে দিল সে।

ডালমন্ডিতে ঘরে ঘরে তখন উৎসব চলছে। হার্মোনিয়ামের শব্দ, ঘুঙুরের আওয়াজ, বেতালা গান, বেসুরো চিৎকার। মাঝে মাঝে সব কিছু ছাপিয়ে জেগে উঠছে তবলার উদ্দাম চাঁটির নির্ঘোষ। দরজায় দরজায় রাত্রির অপ্সরী। শিকার ধরবার জন্যে ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে।

টলতে টলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল জীউৎ। কেদারঘাটের একফালি আলোতে দেখেছিল, এখানে বিদ্যুতের আলোতেও সে চিনতে পারল। আশ্চর্য, নেশায় রাঙা চোখ নিয়েও চিনতে পারল জীউৎ।

মেয়েটার চোখেও নেশার ঘোর। জীউৎকে থেমে দাঁড়াতে দেখে সে এগিয়ে এল। জীউৎয়ের একখানা হাত চেপে ধরে বললে, চলে এসো—

ঠান্ডা একটা সাপ হঠাৎ শরীরে জড়িয়ে গেলে যে অনুভূতি জাগে, তেমনি একটা ন্যক্কারজনক ভয়ার্ত শিহরণে জীউৎ শিউরে উঠল। হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে বললে, আমি চাঁড়াল।

উচ্চৈঃস্বরে মাতালের হাসি হেসে মেয়েটা বললে, আমি চাঁড়ালনী। ভয় কি, চলে এসো—

প্রকাণ্ড একটা ঝাঁকানি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলে জীউৎরাম—ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করে দিলে। পেছন থেকে মেয়েটার হাসি কানে আসছে, একটা ধারালো অস্ত্র দিয়ে যেন পিতলের বাসনের গায়ে সশব্দে আঁচড় কাটছে কেউ।

শ্মশানে শ্মশানচণ্ডাল পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে।

সামনে চিতার ওপর লকলকে আগুন—গঙ্গার জলে নাচছে তার প্রেতচ্ছায়া। শ্মশানচণ্ডালের কালো শরীরে আগুনের আভা পিছলে যাচ্ছে।

আর রাগ নেই, অভিযোগ নেই, গ্লানি নেই। ব্যথা আর করুণায় মনের ভেতরটা টলমল করছে। চেতনার ভেতর থেকে কে যেন বলছে একদিন এই ঘাটেই আসবে নীরদা, এইখানে গঙ্গার জলে জীবনের সমস্ত জ্বালা তার জুড়িয়ে যাবে। সেদিন তার অহঙ্কার থাকবে না, থাকবে না আজকের এই অপমানের কালো কলঙ্কের ছাপ। সেদিন জীউৎ তাকে নিজের মতো করে পাবে, পাবে তাকে স্পর্শ করবার অধিকার, চণ্ডালের ছোঁয়ায় সেদিন তার কাশীপ্রাপ্তির সার্থক মর্যাদা ফিরে আসবে। সেই দিনের প্রতীক্ষা করবে জীউৎ—অপেক্ষা করে থাকবে সেই দিনের জন্যে।

রাধাকান্তের বাড়িতে তখন কথকতা হচ্ছিল। শ্মশানে চণ্ডাল মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে রাজরাণী শৈব্যার মিলন।

সমুদ্র অনেক দূরে। সেখানে ঝড়, সেখানে সাইক্লোন। আর এখানে, এই এই একটুকরো গ্রাম যেন প্রবালদ্বীপ। এর চারদিকে সহজ অশিক্ষা আর অজ্ঞতার শান্তি একটা স্তব্ধ লেগুনের মতো প্রবাল-বলয় দিয়ে ঘেরা।

উপমাটা দিয়েছিল গ্রামের ডাক্তার এবং আশপাশের চারখানা গ্রামের মধ্যে একমাত্র এল-এম-এফ ডাক্তার জয়নুদ্দীন মিঞার ছেলে মইনুদ্দীন। সে তখন কলকাতার কলেজে বি. এ. পড়ত। তারপর সাত-আট বছর পার হয়ে গেছে। সে এখন দূরের মফঃস্বল শহরের উঠ্‌তি উকিল, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার, একজন নামজাদা নেতা। শান্ত, স্তব্ধ লেগুনের চাইতে মাতাল সমুদ্রের গর্জনই তার ভালো লাগে বেশি।

দূরের সমুদ্রে ঝড়। কলকাতা, নোয়াখালি, বিহার, বোম্বাই, পাঞ্জাব। আত্মঘাত আর অপঘাতের রক্তে লাল হয়ে গেল নীল সমুদ্রের জল। প্রবাল-বলয় ভেঙে পড়ল, লেগুনের নিস্তরঙ্গ জলে দেখা দিল মত্ততার আক্রোশ।

ব্রাহ্মণত্বের বিজয়গর্বে প্রায় আধহাতখানেক একটা টিকি মাথার ওপরে গজিয়ে তুলেছে জগন্নাথ সরকার। সেইটেই দুলিয়ে সে বললে, নাঃ, এর প্রতিবিধেন করতেই হবে। এমনভাবে চললে দুদিন বাদে সব বাছাধনকেই যে কলমা পড়তে হবে সেটা খেয়াল রেখো।

তরণী মণ্ডল বললে, তা হলে লাঠি ধরতে হয়।

—তাই ধরতে হবে। নিজের মান নিজে না রাখলে কে রাখবে তাই শুনি? গায়ে যতক্ষণ একফোঁটা রক্ত আছে, ততক্ষণ এ ঘটতে দেব না, পরিষ্কার বলে রাখলাম।

কুকুরের ছানার বেঁড়ে একটা ল্যাজের মতো জগন্নাথ সরকারের মাথার ওপরে টিকিটা নড়তে লাগল।

ব্রাহ্মণের অধিকার সম্বন্ধে একটু বেশি মাত্রাতেই সচেতন জগন্নাথ সরকার। খাঁটি ব্রাহ্মণদের কাছে স্বীকৃতিটা নেই বলেই নিজেকে আরো বেশি করে প্রমাণ করতে চায় সে, প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সমুদ্রের ওপারে একটা বিস্তীর্ণ মহাদেশ জুড়ে যেখানে ব্রাহ্মণত্বের বিজয়পতাকা উড়ছে, অস্পৃশ্য নমঃশূদ্রদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য-গর্বিত জগন্নাথ সরকারের কোনো পার্থক্য নেই সেখানে। তাই নিজের ছোট গণ্ডিটির ভেতরে নিজেকে সে বশিষ্ঠ-যাজ্ঞবল্ক্যের মহিমায় স্থাপিত করে রাখতে চায়। ক্ষার দিয়ে পরিষ্কার করে কাচা লালচে রঙের মোটা পৈতের গুচ্ছটা বাগিয়ে ধরে বলে, হেঁ হেঁ বাবা, খাঁটি কাশ্যপগোত্র, রামকিষ্ট ঠাকুরের সন্তান। একটু তপ-তপিস্যে বজায় রাখলে যাকে-তাকে ভস্ম করে ফেলতে পারতুম।

কিন্তু তপ-তপস্যাটা এখন আর হয়ে ওঠে না বলেই কাউকে আর ভস্ম করাটাও সম্ভব নয় রামকিষ্ট ঠাকুরের সন্তানের পক্ষে। আর মনুপরাশরের সঙ্গে যতই আত্মীয়তা সে দাবি করুক না কেন, আসলে সে এখন অন্ত্যজ, সে নমঃশূদ্রের ব্রাহ্মণ।

কোন্ সাত না দশ পুরুষ আগে অক্ষত-কৌলীন্য স্বনামধন্য রামকিষ্ট ঠাকুরের কোনো বৃদ্ধ প্রপৌত্র লোভ বা অভাবের তাড়নায় নমঃশূদ্রের যাজনা করেছিল। সেই থেকে তারা পতিত। হিন্দুত্বের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য সে পতনকে ক্ষমার চোখে দেখেনি, বিচারও করেনি। একটু একটু করে দিনের পর দিন ঠেলে দিয়েছে পিচ্ছিল পথে, এখন তারা নমঃ'র বামুন।

পৈতে আছে, উপনয়নের ব্যবস্থা আছে, ব্রাহ্মণ্য-সংস্কারের ভাঙাচুরো অর্থহীন অসঙ্গতিগুলোও জড়িয়ে আছে জীবনের সঙ্গে। শিক্ষাদীক্ষা নামে মাত্র, জগন্নাথ সরকার নামটা কাঁচা হাতে সই করতে পারে, তাতে মাত্রা দিতে জানে না, লেখাটা দেখলে নাগরী বলে মনে হয়। চেহারায় ব্রাহ্মণের আর্যত্বের দীপ্তি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। রোদে-পোড়া কালো রঙ, লাঙল ঠেলে চওড়া চওড়া হাত দুটো লোহার মতো শক্ত আর কড়া পড়া, পিঠে খড়ি, তামাটে রঙের খাড়া খাড়া চুল, অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলে যেমন হয়, তেমনি লালচে আর ঘোলাটে বর্ণের চোখ। বড় বড় অসমান দাঁত, তার দুটো আবার হিন্দুস্থানীদের অনুকরণে রুপো-বাঁধানো। শুধু কুকুরের বেঁড়ে ল্যাজের মতো মাথার টিকিতে ব্রাহ্মণত্বের জয়গৌরব ঘোষিত হচ্ছে।

নমঃশূদ্রদের বিয়েতে, ক্ষেত্রপালের পুজোয় সে-ই মন্ত্র পাঠ করে। সে মন্ত্র বিচিত্র। খাঁটি প্রাদেশিক বাংলার ঘাড়ে কতগুলো অনুস্বার-বিসর্গ চাপিয়ে সেগুলোতে দেবমহিমা আরোপ করা হয়। পিতৃপুরুষের কাছ থেকে যেটুকু পাওয়া গেছে প্রয়োজনমতো তার সঙ্গে নতুন মন্ত্রও জুড়ে নেয় জগন্নাথ সরকার। মোটের ওপর পশার আছে এবং সেজন্যে আত্মমর্যাদা সম্পর্কেও সে পুরোপুরি সজাগ।

আজ সেই আত্মমর্যাদায় ঘা লেগেছে।

বাইরের সমুদ্রে ঝড়। কলকাতা, নোয়াখালি, বিহার। সমস্ত দেশজোড়া

একটা অতিকায় ছোরার ঝলক এখানকার আকাশেও বিদ্যুৎচমকের মতো খেলা করে গেল।

অনেকদিন আগে এখানে এক ফকিরের আবির্ভাব হয়েছিল। ফকির নাকি ছিলেন অদ্ভুতকর্মা; সমস্ত হুরী-পরী-জিন ছিল তাঁর আজ্ঞাবহ। হাতে একমুঠো ধুলো নিয়ে তিনি ফুঁ দিতেন—সঙ্গে সঙ্গে সে ধুলো হয়ে যেত খাসা কিস্‌মিস্ মনক্কা, কখনো কখনো একেবারে সেরা মোগলাই পোলাও। কতগুলো ঘাসপাতা একসঙ্গে জড়ো করে নিয়ে মন্ত্রপাঠ করতেন ফকির, দেখতে দেখতে সেগুলো হয়ে যেত চুনি, পান্না, হীরে-জহরৎ। সে-সব হীরে-জহরতের শেষ পর্যন্ত কী গতি হয়েছে ইতিহাসে তা লেখা নেই, তবে ফকিরের মহিমা লোকের স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে। আর সবচাইতে যেটা উল্লেখযোগ্য সেটা এই যে, এহেন করিৎকর্মা মহাপুরুষ কী মনে করে এই অজগর বিজেবনেই তাঁর দেহরক্ষা করলেন।

বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই গ্রামের লোক তাঁর শেষকৃত্য করলে। তাঁর সমাধির ওপর রচনা করলে ছোট একটি গম্বুজ। এখন সে গম্বুজ আর নেই, কয়েকখানা শেওলাধরা ভাঙা ইঁট ছড়িয়ে আছে এদিকে ওদিকে। কিন্তু তাই বলে ফকিরের মহিমার হ্রাস হয়নি বিন্দুমাত্রও। পুরোনো মদের মতো যতই দিন যাচ্ছে সে মহিমা ততই অলৌকিক হয়ে উঠছে।

ফাঁকা মাঠের ভেতরে টিলার মতো একটুখানি উঁচু জমির ওপরে ফকিরের সমাধি। তা থেকে একটুখানি এদিকে সরে এলে একটা জংলা বটগাছ—এলোমেলোভাবে জটা নামিয়েছে চারপাশে। বহুদিনের পুরোনো গাছ—হয়তো ফকিরের সমসাময়িক, হয়তো তার চাইতেও প্রবীণ। মোটা মোটা ডাল থেকে শিকড় নেমে ঢুকেছে মাটির নিচে—রচনা করেছে কতগুলো স্তম্ভের মতো। সব মিলিয়ে গম্ভীর থমথমে একটা আবহাওয়া। নিবিড় নীলাভ ছায়ার আচ্ছন্নতা, ভিজে ভিজে মাটি, কোটরে কোটরে প্যাঁচার আস্তানা। এইখানে ডাকাতে-কালীর থান।

ফকিরের ইতিহাসের সঙ্গে ডাকাতে-কালীর ইতিহাস একই প্রাচীনতার ঐতিহ্যে গাঁথা। কোনো এক নামজাদা ডাকাত এখানে অমাবস্যার রাত্রে নরবলি দিয়ে বেরুত ডাকাতি করতে। এইখানে পঞ্চমুণ্ডী আসন করে সাধনা করতেন রক্তচক্ষু এক মহাকায় তান্ত্রিক। অনেক নরবলির রক্ত এখানকার মাটিতে মিশিয়ে আছে, অনেক নরমুণ্ড লুকিয়ে আছে এর মাটির তলায়। সুতরাং এখানকার হিন্দুদের কাছে ডাকাতে-কালীর একটা নিশ্চিত ভয়ঙ্কর মর্যাদা আছে। এই গ্রাম তাঁরই রক্ষণাধীনে এবং তাঁর কোপদৃষ্টি পড়লে দেখতে দেখতে সবকিছু উজাড় হয়ে যাবে।

সব চাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এতবড় মাঠের ভেতরে এঁরা দুজন পরস্পরের প্রতিবেশী। ফকির আর ডাকাতে-কালী। এতকাল পরম নিশ্চিন্তে এবং নীরবে পাশাপাশি বসবাস করে আসছিলেন। 'এক কম্বলে দশজন ফকিরের জায়গা হয়'—এই প্রবন্ধটির জন্যেই বোধ হয় এতকাল ফকির কিছুমাত্র

আপত্তি করেননি এবং এত কাছাকাছি যবনের আস্তানা থাকাতেও কালী জাত যাওয়ার আশংকা রাখতেন না। বেশ ছিল।

কিন্তু সমুদ্রে ঝড় এল। প্রবাল-বলয় ভেঙে দোলা জাগিয়ে দিলে নিদ্রিত প্রবাল-দ্বীপে।

মাইল-দেড়েক দূরে মাঝারি গোছের একটা মাদ্রাসা। মাঝখানে একদিন এক মৌলবী সেখানে এসে 'ওয়াজ' করলেন। কী বক্তৃতা দিলেন তিনিই জানেন, কিন্তু পরের দিন থেকেই আবহাওয়াটা বদলে গেল একেবারে। তারও দুদিন পরে মুসলমান-পাড়ার 'ধলা মস্তাই' এসে জগন্নাথ ঠাকুরকে জানিয়ে গেল, এবার ডাকাতে-কালীর থানে পুজো করা চলবে না।

—কারণ ?

কারণ, ওখানে ঢাক-ঢোল বাজে। ওখানে ভূত পুজো হয়। তাতে সুখ-নিদ্রায় ব্যাঘাত হয় ফকির সাহেবের। জগন্নাথ ঠাকুর বোঝাতে চেষ্টা করলে। বরাবর ওখানে পুজো হয়ে আসছে। এতকাল ফকির সাহেবের যদি কোনো অসুবিধে না হয়ে থাকে, এবারেই বা হতে যাবে কেন ?

ধলা মস্তাই হাসল, বললে, তা হোক, অত বুঝি না। তবে এইটে বলতে পারি যে, এবারে ওখানে আর পুজো হতে দেওয়া যাবে না। ওতে আমাদের ধর্মের অপমান।

—কিন্তু আমাদের ধর্মেরও তো অপমান হচ্ছে।

—ভূত পুজো আবার কিসের ধর্ম ? ধলা মস্তাইয়ের চোখে হিংসা চক্‌চক্‌ করে উঠল ঃ একটা কথা বলে যাই ঠাকুর। এ এখন আমাদের রাজত্ব। আমরা যা বলব তাই করতে হবে। এখন বেশি চালাকি করতে যেয়ো না, বিপদ হতে পারে।

গ্রামে দুজন মস্তাই। একজন রোগা আর কালো, নিরীহ নির্জীব লোক, সে শুধুই মস্তাই। ধলা মস্তাইয়ের রঙ ওরই ভেতরে একটু ফর্সা, লম্বা তাগড়া চেহারা, চিতানো বুক। মুসলমান-পাড়ার সে সব চাইতে দুর্ধর্ষ ব্যক্তি, নামকরা দাগী। তাই ধলা মস্তাইয়ের শাসানো শুধু কথার কথাই নয়।

—যা বললুম ভুলো না ঠাকুর। পরে গোলমাল হতে পারে।—আর একবার সাবধান করে দিয়ে দলবল নিয়ে ধলা মস্তাই চলে গেল।

তখনকার মতো জগন্নাথ ঠাকুর চুপ করে রইল। কিন্তু চুপ করে থাকা মানেই চেপে যাওয়া নয়। ঘা লাগল ব্রাহ্মণের আত্মমর্যাদায়, কুকুরের ল্যাজের মতো বেঁড়ে টিকিটা উত্তেজনায় খাড়া হয়ে উঠল সজারুর কাঁটার মতো।

নমঃশূদ্রদের গ্রাম। এমনিতেই জাতটা একটু সামরিক, চট করে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাওয়ার মতো নয়। সমাজের সব চাইতে নিচের তলায় পড়ে থাকে বলেই ধর্মের ওপরে আস্থাটা বেশি ; শূদ্র-শক্তির বলিষ্ঠ সহজ সংস্কারে একবার যাকে মেনে নিয়েছে তার কাছ থেকে চূড়ান্ত অপমানের আঘাত পেয়েও তাকে ছাড়তে জানে না। যুগ-প্রবাহিত রক্তধারায় শম্বুকের নিষ্ঠা, একলব্যের দৃঢ়তা। সমাজের ওপরতলার মানুষদের মতো ধর্মটা ওদের অলঙ্কারমাত্র নয়,

একেবারে নিচের তলায় থেকেও ধর্মকে ওরা অহঙ্কার বলে আঁকড়ে রেখেছে।

সুতরাং নমঃ'র বামুন জগন্নাথ সরকার ক্ষেপে উঠেছে।

—পুজো আমরা করবই। তার পরে যা হওয়ার হোক।

একজন বললে, তাহলে সড়কি-টাঙ্গীতে শান দিতে হয়।

জগন্নাথ সরকার হাঁটু চাপড়ে বললে, আলবৎ। খুন-খারাপী দুটো-একটা হয় তো হোক, কিন্তু পিছিয়ে যাওয়া চলবে না। বেশি বাড়াবাড়ি করে তো ফকির-টকির সবসুদ্ধ উড়িয়ে দেব।

শ্রোতাদের মধ্যে উৎসাহী একজন উঠে দাঁড়াল। রক্তের ভেতরে চনচন করে উঠেছে নেশা। খুন-খারাপীর নেশা। হিংস্র জন্তুর চৈতন্যের ভেতরে যেন সাড়া দিয়ে উঠেছে আদিম অরণ্যের আহ্বান। সোজা দাঁড়িয়ে উঠে সে বিকট গলায় একটা হাঁক পাড়ল ঃ জয়, কালী মাইকি জয়—

সমবেত জয়ধ্বনি উঠল ঃ কালী মাইকি জয়—

আর সঙ্গে সঙ্গে যেন দূরের মুসলমান-পাড়া তার জবাব পাঠিয়ে দিলে ঃ আল্লা-হু-আকবর—

জগন্নাথ সরকারের নেতৃত্বে শেষ হল ওদের সভা, ধলা মন্তাইয়ের সভাপতিত্বে শেষ হল মুসলমান-পাড়ার 'ওয়াজ'। সমস্ত মুসলমান-পাড়া আল্লার নামে কসম নিয়েছে, জান দেবে তবু এবার পুজো করতে দেবে না। ইসলামের ইজ্জৎ বাঁচাতে হলে যে করে হোক ওই ভূতপুজো বন্ধ করতে হবে।

আসন্ন ঝড়ের সংকেতে আকাশ থমথম করতে লাগল।

মুসলমান-পাড়ার যিনি আদত মাথা, তিনি হাবিব মিঞা।

নধর গোলগাল চেহারা, টুকটুকে রঙ। সৌখীন মেজাজের মানুষ। দিল্লী থেকে প্রতি সপ্তাহে সুর্মা আসে, তাঁর নিজের এবং তাঁর আদরের লালবিবির জন্যে। কানে থাকে আতরভরা তুলো এবং মুখ থেকে বেরোয় মশলা-দেওয়া পানের গন্ধ। পঞ্চাশ বছর বয়েস হয়েছে হাবিব মিঞার, কিন্তু মনের তারুণ্য এতটুকু ফিকে মারেনি আজ পর্যন্ত। এ অবধি বারোটি বিবি তাঁর হাত ঘুরে গেছে, এখন যে চারটি আছে তার প্রথমটি হচ্ছে আদি ও অকৃত্রিম, বাকি তিনটি আনকোরা নতুন। পুরোনো জিনিস বেশিদিন বরদাস্ত করতে পারেন না হাবিব মিঞা, কিন্তু বড় বিবিকে তালাক দেবার কল্পনাও তিনি করতে পারেননি কখনো। আজ বত্রিশ বছর ঘর করে কেমন একটা মায়া বসে গেছে, তা ছাড়া ধান-পান গরু-গোয়ালের নিপুণ তদারক করতে এমন আর একটি প্রাণী দুর্লভ।

বড় বিবি নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, মাঝখানের দুটি ছায়ামূর্তির মতো অবান্তর। মহিষীর মর্যাদা যে সগৌরবে ভোগ করে থাকে সে হল ছোট বিবি বা লালবিবি। বছর সতেরো-আঠারো বয়েস, ছিমছাম চেহারা, মাজা শামলা রঙ। আদরে আবদারে অভিমানে হাবিব মিঞার সমস্ত মন-প্রাণকে একেবারে পরিপূর্ণ করে রেখেছে। এক মুহূর্তের জন্যে লালবিবিকে চোখের আড়াল করতে পারেন না তিনি। তাই কানের গোলাপী আতর আজকাল আরো

বেশি করে গন্ধ ছড়ায়, শহর থেকে জর্দা কিমাম আনানোর খরচটা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে, চোখের কোলে কোলে আরো গাঢ় হয়ে পড়ছে সুর্মার রেখা। আগের চাইতে আজকাল আরো বেশি করে হাসেন হাবিব মিঞা, ভুঁড়িটা আগের চাইতে আরো বেশি দোল খায়, গালের গোলাপী রঙে আরো বেশি করে যেন যৌবনের আমেজ।

তা সুখী হওয়ার আইনসঙ্গত অধিকার আছে বইকি হাবিব মিঞার। মস্ত জোত, ক্ষেতির সময় বারোখানা লাঙল নামে। ইউনিয়ান বোর্ডের মেম্বার, ফুড কমিটির সভাপতি। যা যা দরকার কোনোটার অভাব নেই।

সব ভালো, তবে সন্ধ্যের দিকে একটু আফিং খান। হজমের গোলমালের জন্যে ধরেছিলেন গোড়াতে, এখন পাকাপাকি নেশা হয়ে গেছে। ঘণ্টা-দুতিন চোখ বুঁজে নিশ্চিন্তে ঝিমুতে মন্দ লাগে না একেবারে। নেশার আমেজের সঙ্গে নবযৌবনা লালবিবির ধ্যানটা একটা মধুর আরামে আচ্ছন্ন করে রাখে।

বলা বাহুল্য, এই সময় বেরসিকের মতো কেউ ডাকাডাকি করলে ভালো লাগবার কথা নয়। হাবিব মিঞার মেজাজটা যতই ভালো হোক না কেন, ইচ্ছে করে রসভঙ্গকারী বেয়াদবকে পায়ের চটিটা খুলে ঘা-কতক পটাপট বসিয়ে দিতে। খাঁটি সৈয়দের বংশধর হিসেবে গর্জন করে উঠতে ইচ্ছে হয়ঃ চুপ রহো গোলামকা বাচ্ছা—

আপাতত মগজের ভেতরে সেই সৈয়দের মেজাজটা পাক খাচ্ছিল। হাবিব মিঞা গাল দিয়ে উঠলেন না বটে, কিন্তু চোখ না মেলেই দুরন্ত জবানীতে আমিরী ভাষায় প্রশ্ন করলেনঃ আবে কৌন চিল্লাতা ?

—আমি ধলা মন্তাই, জনাব !

এ এমন একটা লোক যাকে হুঙ্কার দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া চলে না, দেখানো চলে না আমিরী মেজাজের উত্তাপ। অত্যন্ত বদরাগী গোঁয়ার লোক—ক্ষেপে গেলে সৈয়দ মৌলবী কোনোটাই মানবে না। সুতরাং অত্যন্ত অনিচ্ছায় এবং গভীর বিরক্তির সঙ্গে চোখ মেলতে হল, লালবিবির রঙীন স্বপ্নটা আপাতত মিলিয়ে গেল বাতাসে।

জোর করে মুখে হাসি টেনে আনলেন হাবিব মিঞাঃ তারপর কী খবর ?

দাওয়ার সামনে চাটাইটার ওপরে বসল মন্তাইঃ আজ্ঞে বারণ করে দিলাম।

—তারপর ?

—গণ্ডগোল পাকাবে। বিকেলে দেখেছি দল বেঁধে জটলা করছিল।

—তোমরা কী করবে ? ভয় পেয়ে সব পিছিয়ে যাবে নাকি ছাগীর বাচ্চার মতো ?

—আল্লার কসম !—পিঁজরার পোষ-না-মানা বাঘের মতো একটা চাপা গর্জন করলে ধলা মন্তাইঃ আমি জাত-পাঠান জনাব। ধরে ধরে এক-একটাকে কোতল করে দেব তা হলে।

হাবিব মিঞার কণ্ঠস্বর বিশ্বস্ত শোনালোঃ সব ওই ব্যাটা ঠাকুরের

জন্যে। ও-ই হচ্ছে ওদের মাথা।

—মাথার মাথাটা কেটে নিতে আমার এক লহমা সময় লাগবে না জনাব। তারপরে লাশ গুম করে দেব মধুমতীর জলে। কাকে অবধি টের পাবে না।

—সাবাস!

হাবিব মিঞা চুপ করে গেলেন। মুখে আবার এক টুকরো হাসি দেখা দিল, কিন্তু এ হাসি জোর-করা নয়, সহজ প্রসন্নতার। এতদিনে কাজ হাসিল হবে মনে হচ্ছে। ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারবে। নিজে থেকে কিছু করতে গেলে অনর্থক দাঙ্গা-ফৌজদারীর ঝামেলা বাধত, কিন্তু এ যা হচ্ছে তা যেমন নিরাপদ তেমনি মোক্ষম। জগন্নাথ ঠাকুরকে ভাল করেই জানেন হাবিব মিঞা, সহজে তার ন্যায্য দাবি থেকে বাঁধের দেড় বিঘে ধানী জমি ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না। কিন্তু যে মন্ত্র দেওয়া হয়েছে তাতে সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে জগন্নাথ ঠাকুরের মাথাটা উড়ে যাবে ধড় থেকে এবং তারপরে—

একেই বলে সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না। ভাগ্যিস মৌলবী সাহেব এসে সেদিন ওই রকম গরম গরম বুলি শুনিয়ে গেলেন, নইলে কি এমন সুযোগ মিলত কোনোদিন! মনে মনে নিজের পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন হাবিব মিঞা, তারিফ করলেন নিজেকে। সকলকে লেলিয়ে দিয়ে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করার চাইতে বুদ্ধিমানের কাজ সংসারে আর কী আছে।

ধলা মস্তাই বললে, মামলা-মোকদ্দমা যদি বাধে তা হলে আপনি তো আমাদের পিছে আছেন জনাব?

—আলবৎ।—হাবিব মিঞা সোৎসাহে বললেন, সেকথা কি আর বলতে হবে।

আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই, বক্তব্যও নেই। তবু দ্বিধা করতে লাগল ধলা মস্তাই, আঙুল দিয়ে চাটাইটাকে খুঁটতে লাগল। আরো কী একটা তার বলবার আছে, কিন্তু সাহস সঞ্চয় করতে পারছে না, বলতে পারছে না সহজ স্পষ্ট ভাষাতে। বাধা আছে, সংকোচ আছে।

—জনাব!

—কী বলছিলে?

—বলছিলাম—মস্তাই আবার চুপ করে গেল।

এতক্ষণে অস্বস্তি বোধ হতে লাগল হাবিব মিঞার। লক্ষণটা খারাপ। সাধারণত এই সব নীরবতার ভূমিকার পরেই আসে প্রার্থীর দরবার—দু' কাঠা ধান চাই, দু'কুড়ি টাকা ধার চাই। এতবড় জোয়ান মানুষটা এমন সংকুচিত হয়ে গেলেই সন্দেহ দেখা দেয়।

—কী বলবে, বলেই ফেল না মিঞা।

—জী—চোয়াড়, রুক্ষদর্শন লোকটার মুখচোখ লজ্জিত আর করুণ হয়ে উঠল: জী, ঘরের জরু বিটির যে ইজ্জৎ রইল না।

—ইজ্জৎ রইল না! বল কি হে? তোমার ঘরের ইজ্জতে হাত দেবে এমন বুকের পাটা কার আছে?

—আজ্ঞে সে কথা নয়। কারো হাত দিবার ব্যাপার নয়, দু-একখানা কাপড়—

—কাপড় !—হাবিব মিঞা প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন : কাপড় !

—জী, যদি ব্যবস্থা করতে পারেন—

—তুমি ক্ষেপে গেলে মস্তাই ?—হাবিব মিঞার বিস্ময় আর বাধা মানল না : সরকারী চালান যা এসেছিল সে তো ছ' মাস আগে লোপাট, একফালি কানি অবধি তার পড়ে নেই। আশমানের চাঁদ যদি চাও তাও টেনে নামিয়ে দিতে পারি, কিন্তু কাপড় নয়।

—কিছুতেই কি উপায় হয় না, জনাব ?

—না, কোনো উপায় হয় না।—হাবিব মিঞা মুখ বিকৃত করে বললেন, শালার কণ্ট্রোল হয়ে সব সর্বনাশ করে দিয়েছে রে। সব গুণাহ্ আর সব না-পাক, দেশটা জাহান্নামে যাবে, বুঝলি ?

কিন্তু দেশ জাহান্নামে যাক বা না যাক সেজন্যে মস্তাইকে খুব উৎকণ্ঠিত দেখা গেল না। একটা মস্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে উঠে দাঁড়ালো, তারপর আদাব জানিয়ে নেমে গেল অন্ধকারে।

হাবিব মিঞা আবার ঘুমোবার জন্যে চোখ বুজলেন। কিন্তু আর আমেজ এলো না, নেশাটা বিলকুল চটিয়ে দিয়েছে লোকটা। তা হোক, তা হোক। ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারবে—এইটেই লাভ। দোষের মধ্যে কাপড়ের জন্য বড্ড ঘ্যান ঘ্যান করে। কাপড় ? হাবিব মিঞা মৃদু হাসলেন। কাপড় আছে বইকি। কিন্তু জোড়া বত্রিশ টাকা, মস্তাইয়ের পক্ষে তা আকাশের চাঁদের চেয়েও দুরধিগম্য।

অন্ধকার ধানক্ষেতের আল বেয়ে বেয়ে এগিয়ে চলেছে মস্তাই। সদর রাস্তা দিয়ে গেলে ঘুরতে হয় খানিকটা, এইটেই সোজা পথ। দুপাশে ফলন্ত পাকা ধান পায়ের ওপরে পড়ছে লুটিয়ে লুটিয়ে। বাতাসে ধানের গন্ধ। ওই গন্ধে বুকটা ভরে যায়, কেমন শিরশির করে ওঠে রক্ত। আছে, সব আছে। এই ধান, ক্ষেতভরা এত মধুগন্ধী ধান একদিন ওদের সব দিত, দিত কাপড়, দিত মুখের ভাত, বৌ-ঝিকে গড়িয়ে দিত রুপোর পৈঁছে। সে ধান আছে, তেমনি মাতাল-করা গন্ধ আছে তার। আশ্চর্য, তবু কিছু নেই। বৌ-বেটির পরনে কাপড় জোটে না, পেট ভরে না ভাত খেয়ে, কন্দ আর কচু খুঁড়ে বেড়াতে হয় শুয়োরের মতো। আল্লা !

অন্ধকারে ধাক্কা লাগল একটা। আল থেকে হড়কে ধানক্ষেতের ভেতরে নেমে পড়ল মস্তাই।

—কে ? চোখে দেখতে পাও না—রাতকানা নাকি ?

অন্যদিক থেকে যে আসছিল সেও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—রাগ করো না ভাই, আঁধারে মালুম হয়নি।

—আরে, জগন্নাথ ঠাকুর যে !

জগন্নাথ ঠাকুর চমকে উঠল। আঁতকে পিছিয়ে গেল তিন পা। ঝড়ের

সংকেতে থমথম করছে আকাশ, স্তব্ধ অন্ধকারের নির্জনতায় মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। মন্তাইয়ের আক্রমণের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলে জগন্নাথ সরকার।

বুঝতে পেরে এত দুঃখের ভেতরেও হেসে উঠল মন্তাই।

—ভয় পাচ্ছ কেন ঠাকুর? এখানে তোমার সঙ্গে মারামারি করব না। যা কিছু লড়াই-কাজিয়া তা হবে তোমাদেরই ওই কালীর থানে, তখন দেখা যাবে কার কলিজার জোর কত! তা এত রাত্রে চলেছ কোথায়?

জগন্নাথ ঠাকুরের গলায় স্বস্তির আভাস পাওয়া গেল: হাবিব মিঞার কাছে।

—হাবিব মিঞার কাছে!—আশ্চর্য হয়ে মন্তাই বললে, সেখানে কেন? মিটমাটের জন্যে?

—মিটমাট? কিসের মিটমাট?—জগন্নাথের গলার আওয়াজ উগ্র হয়ে উঠল: তোমরাও মরদ, আমরাও মরদ, লাঠিতেই মিটমাট হবে। সেজন্যে নয়, যাচ্ছি দুখানা কাপড়ের জন্যে।

—কাপড়?

—হ্যাঁ, কাপড়। মান সম্মান আর রইল না মিঞা। বউ দুদিন ঘর থেকে বেরুচ্ছে না। বলছে কাপড়ের যোগাড় না করলে গলায় দড়ি দেবে।

মন্তাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—কাপড় পাবে না ভাই, তার চেয়ে বউকে গলায় দড়ি দিতে বলো। আমাকেও তাই করতে হবে।

মন্তাই আর দাঁড়াল না, হেঁটে চলে গেল হনহনিয়ে। ধানক্ষেতের ভেতরে চুপ করে খানিকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল জগন্নাথ—কিছু একটা বুঝতে চেষ্টা করছে যেন।

দিনের আলোয় দেখা গেল সমান উৎসাহে দু দলই পাঁয়তারা কষছে।

কালী মাইকি জয়—আল্লা-হু-আকবর! রক্তপাত আসছে আসন্ন হয়ে। কোনো বার এ সময় ডাকাতে-কালীর থানে পুজো হয় না, কিন্তু এবার কী মানত আছে জগন্নাথ ঠাকুরের, তাই আগামী অমাবস্যায় পুজো তার না করলেই নয়। মূর্তি তৈরি হচ্ছে কুমোরপাড়াতে, সঙ্গে সঙ্গে শান পড়ছে টাঙ্গী-সড়কি-ল্যাজাতে। এবারে এসপার ওসপার যা হোক কিছু হয়ে যাবে একটা।

এরা দাঁড়ায় ডাকাতে-কালীর থানের পাশে, ঝুরি-নামা বটগাছের শান্ত স্যাঁতসেঁতে রহস্যঘন ছায়ায়। অন্ধকার কোটরে আগুনের ভাটার মতো ধক-ধক করে প্যাঁচার চোখ। এই নীলাভ বিচিত্র ছায়ায়, এই গা ছমছম-করা অস্বস্তিভরা পরিবেশের ভেতরে দাঁড়িয়ে ওদের রক্তের আদিমতার সাড়া আসে। মনে পড়ে যায় অমাবস্যায় নরবলি হত এখানে, থক্‌থকে রক্ত চাপ বেঁধে থাকত মাটিতে! এখনি আধ হাত জমি খুঁড়লে বেরিয়ে আসবে নরমুণ্ড, দেখা দেবে কবন্ধ-কঙ্কাল। ডাকাতে-কালী আজ আবার নতুন করে নরবলি চাইছেন।

ওপারে ফকিরের দরগার সামনে দাঁড়ায় ধলা মন্তাইয়ের দলবল। সমানে শানানো চলছে ল্যাজা-সড়কিতে, বাঁশঝাড় উজোড় করে লাঠি কাটা হচ্ছে, তবে আপাতত শুধু ওদের লক্ষ্য করে যাওয়া। যত খুশি ঘরে বসে মূর্তি তৈরি করো, যত খুশি দল পাকাতে থাকো। কিন্তু থানে মূর্তি বসিয়ে ঢাকে একটা কাঠি দিলেই হয়। রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে—সব তৈরি আছে ভেতরে ভেতরে।

চোখ শাণিত করে দেখে ধলা মন্তাই, অন্যমনস্কভাবে থুতনির নিচে ছোট দাড়িটা আঁচড়াতে থাকে। ওদিকে কুকুরছানার বেঁড়ে ল্যাজের মতো টিকিটা সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে ওঠে নমঃশূদ্রের ব্রাহ্মণ জগন্নাথ ঠাকুরের মাথায়।

আচমকা চিৎকার ওঠে ঃ কালী মাইকি জয়—

ওদিক থেকে সমান উৎসাহে আসে তার প্রতিধ্বনি ঃ আল্লা-হু-আকবর—

মনে হয় এখনি দাঙ্গা শুরু হল বুঝি। কিন্তু দু'দলই জানে—এখনো সময় হয়নি। এ শুধু পরস্পরকে জানিয়ে দেওয়া, চালাকি চলবে না। আমরাও সতর্ক আছি, আমরাও আছি প্রস্তুত হয়ে। শুধু দেখে যাচ্ছি—শুধু হুঁশিয়ারি দিয়ে যাচ্ছি। যথাসময়ে দেখা যাবে কে কতবড় মরদ।

মুখোমুখি দু'দল। সমান সামরিক, সমান উৎসাহী। দু-চারটে খুন-জখমে কোন পক্ষেরই আপত্তি নেই। জমি নিয়ে, মেয়েমানুষ নিয়ে যা হামেশাই ঘটে থাকে, ধর্মের জন্যে তার চাইতে আরো কিছু বেশি মূল্য দিতেই রাজী আছে ওরা।

অমাবস্যা যত বেশি এগিয়ে আসছে, চিৎকারের মাত্রা বেড়ে উঠছে তত বেশি। দিনের বেলা পাঁয়তারা কষে সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরে যায় জগন্নাথ আর মন্তাই। দিনের দুই বীরপুরুষ নেতা সন্ধ্যাবেলায় আশ্চর্যভাবে অসহায়। এ এক প্রতিদ্বন্দ্বী—যার বিরুদ্ধে মুখোমুখি দাঁড়াবার সামর্থ্য নেই। শুধু পরাজয়কে মেনে নিতে হচ্ছে—স্বীকার করে নিতে হচ্ছে পৌরুষের মর্মান্তিক অপমানকে। মন্তাইয়ের বৌ শাসায় ঃ একদিন সে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাবে। ঘরের ভেতরে বিনিয়ে বিনিয়ে শোনা যায় জগন্নাথের বৌয়ের কান্না ঃ এবারে তার গলায় দড়ি না দিয়ে আর উপায় নেই।

গুম্ হয়ে দুজনেই বসে থাকে। দুজনের অবচেতন মনেই হিংস্র সাপের মতো একটা প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা পাক খেয়ে ওঠে ঃ কেমন হয় হাবিব মিঞাকে খুন করলে?

কিন্তু শত্রুকে আঘাত করতে এখনো ওরা শেখেনি, যা শিখেছে তা শুধু আত্মঘাত।

সকালবেলায় দলবল নিয়ে মন্তাই সবে হাবিব মিঞার বাড়ির দিকে এগিয়েছে, এমন সময় বিশ্রী একটা কান্নার শব্দে পা আটকে গেল সকলের। কান্নাটা আসছে হাবিব মিঞার বাড়ি থেকেই।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল সকলে।

সর্বনাশ ঘটে গেছে। কাল রাত্রে একটু ভালোরকম খানা-পিনার ব্যবস্থা

হয়েছিল—তৈরি হয়েছিল মাংস-পোলাও। কিন্তু সৈয়দী আমিরী খানার ঝাঁঝ হেলে-চাষার মেয়ে লালবিবি বরদাস্ত করতে পারেনি। শেষ রাত্রে বারকয়েক ভেদ বমি করে তার হয়ে গেছে।

পাগলের মতো বুক চাপড়াচ্ছেন হাবিব মিঞা, তিন বিবি নাকিসুরে কাঁদবার পাল্লা দিচ্ছে সমস্বরে। এই সুযোগ। এই কান্নার উৎকর্ষের ওপরই নির্ভর করবে ভবিষ্যতে লালবিবির সৌভাগ্যটা জুটবে কার কপালে।

সমস্ত মুসলমান-পাড়া শোকে বিমূঢ় আর আচ্ছন্ন হয়ে রইল। শোকটা প্রকাশ করতে না পারলে ভবিষ্যতে অসুবিধের সম্ভাবনা আছে। ঘন ঘন চোখ মুছতে লাগল, দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল সবাই। গত মন্বন্তরেও বুঝি দেশের এতবড় সর্বনাশ হয়নি।

মহাসমারোহে কবর খোঁড়া হল আল্লাতলীতে। তিন বিবি এসে 'মুর্দা-গোসল' করালো, পড়া হল 'জানাজা'র নামাজ। চমৎকার রঙীন শাড়ি আর ধবধবে চাদরে 'কাফন' করা হল, হাবিব মিঞার বড় আদরের লালবিবি ঘুমিয়ে রইল মাটির তলায়।

দূরে দাঁড়িয়ে হিন্দুরা বিমর্ষ মুখে এই শোকানুষ্ঠান দেখতে লাগল। মনে হল, হাবিব মিঞার শোকে তারাও অভিভূত হয়ে পড়েছে, তাদের গলায় একটিবারও কালীমায়ের জয়ধ্বনি শুনতে পাওয়া গেল না। হাজার হোক, ফুড-কমিটির সেক্রেটারী হাবিব মিঞাকে চটানো চলে না।

কেলেঙ্কারিটা হল সেই রাত্রেই।

কে একজন বেশি রাত্রে বেরিয়েছিল ছাগল খুঁজতে। সে এসে চুপিচুপি খবর দিলে হাবিব মিঞাকে। বাঁধের ওপর থেকে দশমীর চাঁদের মেটে মেটে আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, কারা যেন আল্লাতলীতে কবর খুঁড়ছে লালবিবির।

জিন? না, জিন নয়। নিশ্চয় মানুষ। জ্যোৎস্নায় তাদের ছায়া দেখতে পাওয়া গেছে। জিন হলে ছায়া পড়ত না।

এক হাতে দোনলা বন্দুক আর এক হাতে টর্চ নিলেন হাবিব মিঞা। ডেকে নিলেন দলবলকে। আমবাগানের ভেতর দিয়ে সতর্ক পায়ে এগিয়ে চলল দলটা।

সংবাদটা নির্ভুল। দুজন লোক। একজন শাবল মারছে, আর একজন মাটি তুলছে। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, কাফনের কাপড় চুরি করবে।

—ধর্, ধর্, শালাদের—

লোক দুটো পালাতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। কবরখানার উঁচু-নিচু মাটির ঢিবি আর গর্তে পা পড়ে দুজনেই ধরা পড়ে গেল। তখন দশমীর চাঁদের মেটে মেটে আলোটা এক টুকরো মেঘে ঢাকা পড়েছে, কাফন-চোরদের চিনতে পারা গেল না।

—কোন্ শালা হারামীর বাচ্ছা মুর্দাকে বেপর্দা করতে চায়?

জোরালো টর্চের আলো ফেললেন হাবিব মিঞা।

শুধু লোক দুটো নয়—দলসুদ্ধ সবাই পাথর হয়ে গেছে। টর্চটা খসে গেল হাবিব মিঞার হাত থেকে। একজন সাঁচ্চা মুসলমানের বেটা ধলা মস্তাই, আর একজন বামুন ঠাকুর জগন্নাথ—মুসলমানের মুর্দা ছুঁলে যাকে গঙ্গাস্নান করতে হয়। ধলা মস্তাইয়ের হাতে শাবল, জগন্নাথের কনুই পর্যন্ত গোরের মাটি।

কয়েক মুহূর্ত পরে নিজেকে সামলে নিলেন হাবিব মিঞা। বিকৃত বিকট গলায় হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন: মারু, মারু, মেরে শালাদের তক্তা করে দে। দু শালাই কাফের—ইবলিশের বাচ্ছা!

কিন্তু লোকগুলো সব যেন পাথর হয়ে গেছে। মারবার জন্যে কারো হাত উঠল না, এমন কি আঙুলগুলো এতটুকু নড়ল না পর্যন্ত। শুধু সকলের বিস্মিত বিমূঢ় মনে একটা প্রশ্ন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে: ফকির আর কালীর ভেতরে এত সহজে মিটমাট হয়ে গেল কেমন করে?

অপঘাত

বেথুনের বাস গলির মোড়ে এলেই সোজা বাইরের ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে আসে সঞ্জীব। তার উৎসুক চোখ দুটো তাকিয়ে থাকে গলিটার দিকে—এখনি প্রজাপতির মতো ওখান থেকে বেরিয়ে আসবে নমিতা। সদ্য-ফোটা ফুলের মতো এক টুকরো মেয়ে। ঠিক ফুল নয়, ফুলের পাপড়ি। সঞ্জীবের কাব্য করে বলতে ইচ্ছা করে যেন বসন্তের কুঞ্জবন থেকে দক্ষিণা বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে এল।

আর কাব্য করবার মতো মেয়েই বটে। রাজেন্দ্রাণীর মতো দেহশ্রী। সবুজ রঙের রেশমী ফিতে জড়ানো কালো বেণীটি পিঠের সীমানা ছাড়িয়ে অনেকখানি নিচে নেমে এসেছে। কপালে ময়ূরকণ্ঠী রঙের টিপ। দুধে-আলতায় মেশানো গায়ের রঙ—যে শাড়ি যে ব্লাউজটি পরে, সেইটেই যেন অদ্ভুত ভাবে শরীরের ছন্দের সঙ্গে মিশে যায়। নিজের মনে মনেই আবৃত্তি করে সঞ্জীব: মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল—

মুনিদের ধ্যান ভাঙুক আর নাই ভাঙুক—সঞ্জীবের যে ধ্যানভঙ্গ হয়েছে তাতে আর সন্দেহ কী। তা ছাড়া সন্ন্যাসীও সে নয়। উর্বশী-মেনকা না হলে যে চিত্ত-বিকার ঘটবে না এমন কোনো কঠিন ব্রহ্মচর্য ব্রত সে পালন করছে না। অধিকন্তু উর্বশী যদি জুটেই যায় তা হলে সে যে স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের মতোই ভেসে যাবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

না—অসভ্য অভদ্র নয় সঞ্জীব। চোখের দৃষ্টি রাক্ষসের মতো উদগ্র-প্রখর করে তুলে সে সশরীরে নমিতাকে উদরস্থ করতে চায় না, জুতোটাকে সজোরে ঠুকে ঠুকে শিস্ দিয়ে নমিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো রুচি-বিকারও তার ঘটেনি। দু-চারটে শ্লীল-অশ্লীল মন্তব্য অথবা প্রেম-জর্জরিত হৃদয়ের

আগ্নেয়গিরির থেকে অগ্ন্যুৎপাতের মতো চটুল গানের উৎপাত করে সে নিজের পৌরুষ প্রতিপন্ন করতে চায় না। সে শিক্ষিত—মেয়েদের স্বাভাবিক সম্মান রাখবার মতো সহজ ভদ্রতাবোধটুকু তার আছে। কিন্তু বেলা সাড়ে দশটার সময় বেথুন কলেজের বাস থেকে পরিচিত হর্নটা শোনবামাত্র তার ভেতর কী একটা যে ঘটে যায় কে জানে। যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থাতেই ছুটে বেরিয়ে আসে, দাঁড়িয়ে থাকে উৎসুক কাতর দৃষ্টি মেলে। রাণীর মতো লঘুছন্দে আসে নমিতা, কপালে কাঁচপোকার টিপটি জ্বলজ্বল করে, পিঠের ওপর সবুজ ফিতে জড়ানো কালো বেণীটি দোলা খেতে থাকে আর তারই তালে তালে দোলে সঞ্জীবের হৃৎপিণ্ড।

মাত্র দু মিনিট থেকে আড়াই মিনিট সময়। এরই ভেতরে সঞ্জীবের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তটি ধরা দিয়ে মিলিয়ে যায় সমস্ত দিনটির জন্যে। বিকেলে অফিস থেকে ফিরতে প্রায়ই দেরি হয়,' কখন নমিতা আসে সঞ্জীব জানে না। শুধু ওই একটিবার দেখা—ওই দেখাটুকুর ভেতরেই যেন মনের পাত্রটি তার কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে।

নমিতা কখনো তাকে লক্ষ্য করে কিনা কে জানে। দু-চারদিন তার দিকে তাকিয়ে দেখেছে, কিন্তু তার ভেতরে কোনো পরিচয়ের আভাসমাত্র নেই। তার দৃষ্টি নিরাসক্ত, নির্বিকার। হয়তো পথে-ঘাটে চলা-ফেরায় প্রতি মুহূর্তে পুরুষের দৃষ্টিবাণ ভোগ করতে হয় বলেই এই নিরাসক্তিটা আয়ত্ত করে নিতে হয় মেয়েদের। ট্রামে যেতে যেতে যেমন ঘর-বাড়ি গাড়ি-ঘোড়া কতগুলো অর্থহীন ছবির মতো চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যায়, নমিতার কাছে তার চাইতে বেশি কিছু মূল্য নেই সঞ্জীবের। একটা ল্যাম্পপোস্ট অথবা ট্রাম-স্ট্যাণ্ডের সংকেতলিপি মাত্র।

তবু সঞ্জীব হতাশ হয় না। যতটুকু পাওয়া যায়, ততটুকু লাভ। রূপের তীর্থদুয়ারে ভিখারী হয়ে থেকেই সে খুশি —একটি কটাক্ষের প্রসাদও যদি না মেলে তবে তার জন্যে ক্ষোভ করে লাভ নেই। যেটুকু সে পায়, সেটুকুকে আশ্রয় করে বহু শূন্য মুহূর্ত নানা বিচিত্র স্বপ্ন-কল্পনায় ভরে তোলে সঞ্জীব,—অতন্দ্র রাত্রি আমন্থর হয়ে ওঠে কল্পনার জাল বুনে।

শেষ পর্যন্ত কথাটা কানে গেল বন্ধু পরিমলের।

পরিমল চিরকালই একটু বেপরোয়া। কলেজে যতদিন পড়েছে, সহপাঠিনীদের ততকাল সে জ্বালিয়ে মেরেছে। মেয়েদের পিছু নেওয়া তার বাতিকের মতো ছিল। গায়ে পড়ে আলাপ জমাবার চেষ্টা করেছে, সুবিধে না হলে টেলিফোনে পরিচয় জমাবার প্রয়াস পেয়েছে। কালি ঢেলে রেখেছে মেয়েদের বেঞ্চে, গোবেচারা অধ্যাপকের ক্লাসে চিঠি ছুঁড়েছে মেয়েদের লক্ষ্য করে। আর লিখেছে হাজারখানেক প্রেমপত্র—গর্ব করে নিজের অজস্র প্রেমকাহিনীর গল্প বন্ধু বান্ধবদের শুনিয়েছে। সঞ্জীব পরিমলকে যে কোনোকালে খুব অনুরাগের চোখে দেখেছে তা নয়; কিন্তু এই ডন-জুয়ানটির নানা অভিজ্ঞতা সঞ্জীবকে খানিকটা সশ্রদ্ধ করেছে তার সম্পর্কে।

এ হেন দিক্‌পাল পরিমল সঞ্জীবের অসহায় প্রেমের কাহিনীটা শুনতে পেল একদিন।

ঠোঁটের কোণে পাইপ আঁকড়ে ধরে ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে দর্শন দিলে পরিমল। বললে, তুই একটা গাধা।

—হঠাৎ!

—হঠাৎ কি রে! প্রেমেই যদি পড়েছিস তাহলে অমন ছোঁক্‌ ছোঁক্‌ করে বেড়াচ্ছিস কেন? লেগে যা বুক ঠুকে।

—কী করব?

—এগিয়ে যা, বল্‌, আমি তোমাকে চাই।

সঞ্জীব বললে, যাঃ!

—যাঃ, কেন?

—যদি বলে আপনি আমাকে চাইতে পারেন, কিন্তু আপনাকে আমি চাই না!

—হুঁঃ!—মুখে একটা তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক ভঙ্গি করলে পরিমলঃ আরে রাখ্‌! ওদের এখনো চিনিসনি। প্রেমে পড়বার লোভ পুরুষের চাইতে ওদের ঢের বেশি, ফাঁদে পড়বার জন্যে পা বাড়িয়েই আছে সারাক্ষণ। শুধু লজ্জায় বলতে পারে না।

সঞ্জীব চুপ করে রইল। কথাটা সে বিশ্বাস করতে রাজী নয়, বিশ্বাস করা একান্ত অসম্ভব তার পক্ষে। রাণীর মতো দেহসৌষ্ঠব নমিতার। কপালের ময়ূরকণ্ঠী টিপটিতে যেন মণি-মুকুটের দীপ্তি। শান্ত-সুন্দর মুখে মেঘভাঙা জ্যোৎস্নার মতো আশ্চর্য মনোরম কমনীয়তা। সেই মেয়ে এত সহজেই সঞ্জীবের প্রেম-নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় সমর্পণ করে বসবে, নমিতাকে এত সুলভ বলে সে কল্পনা করতে পারে না।

কিন্তু পরিমল থামল না। অনর্গল বকে গেল সে, অশ্রান্তভাবে অযাচিত উপদেশ বর্ষণ করে গেল। কতগুলো অশ্লীল রসিকতা করে গেল সহজ স্বচ্ছ গলায়। নর-নারীর সম্পর্কের রোমান্সহীন একটিমাত্র শারীরিক রূপকেই সত্য বলে জেনেছে পরিমল। ফ্রয়েড্‌, লিন্ড্‌সে, মারী স্টোপস্‌ আর হ্যাভেলক এলিসের বাছা বাছা উদ্ধৃতির একটা জীবন্ত এবং প্রগল্‌ভ এন্‌সাইক্লোপিডিয়া।

বিশ্রী বিরক্তি বোধ হচ্ছিল সঞ্জীবের। ইচ্ছে করছিল ঘাড় ধরে বার করে দেয় এই বর্বরটাকে, কিন্তু সাহসে কুলিয়ে উঠল না। নিজে খানিকটা দুর্বলচিত্ত বলেই সে ভয় করে তার শত্রুতাকে। যখন-তখন যা-তা স্ক্যান্ডাল্‌ রটিয়ে বেড়াতে পারে—যেখানে-সেখানে যা খুশি বলে আসতে পারে তার নামে। পরিমলের অসাধ্য কাজ নেই কিছু।

ওঠবার সময় পরিমল উদারকণ্ঠে বললে, তোর জন্যে ভারি সহানুভূতি বোধ হচ্ছে। দেখা যাক কিছু করা যায় কিনা।

সঞ্জীব শঙ্কিত হয়ে উঠল। ত্রস্ত স্বরে বললে, থাক্‌ ভাই, তোকে কিছু

করতে হবে না। পাড়ার মেয়ে, শেষকালে—

চুরুটের একরাশ ধোঁয়া সঞ্জীবের মুখের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে পরিমল বললে, থাম্, থাম্। পেটে খিদে, মুখে লাজ কেন বাবা? আমার জন্যে তোমার ভাবতে হবে না, দাড়ি গজাবার আগে থেকে এসব করে আসছি। কত ধানে কত তুষ বেরোয় তা আমার জানা আছে।

পাইথনের চামড়ার চটিটাকে ভঙ্গি করে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল পরিমল।

সঞ্জীব বসে রইল বিমর্ষ মলিন মুখে। হতভাগা পরিমল কী কেলেঙ্কারি ঘটিয়ে বসবে কে জানে। আর লোকটাও আশ্চর্য—টের পেলো কী করে! হাওয়ার মুখে খবর পায় নাকি! প্রতিভাটাকে এদিকে নিয়োজিত না করে কোনো ভালো কাজে লাগালে এতদিনে একটা মহাপুরুষ হয়ে উঠতে পারত পরিমল। কিন্তু ভাগাড় ছাড়া কোনো কিছু আর ওর নজরে পড়বে না কোনোদিন।

নমিতা। খোলা জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে রইল সঞ্জীব। কালো আকাশে তারার দীপালি জ্বলছে। নিচে হ্যারিসন রোড দিয়ে ট্রাফিকের গর্জন, ট্রামের ঘণ্টির শব্দ। কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে পাশের বাড়ির রেডিয়োতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত বাজছে—অন্তত ওই গানের ঝংকারটা এসে রণিত হচ্ছে সঞ্জীবের মনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে।

নমিতা। শুধু পাড়ার মেয়ে নয়—সত্যশরণ চ্যাটার্জির মেয়ে। সত্যশরণবাবু এ অঞ্চলের স্বনামধন্য অ্যাড্‌ভোকেট, এম-এল-এ, নাম-করা কংগ্রেস নেতা। তাঁর ওখানে দন্তস্ফুট করা সঞ্জীবের পক্ষে কোনোদিন কোনো অবস্থায় সম্ভব নয়। আর তা ছাড়া, তা ছাড়া—

সব চাইতে বড় বাধা সেইখানেই। সঞ্জীবের জীবিকার পরিচয় আজকের দিনে খুব গৌরবের ব্যাপার নয়। কলকাতা পুলিসের সে সাব-ইন্‌স্পেক্টার। হাজার হাজার বিদ্রোহী ছেলেমেয়ের বুকের রক্তে রাঙানো রাজপথ তাকে বুটের নিচে মাড়িয়ে যেতে হয়। ছাত্রমিছিলের সামনে রিভলবার বাগিয়ে ধরে তাকে পথরোধ করতে হয়। শুধু মনুষ্যত্বের প্রশ্নই নয়, নিজের বিবেক বলে কোনো জিনিসের অস্তিত্বকেই স্বীকার করা সম্ভব নয় সেখানে। বিদ্যা আছে সঞ্জীবের, বুদ্ধিও আছে। কিন্তু সত্যশরণ চ্যাটার্জির মেয়ের কাছে একটা নেড়ী কুকুরের মূল্যও তার ঢের বেশি। ওদের জগতে সঞ্জীব অস্পৃশ্য, সে চণ্ডাল।

জানলার বাইরে আকাশে অজস্র তারা। নমিতা চিরকাল ওই নক্ষত্র-গুলোর মতোই দুরধিগম্য থাকবে তার কাছে। ওই রেডিয়োর গানের মতোই সুর হয়ে তার মনের মধ্যে ধরা দেবে, সত্য হয়ে আসবে না কোনোদিন। আচ্ছা, চাকরিটা ছেড়ে দেবে সঞ্জীব? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে যায় দেশে বাপ-মা, ভাই-বোন—তার চাকরির ওপরে সমস্ত পরিবারটা নির্ভর করে আছে।

জানলাটা বন্ধ করে দিলে সঞ্জীব। টেবিলের টানা থেকে বার করে আনলে রিভল্‌ভারটা। ওইটে দিয়েই তাকে একদিন আত্মহত্যা করতে হবে নাকি! আলো নিবিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল সে—আজও সারারাত তার ঘুম

আসবে না।...

কিন্তু পরিমল নিশ্চেষ্ট হয়ে ছিল না। এল দিন তিনেক পরেই। কাঁধে স্ট্রাপে ঝোলানো একটা ক্যামেরা। সোল্লাসে বললে, এগিয়েছি—মাভৈঃ!

কোনো কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না সঞ্জীবের। সে শুধু তাকিয়ে রইল বিমূঢ় দৃষ্টিতে।

—সত্যি তোর টেস্ট্ আছে মাইরি। চমৎকার মেয়েটা। ছবিখানা যা এসেছে—

—ছবি?

—আলবৎ ছবি। এই নে, ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখ্। আপাতত এটা তোর সান্ত্বনার ব্যবস্থা হল। তারপর শনৈঃ কন্থা, শনৈঃ পন্থা—

পকেট থেকে একটা এন্‌ভেলপ বাড়িয়ে দিলে পরিমল। আশ্চর্য, নমিতার ছবি। বুকের কাছে বই আর ভ্যানিটি ব্যাগ আঁকড়ে ধরা। বিস্মিত দৃষ্টিতে অপূর্ব সুন্দর ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে।

—পেলি কী করে?

—অত্যন্ত সহজে। সামনে দাঁড়িয়ে বাইশ নম্বর বাড়িটা কোথায় জিজ্ঞেস করলুম, তারপরেই ক্লিক!

—কিছু বললে না?

—বলবে আবার কী? কাঁচা ছেলে পেয়েছিস আমাকে! টের পাওয়ার আগেই হাওয়া!

সঞ্জীব তেমনি বিমূঢ়ভাবে বসে রইল।

—মাইরি, তোকে আমার হিংসে হচ্ছে রে! ছবিটার একটা কপি আমারও অ্যালবামে রেখে দেব। তুই যখন পছন্দ করেছিস, তখন আর ওতে নজর দেব না, নইলে—

একটা বীভৎস রকমের অশ্লীল মন্তব্য করে, তীক্ষ্ন শব্দে পরিমল হেসে উঠল। আর সেই মুহূর্তে কেমন একটা বিশ্রী বিপর্যয় ঘটে গেল সঞ্জীবের মাথার ভেতরে। আর্তনাদ করে সে দাঁড়িয়ে উঠল, ছবিটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ছুঁড়ে দিলে বাইরে, এক টান দিয়ে আছড়ে ফেললে পরিমলের ক্যামেরাটা। চিৎকার করে বললে, রাস্কেল, বেরো, বেরো এক্ষুনি—গেট্ আউট্!

—ব্যাপার কিরে?

—চুপ। আর একটা কথা বলেছিস কি সামনের দাঁতগুলো উড়িয়ে দেব। গেট্ আউট—

সঞ্জীবের আগ্নেয় চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে লাথি-খাওয়া কুকুরের মতো পিছু হটতে হটতে বেরিয়ে গেল পরিমল। দরজার বাইরে থেকে চাপা গর্জনের মতো তার একটিমাত্র কথা শোনা গেল: শালা!

তারপর—তারপর অনেকগুলো দিন কেটে গেল।

মনের দিক থেকে কেমন ক্লান্ত আর অবসন্ন বোধ করছে সঞ্জীব। অদ্ভুত দ্রুত-গতিতে ঘুরে চলেছে সময়টা, কোথাও অপেক্ষা করছে না—অপেক্ষা করছে না সঞ্জীবের শিথিল অবসন্নতার। তাকে বাদ দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীটা, তার রিভলভারকে উপেক্ষা করেই আসছে আন্দোলনের পরে আন্দোলন। ২১শে নভেম্বর চলে গেল, চলে গেল আই-এন-এ ডে, তার পরে স্ট্রাইক। সত্যশরণবাবুর সঙ্গে ব্যবধানের সীমারেখাটা আরো বেশি বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে সঞ্জীবের। সুদূর নক্ষত্রের মতো নমিতা। মাটি থেকে একটা নক্ষত্রের দূরত্ব কত? আলোর গতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল, সেই নক্ষত্র থেকে পৃথিবীতে যদি আলো আসতে হাজার বছর সময় লাগে, তা হলে—

সঞ্জীব কিছু ভাবতে চায় না, ভাবতে ভুলেও গেছে। আরো একটা বছর কেটে গেল। নমিতা বোধ হয় থার্ড ইয়ারে পড়ে এবারে। রঙীন শাড়ি ছেড়ে আজকাল খদ্দরের শাড়ি ধরেছে, মাঝে মাঝে গান্ধীটুপি পরে কলেজে যায়। সুদূরের তারাটা ক্রমেই দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে উঠছে। আরো কিছুদিন পরে একেবারে হারিয়ে যাবে দৃষ্টির বাইরে। আকাশে যে রক্তমেঘ ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে উঠছে, তারই আড়ালে নিশ্চিহ্নভাবে যাবে মিলিয়ে।

কিন্তু চাকরি ছাড়তে পারবে না সঞ্জীব। বাপ-মা, ভাই-বোনের মুখ ভেসে ওঠে চোখের সামনে। তার রোজগারের ওপরেই নির্ভর করছে সংসার। হাতে তার যত রক্ত মাখাই থাক—সেই রক্তমাখা টাকাতেই চলবে দিনগত পাপক্ষয়ের শোচনীয় আত্ম-অবক্ষয়। কিন্তু ওই রক্তাক্ত হাতে নমিতার শুভ্র খদ্দরের শাড়িকে সে কখনো স্পর্শ করতে পারবে না, শুধু সে মুঠোয় তার রিভলভারটাকেই নিষ্ঠাভরে আঁকড়ে রাখতে পারবে।

সেদিন বিকেলে থানা থেকে বাড়ি ফিরছিল সঞ্জীব।

কলেজ স্কোয়ারের কাছাকাছি এসেই তাকে থেমে পড়তে হল। ছাত্র-ছাত্রীর বিরাট শোভাযাত্রা চলেছে, একটা ডাক-ধর্মঘটীদের দাবিতে পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করছে তারা।

নির্নিমেষ চোখে সঞ্জীব তাকিয়ে রইল। বাংলার যৌবন-শক্তি। নানা পতাকার আশ্চর্য সমন্বয়ে সম্মিলিত শোভাযাত্রা। ওদের চোখে-মুখে জীবনের সজীব উন্মাদনা—ওদের কণ্ঠস্বরে আগামী ঝড়ের সংকেত—সেই ঝড়—যার আসন্ন সম্ভাবনার প্রেতচ্ছায়া দুঃস্বপ্নের মতো এসে পড়েছে সঞ্জীবের চেতনার ওপরে। ওদের দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস নেই সঞ্জীবদের—শুধু পরের অস্ত্র হাতে নিয়ে উন্মাদের মতো, অন্ধের মতো ওদের ওপর আঘাত করতে পারে এবং অপেক্ষা করতে পারে সেইদিনের জন্যে—যেদিন এই অস্ত্র ফিরে এসে দ্বিগুণ বেগে প্রতিঘাত করবে।

সিগারেটটা ঠোঁটের কোণে কামড়ে ধরে তাকিয়ে রইল সঞ্জীব। না, আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বরং ওদের মধ্যে নমিতাকে না দেখলেই সে বিস্ময়-বোধ করত। সত্যশরণবাবুর মেয়ে, তিনপুরুষ ধরে জেল খেটে আসছে ওরা,

নমিতার বড়দা মারা গেছে আন্দামানে। হয়তো নমিতাও তৈরি হচ্ছে জেল খাটবার জন্যে, আন্দামানের জন্যে, লাঠি আর বন্দুকের গুলির জন্যে। সেইটেই স্বাভাবিক—সেইটেই অনিবার্য। দুর্লক্ষ্য নক্ষত্রটির ওপর রক্তমেঘের ছায়া আরো বেশি করে ছড়িয়ে পড়ছে, রেডিয়োর গানটা হারিয়ে যাচ্ছে ঝোড়ো হাওয়ার গর্জনের মধ্যে।

চমৎকার লাগছে নমিতাকে। এতদিনে সঞ্জীব তাকে দেখতে পেলো তার সত্যিকারের পরিবেশের ভেতর। শুভ্র সুডোল হাতে পতাকাটি তুলে ধরেছে, রোদে রাঙা হয়ে গেছে অপরূপ কোমল মুখখানা, অসংবৃত অলকগুচ্ছ খেলা করছে গালে-কপালে। রোজ সাড়ে দশটায় কাঁচপোকার টিপ পরে, দীর্ঘ নিবিড় বেণী দুলিয়ে লঘুচ্ছন্দে যে মেয়েটি বেথুনের বাসে এসে ওঠে, তার সঙ্গে এর কোনোখানে এতটুকুও মিল নেই। ছোট একটি প্রদীপের শিখা যেন মশালের আগুন হয়ে জ্বলে উঠেছে এখানে—সঞ্জীবের ঘর তা আলো করবে না, অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে দেবে বরং।

—শেম্—শেম্—

সঞ্জীব চমকে উঠল। তাকেই লক্ষ্য করে বলছে ওরা। শেম্ শেম্। তার পরনে ইউনিফর্ম, তার কোমরে রিভল্‌ভার। টুপিতে রাজটীকা জ্বল-জ্বল করছে। কোনোখানে আত্মগোপন করবার একবিন্দু অবকাশ নেই। সঞ্জীবের মুখে আছড়ে পড়ল এক ঝলক রক্তের উচ্ছ্বাস।

কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সহকর্মী প্রতাপ দাস। কাঁধে তার হাতের স্পর্শ লাগতে সঞ্জীব চমকে উঠল বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো।

—দাঁড়িয়ে কী করছ ব্যানার্জি?

—দেখছি।

—হুঁ, ভয়ঙ্কর বাড় বেড়েছে। দেশ এবার স্বাধীন করেই ফেলবে দেখছি।

শোভাযাত্রাটা ততক্ষণে এগিয়ে গেছে অনেকখানি। নমিতাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার হাতের পতাকাটাকে এতদূর থেকেও চিনতে পারছে সঞ্জীব। অন্যমনস্ক ভাবে বললে, আশ্চর্য নয়।

সঞ্জীবের দৃষ্টি অনুসরণ করে শোভাযাত্রার দিকে একটা আগ্নেয় কটাক্ষ ক্ষেপণ করলে প্রতাপ দাস। বললে, ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের ম্যাগাজিন এখনো ফুরিয়ে যায়নি। অত সস্তা হবে না।

—বোধ হয়।

তেমনি অন্যমনস্ক ভাবেই সঞ্জীব জবাব দিলে। সে ভাবছিল অন্য কথা। এখন পরিমল থাকলে বেশ হত। এই অবস্থায় নমিতার একখানা ফোটো পেলে যত্ন করে সে সাজিয়ে রাখত তার টেবিলে, হারিয়ে যাওয়া নক্ষত্রের শেষ আলোর স্বাক্ষর তার জীবনের সব চাইতে বড় সম্পদ হয়ে থাকতে পারত।

কিন্তু আজ চব্বিশে আগস্ট, উনিশশো ছেচল্লিশ। টেবিলের পাশে একটা পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে সঞ্জীব। একটা সহজ ভদ্রতার কথা অবধি তার মুখে আসছে না।

তার সামনে মুখোমুখি বসেছেন সত্যশরণবাবু। বিনয়ে তাঁর মুখখানা কেমন অস্বাভাবিক আর কৌতুকজনক হয়ে উঠেছে। যেন সত্যশরণ চ্যাটার্জি নয়—তাঁর ক্যারিকেচার। চোখে মুখে সেই তপস্যাক্লিস্ট শুচিতা, সেই উন্নাসিক আভিজাত্য মুহূর্তে যেন ছায়া হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে। একটা তীব্র শারীরিক অস্বস্তি বোধ করছে সঞ্জীব, অস্থির চোখে লক্ষ্য করছে দেয়ালে টাঙানো দেশনেতাদের ছবিগুলোর দিকে।

সত্যশরণবাবু বলছিলেন, আপনি পাড়াতেই থাকেন, মুখ চেনা আছে, কখনো আলাপের সুযোগ হয় না। তাই আজ আপনাকে ডেকে নিয়ে এলাম। এখন তো আপনারাই ভরসা, যদি মুসলমানেরা অ্যাটাক-ফ্যাটাক করে—

শুকনো গলায় সঞ্জীব বললে, না, ভয় নেই।

—কিছু বলা যায় না মশাই, কিছু বলা যায় না। বিশ্বাস নেই ওদের। তা আপনি যদি মাঝে মাঝে একটু দয়া করে আসেন তাহলে আমরা খানিকটা আশ্বাস পাই আর কি।

তেমনি নিষ্প্রাণভাবে সঞ্জীব বললে, আসব।

চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল নমিতাই। সত্যশরণবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন।

নমিতার দিকে একটিবার চোখ তুলেই আবার নামিয়ে নিলে সঞ্জীব। আশ্চর্য, এ তৃতীয় নমিতা। সত্যশরণবাবুর মতো এও নমিতার ক্যারিকেচার—এরও মুখে একটা বিচিত্র অস্বাভাবিকতা, একটা বিগলিত বিনয়ের ব্যঙ্গ। নমিতা কখনো এত কুৎসিত হতে পারে এটা স্বপ্নেরও অতীত ছিল সঞ্জীবের।

মধুর গলায় নমিতা বললে, চা নিন।

চা-টা যেন বিষের মতো তেতো মনে হল সঞ্জীবের। পথে যখন বেরিয়ে এল, তখন সমস্ত পৃথিবীটা তার কাছে যেমন শূন্য, তেমনি নিরর্থক হয়ে গেছে।

বন্দুক

অধৈর্যভাবে ঘরের ভেতরে পায়চারি করছে লোকনাথ সাহা। ক্ষুব্ধ আক্রোশে অনেকক্ষণ ধরে দাঁতের ওপর দাঁত চেপে রাখবার ফলে মাড়িটা টনটন করছে এখন। ডান হাতটা অতিরিক্ত জোরে মুঠো করে রাখবার জন্যে হাতের নরম মাংসের ভেতরে দু-তিনটে নখ একেবারে বসে গেছে, জ্বালা করছে চিনচিন করে—রক্ত পড়ছে বোধ হয়। কিন্তু লোকনাথ সাহা টের পাচ্ছে না কিছু—তেমনি অধৈর্যভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘরের মধ্যে পায়চারি করে যাচ্ছে।

তারপর আস্তে আস্তে সন্ধ্যা ঘনালো। ঘরের ভেতরে নামতে লাগল কালো অন্ধকার। যেগুলো স্পষ্ট আর আকারগত ছিল, ধীরে ধীরে তারা অবয়বহীন হয়ে যেতে লাগল। তারও পরে ঘরের ভেতরে লোকনাথ সাহার নিজের অস্তিত্ব ছাড়া কিছু জেগে রইল না।

নিজের অস্তিত্বটাই শুধু জেগে রইল। কিন্তু অতি তীব্র, অতি ভয়ংকর এই জাগরণ। ইচ্ছে করতে লাগল এই অন্ধকারের মধ্যেই সে ছুটে বেরিয়ে পড়ে, জ্বালিয়ে দেয় এই পৃথিবীটাকে—ভেঙে চুরমার করে দেয় যা কিছু সম্ভব। একটা অসহ্য অথচ অবাস্তব ধ্বংস-কল্পনায় প্রচন্ড বিস্ফোরণের মতো নিজের মধ্যে ধূমায়িত হতে লাগল লোকনাথ সাহা। যুগ পালটাচ্ছে—দেশ স্বাধীন হচ্ছে, সব মানি ; এও জানি যে গরীবের দুঃখ দূর করতে হবে—চাষাভুষোদের পেটের অন্নের সংস্থান করে দিতে হবে। কিন্তু এ কী ব্যাপার! স্বাধীনতার আন্দোলন করতে হয়, লড়াই করতে হয়, করো ইংরেজের সঙ্গে। পেটের ভাত চাইতে হয়—মহকুমা হাকিমের বাংলোর সামনে গিয়ে ধর্না দাও—শহরের রাস্তায় ভুখ-মিছিল বার করো। এদের কোনোটাতেই লোকনাথ সাহার আপত্তি নেই। দরকার হলে দেশের জন্যে সেও আত্মবিসর্জন করতে পারে, অর্থাৎ একটা সভা-সমিতিতে সভাপতি হয়ে মাস তিন-চার 'এ' ক্লাস জেল খেটে আসতে পারে—যা সে এর আগেও করেছে ; আর বলো তো খবরের কাগজে জ্বালাময়ী একখানা পল্লীগ্রামের পত্রও সে লিখে দিতে পারে, অগ্নিময় কণ্ঠে প্রশ্ন করতে পারে ঃ আমরা জানিতে চাই, জনপ্রিয় মন্ত্রীমণ্ডলী এই অনাচার-অবিচারের প্রতিবিধান করিবেন কি না এবং কবে করিবেন ?

কিন্তু এ তো তা নয়। কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে শেষ পর্যন্ত ফণা তুলে উঠেছে কেউটে সাপ। এ কি কখনো কল্পনাও করা যায় যে শেষ পর্যন্ত এ আপদ তারই ঘাড়ে চড়ে বসতে চাইবে ? তিন ভাগের দু ভাগ ধান! তার মানে দু মাস পরে বলবে তিন ভাগের তিন ভাগই চাই! আর শুধু ওই-খানেই থামলে হয়! শেষ পর্যন্ত দাবি করে বসবে ঘর দাও, বাড়ি দাও, গোরু দাও—বউ দাও—

নাঃ—অসহ্য! এবং, অসম্ভব। কচুগাছ কাটতে কাটতে ডাকাত হওয়ার যে অদূর সম্ভাবনা সুনিশ্চিত হয়ে আসছে, এই মুহূর্তে তার কন্ঠরোধ করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে টুঁ শব্দটি করবার পর্যন্ত সাহস না পায়।

সত্যিই অসহ্য। লোকনাথ সাহা কান পেতে শুনতে লাগল গ্রামের দিক থেকে কোলাহল উঠেছে। জয়ের কোলাহল, আনন্দের কলধ্বনি। ফসল কেটে নিজেদের ঘরে তুলেছে ওরা—মহাজন আর জোতদারকে বলে পাঠিয়েছে, দরকার হলে তারা যেন নিজেদের ভাগ নিজেরা এসে নিয়ে যায়। ওরা জমিতে লাঙল দিয়েছে, সার দিয়েছে, রোদে পুড়ে, জলে ভিজে ফসল ফলিয়েছে এবং ফসল কেটেছে। আসলে সব ধানটাতেই ওদের দাবি। তবু জমিদার জোত-দারকে একেবারে বঞ্চিত করতে চায় না, তাই ধর্মের নামে তাদের এক ভাগ ধান দিতে ওদের আপত্তি নেই। তবে বাড়ি বয়ে সে এক ভাগ ওরা দিয়ে আসতে

রাজি নয়—বাবুমশায় এবং মিঞা সাহেবেরা ইচ্ছে করলে নিজেরা এসে অথবা লোক পাঠিয়ে তাঁদের পাওনা ভাগ নিয়ে যেতে পারেন।

লোকনাথ সাহা, ফজল আলী, নুর মামুদ আর বৃন্দাবন পাল চাষাদের বোঝাবার চেষ্টা করেছিল। বলেছিল, আল্লার নামে, ভগবানের নামে ভেবে দেখ্, তোরা কী করতে যাচ্ছিস!

চাষাদের পক্ষ থেকে রহমান জবাব দিয়েছিল, যা করেছি, আল্লার নামে ভেবেই করেছি। গায়ে-গতরে একটু আঁচড় লাগবে না বাবু, জমির ভালো-মন্দের দিকে একবার তাকাবে না, অথচ থাবা দিয়ে অর্ধেক ধান গোলায় তুলে নেবে। নিজেরাই একবার ইমানের দিকে তাকিয়ে দেখ কোন্‌টা হক আর কোন্‌টা বেইমানি।

ফজল আলীর আর সহ্য হয়নি। গর্জে বলেছিল, খুব তো হক আর বেইমানি বোঝাচ্ছিস! ওরে, মোছলমানের বাচ্ছা হয়ে হিঁদুর ফাঁদে পা দিলি! লজ্জা হয় না?

রহমান শুধু হেসেছিল। বাধা দিয়ে বলেছিল, মোছলমান গরীব হিঁদু গরীবের সঙ্গে দাঁড়িয়ে পেটের ভাতের জন্যে লড়াই করলে গুণাহ্ হয় আর হিঁদু জোতদারের সঙ্গে দোস্তি করে মোছলমানের ভাত মারলে সেটাই বুঝি বড় ভালো কাজ হল? বোকা বুঝিয়ো না সাহেব, যাও, যাও—নিজের কাজে যাও—

—পিঁপড়ের পাখনা গজিয়েছে মরবার জন্যে—অ্যাঁ?—ধৈর্যচ্যুত হয়েছিল ফজল আলী: আচ্ছা, টের পাবি! সেদিন পায়ে ধরে কাঁদলেও নাফা হবে না—এই বলে রাখলাম।

—কলিজার রক্ত দিয়ে ধান রাখব, জান দিতে হয় দেব। তবু তোমাদের দোরে হাত পেতে সিন্নি চাইতে যাবো না। এও জানিয়ে রাখছি।

—বটে? বেশ—বেশ।—আর কথা যোগায়নি ফজল আলীর। কয়েক মুহূর্ত নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে ছিল রহমানের দিকে—যেন রক্তখেকো একটা বাঘের মতো ওর ঘাড়ের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। তারপর দাঁতের ফাঁকে একটা ভয়ঙ্কর কটু শপথ উচ্চারণ করে ধীর পদক্ষেপে স্থানত্যাগ করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছিল লোকনাথ সাহা, বৃন্দাবন পাল আর নুর মামুদ।

তারপর—

তারপর থেকে এই চলছে। মানুষগুলো ক্ষেপে উঠেছে, মেতে উঠেছে জয়ের আনন্দে। এ যেন সাপের পাঁচখানা পা দেখবার আনন্দ। কিন্তু সাপের যে সত্যি সত্যিই পাঁচটা পা বেরোয় না—এটা ওদের বোঝানো দরকার। বুদ্ধিটা শেষ পর্যন্ত বাতলে দিয়েছে ফজল আলীই। বলেছে, রঘুরামকে ডাকো।

—রঘুরাম?

—হাঁ, রঘুরাম। সে ছাড়া আর কারো কর্ম নয়।

তারপর গলার স্বর নামিয়ে এনেছে ফজল আলী। চাপা গলায় বলেছে

কতগুলো ভয়ঙ্কর কথা। শুনে লোকনাথের অবধি শরীরটা ঝিমঝিম করে উঠেছে, হিম হয়ে গেছে হাত-পাগুলো। জিভটা শুকিয়ে হঠাৎ যেন আঠার সঙ্গে আটকে গেছে তালুতে।

ক্ষীণকণ্ঠে লোকনাথ বলেছে, অতটা ?

—হ্যাঁ, অতটাই।

—বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না ?

—কিছু না। শত্রুর শেষ রাখতে নেই।

—কিন্তু থানা, পুলিস—

ফজল আলী হেসেছে। বলেছে, সাধে কি তোমাদের সঙ্গে আমাদের বনিবনাও হয় না, না পাকিস্তান চাইতে হয় ? আরে, অত ঘাবড়ালে চলে ? তা ছাড়া থানা পুলিস—গূঢ়ার্থব্যঞ্জক হাসিতে মুখখানাকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে ফজল আলীঃ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে পারলে ওরাও আপত্তি করবে না দেখে নিয়ো। আর—একটু থেমে দু আঙুলে টাকা বাজাবার ভঙ্গি করে বলেঃ ঠিক হয়ে যাবে।

—তাহলে রঘুরামকে খবর দিই ?

—নিশ্চয়।

শুকনো ঠোঁট দুটোকে বার কয়েক লেহন করে দুর্বল অনিশ্চিত স্বরে লোকনাথ বললে, দেখো ভাই, শেষতক পেছনে পেছনে থেকো। শেষে আবার সামনে ঠেলে দিয়ে সরে পড়ো না।

—ক্ষেপেছ !—পিচ করে অবজ্ঞাভরে দাঁতের ফাঁক দিয়ে থুথু ছড়িয়েছে ফজল আলীঃ দুবার হজ করেছি, পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ি আমি। জীবনে একটা রোজা আমার ভাঙেনি। খাঁটি মোছলমানের বাচ্চা আমি—ইমান নষ্ট করব ! কী যে বলছ—তোবা তোবা !

সুতরাং ডাক পড়েছে রঘুরামের। রঘুরাম বলেছে সন্ধ্যের পরে আসবে, দিনের আলোয় এ ব্যাপার সম্ভব নয়। গাঁয়ের লোক এমনিতেই ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো ঘুরছে, দেখলেই সন্দেহ করবে। আর সন্দেহ করা মানেই চকচকে হাঁসুয়ার কোপে টুকরো টুকরো করে কেটে বস্তায় ভরে ভাসিয়ে দেবে করতোয়া নদীতে।

তাই সন্ধ্যার অন্ধকারে আসবে রঘুরাম। আসবে কালো রাত্রির আড়ালে আড়ালে লুকিয়ে নিঃশব্দচর সরীসৃপের মতো। তারই জন্যে প্রতীক্ষা করছে লোকনাথ—পায়চারি করে বেড়াচ্ছে বন্য জন্তুর মতো—চাষীদের কোলাহলের এক-একটা দমকায় বুকের ভেতর এক-একটা করে চিড় খেয়ে যাচ্ছে তার।

রঘুরাম আসবে। কিন্তু কখন ?

রঘুরাম পাশী। তাল গাছ চাঁছে, তাড়ি তৈরি করে। ব্যবসা চলে অবশ্য আবগারিকে ফাঁকি দিয়ে ! একবার ধরা পড়ে দু বছর জেল খেটেছে, কিন্তু স্বভাব বদলায়নি।

রোগা সিড়িঙ্গে লোকটা। নারকোলের দড়ির মতো ছিবড়ে পাকানো

শরীর। অতিরিক্ত তাড়ি খায়, আবার গাঁজাও টানে ততোধিক উৎসাহে, বলেঃ রসটা তো শুকোনো চাই—হে-হে-হে। চোখের রঙ ক্ষ্যাপা বুনো মোষের মতো রক্তাভ, অত্যধিক নেশার ফলে স্বাভাবিক বর্ণ হারিয়ে ওই রঙটাই পাকা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শুধু এইটুকুই যথেষ্ট পরিচয় নয় রঘুরামের। কোন্ ছেলেবেলাতে একটা গাদা বন্দুক যোগাড় করেছিল রঘুরাম, হাত পাকিয়েছিল। তার পর থেকে তার হাতের তাক একটা প্রবাদ-বাক্যের মতো দাঁড়িয়ে গেছে। কার্তিক অঘ্রাণ মাসে আশপাশের বিলে হাঁস পড়তে শুরু হয়। মিঞা সাহেবেরা, বাবু মশায়েরা তখন বিলে নামে শিকারের চেষ্টায়। দমাদ্দম গুলি ছোঁড়ে—দশটা ফায়ারে একটা পাখী নামাতে পারে না। আর তাই দেখে এলোমেলো দাঁতগুলোর দুপাটি একেবারে পরিপূর্ণ করে মেলে দেয় রঘুরাম, হো-হো করে হাসে। বলে, কর্তাদের একটা গুলিও তো পাখীগুলোর গায়ে লাগবে না, তবে যে রকম শব্দ-সাড়া হচ্ছে তাতে দুটো-চারটে বাসায় গিয়ে মরে থাকবে।

তা হাসতে পারে বইকি রঘুরাম, বিদ্রূপ করবার অধিকারও তার আছে। তার হাতের তাগ ফসকায় না। বাবুদের বন্দুক চেয়ে নিয়ে এক ফায়ারে দশটা পাখীও সে নামিয়ে দিয়েছে। বলেছে, শুধু কি বত্রিশ ইঞ্চি বন্দুক আর বাক্স বাক্স টোটা থাকলেই শিকারী হওয়া যায়? হাওয়া বুঝতে হয়, জায়গা বাছতে হয়, জল-কাদা কাঁটাবন ভাঙতে হয়। সুখের শরীর আর কোঁচানো ধুতিটি নিয়ে বন্দুক বাগিয়ে কাক তাড়ানো যায়, কিন্তু শিকার করা যায় না।

সত্যিই রঘুরাম পাকা শিকারী। আর শিকারী বলেই তাকে এমন সমাদর করে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তবে এবার আর তার পাখী শিকার নয়—তার চাইতে ঢের বড়, ঢের বিপজ্জনক শিকারের বন্দোবস্ত।

আর এদিক থেকেও বেশ নিরাপদ নির্ঝঞ্ঝাট লোক রঘুরাম। নীতি বলে, বিবেক বলে কোনো কিছুর বালাই নেই তার। টাকা পেলে যা খুশি সে তাই করতে পারে, খামোকা গোটা তিনেক মানুষ খুন করে আনতে পারে। সকলের মাঝখানে থেকেও সে সকলের বাইরে—প্রয়োজনমতো নিজেকে কেন্দ্র করে সে একটা বৃত্তাকার পৃথিবী সৃষ্টি করে নিয়েছে। তালগাছ চাঁছে, তাড়ি গেলে, গাঁজা টানে, আর গ্রামের প্রান্তে যে ডোমপাড়া আছে সেখানে কোন্ একটা মেয়েমানুষকে নিয়ে সারারাত কাটিয়ে আসে। সুতরাং এ-কাজে তার চাইতে উপযুক্ত লোক আর নেই।

দরজায় ঘা পড়ল। ঘরের ভেতরে হঠাৎ ঘুমের ঘোরে ভয় পেয়ে চমকে জেগে-ওঠা মানুষের মতো বিকৃত স্বরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল লোকনাথঃ কে?

বাতাসের শব্দের সঙ্গে একাকার হয়ে স্বর ভেসে এলঃ রঘুরাম।

—দাঁড়াও, দোর খুলছি।

একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে দরজাটা খুলে দিলে লোকনাথ। বিড়ালের মতো শব্দহীন পায়ে রঘুরাম ঘরে ঢুকল।

—দণ্ডবৎ কত্তা। কী জন্যে অধীনকে ডেকেছেন আজ্ঞে?

—বোসো বলছি।

দরজাটা আবার সাবধানে বন্ধ করে দিলে লোকনাথ। তারপর তেমনি ভাবেই ভয়ংকর চাপা গলায়—যে গলায় ফজল আলী কথা বলেছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই সেই কথাগুলোই সে আবৃত্তি করে গেল। চুপ করে শুনে গেল রঘুরাম—শুনে গেল পাথুরে মূর্তির মতো।

—কখন?

—কাল সন্ধ্যেয়।

—কাল সন্ধ্যেয়?

—হাঁ। দীঘির পাড়ে সভা করবে ওরা। বড় বাঁশ-ঝাড়টার আড়াল থেকে কাজ শেষ করতে হবে।

—কটাকে মারতে হবে?

—না, না, বেশি নয়। এক রহমান হলেই যথেষ্ট, ওটাকে ঘায়েল করতে পারলেই শিরদাঁড়া মট্‌কে যাবে ওদের। এবার তোমার হাতের তাক দেখব রঘুরাম।

রঘুরাম হাসল—এলোমেলো দাঁতগুলো বার করে বিশৃংখলভাবে টেনে টেনে হাসল খানিকক্ষণ। বললে, আচ্ছা, বন্দুকটা দিন।

লোকনাথ বন্দুক বার করে আনলে। বললে, খুব সাবধান। আমার প্রাণ হাতে দিয়ে দিচ্ছি তোমার, রঘুরাম। কাজ শেষ হলেই ফেরত চাই—নইলে মহা গণ্ডগোলে পড়ে যাবো।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, কাজ শেষ হলেই ফেরত দেব বইকি—তাজা কার্তুজগুলো আর খোলা বন্দুকটাকে একটা থলির ভেতরে পুরতে পুরতে রঘুরাম বললে, কিছু ভাববেন না—

তারপর উঠেই দ্রুতগতিতে সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। লোকনাথ খোলা দরজা দিয়ে তাকিয়ে রইল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে—গ্রামের আনন্দ-কলরোল কানের পর্দায় এসে শংকর মাছের চাবুকের মতো এক-একটা করে প্রবল প্রচণ্ড আঘাত বসিয়ে যাচ্ছে তাকে।

কিন্তু একটা জিনিস জানলো না লোকনাথ। সেই রাত্রেই রঘুরাম গেল ফজল আলীর বাড়িতে, তারপর বৃন্দাবন পালের আড়তে, তারপরে নূর মামুদের কাছারিতে। তারপর—

তার পরদিন বিকেলে জোর মিটিং বসেছে দীঘির পাড়ে। দলে দলে লোক জড়ো হয়েছে, চেঁচামেচি করছে, উচ্চারণ করছে তাদের কঠিন অপরাজেয় শপথ। উত্তেজনায় মুষ্টিবন্ধ হাতটাকে বারে বারে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে রহমানঃ ভাই সব, জান কবুল, আমরা ধান দেব না। আমরা না খেয়ে কুত্তার মতো মরব আর মহাজনের গোলা ভরে উঠবে আমাদের খুন-মাখানো ধানে, এ আমরা হতে দেব না—কিছুতেই না—

গগনভেদী সমর্থনের রোলে হারিয়ে যাচ্ছে রহমানের কণ্ঠ। এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে—সূর্যের উজ্জ্বল আলোর মতোই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে আজ আর রহমানের নিজের কথা কিছু বলবার নেই। তার কথা আর সমস্ত মানুষের কথার বন্যায় একাকার হয়ে গেছে, সমস্ত মানুষের প্রতিশোধ আর প্রতিরোধের উদ্ধত মুষ্টির সঙ্গে মিশে গেছে রহমানের উদ্যত মুষ্টিও। ব্যক্তি-মানুষের সীমানা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সমষ্টিময় মানুষের বিপুল বিস্তারে. আজ শুধু রহমান বক্তা নয়—সমস্ত মানুষের বক্তব্য এক সুরে মুখর হয়ে উঠেছে : জান দেব, ধান দেব না—

নতুন জীবনবোধ, নতুন শপথ।

পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে, মাথার ওপরে কাঁপছে আকাশ। আকাশে বাতাসে ঝড়-ভূমিকম্পের সংকেত—বজ্র-বিদ্যুতের আগ্নেয় সূচনা। অসম্ভব—এ সহ্য করা যায় না। বিকেলের ছায়া নিবিড় হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে, অন্ধকার আসছে। আর সেই অন্ধকারের জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে লোকনাথ সাহা, ফজল আলী, বৃন্দাবন পাল, আর নূর মামুদ।

রঘুরামের হাতের তাক কখনো ভুল হয় না।

বিকেল কেটে গেল, সন্ধ্যা নামল। দীঘির পাড়ে এখনো মিটিং চলছে। মশালের আলো জ্বলছে, রহমান, কান্তলাল, যদু প্রামাণিক, মইনুদ্দিন—বলে যাচ্ছে একের পর একজন। একই কথা—পুরনো কথা। জান দেব, ধান দেব না—

কিন্তু কোথায় রঘুরাম—রঘুনাথের মতোই অব্যর্থ সন্ধানী রঘুরাম? তার হাতের তাক কখনো ব্যর্থ হবে না। বাঁশের ঝাড়ের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে মাত্র একটা গুলি ছুঁড়বে সে—বুকে হাত চেপে পড়ে যাবে রহমান। একটি ঘায়েই বিষদাঁত উপড়ে যাবে কাল-কেউটের। কিন্তু সে কখন—কোন্ শুভলগ্নে?

লোকনাথ সাহা, ফজল আলী, বৃন্দাবন পাল আর নূর মামুদ অধৈর্য হয়ে উঠছে। আর কত দেরি করবে রঘুরাম? সময় চলে যাচ্ছে—চলে যাচ্ছে অতি মূল্যবান অতি দুর্লভ সুযোগ। সভা ভেঙে গেলেই রহমানকে আর সহজে পাওয়া যাবে না, কোথা থেকে কোথায় যে ঘুরে বেড়ায় লোকটা তার কোনো ঠিক-ঠিকানাই নেই। আজ হয়তো এখানেই আছে, দেখতে দেখতে কাল সকালে একেবারে হাওয়া হয়ে যাবে, চলে যাবে দূরে—অন্যান্য গ্রামে গিয়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে চেষ্টা করবে। লোকটা এ গাঁয়েরও নয়, কোথা থেকে যে শনির মতো আমদানি হয়েছে ভগবানই জানেন। চাল নেই, চুলো নেই, গাঁয়ে গাঁয়ে চাষা প্রজা ক্ষ্যাপানো ছাড়া আর কোনো কাজই নেই তার।

কিন্তু এত দেরি করছে কেন রঘুরাম, কেন এমনভাবে নষ্ট করে দিচ্ছে এই দুর্মূল্য মহার্ঘ সময়? একটা বন্দুকের শব্দ শোনা দরকার, শোনা দরকার সমস্ত কোলাহল ছাপিয়ে এই আন্দোলনটার মৃত্যুযন্ত্রণার মতো একটা ভয়াবহ আর্তনাদ। একটা অস্বস্তিকর অধৈর্য পাথরের মতো গুরুভার হয়ে চেপে

বসছে লোকনাথ সাহা, নূর মামুদ, ফজল আলী আর বৃন্দাবন পালের বুকের ওপর। মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে, ইচ্ছে করছে নিজেদের হাতগুলো কামড়ে রক্তাক্ত করে দিতে। কেন দেরি করছে—কেন এমন অশুভভাবে বিলম্ব করছে রঘুরাম!

অবশেষে পরমাশ্চর্য যা, তাই ঘটল। মিটিং শেষ হয়ে গেল—নিরাপদে, একান্ত নির্বিবাদে। কাল-কেউটের বিষদাঁত ভাঙল না—বরং আরো বেশি বিষ সঞ্চয় করে নিলে সে—আরো বেশি করে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল আকাশে বাতাসে ঝড় বৃষ্টি ভূমিকম্পের সংকেতময়তা।

—কী হল রঘুরামের?

ছুটতে ছুটতে এল ফজল আলী, নূর মামুদ, বৃন্দাবন পাল।

—কী হল রঘুরামের?

—তাই তো, ব্যাটা করলে কী শেষ পর্যন্ত?

সভয়ে লোকনাথ বললে, কাল সন্ধ্যেবেলায় ব্যাটা আমার বন্দুকটা নিয়ে গেল—

—অ্যাঁ!—তিনজনেই চমকে উঠল।

ফজল আলী বললে, সে কি! তোমার বন্দুক নিয়েছে! আমার কাছ থেকেও তো বন্দুক চেয়ে নিয়ে গেল, বললে, তোমার বন্দুকটা নাকি খারাপ হয়ে গেছে তাই—

নূর মামুদ আর বৃন্দাবন পাল আর্তনাদ করে উঠল: কী সর্বনাশ, ওই একই কথা বলে ব্যাটা তো আমাদেরও বন্দুক চেয়ে নিয়ে এসেছে—

ঘরের ভেতরে যেন বাজ পড়ল।

কারও মুখ দিয়ে আর একটিও কথা ফুটছে না। একটা নয়, দুটো নয়, চার চারটে বন্দুক সংগ্রহ করেছে রঘুরাম! কিন্তু কেন? একটা একগুলির শিকারের জন্যে সে চারটে বন্দুক নিয়ে কী করবে?

হন্যে হয়ে খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত রঘুরামকে পাওয়া গেল চাঁড়াল-পাড়াতে।

গাঁজা আর তাড়ির নেশায় তার তখন তুরীয় অবস্থা। একদল চাঁড়াল মেয়ে-পুরুষের একটা উন্মত্ত অশোভন বৈঠকে বসে সে প্রাণখুলে অশ্লীল গান ধরেছে।

ফজল আলী চিৎকার করে উঠল: এই হারামীর বাচ্ছা, আমাদের বন্দুক কই?

নেশারক্ত চোখ দুটো মেলে তাকালো রঘুরাম। তারপর এলোমেলো বিশৃঙ্খল দাঁতগুলো বার করে পরম কৌতুকে হো হো করে হাসতে শুরু করে দিলে।

—হাসছিস যে শালা? বন্দুক কোথায়?

একমুহূর্তের জন্যে হাসি বন্ধ করে রঘুরাম বললে, রহমানকে দিয়েছি।

—রহমানকে !!!

আকাশ বিদীর্ণ করে বাজ পড়ল না, আকাশটাই যেন ধ্বসে পড়ল মাটিতে। এক মুহূর্তে থ্যাঁতলা হয়ে, চ্যাপ্টা হয়ে, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মিশে গেল লোকনাথ সাহা, ফজল আলী, বৃন্দাবন পাল, আর নূর মামুদ।

—রহমানকে !!!

—তা ছাড়া আবার কী ?—এবার রঘুরাম আর হাসল না ! পাকা ব্যবসায়ীর মতো গম্ভীর বুদ্ধিমানের গলায় জবাব দিলে : ওরা বেশি ধান পেলে আমার তাড়িও বেশি বিক্রি হবে এটা কেন বুঝতে পারছ না ?

শিল্পী

কোনারকের ডাকবাংলোর পেছনের বারান্দায় আমরা চেয়ার টেনে নিয়ে বসেছিলুম। বিকেলের প্রসন্নতা নেমেছে পৃথিবীতে, ঘন ঝাউ বনের নিচে ঝিলমিলি রোদের সঙ্গে শান্ত একটা ছায়া থরথর করে কাঁপছে। নানারকমের পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে, একটা বেঁটে কিং কোকোনাটের নিচে একজোড়া মুনিয়া, তাদের একটি অপরটিকে ঘিরে ঘিরে একটা বিচিত্র নাচের মহড়া দিচ্ছে। বৈজ্ঞানিকের মতে নারীর হৃদয় জয় করবার জন্যে পুরুষের চিরন্তন তপস্যা।

ডাকবাংলোর বুড়ো খানসামা অর্জুন চা দিয়ে গেল। অন্যমনস্কভাবে আমরা চা খেয়ে চললাম। কারো মুখে কোনো কথা নেই। হাজার বছরের নিস্তব্ধ গম্ভীর অতিকায় সূর্যরথের নিঃশব্দ শাসন যেন আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। নিজের ভেতরে এমনি একটা স্তম্ভিত সমাহিতি আমি অনুভব করেছিলুম নালন্দায় গিয়ে,—মনে হয়েছিল আমার চারদিকে একটা অস্পষ্ট দূরাগত মন্ত্রোচ্চার ধ্বনিত হচ্ছে—একটা কথা বললেই যেন কাদের উপাসনায় বিঘ্ন ঘটে যাবে। কোনারকের সূর্যমন্দির দেখেও নিজেকে ক্রমাগত বলতে ইচ্ছে করছিল : কালের রথ যেখানে শব্দহীন, সময়হীন অতীতের মধ্যে থেমে দাঁড়িয়েছে, সেখানে হে আধুনিক কালের প্রগল্‌ভ, তোমার রসনাকে সংযত করো এবং এই পাষাণের মহাকাব্যকে প্রণাম জানিয়ে নিঃশব্দে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।

কিন্তু চা-টা শেষ করে আমি সজাগ হয়ে উঠলুম। অর্জুনের তৈরি গুড়ের কড়া চা-র মহিমা আছে, এক মুহূর্তে কল্পনার ভূতটা ঘাড় থেকে নামিয়ে দিলে। এত বিশ্রী বিস্বাদ চা জীবনে কোনোদিন খাইনি।

আমি বললুম, সবাই এমন ধ্যানস্থ কেন ? একটা সিগারেট কেউ দাও। কথাটার প্রয়োজন ছিল। সকলেই নড়েচড়ে ঠিক হয়ে বসল, যেন প্রত্যেকের মুখেই প্রচ্ছন্ন অপরাধবোধের ছায়া পড়েছে একটা। বেশ শব্দ করেই বিশ্বনাথ সিগারেটের টিনটা আমার দিকে সরিয়ে দিলে, যেন এতক্ষণের নীরবতার প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়।

অ্যাডভোকেট চণ্ডীবাবু রুপোর কৌটো খুলে একটা পান মুখে পুরলেন। বললেন, উঃ, কী চা-ই তৈরি করেছে। এর চাইতে খানিকটা গরম জল গিলে ফেলাও ভালো ছিল।

গোবিন্দ কেমিস্ট্রির ছাত্র। সে মন্তব্য করলে, সিক্সটি পার্সেণ্ট চিরতা আর ফরটি পার্সেণ্ট চিটেগুড়ের কম্বিনেশান।

শুধু কথা বলল না অনু। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম ওর চোখ থেকে তখনো ঘোর কাটেনি। অনেক দূরে—রাশি রাশি বালিয়াড়ি পার হয়ে বিস্তীর্ণ বালির ডাঙা ছাড়িয়ে যেখানে সমুদ্রের নীলিম আভাস, সেদিকে ও স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তখনো, আর শাড়ির জরি পাড়টা হাতের আঙুলে জড়াচ্ছিল ক্রমাগত।

হঠাৎ অনু প্রশ্ন করে বসল, তারা গেল কোথায় ?

আমি সবিস্ময়ে বললুম, কারা ?

—যারা পাথরের গায়ে এমন আশ্চর্য ছন্দ ফুটিয়ে তুলেছিল ? সে মানুষ-গুলো কি একেবারেই ফুরিয়ে গেছে ?

চণ্ডীবাবু তাচ্ছিল্যভরা গলায় বললেন, তারা আর বেঁচে নেই। যারা রয়েছে তারা নিতান্তই উড়িয়া, তাদের প্রতিভার বিকাশ দেখা যাচ্ছে পাণ্ডাগিরির গুণ্ডামিতে—পুরী আর ভুবনেশ্বরে অভদ্র অত্যাচারে।

উড়িষ্যার প্রবাসী বাঙালী বিশ্বনাথ এবার ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। বললে, না, ভুল করছেন। পুরী আর ভুবনেশ্বর দেখে উড়িষ্যাকে চিনতে পারবেন না। শিল্পীর দেশ উড়িষ্যা আজও বেঁচে আছে, বেঁচে আছে ঝাউ-বন আর কেয়ার কুঞ্জে ঘেরা ছোট ছোট গ্রামে,—মরা মহানদী, লোনা নদী চন্দ্রভাগার তীরে তীরে। বিশ্বনাথের বলার ভঙ্গিটা রোমাণ্টিক্ হয়ে উঠতে লাগল ঃ তাদের দেখতে জানা চাই, চিনতে পারা চাই। আর এখনো সময় আছে, বেশি দেরি করলে সত্যিই সে মানুষগুলো আমাদের চোখের আড়ালে চিরদিনের মতো মুছে যাবে।

দূরের সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি রেখে অনু বললে, সত্যি ?

—সত্যি।—এক টিপ নস্যি নিয়ে বিশ্বনাথ বললে, তা হলে একটা গল্প বলি, শুনুন।

এককালে উড়িষ্যার মতো শিল্পপ্রাণ দেশ পূর্বভারতে যে আর ছিল না এ তো ইতিহাসের কথা। উড়িষ্যার অসংখ্য মন্দিরে, বিশেষ করে কোনারকের চারুকলায় তার প্রমাণ রয়েছে। ও নিয়ে আমি বেশি বিদ্যে ফলাব না, আমার চাইতে বড় বড় পণ্ডিত লোক তোমরা এখানে রয়েছ।

কিন্তু একটা জিনিস আমার নিজের চোখেই পড়েছে। রাষ্ট্রবিপ্লবের আঘাত বার বার উড়িষ্যার বুকে এসে লেগেছে। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, অবৌদ্ধ—কারো আক্রমণ থেকেই কলিঙ্গ নিস্তার পায়নি। অশোকের অনুতপ্ত জীবন-কাহিনীতেই সেই ভয়াবহ রক্তপাতের খানিকটা আভাস পেতে পারি আমরা।

তবু আশ্চর্য এই দেশটার শিল্পপ্রীতি। এত রক্ত, এত দুর্যোগের মধ্যেও কলিঙ্গ তার ঐতিহ্য হারায়নি। বহু যুগের এপারে এসেও তার শিল্পীরা এক টুকরো পাথর কুড়িয়ে নিয়ে আশ্চর্য মূর্তি তৈরি করেছে, এক ফালি কাঠের ওপরে ফুটিয়েছে অপরূপ কারুকার্য, তুলির টানে টানে নির্ভুল ছন্দে যতিতে রচনা করেছে রঙ আর রেখার কবিতা। সুতনুকা লিপির রূপদক্ষ দেবদত্তের দল বাংলা দেশ থেকে বহুকাল আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কিন্তু যে ভাস্করেরা তাদের স্বাক্ষর রেখেছিল, এই কোনারকের মন্দিরে, খণ্ডগিরি উদয়গিরিতে, তাদের বংশধরেরা অত সহজেই কিন্তু অতীতকে বিসর্জন দেয়নি।

বাংলার পটশিল্প নিয়ে তোমরা গর্ব করো। সেটা ভালো জিনিস, সন্দেহ নেই। কিন্তু উড়িষ্যার লোককলা যদি কোনদিন আলোচনা করবার সুযোগ পাও তা হলে দেখবে এদের সম্পদ কত সহস্রগুণে বেশি। এখনো এদেশে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে কাঠের একরকম পানপাত্র দেবার রেওয়াজ আছে। এগুলো দেখলে বুঝতে পারবে সূক্ষ্ম চারুকলায় আজ পর্যন্ত এদের কী অসাধারণ অশিক্ষিতপটুত্ব। এদের মেটে দেওয়ালে আঁকা ছবিগুলোকে লক্ষ্য কোরো, একটু মন দিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে সহজ শিল্পবোধ কেমন করে এদের রক্ত-মাংস, অস্থিমজ্জায় জড়িয়ে আছে। কিন্তু এতদিনে এ শেষ হয়ে এল। দুর্ভিক্ষ আর মড়কের দেশ উড়িষ্যায় এ শিল্পীরা আর বেশিদিন বাঁচবে না। এখানে হাইকোর্ট হবে, ইউনিভার্সিটি হবে, এখানকার সী বিচ্ আলোড়িত করে তুলবে আধুনিক কালের সাজসরঞ্জাম, শুনতে পাচ্ছি আর্টিফিশিয়াল পোর্ট পসিবিলিটিও নাকি আছে। সবই হবে—কলকাতা বোম্বাইয়ের সঙ্গে পুরী-কটক-ভুবনেশ্বরের কোনো পার্থক্যই থাকবে না; কিন্তু মরে যাবে সত্যিকারের উড়িষ্যা, হাজার বছরের প্রাণ তার সকলের চোখের আড়ালে নিঃশব্দে শুকিয়ে মরে যাবে। তাকে কেউ বাঁচিয়ে তুলবে না, তাকে বাঁচানোর দায়িত্ব কারো নেই।

কিন্তু আমি বোধ হয় বেশি ভূমিকা করে ফেলছি। কাহিনীটাই বলি।

এই শিল্পীদের একজনকে আমি ছেলেবেলায় জানতুম—তার নাম সনাতন।

কী কারণে ঠিক মনে নেই, প্রায় তিন বছর পুরীর বাড়িটা ভাড়া দিয়ে বাবা উড়িষ্যার এক গ্রামে বাস করেছিলেন। সে গ্রামের নাম আমার মনে নেই—মনে থাকবার কথাও নয়। শুধু মনে আছে অফুরন্ত কেয়াবনের কথা। বর্ষার জল পড়লে অজস্র কেয়া ফুল ফুটত, তার তীব্র মধুর গন্ধে নেশা ধরে যেত, চোখে ঘুম আসত জড়িয়ে। একটি পদ্মদীঘি ছিল—শ্বেতপদ্মে আর রাশি রাশি ঘন সবুজ পাতায় তার জল দেখতে পাওয়া যেত না। আর মনে আছে চন্দ্রভাগাকে—জোয়ারে ফুলে উঠত, দুলে উঠত, আবার ভাটার টান পড়লে শান্ত স্নিগ্ধতার মধ্যে ঝিমিয়ে পড়ত।

এই গ্রামেই থাকত সনাতন।

কী জাত ছিল বলতে পারব না; গলায় পৈতেটা কখনো দেখেছি বলে

স্মরণ করতে পারি না। তবে মাথার চারদিকটা বেশ করে কামিয়ে ব্রহ্মতালুর ওপরে মস্ত বড় একটা ঝুঁটি বাঁধত—যা এখনো কোনো কোনো উড়িয়ার দেখতে পাওয়া যায়। এমনিতে একান্ত শান্তশিষ্ট ছিল মানুষটি, কিন্তু হিন্দুস্থানীর চৈতনের মতো ওই ঝুঁটি সম্পর্কে ভারী দুর্বলতা ছিল তার। আর এই কারণেই ওই ঝুঁটিটা নেড়েচেড়ে দেবার জন্যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা বোধ করতাম আমি। কিন্তু আমার সম্পর্কে একধরনের স্নেহ ছিল সনাতনের—মনে মনে খুশি না হলেও ঝুঁটির ওপরে ওসব হাঙ্গামা সে প্রসন্নমুখেই সহ্য করে যেতো।

সে ছবি আঁকত, আঁকত প্রাণ দিয়ে। আর কোনো কাজ ছিল না তার, কোনো আকর্ষণ ছিল না। দিনরাত শিল-পাটায় রং ঘষা চলত, তুলি ঠিক করা হত—আর ছবি আঁকা ; সমস্ত দিন এই পর্ব চলত তাই নয়—প্রহরের পর প্রহর বিনিদ্র রাত জেগে রেড়ির তেলের আলোয় ছবি আঁকতে দেখেছি তাকে। চোখের কোণে কালি পড়েছে, সমস্ত মুখে ক্লান্তি আর জাগরণের অবসন্ন ছায়াভাস ; তবু দেখতাম কী একটা আশ্চর্য আনন্দে আর উৎসাহে তার চোখ দুটো আগুনের মতো দপদপ করে জ্বলছে।

কিন্তু শুধু ছবি আঁকলে তো সংসার চলে না। কিছু ক্ষেতি জমি আছে—তা দেখাশোনা করতে হয়, বুনতে হয় ধান কলাই। দশটা কাজকর্ম না করলেও উপায় নেই। সুতরাং সনাতনের বাপ চটে আগুন হয়ে গেল।

তারপরে একদিন প্রচণ্ড ঝগড়া।

বাপ বুড়ো হয়েছে—একমাত্র ছেলেই তার ভরসা। কাজেই তার দোষ ছিল বলা যাবে না। প্রাণপণে চীৎকার করে সে বলতে লাগল, দুদিন পরে আমি মরে গেলে তোর অবস্থা কী হবে।

সনাতন সংক্ষেপে বললে, ছবি আঁকব।

—ছবি আঁকবি ?—বিশ্রী মুখভঙ্গি করে একটা অশ্লীল গাল দিলে বাপ ঃ ছবি আঁকলেই তো আর পেটে পিণ্ড 'পাড়িবো না শড়ার ব্যাটা শড়া'!

সনাতন জবাব দিলে না, চুপ করে শুনে যেতে লাগল।

বাপের মেজাজ আরো চড়ে উঠল ঃ সংসারের কাজই যদি না করবে তা হলে এমন ছেলে থাকলে লাভ কী ?

ছেলে জবাব দিলে, কিছুই না।

বাপ বললে, সে ছেলের মরে যাওয়াই উচিত।

এবার সনাতন চটে গেল, তুমিই মরো, আমি নিশ্চিন্তে ছবি আঁকতে পারব।

মরতে বললে বুড়ো মানুষ সব চাইতে বেশি উত্তেজিত হয়ে ওঠে। মৃত্যুর ছায়াটা চোখের সামনে প্রত্যক্ষ আর প্রত্যাসন্ন থাকে বলেই মৃত্যুর কথাটা ভুলে যেতে চায় সে। রাগে সনাতনের বাপের চোখমুখ দিয়ে আগুন ছুটতে লাগল, তার অশ্রাব্য গালিগালাজে কান পাতবার জো রইল না।

বাপ বললে, অর্থাৎ যা বললে তার সারাংশ ঃ 'তোকো যমো নিব, তোকো

শিয়ালো খিব, তোরা মুখে কাটো পড়িব।' আমার বাড়িতে আর তোর জায়গা নেই—তুই যেখানে খুশি চলে যা।

পরদিনই সনাতন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

তার পরের কাহিনীটা অত্যন্ত করুণ। রাগের মাথায় যাই বলুক, পাগলের মতো কান্নাকাটি শুরু করে দিলে সনাতনের বাপ। পাগলের মতো বললে ঠিক হয় না, সত্যি সত্যিই যেন পাগল হয়ে গেল লোকটা। দিনরাত বসে বসে কপাল চাপড়াত, কাঁদতে কাঁদতে দুচোখে পিঁচুটি পড়ে গিয়েছিল তার। স্নান করত না, খেত না, তার দিকে তাকালে ভয় করত।

মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে কান্না শুনেছি তার। সে কান্না মানুষের নয়। একটা জানোয়ারের মুখ চেপে ধরলে বোবা গোঙানির মতো যে রকম অস্বাভাবিক শব্দ হয়, ঠিক তেমনি আর্তনাদ করে কাঁদত সনাতনের বাপ। সে কান্না শুনে আমরা বিছানার ওপরে আঁতকে উঠে বসতাম, সে কান্নায় আমাদের গায়ের রক্ত একটা বিচিত্র আর আকস্মিক ভয়ে যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসতে চাইত।

তিন মাস পরে সনাতনের বাপ মারা গেল। খবর পেয়ে আমরা তাকে দেখতে গেলাম সকালবেলায়। পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে, কলকাতার দাঙ্গায় মৃত্যুর অনেক রূপ চোখে পড়েছে, কিন্তু সেদিনকার সে দৃশ্যের কথা আমি ভুলতে পারব না। একটা নোংরা মেজের ওপরে উবুড় হয়ে পড়ে আছে লোকটা, ঘাড়টা একদিকে ফেরানো—যেন কোনো অশরীরী প্রেতাত্মা সেটাকে মটকে দিয়েছে। মুখের পাশ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ে মেঝেতে কালো হয়ে আছে, আর অজস্র লাল পিঁপড়ে এসে চোখমুখ আক্রমণ করেছে তার। সমস্ত ঘরে একটা চাপা অস্বস্তিকর গন্ধ—মৃত্যুর গন্ধ।

এই বিশ্রী বীভৎস মৃত্যুর একটা করুণ দিকও ছিল—সেটা সেই ছেলেবেলাতেও আমার দৃষ্টি এড়ায় নি। সনাতনের বাপ বুকের নীচে প্রাণপণে আঁকড়ে রেখেছিল একরাশ ছেঁড়া পট, সনাতনের আঁকা ছবি। মরবার আগে সে ছেলেকে ক্ষমা করে গিয়েছিল।

আরো কিছুদিন পরে ফিরল সনাতন। তখন বাড়ির ভিটেটা ভেঙে নেমেছে, গলে পচে ঝরে গিয়েছে চালের খড়, সমস্ত উঠোনময় গজিয়েছে আকন্দের জঙ্গল। অভিভূত বিহ্বল ভাবে খানিকক্ষণ সেই ভাঙা দাওয়ার ওপরে বসে রইল সনাতন। তারপর মিনিট দশেক খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে জঙ্গল সাফ করতে লেগে গেল। শিল্পী মানুষ—শোকটাকে বেশিক্ষণ আগলে রেখে রোমন্থন করা তার স্বভাব নয়।

একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম। সনাতন খানিকটা গৃহী হয়েছে। জমিতে লাঙল দেয়, চাষ আবাদ করে। ছবি আঁকা অবশ্য বন্ধ হয়নি, কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদটাকেও তো অস্বীকার করবার জো ছিল না। বাপ যতদিন ছিল, ততদিন সামনে ছিল পাহাড়ের আড়াল; সে আড়ালটা সরে যেতেই পৃথিবীর দাবী দুহাত মেলে সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

ফাঁকা ঘরে আর মন টিঁকছিল না বলে এবারে সনাতন বিয়ে করল। বৌ ঘরে এল—নাকে প্রকাণ্ড চাকার মতো নথ-পরা চিরন্তন উড়িয়া মেয়ে। ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ঝগড়া, ঝাঁটা আর গৃহকর্ম শুরু করে দিলে আন্তরিক উৎসাহের সঙ্গে।

শিল্পী সনাতন, ভাস্কর সনাতন ওই কলহকুশলা মেয়েটিকে বিয়ে করে কতখানি সুখী হয়েছিল বলা মুশকিল। কিন্তু মনে হয় তার বিয়ে করবার কারণটা এতদিনে আমি বুঝতে পেরেছি। সংসারের পক্ষে একান্ত অপটু সনাতন বুঝতে পেরেছিল নিজের বোঝা নিজে টেনে চলবার মতো সামর্থ্য তার নেই। বাপের শূন্য জায়গা স্ত্রীকে দিয়ে চেয়েছিল পূরণ করতে, ভেবেছিল এবার অন্তত এমন একজন এল যে তাকে বুঝতে পারবে, সংসারের বাজে ঝামেলাগুলো কাঁধে তুলে নিয়ে অস্বস্তিকর দৈন্যতার দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেবে তাকে।

কিন্তু ভুল করেছিল সনাতন। সে জানত না, বাপের চাইতে স্ত্রীর দাবী বেশি ; স্ত্রী তাকে আশ্রয় দিতে চায় না, আশ্রয় চায় তারি কাছে। স্নেহ-প্রেমের ব্যাপারটাকে স্ত্রী সংসারের মূল্যে বাজিয়ে নিতে চায়, যাচাই করে নিতে চায় জীবনের প্রয়োজন দিয়ে।

সুতরাং সংঘর্ষ বাধল।

স্ত্রীকেও অবশ্য দোষ দেওয়া চলে না। তুমি কি আশা করতে পারো, ঘরের বৌ তোমার বলদ তাড়াবে, তোমার ছাগল অন্যের ফসল খেয়ে খোঁয়াড়ে গেলে তাকে ছাড়িয়ে আনবে, তোমার জমিতে লাঙল ঠেলবে, তোমার দাওয়ার খুঁটি কাটবে আর চালে উঠে ঘরে ছাউনি দেবে ? জাঁতা ঘোরাতে সে রাজী আছে, উদূখল পাড়তে তার আপত্তি নেই, দাওয়া নিকিয়ে দেবে, ধান রুয়ে দেবে, জাবনা কাটবে, দুবেলা তোমার কানায়েও ঠেলবে। তার নির্ধারিত সীমানার ভেতরে সব কাজ করতেই সে রাজী আছে, কিন্তু একা হাতে পুরুষের সমস্ত কাজগুলো করাও কি তার পক্ষে সম্ভবপর ? তুমি যদি দিনরাত মনের আনন্দে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াও আর বসে বসে শুধু কাগজ নিয়ে ছাইপাঁশ আঁকিবুকি করো, তাহলে সে ক্ষেত্রে প্রতিবাদ জানানোর আইন-সঙ্গত অধিকার তার নিশ্চয় আছে।

দিন কয়েক স্ত্রী গুঞ্জন করে অসন্তোষ প্রকাশ করলে, তার পরে নিজমূর্তি ধরলে রক্ষাচণ্ডীর মতো। রুপোর গোটপরা কোমরে হাত দিয়ে বাঁকা হয়ে সে ত্রিভঙ্গঠামে দাঁড়িয়ে গেল। বাঁশি বাজাবার জন্যে নয়—ঝগড়া করার সুমহান অনুপ্রেরণায়।

ক্ষুরধার রসনা। তিনটে ফাটা কাঁসর একসঙ্গে বাজাবার মতো আওয়াজ। কত ছোট যন্ত্র থেকে কত ভয়ংকর আওয়াজ বেরুতে পারে তা দেখলে পানের দোকানের অসহ্য রেডিয়োগুলো পর্যন্ত লজ্জা পাবে।

দিন কয়েক সনাতন কানে হাত দিয়ে রইল। কিন্তু যে আওয়াজ চীনের প্রাচীর ভেদ করতে পারে, সাধ্য কি তাকে ঠেকিয়ে রাখা। রাইফেলের

গুলির মতো কর্ণপটহ বিদীর্ণ করে তা সনাতনের মরমে গিয়ে প্রবেশ করতে লাগল। ঘরের দাওয়া ছেড়ে স্ত্রী মাঠে এসে নেমে দাঁড়ালো ; বক্তব্যটা শুধু সনাতনকে জানিয়ে তার তৃপ্তি নেই—পৃথিবীতে যত চক্ষুষ্মান্ এবং বিবেকবান লোক আছে সকলের কাছেই সে তার নারীত্বের দাবীটা ঘোষণা করতে চায়।

সনাতন শিল্পী বটে, কিন্তু নারীত্বের মর্যাদা সম্পর্কে সে ততটা ওয়াকিবহাল ছিল না। তা ছাড়া তার ধৈর্য অসীম থাকার কথাও নয়। শেষ পর্যন্ত স্ত্রী যখন একদিন রঙের বাটিটা তার ছবির ওপরে উবুড় করে দিলে, তখন শিল্পীর হৃদয়ে চিরন্তন পুরুষ জেগে উঠল।

খোঁচা খাওয়া বাঘের মতো ভয়ংকর একটা গর্জন ছেড়ে স্ত্রীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সনাতন। একটা হ্যাঁচ্‌কা টানে ছিঁড়ে নিলে জটপাকানো একরাশ চুল, কিল, চড় আর লাথি চালাতে লাগল প্রাণপণে। স্ত্রীও একেবারে অহিংস ছিল না, সুতরাং পালাটা জমল ভালো।

সময়মতো পাড়ার লোক পৌঁছে না গেলে সেযাত্রা সনাতন স্ত্রীকে খুনই করে বসত বোধ হয়। দুজনকে যখন ছাড়িয়ে দেওয়া হল, তখন স্ত্রীর উলঙ্গিনী কালীমূর্তি, গলায় পাঁচ-পাঁচটা আঙুলের দাগ। সনাতনের অবস্থাও খুব সুখের নয়—ধারালো নখের আঁচড়ে গাল-মুখের এক পর্দা চামড়া উড়ে গিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে গড়িয়ে। অবরুদ্ধ স্বরে হাঁপাতে হাঁপাতে পরস্পর পরস্পরকে গাল দিচ্ছে পৃথিবীর অশ্রাব্যতম এবং কটুতম ভাষাতে।

পাড়ার লোকে বললে, ছিঃ ছিঃ!

বুনো মোষের মত গোঁ গোঁ করতে করতে সনাতন বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

দিনকয়েক সব চুপচাপ। বোধ হয় লজ্জিত হয়েছিল সনাতন - এবার সে আদর্শ স্বামীর মতোই সংসারধর্মে মন দিলে। স্ত্রীর রসনাও একটু ক্ষান্ত হল, বোধ করি বুঝতে পেরেছিল শান্তশিষ্ট ভোলানাথ মানুষকে ক্ষেপিয়ে দিলে সে কালভৈরবের মূর্তি গ্রহণ করতে পারে।

কিন্তু সন্ধি আর শান্তি এক নয়। সনাতনের রক্তের ভেতরে কোণারকের শিল্পীদের যুগার্জিত সংস্কার ; তার ছবি আঁকার নেশা মদের চাইতেও উগ্র, রেস খেলার চাইতেও সর্বগ্রাসী। ফলে আবার খিটিমিটি শুরু হয়ে গেল এবং পুরাতনের পুনরাবৃত্তি।

এবার স্ত্রীকে পাওয়া গেল অজ্ঞান অবস্থায়। তার মাথায় এক ঘা ডাণ্ডা বসিয়েছে সনাতন—রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারদিক। আজ নিজের কীর্তির দিকে তাকিয়ে সনাতন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সনাতনের শ্বশুর অবস্থাপন্ন লোক। চারখানা গোরুর গাড়ি তার ভাড়া খাটে, তার বাড়ির দাওয়ায় পাঠশালা বসে। খবর পেয়ে সে ক্ষেপে গেল। মেয়েকে নিয়ে তো গেলই, থানাতেও এজাহার করে দিলে।

এল পুলিশ। কোমরে দড়ি বেঁধে সনাতনকে হাজতে নিয়ে গেল। বললে, শড়া খুনী!

খুনী! কথাটা সনাতনের নিশ্চয় বুকে বিঁধেছিল বাজের মতো। সে ছবি আঁকে, সৌন্দর্যের সাধনা ছাড়া তার জীবনে বড় সত্য আর কিছু নেই। সে খুনী।

থানায় যাওয়ার সময় আমরা দেখলুম সনাতনের চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে। আশ্চর্য রক্তহীন আর বিবর্ণ তার মুখ। মনে হল সনাতন আর বেঁচে নেই—একটা শবদেহকে কোমরে দড়ি বেঁধে ওরা টেনে নিয়ে চলেছে।

বাস্তবিক, শিল্পী সনাতনের মৃত্যু হল। সে আর বাঁচল না।

হাজার হোক, শ্বশুর। জামাইকে শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছে থাকলেও জেল খাটাতে চায়নি। কাজেই দিনকয়েক বাদে সে আবার ফিরে এল। .

এবার একা—একেবারে একা। স্ত্রীর সঙ্গে যতই বিরোধ আর বিবাদ থাক—সংসারে একটা নতুন আস্বাদ যে সে পেয়েছিল কোনো সন্দেহ নেই সে বিষয়ে। এবার বোধ হয় সনাতনের মনে হল জীবনটা তার একটা আশ্চর্য শূন্যতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। কেমন হয়ে গেল সনাতন। ছবি আঁকে না, কথা বলে না কারুর সঙ্গে! খুনী! আমার মনে হয় এই একটি মাত্র আঘাত —এবং সব চাইতে অপ্রত্যাশিত নির্মম আঘাতই ওর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিলে।

দেখতুম, প্রায় চন্দ্রভাগার ধারে একটা কেয়াঝাড়ের ছায়ায় সনাতন চুপ করে বসে থাকত। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত নদীর জল, আকাশে লাল মেঘ, আর বহুদূরে ঝাউবনের ওপারে কোণারকের মন্দিরের কালো চূড়োটা। ছেলেবেলার সহজ সংস্কারেই আমি কেমন যেন বুঝতে পেরেছিলুম সনাতন আর সে মানুষ নেই—সনাতন বদলে গেছে। ওকে এখন ভয় করত।

আমি একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলুম, সনাতন, তুমি আর ছবি আঁকো না?

—না। সব ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

—কেন?

সনাতন উত্তর দেয়নি। উঠে চলে গিয়েছিল।

তারপর ক্ষেত-গিরস্তিতে মন দিলে সনাতন, একেবারে পুরোদস্তুর চাষা বনে গেল। গাঁয়ের আরো দশজনের সঙ্গে তার কোথাও কোনো পার্থক্য রইল না। যা বলছিলুম, শিল্পী সনাতনের মৃত্যু হল।

কিন্তু ওইখানেই শেষ হল না।

জানোই তো, চাষবাসের পক্ষে সমুদ্রের বালি এদেশে—বিশেষ করে এ অঞ্চলটায় কিরকম বিশ্রী আর অস্বস্তিকর। হাওয়ায় সারাক্ষণ বালি উড়ে উড়ে এসে পড়ছে—প্রায়ই ক্ষেত পরিষ্কার করতে হয়। আর নিয়মিতভাবে ক্ষেতের বালি সরাতে না পারলে জমির দফা একেবারে ঠাণ্ডা।

সেবার সমুদ্রে ঝড় এল।

অমন ভয়ঙ্কর ঝড় বিশ বছরের মধ্যে হয়নি। সারারাত ধরে চলল বৃষ্টি আর বাতাসের মাতামাতি, তিন চার মাইল দূর থেকেও সমানে শোনা যেতে লাগল উত্তেজিত ক্ষুব্ধ সমুদ্রের অবিশ্রান্ত গোঙরানি! ঝাউবন উপড়ে পড়ল, গ্রামে ঘড় উড়ে গেল, বান ডেকে গেল নীলস্রোতা শান্ত চন্দ্রভাগায়। দুদিন পরে সে দুর্যোগ যখন থামল, তখন দেখা গেল সর্বনাশ শুধু সনাতনেরই হয়নি। কোথায় ক্ষেত—কোথায় বা সেখানে নতুন ধানের তাজা তক্‌কে শীষ! বালি—সব বালি! যতদূর চাও শুধু অভিশপ্ত বালির বিস্তার, মাঝে মাঝে উচ্চচূড় বালিয়াড়ী। সবুজ, শস্যের ঐশ্বর্যে ভরা মাটি একরাত্রে দিগন্ত সমাকীর্ণ একটা অতিকায় মরুভূমিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

যে ক্ষেত-খামারের জন্যে এত সমস্যা, তার সমাধান ঘটে গেল। যে ঘর-সংসার রাখবার জন্যে এত বিরোধ, সে সংসার আগেই ভেঙেছে, আজ ঘরও গেল।

আবার নিরুদ্দেশ হল সনাতন, আর ফিরল না।

অবশেষে বছরতিনেক আগে দেখা হয়েছিল ভুবনেশ্বর স্টেশনে। আমি আসছিলুম পুরীতে—এমন সময় ওকে দেখলুম। প্রথমটায় চিনতে পারিনি। তারপরে গলার স্বর শুনে বুঝতে পারলুম।

সনাতন এখন পাণ্ডার দালাল। যাত্রী পাকড়াও করে বলছে, বাবুর নামো কী অছি? পাণ্ডার নামোটি কী অছি?

আমি ডাকলাম, সনাতন, চিনতে পারো?

চমকে উঠল সনাতন। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। অদ্ভুত রকমের বুড়ো হয়ে গেছে, ঝুলে পড়েছে চোখের চামড়া। মালটানা গাড়ির গোরুর মতো একটা মন্থর ক্লান্তি যেন আচ্ছন্ন করে দিয়েছে তাকে। মনে হল, এ সনাতন নয়—সনাতনের 'মমি' একটা।

আমি সেই পুরোনো প্রশ্নটা করলুম আবার: আর ছবি আঁকো না সনাতন?

সনাতন হাসল। বললে, কে, রাঙাবাবু? কত বড় হয়ে গেছো আজকাল! ভালো আছো তো?

বললাম, ভালোই আছি। কিন্তু তোমার খবর কী? ছবি আঁকা কি ছেড়ে দিয়েছো?

সনাতন ম্লান হাসল: পারি না। ও কাজ আমার নয় রাঙাবাবু। পাণ্ডার চাকরি করি—যাত্রী ধরি, খেতে পাই।

ট্রেন ছেড়ে দিলে। দেখলাম সনাতন প্ল্যাট্‌ফরমে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ অনুতাপ হল। যা ও ভুলে যেতে চায় তাকে এমন করে জাগিয়ে না দিলেই বোধ হয় ভালো হত। যে মরেছে, তাকে জীবনের কথা মনে করিয়ে দিয়ে লাভ নেই।

আজ ভাবি, শিল্পীর এই অপঘাতের জন্যে দায়ী কে? সংসারের

স্বাভাবিক দাবী-দাওয়া? হয়তো তাই। সংসারকে রাখতে গিয়ে লোকটা শিল্পকে হারালো, কিন্তু প্রকৃতি তার সে সংসারকেও রাখতে দিলে না। আশ্চর্যভাবে সর্বহারা হয়ে গেল সনাতন।

এই হয়—এই হবে। কোনো উপায় নেই। আজ আর কারো সাধ্য নেই কোণারকের উত্তরাধিকারীদের বাঁচিয়ে তুলতে পারে। কটকে ইউনিভার্সিটি হবে—হয়তো উড়িষ্যার কলাশিল্প নিয়ে গবেষণা হবে, থীসিস্ লিখে ডক্টরেট্ পাবে ছেলেরা। কিন্তু সনাতনেরা আর বাঁচবে না, তাদের বাঁচানোর উপায় নেই। অথবা হয়তো উপায় আছে—কিন্তু পুরীর সী বিচ্ আর শহরের স্বাচ্ছন্দ্যে যারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তাদের সময় নেই বিস্মৃত তোষালীর ভাস্করদের খুঁজে বার করতে, অতীত কলিঙ্গের রূপদক্ষের নতুন কালে নতুন প্রাণ দিয়ে জাগিয়ে তুলতে।

বিশ্বনাথ থামল, সিগারেটের টিনটা টেনে নিলে নিজের দিকে।

কোণারকের ঝাউবনে সন্ধ্যা নেমেছে। দূরে আবছায়া অন্ধকারে মিলিয়ে আসছে সমুদ্র।

৺শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ কুণ্ডু

সমবেত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দ,

৺শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ কুণ্ডুর শ্রাদ্ধ-বাসরে আপনারা আমাকে যে দুকথা বলবার সুযোগ দিয়েছেন এজন্যে আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আমি নিতান্তই সামান্য ও অধম ব্যক্তি, এই গুরুদায়িত্ব পালন করবার ক্ষমতা আমার নেই। সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষের অমর কীর্তিকলাপ বর্ণনা করবার মতো উপযুক্ত ভাষাও আমার নয়। তথাপি এই ভার যখন আমার ওপর অর্পিত হয়েছে, তখন আমি সংক্ষেপেই তাঁর সম্বন্ধে দুচার কথা নিবেদনের প্রয়াস পাব। আশা করি ত্রুটি-বিচ্যুতি আপনারা মার্জনা করবেন। আর পরম ভাগবত পুণ্যশীল দানবীর ৺শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ কুণ্ডু আজ যাঁর চরণাশ্রয় লাভ করেছেন এবং যিনি আমার মতো নগণ্য ব্যক্তিকেও বিদ্বান এবং সুধীজন সমক্ষে দুকথা বলবার অনুপ্রেরণা দিলেন ঃ

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্।"

বাংলা ১২৯২ সালে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণার কুণ্ডুগ্রামে পুণ্যশ্লোক শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ কুণ্ডুর জন্ম হয়। এই গ্রামের বহু কৃতী সন্তানের নামই বাংলার ব্যবসায়ক্ষেত্রে সুপরিচিত। বাঙালির ব্যবসা-বাণিজ্য যখন দিনের পর দিন মাড়োয়ারীদের করালগ্রাসে চলে যাচ্ছিল, সেই সময় এই গ্রামের সুসন্তানেরাই সাহস এবং প্রতিভাবলে অগ্রসর হয়ে জাতির সম্মান রক্ষা করেছেন। গোপীবল্লভ এঁদেরই মধ্যমণি ছিলেন।

গোপীবল্লভের স্বর্গীয় পিতৃদেব রাধাবল্লভ কুণ্ডুর অবস্থা বিশেষ সচ্ছল

ছিল না। বজ্রযোগিনীর বাজারে তাঁর সামান্য একটা কাটা কাপড়ের দোকান ছিল। তার আয় থেকেই কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা চলত। তাই মৃত্যুকালে তিনি যৎকিঞ্চিৎ দশ হাজার মাত্র টাকা রেখে যেতে পেরেছিলেন।

শিশুকালে গোপীবল্লভ গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু পুঁথিগত বিদ্যার প্রতি তাঁর রুচি ছিল না। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বলেছেন, কলেজীশিক্ষা আর ডিগ্রির মোহে বাঙালী অধঃপাতে গেল—কোন্ অলৌকিক প্রতিভাবলে নিতান্ত শৈশবেই গোপীবল্লভ এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন এ একটা আশ্চর্য রহস্য। পরম করুণাময় ঈশ্বরের লীলাই এই। **Morning shows the day**—এই প্রবচনটি গোপীবল্লভের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল।

পাঠশালার নৃশংস পণ্ডিত সেই সুকুমার বালককে অনেক কঠিন শাস্তি দিয়ে পুঁথির বিদ্যা মুখস্থ করাতে চেয়েছিল। বেত্রাঘাত করত, বেঞ্চিতে দাঁড় করিয়ে রাখত—প্রখর রৌদ্রে পাঠশালার বাইরে একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করত। কিন্তু নির্ভীক গোপীবল্লভ সেই অমানুষিক অত্যাচারেও কখনো আদর্শভ্রষ্ট হননি। ক্লাসের অন্য ছেলেরা প্রমোশন পেলেও তিনি পেতেন না—কিন্তু সেজন্যে দুর্বলের মতো তিনি কোনোদিন অশ্রুমোচন করেননি। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলেও তিনি ক্ষুণ্ণ হতেন না বরং সেই সময়ে নারিকেল বৃক্ষে আরোহণ করে তিনি ডাব পাড়তেন, ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে যেতেন। শিশুকাল থেকেই তিনি এইরকম দৃঢ় চরিত্রবলে বলীয়ান ছিলেন।

ইতিমধ্যে এমন একটি ঘটনা ঘটল যার ফলে গোপীবল্লভকে পাঠশালার অধ্যয়ন ত্যাগ করতে হল। ঘটনাটির জন্য গোপীবল্লভের কোনো দায়িত্ব ছিল না—কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁকেই এর শাস্তিটা ভোগ করতে হয়েছিল। ব্যাপার আর কিছুই নয়—কোন সহপাঠী বালক ইচ্ছা করেই হোক আর ভ্রমবশেই হোক তাঁর পাঠ্যপুস্তকের ভেতরে নিজের একখানা নতুন বই রেখে দেয়। বাড়িতে ফিরে গোপীবল্লভ সেখানি পান এবং দুখানা পাঠ্য বই তাঁর প্রয়োজন নেই বলে সরলমনে তিনি বইখানি প্রতিবেশী অপর একটি বালককে বিক্রয় করে দেন। ঘটনাটি গুরুমশাইয়ের কর্ণগোচর হয় এবং শিক্ষকরূপী সেই নৃশংস জল্লাদ সরলমতি শিশুকে এমন বেত্রাঘাত করেন যে তার ফলে গোপীবল্লভকে সাত-দিন শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হয়। গোপীবল্লভের পরম স্নেহশীলা মাতা ভামিনী দাসী এতে অত্যন্ত ব্যথিতা হয়ে পুত্রকে বিদ্যালয় থেকে ছাড়িয়ে আনেন এবং তার পর থেকে তিনি আর বাইরের শিক্ষালাভ করবার সুযোগ পাননি।

তাঁর যথার্থ শিক্ষার সূত্রপাত করেন পিতৃদেব রাধাবল্লভ। তিনি তখন থেকেই প্রতিভাবান পুত্রকে দোকানে নিয়ে যেতে শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যেই গোপীবল্লভ পিতার উপযুক্ত পুত্র হয়ে ওঠেন। যে সমস্ত বাকীর খরিদ্দার রাধাবল্লভের ন্যায্য প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে নানা টালবাহানা করত, সুযোগ্য গোপীবল্লভ বাক্য-কৌশলে অতি সহজেই তাঁদের কাছ থেকে টাকা

আদায় করে আনতেন। আপনারা যাঁরা তাঁর পরবর্তী জীবনের সঙ্গে সুপরিচিত, তাঁরা অবশ্যই জানেন যে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর এই ক্ষমতাটি অব্যাহতই ছিল।

বাল্যকালেই প্রতাপপুর গ্রামনিবাসী রাজীবলোচন কুণ্ডু মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা তারাসুন্দরীর সঙ্গে গোপীবল্লভের শুভ পরিণয় হয়েছিল। মাত্র অষ্টাদশ বর্ষ বয়সেই ভাগ্যবান গোপীবল্লভ পুত্রমুখ দর্শন করেন। আমাদের পরম স্নেহভাজন শ্রীমান কৃষ্ণবল্লভই সেই সুলক্ষণাক্রান্ত সন্তান।

পৌত্রলাভের সামান্য কিছুদিন পরেই রাধাবল্লভ ইহলোক ত্যাগ করে বৈকুণ্ঠের অধিবাসী হন এবং তাঁর কাজকারবারের দেখাশুনার ভার গোপীবল্লভের স্কন্ধে পতিত হয়। পিতৃশোকের তীব্র শেল মর্মে মর্মে বিদ্ধ হতে থাকলেও কর্তব্যকর্মে গোপীবল্লভ কখনোই ত্রুটি করেন নি। পিতার কারবার তিনি নিপুণ ভাবেই পরিচালনা করতে থাকেন এবং ব্যবসায় ক্রমশই উন্নতি ঘটতে থাকে।

এই সময়ে আর একটি দুঃখদায়ক ব্যাপার ঘটে যায়। অনুজ রামবল্লভের সঙ্গে মতান্তর ঘটায় মামলা আদালত পর্যন্ত গড়ায় এবং হাকিম সম্ভবত উৎকোচ গ্রহণ করেই রামবল্লভের পক্ষে রায় দান করেন। ফলে গোপীবল্লভ পিতার দোকানের ন্যায় অধিকার থেকে বঞ্চিত ও বিতাড়িত হন এবং অতি অল্পের জন্যে চৌর্যাপরাধে কারাবাস থেকে নিষ্কৃতি পান। সংসারের এই বিশ্বাসঘাতকতায় কোমলপ্রাণ নিষ্পাপ গোপীবল্লভ অত্যন্ত মর্মপীড়িত হন এবং পিতৃভবনে বসবাস অসম্ভব বোধ হওয়াতে নিজের অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য কলিকাতা মহানগরীতে চলে আসেন।

উদ্যোগী পুরুষসিংহ চিরকালই লক্ষ্মীর বর লাভ করে থাকে—গোপীবল্লভের ন্যায় অনন্যকর্মা পুরুষও সে বরলাভে বঞ্চিত হলেন না। নিজের যে যৎসামান্য পুঁজি ছিল তাই দিয়ে তিনি প্রথমে পাটের 'ফাটকা বাজারে' স্বীয় ভাগ্য নিরূপণ করতে প্রয়াস পান। কিন্তু মাড়োয়ারী ও ভাটিয়াদের কুচক্রান্তে কিছু অর্থদণ্ডই তাঁর সার হয়। গোপীবল্লভের ধর্মপ্রাণ ফাটকা বাজারের হীনতা ও নীচতা সহ্য করতে পারল না। তিনি জীবিকা নির্বাহের অন্য পন্থা সন্ধান করতে থাকেন।

মানবচরিত্রের উৎকর্ষ সাধন ও পৃথিবী থেকে পাপ দূরীভূতকরণ গোপীবল্লভের আজীবন ব্রত ছিল। তাই পাপীদের শাস্তি দিবার জন্য এই সময়ে যে দুঃসাহসিক পন্থা তিনি অবলম্বন করেছিলেন তা শুনলে আপনারা শিহরিত ও রোমাঞ্চিত হবেন। জগাই মাধাইকে উদ্ধার করবার জন্যে মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ যা করেছিলেন এবং প্রেমাবতার যীশুখ্রীষ্ট যেভাবে পতিতদের তারণ করতেন, একমাত্র তাদের সঙ্গেই তার তুলনা সম্ভব।

গোপীবল্লভ জানতেন: 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্,'—কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়—পাপীর সঙ্গে সমপর্যায়ী হয়ে তার পাপমোচন করতে হয়। আপনারা জানেন এই কলিকাতা মহানগরীতে একাধিক গণিকাপল্লী আছে। এগুলি

আমাদের জাতীয় কলঙ্ক এবং পাপের আগার বিশেষ। যে সমস্ত চরিত্রহীন মদ্যপ এই সমস্ত কুস্থলে যাতায়াত করে তাদের শিক্ষা দেবার জন্যে গোপীবল্লভ একটি অভাবনীয় পন্থা অবলম্বন করলেন।

নিজে তিনি পরম নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন—ত্রিসন্ধ্যা তিনি বিষ্ণুমন্ত্র জপ করতেন। মাদকদ্রব্য তিনি জীবনে স্পর্শ করেননি এবং স্বনামধন্য জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ছিলেন। কিন্তু দুরাচার লম্পটদের চরিত্র শোধনের জন্যে তিনি এই সমস্ত পাপপল্লীতে পরিভ্রমণ করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। কলিকাতার বিশিষ্ট পরিবারের ধনী সন্তানেরা অবিদ্যার পাদপদ্মে যেভাবে যথাসর্বস্ব নিবেদন করছিল, তিনি তা রোধ করবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন।

নিজের সামান্য যা কিছু অর্থের পুঁজি ছিল, তাই দিয়ে রাত্রিকালে এই পল্লীতে তিনি পরিভ্রমণ করতেন। মদ্যপ ধনীসন্তানেরা অসময়ে অর্থের প্রয়োজনে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লে তিনি সেই সময় হ্যাণ্ডনোটযোগে তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ ঋণ দিতেন। তাদের মত্ততার সুযোগে তিনি শতমুদ্রা দিয়ে দশসহস্র মুদ্রার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নিতেন এবং এই উপায়ে ক্রমে তিনি বহু চরিত্রহীন ধনী সন্তানকে অবিদ্যা গমনজনিত পাপ থেকে মুক্ত করেন। গোপীবল্লভ বলতেন, "অর্থ ঈশ্বরের দান। মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, পুণ্যকর্ম, দেবালয় ও অতিথিশালা স্থাপন প্রভৃতি সৎকার্য অর্থের ওপরেই নির্ভর করে। সুতরাং এই ঐশ্বরিক বস্তুকে যারা কদাচারে অপব্যয় করে, তাদের কাছ থেকে একে রক্ষা করাই ধর্মনিষ্ঠ মনুষ্যের কর্তব্য।" বস্তুত গোপীবল্লভ এই কর্তব্যপালনে সদা সজাগ ছিলেন। এর ফলে একদিকে যেমন মনুষ্যকুল-কলঙ্ক অপোগণ্ড ধনীসন্তানেরা পাপকার্যে অর্থব্যয়ে অপারগ হয়, অন্যদিকে পরম করুণাময় শ্রীশ্রীকৃষ্ণের কৃপায় গোপীবল্লভ কিছু সঞ্চয়েরও সুযোগ পান।

অতঃপর গোপীবল্লভ কলিকাতার বড়বাজারে ছোট একটি কাপড়ের দোকান খোলেন। এ সময় বহু প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়। কিন্তু অপরিসীম শক্তি ও মেধাবলে তিনি এই সমস্ত প্রতিবন্ধক বিচূর্ণ করতে সক্ষম হন। শ্রীভগবানের অপার অনুগ্রহে তাঁর ব্যবসা বিস্তার-লাভ করতে থাকে এবং পরিশেষে ব্যবসায়ীমহলে তাঁর নাম সসম্মানে উচ্চারিত হতে থাকে।

তাঁর ক্রমোন্নতির ইতিহাস সকলেই অবগত আছেন, সুতরাং সে সম্পর্কে অধিক বাগ-বিস্তার করে আমি আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবো না। শেষ জীবনে একটি কাপড় ও আর একটি চিনির কল প্রতিষ্ঠা করে তিনি বাঙালির বাণিজ্যক্ষেত্রে যুগান্তর সূচিত করেন। তাঁর সুযোগ্য সন্তান আমাদের পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান কৃষ্ণবল্লভ ও শ্রীমান ব্রজবল্লভের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমে আরো সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক এই আমাদের আন্তরিক কামনা।

শুধু ব্যবসায়ী হিসাবেই নয়, ভক্ত বৈষ্ণব হিসাবেও তাঁর খ্যাতি সর্বজন-বিদিত। কিন্তু পরাধীন ভারতবর্ষের জন্যেও তিনি যে কী গভীর মর্মবেদনা

অনুভব করতেন এ সংবাদ আপনারা অনেকেই জানেন না। তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্যেরও তুলনা ছিল না। এ বিষয়ে আমি সামান্য দু'একটি ঘটনার উল্লেখ করেই তাঁর মহত্ত্ব প্রমাণের প্রয়াস পাব।

কিছুদিন পূর্বে তাঁর গোপীবল্লভ কটন মিলের একদল দুর্বৃত্ত শ্রমিক অন্যান্য শ্রমিকদের প্ররোচনা দিয়ে ধর্মঘট বাধাবার চেষ্টা করে। আপনারা সকলেই জানেন ইতর শ্রমজীবীরা আজকাল কী পরিমাণে অবাধ্য ও দুর্বিনীত হয়ে উঠেছে। তাদের হাস্যকর ও অযৌক্তিক দাবী-দাওয়া পূরণ করতে গেলে জাতির ব্যবসাবাণিজ্য তিন দিনেই বন্ধ করে দিতে হয়। মনে আছে একদিন গোপীবল্লভ অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে বক্তাকে বলেছিলেন, "দেখুন, যাদের টাকা, মস্তিষ্ক ও চেষ্টায় এই কলকারখানা গড়ে উঠল আজ তাদের বঞ্চিত করে, তাদের ন্যায্যলাভের অংশে লোভ করা কি অত্যন্ত অন্যায় নয়? শ্রমিকের প্রয়োজন ও মালিকের প্রয়োজন এক হতে পারে না, হাতী ও পিপীলিকার খাদ্য কখনো সমান হওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। শ্রমজীবীদের লোভ আজ মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে—দেখবেন মৃত্যু তাদের অবধারিত।"

গোপীবল্লভের দূরদর্শিতা যে কি অসাধারণ ছিল, এই উক্তিই তার সার্থক প্রমাণ। ধর্মঘটের ফলে কর্তব্যের তাগিদে তিনি পুলিশ ডাকতে বাধ্য হন এবং পরিণামে পুলিশের গুলিবর্ষণে তিনজন শ্রমিক প্রাণ হারায়। তবে দুষ্ট ব্যক্তিদের চক্রান্তে শ্রমিকদের অবৈধ দাবী কিছু পরিমাণে তাঁকে মেনেও নিতে হয়। মনে আছে এই সময় তিনি সক্ষোভে বলেছিলেন, "এই জন্যেই বাঙালীর কিছু হয় না। আমার সৌভাগ্য যে-সমস্ত পরশ্রীকাতরদের সহ্য হয় না তারাই শ্রমিকদের উস্কানি দিয়ে আমার এই অনিষ্ট করল। যতদিন পর্যন্ত এই ঈর্ষা ও পরানিষ্টপ্রবণতা দূর না হবে ততদিন পর্যন্ত জাতির উন্নতি নেই—জাতীয় স্বাধীনতাও সুদূরপরাহত।" তাঁর এই সারগর্ভ উক্তি সুধীজনের বিশেষভাবে চিন্তনীয় বলেই আমার মনে হয়।

তাঁর চিনির কল একটি লিমিটেড কোম্পানী এবং বহু মধ্যবিত্ত পরিবার এর অংশীদার বা শেয়ার-হোল্ডার। এই প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশের ওপরে তাদের অন্নসংস্থান হয়ে থাকে। নিজে ম্যানেজিং ডাইরেক্টার ও বারো-আনি অংশীদার হয়েও অন্যানা অংশীদারদের স্বার্থরক্ষা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। এখানেও শ্রমিক বিক্ষোভের সূত্রপাত ঘটায় সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে তাঁকে কঠোর হস্তে দন্ডধারণ করতে হয়। তিনি বলেছিলেন, "আমি এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। অন্যান্য যাঁরা আমাকে বিশ্বাস করে এখানে তাঁদের টাকা খাটাচ্ছেন, শ্রমিকদের অন্যায় দাবী মেনে নিয়েও তাঁদের স্বার্থ ক্ষুন্ন করে আমি বিশ্বাসঘাতক হতে পারব না।" তাঁর সত্যনিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধ সব সময়েই এই রকম সজাগ ও স্বতস্ফূর্ত থাকত।

সনাতন ধর্মের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা আজীবন অচল ছিল। আধুনিক সমাজের ধর্মহীনতা তাঁকে অত্যন্ত পীড়িত করত। বিশেষ করে স্ত্রীশিক্ষার নামে আজ

যে ব্যভিচারের স্রোত দেশময় প্রবাহিত হচ্ছে তিনি তার তীব্র বিরোধিতা করতেন। তিনি বলতেন, "মাতৃজাতির শিক্ষা অন্তঃপুরে, সন্তানপালন এবং পরিজনদের সেবার ভিতরে। ইংরেজি শিক্ষা মেয়েদের বিবিয়ানাই শেখায় মাত্র। তারা নারীর আদর্শ ভুলে গিয়ে পরপুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশাই পছন্দ করে, সিনেমার মোহে বিভ্রান্ত হয় এবং স্বামী ও গুরুজনদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে স্বেচ্ছাচারিতায় কালহরণ করে।" এই উক্তি যে কতদূর সত্য আশা করি ভুক্তভোগীদের তা বিশদভাবে বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন হবে না।

এই কারণেই নিজের কন্যা বা পৌত্রীদের তিনি স্কুল-কলেজের বিষময়ী শিক্ষার সংস্পর্শ থেকে সযত্নে দূরে রেখেছিলেন। কিছুদিন পূর্বে যখন কুখ্যাত "রাও বিল" প্রবর্তনের চেষ্টা হয় তখন গোপীবল্লভ এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ ঘোষণা করেন। ইংরেজ সরকার আমাদের জাতীয় ধর্মকর্ম প্রভৃতির ওপরেও যে হস্তক্ষেপ করবে, তাঁর স্বাধীন চিত্ত ও নির্ভীক বিবেক তা কখনোই সহ্য করতে পারত না। এই থেকেই আমরা তাঁর প্রবল জাতীয়তাবোধের পরিচয় পাই।

সম্প্রতি দেশে রাজনীতি নিয়ে যে মাতামাতি চলছে গোপীবল্লভ তা পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, "আন্দোলন করে বা বিপ্লব করে স্বাধীনতা আসে না। ইংরেজ আমাদের শত্রু নয়। তা ছাড়া তারা রাজা—আমাদের শাস্ত্রে রাজদ্রোহিতা মহাপাতক।" তাঁর মতে "স্বাধীনতা অর্থ হচ্ছে জাতির আর্থিক উন্নতি। সেই দিকেই আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। বরং ইংরেজ ভারত শাসন করলে একদিক দিয়ে সুবিধে আছে—পাকিস্তান আর হিন্দুস্থানের জটিল সমস্যাটার উদ্ভবই হবে না। তা ছাড়া নিজেদের দেশ স্বাধীন করবার যোগ্যতাও এ পর্যন্ত আমাদের আসেনি, কারণ দেশীয় শিল্পপতিদের অনিষ্ট কামনা ছাড়া আমরা আর কিছুই করতে রাজী নই।" উগ্র রাজনৈতিক মত্ততাসম্পন্ন ব্যক্তিরা যদি একটু স্থিরচিত্তে কথাগুলো প্রণিধান করেন, তা হলে এ থেকে তাঁরা উপকৃত হবেন বলেই আমার বিশ্বাস। স্বাধীনতার আন্দোলন করলেই যে দেশের কল্যাণ হয় না এ কথা বোঝবার সময় কি আমাদের আজও আসেনি?

আমার ভাষণ দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এই একান্ত অনুকরণীয় মহৎ চরিত্রটি সম্পর্কে আরো দু'চারটি কথা না বললে আমার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেই দু'চারটি কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব।

তেরশো পঞ্চান্ন সালে যে ভয়ংকর মন্বন্তর সমগ্র বাংলা দেশকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল, তার মর্মভেদী করুণ দৃশ্য আপনারা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে বিস্মৃত হন নি। সরকারের অপরিণামদর্শিতা যে এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী তা আপনারা সকলেই জানেন। গোপীবল্লভ এই সময় সরকারী নীতির সুতীব্র সমালোচনা করতেন। এ সময়ে তিনি সামান্য কিছু ধান চাল স্টক করেছিলেন সত্য, কিন্তু অন্যান্য অসাধু ব্যবসায়ীদের মতো তা থেকে তিনি নির্বিচারে লাভ

করেননি—মাত্র সামান্য তিন লাখ টাকা তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য হিসাবে সঞ্চয় করেছিলেন। স্বীয় গ্রাম কুণ্ডুগ্রামে তখন যে লঙ্গরখানা খোলা হয়, তাতে তিনি এক সহস্র মুদ্রা চাঁদা দেন। এ থেকে তাঁর দানশীলতার সম্যক পরিচয় লাভ করা যায়।

দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে পরম অহিতকর কণ্ট্রোল নীতির তিনি একান্ত বিরোধী ছিলেন। এই কণ্ট্রোলের জন্যে আমাদের যে দৈনন্দিন কী অপরিসীম দুর্ভোগ ভুগতে হচ্ছে আপনাদের তা অবিদিত নয়। গোপীবল্লভ সব সময়েই বলতেন, "সরকারের এই কণ্ট্রোলের দুর্নীতি যতদিন দূরীভূত না হচ্ছে ততদিন দেশ থেকে দুর্ভিক্ষ যাবে না।" কথাটি বর্ণে বর্ণে যে সত্য তাতে আর সন্দেহ কী!

তাঁর তেজস্বী মন, বলা বাহুল্য, এই সরকারী অনাচার মেনে নিতে পারেনি। তিনি স্বাধীনভাবেই নিজের বাণিজ্য চালিয়ে আসছিলেন। কিন্তু একজন বাঙালি সাপ্লাই ইন্‌সপেক্টার তুচ্ছ পদোন্নতির আশায় তাঁর তিনখানা মালের নৌকো ধরিয়ে দেয় এবং সেজন্যে গোপীবল্লভের প্রচুর ক্ষতি ও অর্থদণ্ড হয়। এই ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "বাঙালিকে বাঙালি না রাখিলে কে রাখিবে একথা সম্পূর্ণ মিথ্যে। বাঙালি সব সময় বাঙালির সর্বনাশের চেষ্টা করে।" এই সমস্ত ব্যাপারে শেষ জীবনে জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েন এবং এ হতাশা অমূলক নয়।

তাঁর পুণ্যকর্ম আপনাদের সুবিদিত। স্বপল্লী কুণ্ডুগ্রামের 'বৈষ্ণবতোষিণী সভা'র তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও স্থায়ী সভাপতি ছিলেন। ৺শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ধামে প্রচুর অর্থব্যয়ে তিনি যে গোপীবল্লভের মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তা ব্রজমণ্ডলের অন্যতম সম্পদ। তাঁর কারবারে এবং কলে বহু দেশবাসীর অন্ন-সংস্থান হয়ে থাকে। সবদিক থেকেই তিনি যুগন্ধর মহামানব ছিলেন।

আজ তাঁর আত্মা ৺শ্রীশ্রীবৈকুণ্ঠলোকে ৺শ্রীশ্রীবিষ্ণুর চরণাশ্রয় লাভ করেছে। তাঁর দেহান্তরিত মহাপ্রাণী সেখানে পরমা শান্তিলাভ করুক। তাঁর জীবনের আদর্শ ও সত্যকে অবলম্বন করে আমরাও যেন আমাদের উপযুক্ত রূপে গড়ে তুলতে পারি—আজ এইমাত্র আমাদের কামনা।

ওঁ শান্তি! শান্তি! শান্তি! শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু!

উস্তাদ মেহেরা খাঁ

চার পুরুষ ধরে এঁদের গানবাজনার সখ। প্রথম যিনি, তিনি নাকি ছিলেন অদ্বিতীয় তবলচী। সারা দেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল, তিনি আসরে বসলে বুক দুরু দুরু করত দিল্লী লক্ষ্ণৌয়ের সব নামজাদা ওস্তাদদের। একবার বেতালা হলে আর রক্ষা ছিল না, হাতখানা বাঁয়ার ওপরে না নেমে সোজা গিয়ে নামত অসতর্ক গাইয়ের গালে। যখন বাজাতেন তখন আঙুল-

গুলো তাঁর চোখে পড়ত না, তবলা-লহরা শুনে মনে হত যেন দ্রুত জলদে সেতারের ঝঙ্কার বেজে চলেছে।

দু বছরের ছেলেকে কোলে বসিয়ে তবলার পাঠ দিয়েছিলেন তিনি। ছেলে বাপের চাইতেও বড় ওস্তাদ হয়ে উঠলেন। শোনা যায় শেষ বয়সে তিনি আর তবলা বাজাতেন না। কেউ জিজ্ঞেস করলে নিবিড় ক্ষোভের সঙ্গে বলতেন, সঙ্গত করবার মত একটা গাইয়েই নেই, ও বাজিয়ে আর কী করব।

বোধ হয় সেই দুঃখে নিজের ছেলেকে তিনি আর তবলা ধরালেন না। তবু হয়তো বা রক্তের সংস্কারে নিজের তাগিদেই তৃতীয় পুরুষ ধরলে সেতার আর গান। আর সেই সময়েই আবির্ভাব হল উস্তাদ মেহের খাঁয়ের! মেহের আলীর সংক্ষেপ হয়েছে মেহেরা, অতিরিক্ত আকারটার তিনি প্রতিবাদ করেন না, লোকেও নিরঙ্কুশ।

এখন চতুর্থ পুরুষের যুগ চলছে। আগের তিন পুরুষের চাইতে একেবারে আলাদা। বাঁশি বাজায়, বাজায় বিলিত বাজনা গীটার। আকারে প্রকারে পুরোদস্তুর হাওয়া লেগেছে আধুনিক কালের। পূর্বপুরুষেরা মাত্র সরস্বতীর বীণাপাণি রূপটাই দেখেছিলেন, কিন্তু বিচিত্র ব্যতিক্রমের মতো চতুর্থ পুরুষ তাঁর জ্ঞানপদ্মের দুটি চারটি পাঁপড়িও সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। পাতলা ছিপছিপে চেহারা, যে নরোত্তম চৌধুরী গাড়িতে চেপে বসলে চাকা খসে পড়বার আশঙ্কা হত, তাঁর বংশধর বলে বিশ্বাস করা শক্ত।

শুধু উস্তাদ মেহেরা খাঁ কোলের কাছে টেনে নেন তানপুরাটা। গুন গুন করে গান করেন দাদুর পদ ঃ

"ঘড়ি ঘড়ি ঘড়িয়াল বজাওয়ি,
যো দিন যাওয়ি সো বাহুড়ি ন'আওরি—"

"যো দিন যাওয়ি সো বাহুড়ি না আওয়িং।" যে দিন যায় সে আর ফিরে আসে না। একথা উস্তাদ মেহেরা খাঁয়ের চাইতে কে আর বেশি করে জানে!

কোথা থেকে কোথায়! নিজের কাছে নিজেকেই এখন একটা অপরিচিত মানুষের মতো মনে হয় উস্তাদ মেহেরা খাঁয়ের। কপালের ওপরে কতগুলো রেখা ফুটে ওঠে এলোমেলো ভাবে, বাইরে যে চোখ তাঁর ঝাপসা হয়ে এসেছে, মনের ভেতরে তা যেন ঝলমলিয়ে ওঠে দৃষ্টি-প্রদীপের আলোতে। শুধু তাও নয়। বাইরে ক্রমশ সমস্ত আবছা হয়ে আসছে বলেই বোধ হয় মনের নিভৃতে আপাত বিস্মরণগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ভাস্বর হয়ে উঠেছে অন্তর্মুখিনতার দীপ্তিতে।

ঘরের দাওয়ায় সতরঞ্চ পেতে চুপ করে বসে ছিলেন উস্তাদজী। একপাশে সেতারটা পড়ে আছে। বাজাবার জন্যে নয়, কেমন অভ্যাস হয়ে গেছে। যখন বাজান না, তখনও অন্যমনস্কভাবে সেতার কিংবা তানপুরার ওপরে একখানা হাত ফেলে রাখেন তিনি। অন্ধের লাঠির মতো ওরা হাতের কাছে না থাকলে কেমন অসহায় মনে হয় নিজেকে, বোধ হয় নিরাশ্রয়।

অথবা সমস্ত জীবনের সাধনা দিয়ে সুরলক্ষ্মীর কাছ থেকে যে সম্পদ তিনি পেয়েছেন, কৃপণের ধনের মতো সে সঞ্চয়কে তিনি চোখের আড়াল করতে পারেন না।

দূরে কোথায় সানাই বাজছে—বিয়ের আয়োজন চলেছে কোথাও। উস্তাদজী উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন। বেহাগ ধরেছে লোকটা। বেশ বাজাচ্ছে—শিক্ষা আছে মনে হয়। কিন্তু এ কি! মেহেরা খাঁ ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। তাল কাটল। আবার, আবার, আরে আরে এ কী হচ্ছে! উত্তেজনায় হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঠে বসলেন তিনি—পাগল হয়ে গেল নাকি লোকটা? বেহাগের সঙ্গে খাম্বাজকে মিশিয়ে ফেলল যে!

নৈরাশ্যে এবং ক্ষোভে উস্তাদজী আবার এলিয়ে দিলেন নিজেকে। অস্ফুট স্বরে বললেন, বেওকুফ, বেতমিজ!

এটা বাঁধা গালাগালি। যে কোনো বিরক্তি আর অসন্তোষের প্রতিক্রিয়ার মতো ওই দুটি কথা বেরিয়ে আসে উস্তাদজীর মুখ দিয়ে। কথা দুটো শিখেছিলেন গুরুদেব আল্লাবক্সের কাছে, শিষ্যেরা ভুলচুক করলে গর্জে উঠতেন তিনিঃ বেওকুফ বেতমিজ কাঁহাকা। গুরুর অন্যান্য দোষগুণের সঙ্গে শিষ্যও এ দুটি আয়ত্ত করেছেন উত্তরাধিকারের সূত্রে।

শানাইওয়ালার বাজনাটা যেন ছুরির খোঁচার মতো এসে ঘা দিচ্ছে কানে। মেহেরা খাঁ আবার বললেন, বেতমিজ, বেকুফ!

এরই ভেতরে শংকর কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলে, কাকে গাল দিচ্ছেন ওস্তাদজী?

মেহেরা খাঁ মুখ ফেরালেন। কথাটার জবাব না দিয়ে বললেন, আও বেটা, বৈঠো।

পাশের সতরঞ্চে বসল শংকর। তারপর আবার প্রশ্ন করলে, কিন্তু গাল দিচ্ছেন কাকে?

ভ্রূকুঞ্চিত করলেন উস্তাদজী। বললেন, শুনতে পাচ্ছ?

—কী?

—ওই শানাই?

—ওঃ! শংকর হাসল—ব্যাপারটা সে বুঝতে পেরেছে। বললে, ভুল বাজাচ্ছে বুঝি?

—শুধু ভুল! আর একটা ভয়ংকর ভ্রূভঙ্গি করলেন উস্তাদজীঃ যা তা তাল কাটছে, সে কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু বেহাগের সঙ্গে খাম্বাজ মিশিয়ে বেইজ্জৎ করে দিয়েছে একেবারে। কান ধরে দুই থাপ্পড় দেওয়া উচিত বেকুফের।

শংকর বললে, ভুলটা কিন্তু আপনারই উস্তাদজী।

উস্তাদজী প্রায় সিংহের মতো হুংকার করে উঠলেনঃ আমার ভুল? কোন্ বেতমিজ—

হাসিমুখেই শংকর বাধা দিলে। বললে, আপনি বুঝতে পারেন নি।

—আমি বুঝতে পারিনি। এবার আর ক্রোধ নয়, বিস্ময়ে আর বেদনায় মেহেরা খাঁ যেন হতবাক হয়ে গেলেন ঃ এই চল্লিশ বছর ধরে আমি তবে কী করেছি।

উস্তাদজীর বেদনার্ত আহত মুখের দিকে তাকিয়ে সহানুভূতি বোধ করল শঙ্কর। কোমলভাবে বললে, আপনি ঠিকই করেছেন। কিন্তু এ তো তা নয়। ও লোকটা বেহাগ বাজাচ্ছে না, বাজাচ্ছে আধুনিক একটা গান।

—ওঃ, আধুনিক গান। মুহূর্তে উস্তাদজী যেন নিভে গেলেন। একবার অসহায় দৃষ্টিতে শঙ্করের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলেন তিনি।

শঙ্কর দাঁড়িয়ে রইল অনিশ্চিত ভাবে। কিছু একটা বলা উচিত, কোনোরকম একটা আশ্বাস দেওয়া উচিত উস্তাদজীকে। কিন্তু কোনো কথা মুখে এল না তার। মৃদু একটা নিঃশ্বাস চেপে নিয়ে শঙ্কর চলে গেল বাড়ির ভেতরে।

আধুনিক! আধুনিক কাল—আধুনিক গান! সেতারের ওপর হাতটা অস্থির হয়ে উঠল মেহেরা খাঁর, ঝনাৎ করে সাড়া দিয়ে উঠল তারগুলো। উস্তাদজীর মনে হল আহত যন্ত্রণার একটা আকস্মিক আর্তনাদ যেন সাড়া দিয়ে উঠেছে সেতারটা থেকে। এতদিন ধরে ওর তারে তারে জেগেছে বিশুদ্ধ সুরে লয়ে বিস্তারে নানা রাগ-রাগিণীর আলাপ; ওর তারে তারে ভৈরোঁ পূরবীর প্রশান্তি পড়েছে ধ্যানমূর্ছিত হয়ে, ওর ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে মেঘমেদুর নীলিম দিনের বাদল মৃদং প্রতিধ্বনিত হয়েছে, গভীর রাত্রির স্তব্ধতায় ওর মৃদু করুণ মীড় আহ্বান জানিয়েছে লোকান্তপারের অশরীরীদের—তাদের নিঃশব্দ নিঃশ্বাস যেন অনুভব করতে পেরেছেন উস্তাদজী; ওর দ্রুত কঠিন ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে যেন বিলসিত হয়ে গেছে সুরের সুতীক্ষ্ন বিদ্যুৎলেখা, ওর তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে জ্বলেছে সুরের মশাল।

কিন্তু আজ! এই মুহূর্তে উস্তাদজী যেন ওর আহত বুকের ভেতর থেকে অসহায় আর্তনাদ শুনতে পেলেন একটা। ও কি শুধুই আর্তনাদ, না মৃত্যুযন্ত্রণার গোঙানি?

আধুনিক কাল। হ্যাঁ—যুগ বদলেছে বইকি। যো দিন যাওয়ি সো বাহুড়ি ন আওয়ি। যে দিন গেছে সে আর ফিরবে না। প্রবাহিত হয়ে চলে গেল যে সময়, উজানের মুখে সে আর ফিরে আসবে না কোনো দিন।

আত্মমগ্ন দৃষ্টিটা তুলে ধরলেন মেহের খাঁ। কাল বদলায়, মানুষ বদলায়; কিন্তু যে পৃথিবী, যে প্রকৃতি থেকে তার বিন্দু বিন্দু মাধুর্যের মতো ক্ষরিত হয়েছে সুর আর সঙ্গীত, কই সে পৃথিবী তো বদলায়নি! আশ্চর্য সবুজ আর স্নিগ্ধ মনে হচ্ছে দূরের বনরেখাকে, সকালের রোদে ঝলমল করে উঠেছে সামনে খালের ঘোলা জলটা, ওই শানাইয়ের অস্বস্তিকর ভুল বাজনাটাকে ছাপিয়েও দোয়েলের শিস্ শুনতে পাচ্ছেন তিনি। চল্লিশ বছর আগে যা দেখেছিলেন আজও তা তেমনিই আছে—কোথাও এতটুকু ব্যতিক্রম

হয়নি তার। শুধু সময় বদলেছে—বদলে গেছে মানুষ।

বদলে গেছে মানুষ। অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে কথাটা ভাবতে গিয়ে নিজেই চমকে উঠলেন উস্তাদজী। বদলাবেই তো—উপায় নেই, রোধ করা যাবে না তাকে। মেহেরা খাঁ নিজেই কি কম বদলেছেন? চল্লিশ বছর আগেকার একখানা ভুলে যাওয়া মুখ হঠাৎ আলো হয়ে উঠল মনের কালো অন্ধকারের ওপরে। আজকে কি ওই হারানো মানুষটাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে আর?

বাইরের দৃষ্টিটা হঠাৎ ফিরে এল নিজের ভেতরে—সন্ধানী আলোর ঝলক ফেলে ফেলে কী যেন খুঁজতে লাগল সেখানে। একটা পোড়ো বাড়ির মতো অসংলগ্ন ধ্বংসস্তূপ—ভাঙা খেলনার টুকরো যেন ছড়িয়ে আছে এদিকে ওদিকে। নানা রঙ, নানা আকার। ছেলেমানুষি কৌতুক বোধ হয়, অকারণ কৌতূহলে কুড়িয়ে নিতে ইচ্ছে করে ওই ভাঙা টুকরোগুলোকে, জোড়াতাড়া দিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে—

সন্ধানী আলোর অর্থহীন সন্ধান এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল, শিউরে উঠল আলোকবৃত্তটা। জীবনের সব কিছুই খেলনা নয়, সব কিছুই ভাঙা খেলনার টুকরো নয়। ওই আলোকবৃত্তটার ভেতরে ছায়াবাজির মতো কতগুলো বিশৃঙ্খল ছবি ফুটে উঠছে। উস্তাদজী চোখ বুজলেন। হ্যাঁ—চেনা যাচ্ছে বইকি। একটা শহর—মস্ত বড় শহর। তার নাম দিল্লী।

হাতীর মতো অতিকায় চেহারা, টুকটুকে রঙ—ফুলো মস্ত গাল দুটো থেকে যেন ফুটে পড়ছে রক্ত, লাল লাল চোখে নেশার জড়তা। উস্তাদ আল্লাবক্স। প্রকাণ্ড একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে পড়ে আছেন পাহাড়ের মতো। পাঁচটা হীরের আংটি পরা মোটা মোটা আঙুলে ফরাসের ওপরে তাল বাজিয়ে চলেছেন তিনি। হঠাৎ পাহাড়ের মতো অত বড় শরীরটাতে যেন ভূমিকম্পের দোলা লাগল, বিশাল পুরুষ পিঠ খাড়া করে উঠে বসলেন তাকিয়া ছেড়ে। তারপরে মস্ত বড় একখানা হাত সস্নেহে নেমে এল মেহেরা খাঁয়ের কাঁধের ওপরে। আল্লাবক্স বললেন, সাবাস বেটা, সাবাস। তোর জন্যে আজ আমার অহঙ্কার হচ্ছে। আল্লাবক্স খাঁ একদিন থাকবে না, কিন্তু সেদিনও লোকে নাম করে বলবে উস্তাদ মেহেরালী খাঁ তারই শিষ্য।

জীবনের সব চাইতে বড় পুরস্কার সেদিন পেয়েছিলেন মেহেরা খাঁ, চোখে তাঁর ছলছল করে উঠেছিল অশ্রু। আনন্দে, আবেগে যেন বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল তাঁর। পাঁচ বছর বয়সে যে সাধনা শুরু করেছিলেন, আজ পঁচিশ বছর বয়সে তা সার্থক হল। তানপুরা ফেলে দিয়ে তিনি উস্তাদজীর পায়ের নিচে লুটিয়ে পড়েছিলেন, হিন্দু শিষ্যদের মতো তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় মেখেছিলেন তিনি।

গুরু জয়পত্র দিলেন, করলেন আশীর্বাদ। সেদিন মন ভরে গিয়েছিল মেহেরা খাঁয়ের, বুক দুলে উঠেছিল গর্বের উল্লাসে। সামনে পড়ে আছে পৃথিবী। জয় করতে হবে তাকে, নিজেকে প্রমাণিত করতে হবে, প্রতিষ্ঠা

করতে হবে 'সারে হিন্দুস্তানের' জ্ঞানী-গুণীর দরবারে। গুরু তাঁকে আশীর্বাদ করেছেন, কেউ আগলে দাঁড়াতে পারবে না তাঁর জয়যাত্রার পথ। কিন্তু—

কিন্তু জীবনে কত বড় পরাজয় যে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে, সে কি কল্পনাও করতে পেরেছিলেন মেহেরা খাঁ?

হঠাৎ নড়েচড়ে তিনি নিজেকে সজাগ করে নিলেন। যে স্রোত আর ফিরবে না, কী হবে তার কথা ভেবে? ঠিক কথা, আধুনিক কাল। মনের অন্ধকারে খানিকটা ছায়াবাজির মতো আকস্মিকভাবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা সেই দিল্লী শহর আবার ডুব দিয়েছে অবচেতনার গভীরতায়। যা গেছে তাকে যেতে দাও, যা হারিয়ে গেছে, চিরদিনের মতোই হারাতে দাও তাকে। এ শহর দিল্লী নয়। বাংলা মুলুকের ছোট একটি গ্রাম—যার নাম নরোত্তমপুর। এখানে বাগ-বাগিচা নেই, নবাবী কেল্লা নেই, নেই হীরামহল মোতিমহল, চকবাজার আর জনতা। এখানে শুধু উজ্জ্বল নীল আকাশ, এখানে দোয়েলের শিস্, এখানে জলে ঝলমলে রোদ, এখানে সবুজ বনরেখার সুস্নিগ্ধ নিবিড়তা।

এই ভাল—এরই তো প্রয়োজন ছিল। কাল বদলাচ্ছে—বদলাক। মেহেরা খাঁয়েরও তো বদলাবার প্রয়োজন ছিল, নইলে কি তিনিই বাঁচতে পারতেন?

সেতারটাকে এবারে কোলের ওপরে তুলে নিলেন তিনি। সযত্নে হাত বোলালেন তারগুলোর ওপরে, যেন পরিচর্যা করতে চাইলেন তাঁর নিভৃত সেই ব্যথার কেন্দ্রলোকটাকে। একে ব্যথা দেওয়া চলবে না, দুঃখ দেওয়া চলবে না একে। এই সেতার মেহেরা খাঁয়ের আশ্রয়, আশ্বাস। পৃথিবীর পথে এই তো তাঁর চিরদিনের সহযাত্রী। তাই সেদিনের সেই পরম ব্যথার মুহূর্তেও—

উস্তাদজী চকিতে সংযত করে নিলেন নিজেকে। বেওকুফ—বেতমিজ মন! একটুখানি ফাঁক পেলেই নিষেধ ভেঙে বেরিয়ে পড়তে চায়, সামলানো যায় না! দ্রুত আঙুলে সেতারে ঝঙ্কার দিলেন মেহেরা খাঁ। তারপর গুন গুন করে ধরলেন 'রুইদাসের' পদ:

"নিত প্রভাত ভব তিঁবির ছুটে
অন্তর তিঁবির ছুটত নাহি।
সত্যরূপ প্রেমরূপ পহুঁ
পৈঠহুঁ আন্তর মাহি—"

আধুনিক কালের মানুষ শঙ্কর। বাঁশি বাজায়, বাজায় বিলিতী বাজনা গীটার। কিন্তু এ বাজনার পাঠ সে নেয়নি ওস্তাদ মেহেরা খাঁয়ের কাছ থেকে। ছেলেবেলায় কিছুদিন উস্তাদজী তাকে সেতার শিখিয়েছিলেন, তার পরেই সে চলে গেল কলকাতায়। তার শিক্ষা কলকাতাতেই।

কলকাতা। নতুন দিনের নতুন শহর। পুরনো কালের দিল্লী আগ্রার মতো বনেদীয়ানা তার নেই; সোনা রুপোর জরি দিয়ে কাজ করা সেকেলে

জাঁকজমকপূর্ণ নেই, তার মাথায় নেই হীরেমুক্তো অপহৃত ছিন্নবিচ্ছিন্ন নবাবী তাজ। তার আমদরবার, দেওয়ান-ই-খাস আর শিশমহলে ঝঙ্কৃত হয় না মিঞাকি মল্লার আর বিলাসখানী টোড়ীর করুণ অনুরণন। তার আকাশ-বাতাসে শোনা যায় না স্বপ্ন-গভীর অতীতের পদসঞ্চার। কলকাতা নতুন, কলকাতা আধুনিক। তার আকাশ ছোঁয়া লোহায় গাঁথা উদ্ধত নিরলঙ্কার বাড়িগুলোর সঙ্গে কোনো মিল নেই বিস্মৃতি দিনের শিল্পীদের কারুকৃতার্থ দেওয়ান-ই-খাস আর চামেলী-মহলের। তার নিরাভরণ বিশালতায় আলাপ আর বিস্তারের অলস ধ্যানগভীর ব্যাপ্তি নেই কোনোখানে, সেখানে সংক্ষিপ্ত আধুনিকতা, বাহুল্যহীন অগভীর আধুনিক গান।

তাই শংকরের বাবা জগন্নাথ চৌধুরী যে দৃষ্টি দিয়ে বিচার করেছিলেন উস্তাদ মেহেরা খাঁকে, শংকর তা করে না। নবাবী আমলের পুরনো জাঁকজমকের আতিশয্য কৌতূহল জাগায় কিন্তু আকৃষ্ট করে না শংকরকে। মনের দিক দিয়ে এক ধরনের করুণাই আছে তার উস্তাদজী সম্পর্কে। তাই রাগিণী শুরু করবার আগে দেড় ঘণ্টা ধরে তার আলাপ-বিলাপের পর্ব খানিকটা অসহ্য প্রলাপের মতো মনে হয় শংকরের, মাথা ঘুরতে থাকে, বোঁ বোঁ করে একটা অস্বস্তিকর শব্দ বাজতে থাকে কানের ভেতরে। তবু ভদ্রতার খাতিরে বসে বসে ওই উৎকট ম্যাও ম্যাও আর 'মারি ঘং' শুনতে হয় তাকে, তারপর বিনীত হাসিতে বলতে হয়, হাঁ উস্তাদজী, গান তো একেই বলে! আজকালকার গান কি আর গান!

উস্তাদজী খুশি হন, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন না। তবে সান্ত্বনা এই যে সে তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল চোখের দীপ্তি নিষ্প্রভ হয়ে গেছে আজকাল, আবছা আর আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তাই শংকরের মুখে চোখে অলক্ষ্যপ্রায় কৌতুকের ইঙ্গিতটা দেখতে পান না তিনি। সংশয় আর আবেগের মধ্যকেন্দ্রে দুলতে থাকে উস্তাদজীর মন। তানপুরায় একটা মৃদু আঘাত দিয়ে বলেন, আচ্ছা, তবে তোমাকে তুলসীদাসী ভজন শোনাই একখানা।

শংকর আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। উস্তাদজীকে সে চেনে বিলক্ষণ। তাঁর ভজন আধুনিক ভজন নয়, আলাপ, বিস্তার এবং হা হা করে গিটকিরির সে ভজনের সঙ্গে ধ্রুপদের বিশেষ পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না শংকরের। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে সে বলে, এখন ভজন থাক উস্তাদজী, ভীমপলশ্রীর পরে ভজন তেমন জমবে না।

পালাবার ছুতোটা বুঝতে কষ্ট হয় না মেহেরা খাঁয়ের। একটা নিঃশ্বাস চেপে নিয়ে তানপুরাটা সরিয়ে রাখেন তিনি।

বাপের গুরুদেবকে চটানো চলবে না, অন্তত যতটা সম্ভব লোক-দেখানো শ্রদ্ধাটাও করতে হয় তাকে। কিন্তু আড়ালে হাসাহাসি করে শংকর। 'আবোল-তাবোল' উদ্ধৃত করে বলে, "গান জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে ভীষ্মলোচন শর্মা"—

মাঝে মাঝে ক্ষীণ প্রতিবাদ করে শংকরের স্ত্রী রমা।

—ওঁকে এভাবে ঠাট্টা করা উচিত নয় তোমার। কতবড় ওস্তাদ উনি,

বাবা কত শ্রদ্ধা করতেন ওঁকে। সাধনা করে উনি শিখেছেন, তোমাদের মতো ফাঁকির কারবার ওঁর নয়।

তর্ক করবার উৎসাহে পাঞ্জাবির আস্তিনটা গুটিয়ে নেয় শঙ্করঃ ওস্তাদ উনি নিশ্চয়, কিন্তু উনি যা করেন তা জিম্‌নাস্টিক, তাকে গান বলে না।

রমা প্রশ্ন করেঃ তা হলে তুমি গান বল কাকে?

—আমি তাকেই গান বলি যা কথা আর সুরের সমাবেশে অধিকার করে মনকে, দুলিয়ে দেয় প্রাণ। জান এ সম্বন্ধে কী বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, কী লিখেছেন দিলীপ রায়?

রমা জানে না। এবং জানে না বলেই সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করে, তবে কি ওঁর গান গানই নয়?

শঙ্কর হাসেঃ একটা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, আর একটা রবীন্দ্রনাথের কাব্য।

—তার মানে?

—মানেটা অত্যন্ত পরিষ্কার। উনি গান শেখেননি, শিখেছেন গানের ব্যাকরণ। সেও অবশ্যি সেকালের ব্যাকরণ, কিন্তু সে কথা থাক। আসল ব্যাপারটা কী জান? ব্যাকরণ পড়ে পণ্ডিত হওয়া যায়, বাহাদুরি পাওয়া যায়, কিন্তু কাব্যরচনা করা যায় না। ওর জন্যে চাই আলাদা কবিপ্রতিভা, আলাদা একটা রসিক মন। সে মন ওঁর নেই।

রমা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, বলে, ও। কিন্তু এই যে তোমাদের সব একঘেয়ে গান? চাঁদ, রজনীগন্ধা, বিরহের বালুচর, উদাসী পথিকের আকুল বাঁশির ডাক, আমি ভালবাসা ভিখারী, প্রেমের চকোর—এগুলো বুঝি সব উঁচুদরের কবিতা?

মেয়েমানুষের বেশি তর্ক করাটা শঙ্করের পছন্দ হয় না, অন্তত এদিক থেকে চৌধুরীবংশের ঐতিহ্যটাকে কিছু পরিমাণে বজায় রেখেছে শঙ্কর। বিরক্ত হয়ে বলে, যা বোঝ না তা নিয়ে কেন বাজে তর্ক করতে আস বল তো?

—তর্ক করতে যাব কেন? ওস্তাদজীকে তোমরা অসম্মান কর, এইটেই আমার ভাল লাগে না।

শঙ্করের গলার স্বর রূঢ় হয়ে ওঠে এবারেঃ অসম্মান কে ওঁকে করেছে? এ হল সমালোচনা। আর সমালোচনা করবার অধিকার প্রত্যেক মানুষের আছে।

—কিন্তু আড়ালে হাসাহাসি করাকে কি সমালোচনা বলে?

শঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়েই রমা বুঝতে পারে বজ্র-বিদ্যুৎ আসন্ন হয়ে এসেছে। সুতরাং ঝড়ের জন্যে আর অপেক্ষা না করে বুদ্ধিমতীর মতো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় রমা। পেছন থেকে সাপের গর্জনের মতো শঙ্করের চাপা স্বর শুনতে পাওয়া যায়ঃ ইডিয়ট!

ইডিয়ট বলুক শঙ্কর, যা মুখে আসে, যা খুশি তাই বলুক। কিন্তু মনের দিক থেকে গভীর আর নিবিড় ভাবে উস্তাদজীকে শ্রদ্ধা করে রমা, ওঁর সম্বন্ধে একধরনের সস্নেহ দুর্বলতা আছে তার। তা ছাড়া পুরুষ বলে যে জিনিসটা

এড়িয়ে গেছে শঙ্করের চোখ, ঠিক সেইটেই ধরা পড়ে গেছে রমার দৃষ্টিতে। তার সন্দেহ হয় কোথায় গভীর একটা বেদনার জায়গা আছে উস্তাদজীর— কোথায় একটা—

মনে পড়ে তার বিয়ের সময়ের কথা। মস্ত আসর বসেছিল এ বাড়িতে, বহু জ্ঞানী-গুণীকে কলকাতা থেকে আমদানি করেছিল শঙ্কর। ঝকঝকে আধুনিকের দল, মধুক্ষরা কণ্ঠ, কাব্যসঙ্গীতের চটুল উচ্ছল মায়া বিস্তীর্ণ করে দিয়েছিল তারা। আর সেই নতুনদের মাঝখানে কী বিচিত্র দেখাচ্ছিল উস্তাদজীকে, মনে হচ্ছিল কী অদ্ভুতরকম বেমানান। পাকা চুল, পাকা দাড়ি, ময়লা পাজামা, অতিরিক্ত দীর্ঘ দেহ বলে একটু কোলকুঁজো, মিটমিটে চোখের দৃষ্টি। মাথা নিচু করে গান শুনছিলেন। হঠাৎ শঙ্কর বললে, উস্তাদজী, এবারে আপনি আমাদের কিছু গান শোনান।

যেন চমকে উঠলেন উস্তাদজী, যেন অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তাঁর। কেমন ভারী ভারী জড়তা ভরা গলায় উস্তাদজী বলেছিলেন, আমি ?

—আপনি না গাইলে কি আসর হয় ?—তানপুরাটা ঠেলে শঙ্কর এগিয়ে দিয়েছিল উস্তাদজীর দিকে।

অনাসক্তভাবে তানপুরা তুলে নিলেন তিনি, তারপর গান শুরু করলেন। গান তিনি কি গেয়েছিলেন বা কেমন গেয়েছিলেন তা বোঝবার ক্ষমতা সেদিন ছিল না রমার। তবে ঘোমটার আড়াল থেকে সকৌতুক দৃষ্টিতে দেখেছিল তাঁর ঘন ঘন মাথা নাড়া—আর অবাক হয়ে ভেবেছিল কী অসাধারণ গলার জোর! খানিক পরেই আধুনিকদের মুখে ফুটে উঠেছিল চাপা বাঁকা হাসি, পান চিবুতে চিবুতে একে একে তারা বেরিয়ে গিয়েছিল প্রায় সকলেই। আর তবলচী কয়েক মিনিট পরে সেই যে হাত তুলল, আর বাজায়নি। শুধু নির্নিমেষ চোখে অভিভূত হয়ে তাকিয়েছিল উস্তাদজীর মুখের দিকে।

কিন্তু কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই উস্তাদজীর। কে গেল, কে রইল কোনো কিছু তিনি লক্ষ্য করলেন না, নিজের মনেই ঝাড়া দেড় ঘণ্টা তিনি গান করে গেলেন। গান যখন শেষ হল, তখন তবলচী এগিয়ে এসে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়েছিল। বিহ্বলভাবে বলেছিল, আপনি এখানে কেন পড়ে আছেন ? কলকাতায় চলুন।

উস্তাদজী শুধু মৃদু হেসেছিলেন, উত্তর দেননি।

তবলচী বলেছিল, যদি কিছু মনে না করেন, আপনার মুখে একখানা টোড়ী শুনতে চাই।

—টোড়ী !—শান্ত ঘুমন্তপ্রায় উস্তাদজী হঠাৎ যেন আর্তনাদ করে উঠেছিলেন একটা, বলেছিলেন, না, না, টোড়ী নয় টোড়ী নয়!—তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুতবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। যেন ভয় পেয়েছেন তিনি, যেন পালিয়ে যাচ্ছেন।

তবলচী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল—কী আশ্চর্য, এমন একটা রত্ন এই অন্ধকারে পড়ে আছে!

আর ঘোমটার আড়ালে সেই মুহূর্তে রমা একটা কিছু অনুমান করেছিল। যত দিন যাচ্ছে ততই নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস হচ্ছে সে অনুমানটা বোধ করি মিথ্যে নয়। আর সেই থেকেই উস্তাদজী সম্বন্ধে একটা মৃদু সহানুভূতিতে ভরে আছে রমার মন।

দেউড়ির পাশে ছোট একখানি ঘর। আজ পনেরো বছর আগে এই ঘরে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি, সেই থেকে আজ পর্যন্ত আর নড়ে বসবার দরকার হয়নি। অল্প প্রয়োজন, আয়োজন আরো অল্প। একটি ছোট খাট, ছোট বিছানা, টুকিটাকি দু-চারটি জিনিসপত্র। একটি সেতার, দুটি তানপুরা। স্তব্ধ শান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে ঘরটি।

কোলের ওপর সেতারটা টেনে নিয়ে টুং টাং করছিলেন উস্তাদজী। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, ছায়া ঘনাচ্ছে ঘরের ভেতরে। আলো জ্বালাননি মেহেরো খাঁ, এক-একটি সন্ধ্যায় আলো জ্বালাতে ভাল লাগে না তাঁর। অন্ধকারের আড়ালে সমস্ত মনটা যেন কেন্দ্রগামী হওয়ার সুযোগ পায়, নিজের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার অবকাশ ঘটে। উস্তাদজী অনুভব করেন, সেতারের প্রতিটি ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মনের গভীরে মণিপদ্ম একটির পর একটি দল মেলেছে তার, আর তাদের ওপর ফুটে উঠছে একটির পর একটি বিদ্যুৎদীপ্ত রাগ-রাগিণীর মূর্তি,—বাজছে কেদারা, ভীমপলশ্রী, সোহিনী, ছায়ানট, নটমল্লার, টোড়ী—

টোড়ী! উস্তাদজীর চমক লাগে। বীণাবাদিনী একটি নারীমূর্তি, তার কণ্ঠ থেকে বিরহের করুণ সঙ্গীত ঝরে পড়ছে আকাশ বাতাস বন-বনান্তকে আচ্ছন্ন বিবশ করে দিয়ে। তার সঙ্গীতে আকৃষ্ট হয়ে এগিয়ে এসেছে একটি বনের হরিণী, তারও নীলিম আয়ত চোখ ছলছল করছে অশ্রুতে।

এই তো টোড়ী রাগিণীর রূপ। কিন্তু শুধুই কি রাগিণীর রূপ? শহর দিল্লী নয়—ছায়াবাজির মতো আর একটা শহরের ছবি মনের সামনে ভাস্বর হয়ে ওঠে—যার সামনে নীল সমুদ্রের দোলা চলেছে অশ্রান্ত আনন্দে। তার নাম "মুম্বই"—লোকে যাকে বলে বোম্বাই। খোলা জানালা দিয়ে সেদিনও তো তেমনি চোখে পড়ছিল ওই নীল সমুদ্রের চঞ্চলতা, চাঁপাফুলের মতো ললিত অঙ্গুলি-বিন্যাসে যে "মিঞাকি টোড়ী" বাজিয়ে চলেছিল, তারও চোখে ছিল সমুদ্রের অতলান্ত অশ্রুর ইঙ্গিত, তার নাম—

তার নাম আশিক বাঈ।

কিন্তু ঝুটা, সব মিথ্যে। মিথ্যে আশিক বাঈ, মিথ্যে তার প্রেম। টোড়ী রাগিণী শুধু কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। যে ভালবাসে, সে কি ঠকায় কখনো? 'ই দেওয়ানা দুনিয়ামে সব কুছ হ্যায় ঝুটা'—

ঘরের মধ্যে অন্ধকার আরো গভীর হয়ে আসছে। তবু তারই ভেতরে আচমকা উস্তাদজীর মনে হল দরজার কাছে কার যেন ছায়া পড়েছে।

—কে ওখানে?

মৃদুকণ্ঠ শোনা গেল, আমি উস্তাদজী।

—ওঃ। কিন্তু এভাবে না এলেই ভালো করতিস বেটি—

—এ ছাড়া যে উপায় নেই উস্তাদজী।

—কিন্তু বেটি, এ লুকোচুরির বড় খারাপ। এ অন্যায়।

—কিছু অন্যায় নয়। আমি আলোটা জ্বালি।

কেটে যাচ্ছিল অভ্যস্ত দিন। শঙ্কর বাজাচ্ছিল বাঁশি আর গীটার—উস্তাদ মেহেরা খাঁ নিমগ্ন হয়ে ছিলেন তাঁর তানপুরা আর সেতারে। বয়স বাড়ছিল উস্তাদজীর, ক্ষীণ হয়ে আসছিল চোখের দৃষ্টি, আর সেই সঙ্গে বিস্মরণগুলো আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল মনের নেপথ্যলোকে। আজ বিশ বছর আগে উস্তাদ আল্লাবক্স মারা গেছেন, কিন্তু গভীর রাত্রিতে মালকোষ বাজাতে বাজাতে রোমাঞ্চিত মেহেরা খাঁ স্পষ্ট অনুভব করতেন যেন বিশালকায় পুরুষ পাশে এসে বসেছেন। গোলাপী রঙের ফুলো ফুলো গাল, মেহেদী-রঙানো পাকা দাড়ি, দু চোখ নেশায় আরক্ত। সস্নেহে একখানা অশরীরী হাত তিনি রেখেছেন মেহেরা খাঁর কাঁধের ওপরে, জড়িত স্বরে বলছেন, সাবাস বেটা, তোর জন্যে আমার অহঙ্কার হচ্ছে।

"যো দিন যাওয়ি যো বাহুড়ি ন আওয়ি।" যে দিন চলে যায় সে আর ফিরে আসে না। স্রোতের মুখে যে সময় ভেসে চলে গেল, উজানের ধারায় জীবনে তার প্রত্যাবর্তন হবে না কোনোদিন। নাই বা হল, ক্ষতি কী তাতে। দিন বদলাচ্ছে বদলাক, কাল বদলাচ্ছে,—তাকে বদলাতে দাও। আজ দাদুর ওই পংক্তিটার একটা নতুন অর্থ যেন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে। যা গেছে তার জন্যে ক্ষোভ করে লাভ নেই। লাভ নেই অকারণ বেদনায় নিজেকে আহত আর পীড়িত করে।

আশ্চর্য, সেই শহর বোম্বাইয়ের কথা ভাবতে গিয়ে তেমন করে আর যন্ত্রণায় সমস্ত মনটা আর্তনাদ করে ওঠে না। সেই নীল সমুদ্রের দোলায় আর দুলে ওঠে না অতলান্ত অশ্রুর আভাস। মানুষ বদলায়—আশিক বাঈও বদলে গিয়েছিল—প্রেমের প্রতিদান দিতে সে রাজী হয়নি, দেওয়ানা হতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু আজ—এই এতদিন পরে নিজেকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করছেন উস্তাদজী। টোড়ী রাগিণী মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয় ভালবাসা আর বিরহের অশ্রু। এক আশিক বাঈ যদি হারিয়ে গিয়ে থাকে, হাজার জনের চোখে তার প্রেম সত্য হয়ে রইল। সে প্রেমে উস্তাদজীর হয়তো অধিকার নেই, কিন্তু পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের জীবনে তা তো সার্থক হয়ে উঠবে। একজনের বিরহ-অশ্রু যদি সত্য না-ই হয়, তবু আরো হাজার হাজার ভাগ্যবানের জীবনে টোড়ী রাগিণী চিরন্তন হয়ে রইল।

আশিক বাঈকে পাননি উস্তাদজী, কিন্তু আর-একজনকে পেয়েছেন। কন্যার মতো নিবিড় স্নেহ দিয়ে তাকে প্রাণ খুলে শেখাচ্ছেন মেহের খাঁ, সমস্ত সম্বল দিতে চাইছেন উজাড় করে। যাকে দিতে চেয়েছিলেন সে নিতে পারল না। চোখের সামনে পৃথিবীর আলো যখন দিনের পর দিন নিভে আসছে

তখন গভীর ব্যথার সঙ্গে এই কথাই বারে বারে মনে হত—তাঁর এতবড় সুরের ঐশ্বর্যকে কৃপণের সম্পদের মতোই আগলে গেলেন তিনি, কারো কোনো কাজে লাগল না। কিন্তু আজ সে অতৃপ্তি কেটে গেছে। পিয়ারীকে যা দিতে পারেননি, বেটীকেই তা দিয়ে যাবেন।

কদিন থেকে ভারী প্রসন্ন আছে উস্তাদজীর মন। আর ক্ষোভ নেই, বেদনা নেই আর। এতদিন ধরে যেন একটা বোঝা বয়ে বেড়িয়েছেন তিনি, দেবার মানুষ ছিল না। শঙ্করের বাবা জগন্নাথ চৌধুরী কিছু নিয়েছিলেন, শঙ্কর একেবারেই নিতে পারল না। কিন্তু এমন আশ্চর্যভাবে আর একজন এসে হাত পেতে দাঁড়াবে এ কি কল্পনাতেও ছিল উস্তাদজীর ?

সকালে ঝিলিমিলি রোদ উঠেছে। ঝিলমিল করছে খালের জল। সবুজ অরণ্যে শিস্ দিচ্ছে দোয়েল, বসে বসে সেতারের কানে মোচড় দিচ্ছিলেন তিনি।

সকালবেলাতেই এখানকার পোস্ট অফিসে ডাক আসে। শঙ্কর তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় খবরের কাগজের সন্ধানে। আজও সে কাগজ পড়তে পড়তে ফিরছিল।

উস্তাদজী ডাকলেন, শঙ্কর ?

শঙ্কর মুখ তুলল। সে মুখে যেন মেঘের রঙ। দুশ্চিন্তা আর আশঙ্কার ভারে থম থম করছে। কিন্তু বয়েস বেড়েছে, চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ হয়ে গেছে উস্তাদজীর। শঙ্করের মুখের চেহারা তিনি ভালো করে দেখতে পেলেন না।

উস্তাদজী আবার ঢাকলেন, একটা ভৈরোঁ শুনবে শঙ্কর ?

—এখন নয় উস্তাদজী, অনেক কাজ—শঙ্কর যেন তাঁকে এড়িয়েই বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

শুধু শঙ্করের মুখেই মেঘের রঙ ধরেনি—ঝোড়ো মেঘের কালো রঙ ধরেছে দেশের আকাশে। কলকাতায় কিছুদিন ধরেই সর্বনাশা দাঙ্গা শুরু হয়েছে হিন্দু-মুসলমানের। প্রাসাদপুরী কলকাতা, আধুনিক কলকাতা রূপান্তরিত হয়েছে সুন্দরবনে। তার পথে পথে এখন হিংস্র জানোয়ারের ক্ষুধিত পদসঞ্চার।

এ খবর উস্তাদজী রাখেন না, এ সমস্ত তাঁর সংকীর্ণ জীবনবৃত্তের বাইরে। নিজের ছোট ঘরটি—নিঃসঙ্গ নিরালা জীবন, তাঁর সেতার আর তানপুরা, স্বপ্নের গভীরে শহর মুম্বই আর শহর দিল্লী। এতদিন এ খবর তাঁকে কেউ দেয়নি, তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কেই যেন সজাগ ছিল না কেউ। কিন্তু আপাতত তাঁর সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠবার সুযোগ ঘটেছে।

কাগজ নিয়ে পোস্ট অফিস থেকে বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছে শঙ্কর, এমন সময় চার-পাঁচটি ছেলে এসে ঘিরে দাঁড়াল তার চারদিকে।

—আপনার সঙ্গে কথা আছে শঙ্করদা।

—আমার সঙ্গে ?

—হাঁ, খুব জরুরী কথা।

ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে শঙ্কর সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল।

—ব্যাপারটা কিহে ?

চাপা গলায় একজন বললে, এখানেও লাগবে।

—সে কী!—শঙ্করের শরীরের ভেতর দিয়ে চমকে গেল একটা শীতল শিহরণ ঃ কী লাগবে ?

—দাঙ্গা।

—বল কী!—শঙ্কর প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

—ঠিকই বলছি।—বিশ্বস্ত স্বরে ওদেরই আরেকজন বলে গেল, বাইরে থেকে বিস্তর লোকজন এসেছে পাশে পাশে। খালপারের মসজেদে রোজ ওদের গোপন জমায়েং হচ্ছে। গভীর রাত্রে মশাল জেলে লাঠি খেলছে সব। কাল দেখেছি নুরু মিয়ার বাঁশঝাড় থেকে লাঠি কাটছে।

—শুধু কি তাই ?—আর একজন বললে, রাম জেলের কাছে চাঁদা চাইতে গিয়েছিল। বলেছে চাঁদা না দিলে ঘরবাড়ি লুটপাট করে নেবে।

বিবর্ণ মুখে শঙ্কর বললে, তবে আর কী হবে। তোমরাও তৈরী হয়ে যাও।

—তৈরী আমরা আছিই। কত ধানে কত চাল বেরোয় সেটা বুঝিয়ে দিতে পারব। কিন্তু আপনাকে একটু সাবধান থাকতে হবে শঙ্করদা, বিভীষণ রয়েছে আপনার বাড়িতে।

—আমার বাড়িতে! আকাশ থেকে পড়ল শঙ্কর ঃ সে আবার কী!

—ওই উস্তাদজী।

—উস্তাদজী! শঙ্কর এবারে হো হো করে হেসে উঠল ঃ মাথা খারাপ হয়েছে নাকি তোমাদের! আজ পনেরো বছর ধরে এ বাড়িতে উনি আছেন—আমাদের একেবারে আপনার জন।

—ও কেউটে সাপের জাত শঙ্করদা। সব সমান। কলকাতায় কী হল জানেন না ?

শঙ্কর তবু হাসছিল ঃ উনি গুরুজন, বাবার গুরু। ওর সম্বন্ধে এসব কথা ভাবলেও পাপ হয়।

ছেলেরা চটে উঠল ঃ আপনার পাপ পুণ্য নিয়ে তবে আপনি থাকুন। আমাদের কাজ আমরা করলাম, সাবধান করে দিলাম আপনাকে। পরে যদি কিছু একটা হয় আমাদের দোষ দিতে পারবেন না।

হাসিমুখেই শঙ্কর কথাটাকে উড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু আস্তে আস্তে হাসিটা তার শুকিয়ে আসতে লাগল। দিনের পর দিন একই কথা, একই আলোচনা। চারদিকে একটা নিঃশব্দ অনিবার্য প্রস্তুতি যে চলেছে তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। নিজের চোখেই শঙ্কর দেখেছে খালপারের মসজেদে গভীর রাত্রে মশালের আলো—লাঠির ঠকাঠক শব্দ, দূরে কাছে নানা জায়গা থেকে টুকটাক খবর আসছে সব সময়ে। আর চোখ বুজে থাকা চলে না।

এতদিনে একটা নতুন সত্য আবিষ্কৃত হল শঙ্করের কাছে, খুলে গেল একটা নতুন দিক। উস্তাদজীর সমস্ত পরিচয় ছাপিয়ে একটি মাত্র পরিচয় মনের মধ্যে ক্রমাগত আঘাত করতে লাগল : উস্তাদজী গুণী নন, উস্তাদজী আর কিছু নন তিনি মুসলমান। এবং ফলে তাঁকে বিশ্বাস করা চলে না।

আজকাল তাই শঙ্কর একটা বিচিত্র নতুন চোখে তাকায় উস্তাদজীর দিকে। সে চোখে শ্রদ্ধা নেই, নবাবী আমলের আতিশয্যের প্রতি সকৌতুক কৌতূহল নেই কোথাও। আছে সন্দেহ, আর আছে বিশ্লেষণ।

কিন্তু উস্তাদজীর দৃষ্টি নিষ্প্রভ, তিনি বুঝতে পারেন না। একটা ছেলেমানুষি খুশির অকারণ জোয়ার এসেছে তাঁর ভেতরে, কেটে যাচ্ছে সেই ধ্যানপ্রশান্ত নির্লিপ্ততা। ডাক দিয়ে বলেন, আও বেটা, তোমাকে একখানা জৌনপুরী শুনাই।

শঙ্কর সংক্ষেপে জবাব দেয়, কখনো জবাব দেয় না। নিজের আনন্দে উস্তাদজী একটার পর একটা রাগিণী বাজিয়ে চলেন, যেন বিস্মৃত যৌবন ফিরে এসেছে তাঁর। আর কালো মুখ করে শঙ্কর চলে যায় বাড়ির ভেতরে, উস্তাদজীর এই খুশি, এই আনন্দ—তাকে আরো বেশি সন্দিগ্ধ করে তোলে।

রমা একদিন জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার কী? দিনরাত এত সব কী ভাবো?

ইতস্তত করে শঙ্কর বলে ফেলল।

প্রথম কথাটা শুনে যেভাবে শঙ্কর হেসে উঠেছিল, ঠিক তেমনি করেই হেসে ফেলল রমা। বললে, তোমার মাথা খারাপ। এমন অসম্ভব জিনিস বিশ্বাস করলে কেমন করে?

যে জিনিসটা মনের দিক থেকে অবিশ্বাস করতে পারলেই বেঁচে যেত শঙ্কর, ঠিক সেই কথাটা রমার মুখে শোনামাত্র একটা ক্ষিপ্র প্রতিক্রিয়া ঘটে গেল তার ভেতরে। ঝন্‌ঝনিয়ে উঠল চৌধুরীবংশের আভিজাত্য—প্রতিবাদ অসহিষ্ণুতা; বিশেষ করে স্ত্রীলোকের প্রতিবাদ।

মুখের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল শঙ্করের, বিতৃষ্ণ বিকট হয়ে উঠল কন্ঠস্বর : তুমি চুপ কর।

—চুপ করব? কেন? তুমি কি পাগল?

—যা জান না তা নিয়ে তর্ক করতে এসো না। বিশ্বাস আছে ওদের? হয়তো এসে ঘুমের মধ্যে ঘ্যাঁচ করে ছোরা বসিয়ে দেবে।

—কিন্তু—

—আর বাজে বোকো না—নিজের কাজে যাও—

কথাটা বলে দুম দুম করে শঙ্কর নিজেই সরে গেল, আর পাংশু বিশীর্ণ মুখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রমা।

একটা পাশার আড্ডা আছে গ্রামে। সন্ধ্যার দিকে শঙ্কর রোজ যায় সেখানে, ফিরতে দশটা সাড়ে দশটা বাজে। আপাতত পাশা খেলা বন্ধ হয়ে গিয়ে সেখানে লাঠি খেলা শেখানো হচ্ছে।

পাশার ভেতরে তবু নিজেকে ভুলে থাকবার একটা উপায় ছিল, কিন্তু সে পথ এখন বন্ধ। আর ভাল লাগে না, সমস্ত স্নায়ুগুলো যেন বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। ঘরশত্রু বিভীষণের আশঙ্কাটা একটা ক্ষয়রোগের মতো দিনের পর দিন যেন কুরে কুরে খাচ্ছে তাকে। রাত্রে ঘুম আসে না, উত্তেজনায় আর অস্বস্তিতে যেন তার শিরাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়তে থাকে। কিছু একটা করা দরকার, উস্তাদজী সম্পর্কে কিছু একটা করা উচিত। কিন্তু কী করা সম্ভব ?

বিদায় করে দেবে বাড়ি থেকে ? না, সেও অসম্ভব। পনেরো বছর আগে যে গৌরবে মেহেরা খাঁ এ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন আজ তাঁকে সেই গৌরব থেকে অপসারিত করা অসাধ্য শঙ্করের পক্ষে। শ্রদ্ধা না করুক —ভয় করে তাঁকে, তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে অত্যন্ত ছোট মনে হয় নিজেকে। তাঁর সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটা কিছু তাঁকে বলবে এতবড় স্পর্ধা নেই তার।

ভারি ক্লান্তি লাগছে, অসহ্য একটা অস্বস্তির পীড়নে জ্বলে যাচ্ছে শরীর, পুড়ে যাচ্ছে মন। আজ তাই অসময়ে, সন্ধ্যার পরেই বাড়ির দিকে ফিরছিল শঙ্কর।

কিন্তু দেউড়ির কাছাকাছি আসতেই উৎকর্ণ একটা কুকুরের মতো থমকে দাঁড়াল শঙ্কর—যেন সমস্ত ইন্দ্রিয় তার আসন্ন কিছু একটার সংকেত পেয়েছে। উস্তাদজীর ঘরের দরজা বন্ধ, কিন্তু সেখানে কারা ফিসফিস করে কথা বলছে না ? হ্যাঁ—ঠিক, কোনো ভুল নেই।

শঙ্করের সমস্ত শরীর যেন পাথর হয়ে গেল, বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে লাগল হৃৎপিণ্ড, চোখে মুখে ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল রক্তের কণা। আর ভুল নেই।

এগিয়ে এসে শঙ্কর কঠিনভাবে ঘা দিলে দরজায় ঃ উস্তাদজী, উস্তাদজী !

এক মুহূর্তের স্তব্ধতা। তার পরেই ঘরের ভেতরে টের পাওয়া গেল একটা অস্পষ্ট চঞ্চলতার শব্দ। তার পরেই পেছন দিকের দরজা খুলে কে যেন ছুটে বেরিয়ে গেল।

শঙ্কর ঘুরে গিয়ে তাকে ধরবার চেষ্টা করল, কিন্তু তার আগেই সে যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে গেছে। হিংস্র বাঘের মতো মুখ করে উস্তাদজীর ঘরে ঢুকল শঙ্কর।

ঘরে আলো জ্বলছে। বিছানার ওপরে বসে আছেন উস্তাদজী। তাঁর চোখে মুখে শঙ্কার ছাপ। কোলের ওপর পড়ে আছে সেতারটা।

শঙ্কর কঠোর স্বরে বললে, ঘরে কে এসেছিল উস্তাদজী ?

উস্তাদজীর ঠোঁট দুটো একবার কেঁপে উঠল।

—কে এসেছিল ?

—আমি বলতে পারব না।

ঘৃণায় আর ক্রোধে কুটিল হয়ে উঠল শঙ্করের মুখ ঃ আমি জানতে চাই।

আবহাওয়াটা লঘু করবার চেষ্টা করলেন উস্তাদজী, ম্লানভাবে হাসলেন একটুখানি ঃ তোমার বাপকে আমি হুকুম করতাম আর তুমি কিনা আমাকে হুকুম করতে চাও ?

বীভৎস গলায় শঙ্কর বললে, চালাকি চলবে না। বলতে হবে আপনাকে।

উস্তাদজীর মুখ লাল হয়ে উঠল। মৃদু কণ্ঠে বললেন, আমি সত্যবন্ধ—বলতে পারব না। আর তা ছাড়া সে জেনে তোমার কোনো দরকার নেই। নিজের কাজে যাও বেটা।

শঙ্কর বললে, বলতে হবে না, আমি বুঝেছি। দুধ দিয়ে বাবা কালসাপ পুষেছিলেন। আমার ঘরে বসে আপনি আমারই সর্বনাশ করতে চাইছেন।

তীরের মতো সোজা হয়ে উস্তাদজী দাঁড়িয়ে উঠলেন ঃ বেওকুফ, বেতমিজ, কী বলছ তুমি !

—বলছি আপনি বেইমান। আমার বাড়িতে বেইমানের জায়গা নেই।

বেইমান ! উস্তাদজীর মুখ থেকে সমস্ত রক্ত যেন সরে গেল, সাদা হয়ে গেল কাগজের টুকরোর মতো। সিংহের মতো চিৎকার করে উঠলেন তিনি ঃ চোপরাও বেতমিজ।

শঙ্কর পাথরের মতো শক্ত স্বরে বলল, আমি চুপ করব, কিন্তু আজই আপনাকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে ওস্তাদজী।

ক্রোধে অপমানে উস্তাদজী থর থর করে কাঁপতে লাগলেন ঃ তুমি—তুমি আমাকে এমন কথা বললে !

শঙ্কর বললে, বললাম। আপনি বিশ্বাসঘাতক, আপনি বেইমান !

উস্তাদজী বসে পড়লেন। একটা কথা বললেন না, চাইলেন না একটা কৈফিয়ৎ। তার পরের দিন সকালে আর তাঁকে দেখতে পাওয়া গেল না। চল্লিশ বছর আগে আশিক বাঈ যাঁকে দেওয়ানা করে দিয়েছিল, চল্লিশ বছর পরে আবার তিনি 'ই দেওয়ানা দুনিয়ামে' বেরিয়ে পড়লেন বার্ধক্য-শিথিল, ক্লান্ত পদক্ষেপে।

কিন্তু দিওয়ানা হতে চাইলেই কি হওয়া যায় ? এতদিন পরে কখন যে নিবিড় হয়ে মনের ভেতরে ফাঁস পড়ে গেছে উস্তাদ মেহেরা খাঁ তা কি ভাবতেও পেরেছিলেন ? যাকে তিনি ভেবেছিলেন মুম্বইয়ের নীল সমুদ্রে চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে তা আবার এমনভাবে ফিরে এল কী করে ?

'যো দিন যাওয়ি বাহুড়ি সো আওয়ি।'

যে দিন যায় সে আবার ফিরে আসে। আবার নতুন করে মনের কাছে ফিরে এসেছে আশিক বাঈ। সব রাগ-রাগিণীর পাঠ তাকে তিনি দিতে চেয়েছিলেন, শুধু দিতে পারেননি টোড়ী। ব্যথা ছিল, বেদনা ছিল; ছিল নিজের ভেতরে নিভৃত দুঃখ সম্ভোগের মোহ। কিন্তু আর সে মোহ নেই, সে দুঃখের অবসান হয়ে গেছে। যাকে তিনি সব ধরে দিলেন, আজ তাকে তাঁর শেষ অর্ঘ্য, তাঁর টোড়ী তুলে না দেওয়া পর্যন্ত মুক্তি নেই দেওয়ানা ফকিরের।

বৃষ্টি পড়ছে দাঙ্গা-কলঙ্কিত কলকাতায়—নেমেছে শোকের মতো শ্রাবণের রাত্রি। তানপুরা কাঁধে পথে পথে ঘুরছেন উস্তাদজী। পা টলছে, চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন। তিনদিন খাওয়া হয়নি। সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে, ক্লান্তিতে শরীর যেন লুটিয়ে পড়ছে তাঁর। এ নরোত্তমপুর নয়, নবাবী আমলের বাগ্-বাগিচা আমদরবারের শহর দিল্লী নয়। এ কলকাতা—আধুনিক, উদ্ধত। এখানে উস্তাদজী কোথায় খুঁজে পাবেন তাঁর আশিক বাঈকে—কেমন করে তার হাতে তুলে দেবেন তাঁর শেষ অর্ঘ্য ?

নির্জন পথ—অন্ধকার। হঠাৎ দুদিক থেকে দুজন গুণ্ডা চেহারার লোক এসে তাঁর হাত ধরল।

—এই মিঞা সাহেব, যাবে কোথায় ?

অদ্ভুত আবিষ্ট চোখে উস্তাদজী তাকালেন।

—বলতে পারো ভাই, এখানে শংকর চৌধুরীর বাড়ি কোথায় ?

—শংকর চৌধুরীর বাড়ী—লোক দুটো হিংস্র জন্তুর মতো হেসে উঠল শব্দ করেঃ খুব কাছেই। পাশের এই অন্ধকার কানা গলিটার ভেতরে। সদর রাস্তাতেই পেঁছে দিতে পারতাম, কিন্তু কানা গলিই সুবিধে—শর্ট কাট্। চলে এসো।

নির্জন পথ। শ্রাবণের অশ্রুধারার মতো অশ্রান্ত বৃষ্টি। উস্তাদ মেহেরা খাঁর শেষ অর্ঘ্য আর পেঁছিল না। কিন্তু বেশিদিন লুকোচুরি তো চলবে না শংকরের কাছে। একদিন বুঝতে পারবে শংকর—একদিন জানতে পারবে টোড়ী রাগিণীর পাঠ শেষ না করেও কত ভালো সেতার শিখেছে রমা। নিভৃত অন্ধকার ঘরে তার সেই একনিষ্ঠ সাধনা, তার গুরুর আশীর্বাদ সার্থক হয়েছে।

কালো বদর

উত্তরে বলে মেঘনা। তারও উত্তরে ব্রহ্মপুত্র, আরও উত্তরে যেখানে হিমালয়ের বুকের ভেতর থেকে ফেনায় ফেনায় গর্জে বেরিয়ে আসছে সেখানকার ইতিহাস কেউ বলতে পারে না।

মেঘের মতো জলের রঙ বলে নদীর নাম দিয়েছিল মেঘনা। এখানে এসে নাম হল কালাবদর। শুধু মেঘবরণ জল নয়, অদূর সমুদ্রের ঘন নীলিমাও যেন এর ভেতরে এসে সঞ্চারিত হয়ে গেছে। দিনে রাতে দুবার মাত্লা হাতীর ঝাঁকের মতো ছুটে আসে জোয়ারের জল—এদেশে বলে 'শর' এল। সে তো আসা নয়, বলতে হয় আবির্ভাব। পাহাড়-প্রমাণ উঁচু হয়ে ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসে ক্ষ্যাপা জলোল্লাস, রাশি রাশি মল্লিকা ফুলের মালার মতো ফেনার ঝালর দুলতে থাকে তার সর্বাঙ্গে, জলকণার একটা ছোট 'কুয়াশা' ঘুরতে থাকে তার মাথার ওপর আর দুদিকের তটের গায়ে প্রবল শব্দে আছড়ে পড়ে তার পাশব-মত্ততা। একখানা ছোট নৌকোও যদি তখন কূলে

বাঁধা থাকে, মুহূর্তে হাজারখানা হয়ে কুটোর মতো মিলিয়ে যায়, কখনো আর তার সন্ধান মেলে না।

কালাবদর। পাঁচ পীর বদর বদর করে পাড়ি ধরে মাঝিরা। উৎসুক আকুল চোখে আকাশটাকে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখে কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা একফালি সোনামুখী মেঘ। বিশ্বাস নেই এই সর্বনাশা নদীকে। মেঘ দেখলেই কালো ময়ূরের মতো আনন্দে পেখম মেলে দেয়, নাচতে শুরু করে ভৈরবী উল্লাসে। তখন ছোট নৌকো তো দূরের কথা, জাহাজে পর্যন্ত সামাল সামাল ওঠে!

বিশাল ভয়ংকর নদী কালাবদর। কাল-কেউটের মতো তার জলের রঙ—তার গর্জনে কোটি কোটি বিষাক্ত কেউটের ফোঁস-ফোঁসানি। ঝড় ওঠে, নৌকো ডোবে, মানুষ মরে। শরের ঘা লেগে উঁচু ডাঙাসুদ্ধ নারকেল-সুপারির গাছ ভেঙে পড়ে করাল স্রোতে। কালীদহ ছেড়ে কালীয়নাগ কালাবদরে এসে বাসা বেঁধেছে।

আলাইপুরের খালটা যেখানে মানুষের প্রসারিত একটা মুঠির মতো হঠাৎ চওড়া হয়ে কালাবদরে এসে পড়েছে, ওইখানেই 'কেরায়া' নৌকোগুলোর আড্ডা। পাগলা শরের ভয়ে মাঝিরা পারৎপক্ষে নৌকো নদীর ওপরে রাখে না, খালের এই মুখটুকুর ভেতরে ঢুকেই লগি পোঁতে। বিশ্বাস নেই কালাবদরকে। হয়তো একটুখানি বাজার করতে গেছে, কিংবা সংগ্রহ করতে গেছে দুটো একটা মাছ—এমন সময় এল নদীর মাতলামি, ফিরে এসে মাঝি দেখলে নৌকো তো দূরের কথা, তার কাছিটির চিহ্ন অবধি নেই। খাল এদিক থেকে নিরাপদ। জলের ঝাপটা ভেতরে যতটুকু আসে তা নৌকোকে একটু-খানি নাগরদোলায় দুলিয়ে যায় মাত্র, তার বেশি আর কিছুই করে না।

খালে আজ বেশি নৌকো ছিল না। কফিলদ্দি মাঝি সবে পেঁয়াজকলি দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোলটা চাপিয়ে দিয়েছে, এমন সময় এল সোয়ারী।

—ও মাঝি ভাই, কেরায়া যাবা?

—যাইবেন কই?

—জাউলা!

—জাউলা? জাউলার হাট?

—হ।

—কন কী? হারা (সারা) রাত্তির পাড়ি দেওনের কাম।

—করমু কি কও? বিয়া আছে, যাইতেই অইবে।

—হঃ বুঝছি।

এতক্ষণ অন্যমনস্কভাবে অভ্যস্ত রীতিতে কথা বলছিল কফিলদ্দি, হুঁকোয় অল্প অল্প টান দিচ্ছিল নিরাসক্তভাবে। এইবার ধীরেসুস্থে মুখ থেকে হুঁকোটা নামালে, কল্কের আগুনটা ঝেড়ে দিলে খালের ঘোলা জলে। জল-স্রোতের মধ্যে ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ করে পোড়া টিকের টুকরোগুলো পড়তে লাগল,

কালো ছাইয়ের একটা সরল রেখা লগিটার চারদিকে পাক খেয়ে তীব্র বেগে নদীর দিকে চলে গেল।

—ক্যারায়া দিবেন কত ?

—বুঝিয়া-সুজিয়া লও ভাই, তোমাগো আর কমু কি ?

—তমো কয়েন ? (তবু বলুন ?)

—পাউচ্‌গা টাহা দিমু (পাঁচটা টাকা দেব)—এয়ার বেশি না।

—হেইলে হাতর দিয়ে যায়েন (তা হলে সাঁতার দিয়া যান), নায়ে নায়ে চড়নের কাম নাই। এটাও অভ্যস্ত জবাব। কিন্তু এ অভ্যাস বেশিদিনের নয়, যুদ্ধ বাধবার পর থেকে। আগে মাঝিরাই সোয়ারীর তোয়াজ করত, চার আনা ভাড়া বেশি দেওয়ার জন্যে আল্লার দোহাই পাড়ত, দুহাত জোড় করে বলত : আইচ্ছা আইচ্ছা, বেশি না দ্যান, কুদ্‌ ঘাটের (সরকারী কর-সংগ্রহের ঘাট) পয়সা আর এক ব্যালার জলপান দিবেন :

কোথায় গেল সে সব। আশ্চর্যভাবে ঘুরল পৃথিবীর চাকা—সময়ের চাকা। যুদ্ধ গেল, মন্বন্তর গেল। মরল হাজারে হাজারে মানুষ। কালা-বদরের কালো জলে যারা ডুবে মরে, তারপর ভেসে ওঠে প্রকাণ্ড একটা জয়ঢাকের মতো, তাদের মতো করে নয়। বরং শুকিয়ে মরল, এতবেশি শুকিয়ে মরল যে ফুলবার মতো শরীরে আর কিছু রইল না, শুকনো হাড়ের থেকে চিম্‌সে চামড়া গলে গলে মিলিয়ে গেল মাটিতে। হাড়ের ওপরে ঠোকা মেরে ঠোঁট ঘুরিয়ে অবজ্ঞায় উড়ে চলে গেল শকুনের পাল। আর পৃথিবী বদলালো। যারা বাঁচল, তাদের একটাকা কেরায়া উঠল পাঁচ টাকায়, তাদের মেজাজ হল হাজার-বিঘে ধান-জমির মালিক তালুকদারের মতো। সুতরাং হুঁকো নামিয়ে নিবিষ্টভাবে আবার ঝোলের কড়াইয়ের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করলে কফিলদ্দি।

—লও, আর আন্ট আনা দিমু, হোন্‌ছো (শুনছো) ? কথা কও না দেহি ?

—কমু আর কি ? পাঁচ-ছয় টাহার কাম না কত্তা—দউশগার কোমে কথা নাই।

—ওরেঃ, ডাহাইত (ডাকাত) ! মাথায় বাড়ি দিতে চাওনি ?

অবজ্ঞাভরে খালের জলে থুথু ফেললে কফিলদ্দি : চাউলের মোন হইছে কুড়ি টাহা—হেয়া দ্যাহেন না ?

—লও ভাই, আর অ্যাট্টা (একটা) টাহা ধর। আর বগড় বগড় দিয়া কাম নাই।

এতক্ষণে যেন চমক ভাঙল কফিলদ্দির। এতক্ষণে সে এদের দিকে তাকালো। মধ্যবয়সী একটি পুরুষ, গায়ে ময়লা একটা ছিটের সার্ট, পায়ে একজোড়া মলিন জুতো। রোগা চেহারা, গলার হাড়টা থুতনীর নীচ দিয়ে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। হাতে একটা ছোট পুঁটলি। তার পেছনে ঘোমটা দেওয়া একটি বউ, একখানি ডুরেশাড়ীর নীচে তার রোগা রোগা

দুখানি পা দেখা যাচ্ছে। মুখখানি ঘোমটায় ঢাকা—কিন্তু পায়ের দিকে তাকিয়েই কফিলন্দি বুঝতে পেরেছে ওই মেয়েটির মুখে পুরুষটির মতোই ক্লান্তির কালো ছাপ আঁকা রয়েছে। মধ্যবিত্তের পরিচিত ক্লান্তি আর অবসন্নতা।

শেষ পর্যন্ত রফা হল সাত টাকায়।

আলাইপুরা থেকে জাউলার হাট কোণাকুনি পাড়ি, প্রায় বারো মাইল পথ। মাঝখানে হাসানদির আধ-জাগা লম্বা চড়াটা ছাড়া আর ডাঙা নেই কোনোখানে। রাত্রির ছায়ায় কালাবদরের কালো জল হয়ে গেল নিকষ কালো, তারপর কখন একফালি মেঘ এসে চিকচিকে তারাগুলোর ওপর দিয়ে ঘন একটা পর্দা টেনে দিয়ে গেল।

তখন ঝিরঝির করে বাতাস বইছিল নদীতে। আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল বাতাসের বেগ। কালাবদরের কালো ঢেউয়ের মাতন শুরু হয়ে গেল। অন্ধকার জলের ওপরে উজলে উজলে উঠতে লাগল ফেনার রাশি। একটা ঢেউয়ের মাথা থেকে নৌকোটা প্রবল বেগে আর একটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বিরক্ত ভ্রূকুটি ফুটে উঠল কফিলদ্দির কপালে। কালাবদরের এমন মাতামাতি কিছু অস্বাভাবিক নয়। তার এক-কাঠের শালতি ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ঘোড়ার মতো জোর কদমে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে চলে যাবে তাও সে জানে। হাজার ঝাপটা লাগলেও তার নৌকোর তলার জোড় খুলবে না। কিন্তু ছুটন্ত তেজীয়ান ঘোড়াকে যেমন রাশ টেনে সামলে সামলে রাখতে হয়, তেমনি তাকেও আজ সারারাত নৌকো সামলাতে হবে। পালের মুখে ছেড়ে দিয়ে গলুইয়ের ওপরে একটুখানি কাত হয়ে নেবার আশা আজ বিড়ম্বনা, নদী আজ সারারাত ভোগাবে বলে বোধ হচ্ছে।

চারদিকে জলের গর্জন উঠছে। আকাশে জোরালো মেঘ নেই, মাঝে মাঝে পাতলা পর্দাটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে গিয়ে উঁকি দিচ্ছে তারা। কিন্তু বাতাসের বিরাম নেই—ঢেউ উঠছে সমানভাবে। হাতের পেশীগুলোকে দৃঢ় করে কফিলন্দি নৌকোটাকে আর একটা বড় ঢেউয়ের ওপর দিয়ে বার করে নিয়ে গেল।

ভেতরে স্বামী-স্ত্রী বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ চমকে উঠল তারা।

—ও মাঝি ভাই, মাঝি ভাই?—পুরুষটির গলা।

জলের দিকে স্থির চোখ রেখে কফিলন্দি বললে, কী কন, কন কী?

—গাং দেহি ক্যামন ক্যামন ঠ্যাকে। কাইতান (কার্তিকী তুফান) ওঠল নাকি?

চিন্তিত স্বরে কফিলদ্দি বললে, মনে তো লয়।

—খাইছে! পুরুষটির স্বরে ভয়ার্ত কাতরতা ফুটে বেরুল: নাও কোনহানে (খানে)?

—মদ্য গাঙে (মাঝ নদীতে)।

—হাসানদির চর ?

—ঠাহোর পাইতে আছি না।

—এ্যাহোন করন কি ?—কফিলদ্দি মেয়েটির একটা অস্ফুট আর্তনাদও যেন শুনতে পেল।

—ডরাইবেন না, চুপ মারিয়া শুইয়া থাকেন। আমার নাও ডোবেবে না।

—কইবে কেডা ? যে রাইক্কোসা (রাক্ষুসে) গাঙ—মানুষ খাউনের লইগ্যা জেব্বা (জিহ্বা) বাড়াইয়া রইছে।

—নাও ফালাইতে (ডোবাতে) এয়ার আর দোসর নাই।

মেয়েটির আর্তনাদ এবার স্পষ্টই শুনতে পেল কফিলদ্দি। আর সঙ্গে সঙ্গেই কেমন একটা বিশ্রী বিরক্তিতে তার মনটা আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। রূঢ় গলায় বললে, ফ্যাগড়া প্যাচাল পাড়েন ক্যান্ কত্তা ? (বাজে বক্‌ছেন কেন ?) চুপ মারিয়া শুইয়া থাহেন কইলাম। আমার নাও গেলনের আগে নদীরে পীরের সিন্নি খাইয়া আইথে লাগবে। (আমার নৌকো গিলবার আগে নদীকে পীরের সিন্নি খেয়ে আসতে হবে।)

—বাচাইলে তুমি বাচাইবা, মরলে তোমার হাতেই মরুম—পুরুষটি মূঢ় অসহায় গলায় জবাব দিলে।

—মরণের অ্যাহোন হইছে কি ? খামাক্‌খা (খামোকা) হাবিজাবি কইয়া মাঠারইনরে ডরাইতে আছেন, চোপাহান (মুখখানা) একটু ক্ষ্যামা দিয়া থোয়ূন।

চুপ করে গেল পুরুষটি। কফিলদ্দির কণ্ঠস্বরের রূঢ়তাটা তাকে নিরুৎসাহ করে দিয়েছে। বিপদে পড়লে খানিকটা প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে মানুষ, কথার ভেতর দিয়ে মনের থেকে নামিয়ে দিতে চায় পুঞ্জিত ভয়ের বোঝাটা। কিন্তু সে অবস্থা নয় কফিলদ্দির। হাতের পেশীকে লোহার মতো শক্ত করে যখন ক্ষ্যাপা ঘোড়ার মতো উচ্ছৃংখল ঢেউকে একটার পর একটা টপকে যেতে হচ্ছে, যখন চোখের দৃষ্টিকে রাত্রিচর পাখীর মতো তীক্ষ্ণ তীব্র করে রাখতে হচ্ছে নিকষ কালো অন্ধকারে ঢাকা চক্রবালের দিকে এবং যখন জানা আছে কালাবদরের এই মাঝ গাঙে দুশো হাত লগিরও থই মিলবে না, তখন উৎসাহের অভাবটা কফিলদ্দির তরফ থেকে একান্ত স্বাভাবিক এবং সঙ্গত।

আকাশে হাল্‌কা হাল্‌কা মেঘ বটে, কিন্তু এককোণে পেটা লোহার একটুকরো পাতের মতো খানিকটা ঘন কৃষ্ণতা লেপ্‌টে আছে আকাশের গায়ে। ঝড়াং ঝড়াং করে লাল-বিদ্যুতের এক একটা শিখা সেখানে কতগুলো আগ্নেয় বাহু এদিক ওদিক বাড়িয়ে দিয়েই ফিরে যাচ্ছে আবার। কালাবদরের কালো জলটা অদ্ভুতভাবে কুটিল হয়ে হয়ে উঠছে সে আলোয়, যেন জলের তলা থেকে একটা অতিকায় অক্টোপাশ তার রক্তাক্ত বহুভুজগুলি নিয়ে মুহূর্তের জন্যে ভেসে উঠেই আবার হারিয়ে যাচ্ছে ভয়ঙ্কর গভীর অতলতায়। আর ওদিকে মাঝে মাঝে শঙ্কিত ভাবে তাকাচ্ছে কফিলদ্দি। ওই ইস্পাতের

পাতটা যদি ক্রমশ নিজেকে ছড়াতে আরম্ভ করে, যদি এক সময় একটা দমকা হাওয়ায় আচ্ছন্ন করে ফেলে সমস্ত আকাশটাকে, তাহলে—তাহলে—

পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে উঠল কফিলদ্দির। পাকা মাঝি, কালাবদরের কালো জলের সঙ্গে তার পরিচয় সুদীর্ঘ এবং ঘনিষ্ঠ। আর এই কারণেই নদীকে তার বিশ্বাস নেই। উন্মাদ কালাবদরের কাছে বড় বড় জাহাজও যা, একমাল্লাই সালতিরও সেই একই অবস্থা।

ঢেউয়ের বেগটা প্রবল হচ্ছে ক্রমশ—বাতাস এখন চোখে মুখে যেন ঝাপটার মতো ঘা দিতে শুরু করেছে। লাল বিদ্যুতের আকস্মিক উদ্ভাসে সামনে যতদূর চোখ যাচ্ছে শুধু ঢেউয়ের ফেনা উপচে উপচে পড়ছে। ভূতগ্রস্ত মানুষ যেমন বিশৃঙ্খলভাবে মাতামাতি করতে থাকে, গাঁজলা ভাঙে তার মুখ দিয়ে, তেমনি অসম্বৃত উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেছে নদী, তেমনি করে ফেনা গড়াচ্ছে তার লক্ষ লক্ষ মুখে। কালাবদরকে ভূতে পেয়েছে।

কালাবদরকে ভূতে পেয়েছে। হৃৎপিণ্ড থেকে একঝলক রক্ত যেন উছলে উঠে কফিলদ্দির মাথার মধ্যে গিয়ে পড়ল। বৈঠাতে প্রবলভাবে টান দিলে সে, নৌকোটা আকস্মিকভাবে যেন মস্ত একটা লাফ দিয়ে হাত তিনেক এগিয়ে গেল। নৌকোর ভেতরে ভয়ার্ত যাত্রী দুজন প্রায় হাহাকার করে উঠল।

—কী হৈল, ও মাঝি ভাই, হৈল কী ?

—চুপ করেন কইলাম না ?—কফিলদ্দি গর্জে উঠল ঃ অ্যাক্কালে চুপ !

যাত্রীরা চুপ করল। কোনো উপায় নেই, কিছু বলবার নেই। অসহায়, বিব্রত, মাঝির করুণার কাছে একান্তভাবেই আত্ম-সমর্পিত। কফিলদ্দি ইচ্ছা করলে ওদের খুন করতে পারে, রাত্রির অন্ধকারে পুঁতে দিতে পারে কালাবদরের যে কোনো একটা বালুচরের হোগলা-বনের মধ্যে, কেউ টের পাবে না, একটা রক্তের বিন্দু দূরে থাক, একটুকরো হাড়ও খুঁজে পাবে না কোনোদিন। নইলে একটা পাক দিয়ে চোখের পলকে ডুবিয়ে দিতে পারে নৌকো—মুহূর্তে তলিয়ে দিতে পারে ক্ষিপ্ত কালোজলের ভেতরে। কালাবদরের মাঝি—ওর আর কী, কিছুতেই ডুববে না, একটা খড়ের আঁটির মতো অবলীলাক্রমে ভাসতে ভাসতে ডাঙায় গিয়ে পৌঁছবেই শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু কফিলদ্দির আত্মবিশ্বাস নেই অতটা। কালাবদরকে সে চেনে, কালাবদরকে সে বিশ্বাস করে না। ঠিক কথা—এ সাধারণ নদী নয়, এ ভূতুড়ে। এর জলের ভেতরে শয়তান লুকিয়ে আছে, এর ঢেউয়ে ঢেউয়ে হাজার হাজার প্রেতাত্মা নেচে বেড়ায়। কত মানুষ যে এই নদীতে ডুবে মরেছে তার কি হিসেব আছে কিছু ? এর অদৃশ্য অতলতায় বালির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আছে শ্যাওলা-ধরা অসংখ্য কঙ্কাল, অসংখ্য নরমুণ্ডের শূন্য খোলের ভেতরে ডিম পাড়ছে গভীরচারী পাঙাস-মাছের দল, ডোবা নৌকোর পচা-ভাঙা কাঠের ভেতরে কিলবিল করে বেড়ায় রাক্ষুসে কামটের ছানা। আর, আর আছে প্রেতাত্মা। দুর্যোগের রাত্রে, ঝড়ের রাত্রে তারা উঠে আসে,

উদ্দাম জলের দোলায় দোলায় তাণ্ডব নাচে, অসহায় মানুষ পেলেই হিমশীতল কঙ্কাল বাহু বাড়িয়ে টেনে নেয় তাদের। সদ্য, নোনা-কাটা চরের হোগলা আর শোনঘাসের বনে ডাকাতের হাতে অপঘাতে যারা প্রাণ দিয়েছে, জলের গর্জনে গর্জনে তাদেরও বিকট অট্টহাসি বেজে ওঠে, তারাও—

গজরাচ্ছে কালাবদর, মেতে উঠেছে ফেনায় ফেনায়। লোহার চ্যাপ্টা পাতটার ভেতরে বজ্র ঝলকাচ্ছে, জলের মধ্যে লিক্ লিক্ করে উঠছে রক্তাক্ত অক্টোপাস। কফিলদ্দির সারা গা দিয়ে ঘাম ছুটতে লাগল। নৌকো এগোচ্ছে না—প্রতিকূল জল ক্রমাগত বাধা দিচ্ছে, ক্রমাগত প্রেতাত্মাদের কঙ্কাল হাতগুলো যেন তাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে। হু হু করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে, কোথাও যেন যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে কেউ। মাঝে মাঝে ঢেউয়ের মাথায় কী চিক চিক করছে, যেন সেই তাদের চোখ, সেই যারা—

—পাঁচ পীর বদর বদর—

হঠাৎ আর্তনাদের মতো শব্দ করে বিকটভাবে চেঁচিয়ে উঠল কফিলদ্দি। তার ভয় করছে, ভয় ধরেছে তার। জলের ভয় নয়, এই সব প্রেতাত্মাদের ভয়। মাঝে মাঝে এইরকম এক একটা আকস্মিক ভয়ে কালাবদরের মাঝিদেরও মন আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। কিন্তু কফিলদ্দি জানে এ খারাপ লক্ষণ, ভারী খারাপ লক্ষণ। দুর্যোগের রাত্রে যখন মরণ ঘনিয়ে আসে, তখনি এই ধরনের ভয় পায় মাঝিরা। কেউ ডুবে মরে, কেউ পাগল হয়ে যায়, কারো কারো জবাফুলের মতো রাঙা চোখ দুটোর ভেতর দিয়ে যেন রক্ত ফেটে পড়বার উপক্রম করে—মুখ দিয়ে এম্‌নি করেই ফেনা গড়াতে থাকে!

—লা ইল্লাহা, রসুলাল্লা—

না, না, এ ভয় চলবে না কফিলদ্দির। এ ইচ্ছে করে নিজের মৃত্যু ডেকে আনা ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষে ভয় পেলেই তার দুর্বল স্নায়ুর ওপরে ইব্‌লিশ তার প্রভাব বিস্তার করে, মানুষের অসতর্কতার সুযোগ নেবার জন্যেই তৈরী হয়ে থাকে জিন-পরী-প্রেতাত্মার দল! চোখ বুজে আবার প্রবল বেগে দাঁড়ে টান দিলে কফিলদ্দি। এ অন্ধকারে চোখ বুজে আর চোখ চেয়ে থাকা একই কথা।

নৌকোর পুরুষ যাত্রীটি আবার স্তব্ধতা ভঙ্গ করলে।

—ও মাঝি ভাই, হোন্‌ছো নি?

—কী কইথে আছেন?

—নায়ের পাল উড়াইয়া দ্যাও না? বায়ে (বাতাসে) লইয়া যাউক।

—হ, এতক্ষুণে অ্যাট্টা পণ্ডিতের মতো কথা কইছেন:—অত্যন্ত তিক্ত শোনালো কফিলদ্দির স্বর।

অপরাধীর গলায় পুরুষটি আবার বললে, ক্যান, অনেয্য কইছি নাকি? জোর কাইতান মারতে আছে, নাও ডুবাইয়া দে (ডুবিয়ে দেয়) কিনা বোঝতে আছি না। হেয়ার থিয়া (তার চেয়ে) বায়ে যেদিক লইয়া যায়—

—যা বোঝেন না, হেয়ার উপার কথা কইয়েন না কত্তা। দ্যাখতে আছেন

না গাঙের চেহারাডা ? বায়ে যদি সমুন্দুরে টানিয়া লইয়া যায়, হ্যাশে (শেষে) কী হরবেন (করবেন) ? লোনা সমুন্দুরে ডুবিয়া মরণের সাধ হইছে নি ?

তা বটে। এ যুক্তি নির্ভুল। কালাবদরের বুকে ক্ষ্যাপা বাতাস ক্রমশ ঝড়ের রূপ নিচ্ছে। এই ঝড়ের মুখে পাল তুলে দিলে দেখতে দেখতে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে কে জানে ? সমুদ্রে না হোক অন্তত তার মোহনার মুখে নিয়ে গিয়েও যদি ফেলে দেয়, তা হলে আর আশা নেই। কালাবদর যদি বা ক্ষমা করতে রাজী থাকে, কিন্তু ভয়ঙ্কর বিপুল সমুদ্রের ক্ষমা নেই ; কালাবদরের চাইতেও ঢের বেশি নিবিড় তার কালো রঙ, তার জলের মাতামাতি আরো উদ্দাম। কালাবদরে তবু কূল মিলতে পারে, কিন্তু সমুদ্র অকূল, আদি অন্তহীন।

—হেইলে উপায় ?

—খোদা ভরসা।

খোদা ভরসা। তাই বটে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুরুষটি চুপ করে গেল। আর জলের ক্ষিপ্ত কলধ্বনির মধ্যেও কফিলদ্দি শুনতে পেল মেয়েটির চাপা কান্নার শব্দ। ওরা ভয় পেয়েছে, অত্যন্ত পেয়েছে !

জলের সঙ্গে লড়াই করতে করতে হাতের পেশীগুলো যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে কফিলদ্দির। দাঁতের ওপর দাঁত চেপে বসেছে, শরীরের সর্বাঙ্গে বয়ে যাচ্ছে ঘামের স্রোত। এতদিনের পরিচিত অভ্যস্ত নৌকোটাও যেন আজ বাগ মানছে না। কী কুক্ষণেই আজ সে কেরায়া ধরেছিল।

হু হু হু হু। বাতাসের অশ্রান্ত আর্তনাদ। অন্ধকার জলের ওপরে থেকে থেকে রক্তাক্ত চমকানি। উঃ, বাতাসটা কি আজ আর কিছুতেই থামবে না ? চারদিকে প্রেতাত্মাদের গোঙরানি চলেছে সমানে, ঢেউয়ের মাথায় মাথায় তেমনি চিক চিক করে ঝিকিয়ে উঠছে কাদের বিষাক্ত কুটিল চোখ, ফেনাগুলো উছলে উছলে পড়ছে চারদিকে—যেন কাদের পৈশাচিক কঙ্কাল মুষ্টিগুলো ওদের নিষ্পিষ্ট করবার জন্যে বারে বারে খুলছে আর বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অপরিসীম ভয়ে আবার চোখ মুদে ফেলল কফিলদ্দি, শক্ত করে চেপে ধরলে চোখের পাতা দুটো—জলের দিকে আর সে তাকাতে পারছে না।

কফিলদ্দি ভয় পেয়েছে, ওদের চাইতেও বেশি ভয় পেয়েছে ! নদীর ভয় ? না। তার চাইতেও ভয়ানক—ভয়ানক—পিশাচের ভয়, অপদেবতার ভয়। এর চাইতেও অনেক কঠিন দুর্যোগের ভেতরে তার সালতি নির্ভয়ে পথ কেটে এগিয়ে গিয়েছে, মৃত্যুর রাক্ষসরূপ কালাবদর তাকে দেখিয়েছে অনেক বার। কিন্তু পাকা মাঝির বুক তাতে এমন করে আতঙ্কে ভরে যায়নি, এমন করে তার স্নায়ুকে শিথিল, নিস্তেজ করে দিতে পারেনি। বরং দুলে উঠেছে রক্ত—কলিজার ভেতরে বয়ে গেছে উত্তেজনার উত্তপ্ত জোয়ার। দাঙ্গার সময় বিরুদ্ধ দলের মধ্যে লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলে শিরায় শিরায় রক্ত যেমন টগবগ করে ফুটতে থাকে, তেমনি একটা কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংকল্পে সতেজ আর

সজাগ হয়ে উঠেছে চেতনা। কিন্তু আজ এমন হল কেন ? যেন মনে হচ্ছে আজ তার নদীর সঙ্গে সংগ্রাম নয়—এ যুদ্ধ কতকগুলো ভয়ঙ্কর অশরীরীর সঙ্গে, কতকগুলো অপঘাতে মরা হিংস্র প্রেতাত্মার সঙ্গে ? কেন হল ? এমন কেন হল ?

বৈঠা ছেড়ে দাঁড় ধরেছে কফিলদ্দি। তেমনি চোখ বুজে দাঁড় টেনে চলেছে—শরীরের সমস্ত শক্তিকে সঞ্চারিত করে নিয়েছে দুটো বাহুর মধ্যে। টানের সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা গলুয়ের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ছে নীচের দিকে—বুকের ভেতরে কী যেন চড় চড় করে উঠছে, হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ তার ছিঁড়ে যাবে নাকি ?

কেন এমন হল ? কেন ? সেও কি আজ পাগল হয়ে যাবে ? তার চোখ দিয়ে অমনি করে ফেটে পড়বে রক্ত ? আধহাত জিভ বার করে দিয়ে সেও হাঁপাবে একটা ক্লান্ত কুকুরের মতো আর থেকে থেকে আকাশ-ফাটানো এক একটা অর্থহীন ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করে উঠবে ?

—লা ইল্লাহা—রসুলাল্লা—

জিন জেগে উঠেছে, প্রেতমূর্তিরা মাথা তুলেছে চারদিকে। এ বাতাসের শব্দ নয়, তাদের আর্তনাদ ; এ জলের গর্জন নয়, তাদের গোঙরানি ; ফেনায় ফেনায় তাদেরই কঙ্কাল মুঠিগুলো মানুষের গলা টিপবার একটা লোলুপ উল্লাসে প্রসারিত হয়ে উঠেছে।

কালাবদরকে ভূতে পেয়েছে, পালাতে হবে এর কাছ থেকে ! এ প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ নয়, অলৌকিক সত্তার সঙ্গে। রহমান-রহিমতুল্লা ! দাঁড়ের ঝাঁকিতে ঝাঁকিতে হোঁচট খাওয়া মাতালের মতো অসংলগ্ন গতিতে চলেছে নৌকা—কফিলদ্দির হৃৎপিণ্ডটা কখন বুঝি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

হু হু হু হু। বাতাসের বিরাম নেই। উন্মত্ত কালোজলে মুহুর্মুহু ভেসে উঠছে রক্তাক্ত অক্টোপাসটা। নৌকার যাত্রী দুজন পরস্পরকে জড়িয়ে পড়ে আছে মূর্ছিতের মতো, আর অশরীরীদের সঙ্গে লড়াই করে অমানুষিক শক্তিতে দাঁড়ে ঝাঁকি মারছে কফিলদ্দি—আল্লা, আল্লা, নবী !

আকাশে মেঘের পর্দাটা আরো ঘন হয়ে চেপে বসছে। অন্ধকার। দুর্ভেদ্য, আদি অন্তহীন।

সোয়ারী নামিয়ে দিয়ে কফিলদ্দি ময়লা গামছা পেতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। বেশ বেলা হয়েছে, মিষ্টি নরম রোদে ধুয়ে যাচ্ছে পৃথিবী, সোনা মেখে ঝলমলিয়ে উঠেছে কালাবদরের জল। দুর্যোগের চিহ্নমাত্র নেই কোনোখানে।

এমন কিছু অসম্ভব দুর্যোগ নয়, তবু কাল রাত্রে কেন এত ভয় পেল কফিলদ্দি ?

আর আশ্চর্য, তখনি একটা কথা বিদ্যুৎচমকের মতো মনের মধ্যে সাড়া দিয়ে উঠল। সোজা হয়ে কফিলদ্দি উঠে বসল, সরিয়ে ফেললে পাটাতনের তক্তা একখানা। চোখে পড়ল শানানো মস্ত রামদাখানা সেখানে ঝকমক করছে।

আরো মনে পড়ল, মহাজনের দেনায় জ্বালাতন হয়ে কাল সে ক্ষেপে গিয়েছিল। কাল সে চেয়েছিল প্রথম ডাকাতি করতে, প্রথম মানুষ খুন করে রক্তের আস্বাদ নিতে। কিন্তু কথাটা সে ভুলে গেল কেন? কাল রাত্রে কালাবদরের জলে যারা তাকে ভয় দেখিয়েছিল তারা কি প্রেতাত্মা? না, আল্লার ক্রোধ সহস্র সহস্র তর্জনী তুলে শাসন করেছিল তার পাপকে, তার মনের ভেতরে লুকিয়ে থাকা ইবলিশকে? বিমূঢ়ের মতো রামদাখানার দিকে তাকিয়ে রইল কফিলদ্দি! কী আশ্চর্য, কথাটাকে এমন করে ভুলে গেল কেমন করে?

নরম রোদে অপূর্ব প্রশান্ত হয়ে গেছে কালাবদর। কফিলদ্দির নৌকার গায়ে কুল্ কুল্ করে সস্নেহ আঘাত দিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ কালনাগিনী যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে, শুনতে পেয়েছে কোন সাপ-খেলানো বাঁশির সুর।